“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

পথ

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দে, ডি-এস্‌সি, (গ্লাসগো),
এম-আই-ই, এম-এ-ই,

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্জন

শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ,
পি-আর-এস্‌, ডি-লিট্‌,

শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ,
এম-এ, (ক্যান্টাব্‌)

পরিচালক

শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, এম-আই-এম-এ

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
আষাঢ়—১৩৩৮

কার্য্যালয়—২৮এ, মহারাণী হেমন্ত
কুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] আনা।

বার্ষিক (সডাক) ৬৲ টাকা

সূচী

"পথ"এর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি ঃ—

১। "পথ"এর বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৲, ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র, প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা।

২। বৈশাখ মাস হইতে নববর্ষ আরম্ভ হইল। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হয়। পত্রিকা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

	এক সংখ্যার	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০৲	২২০৲	৪০০৲
অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	২২৲	১২০৲	২২০৲
সিকি পৃষ্ঠা	১২৲	৬৪৲	১২০৲

স্বদেশী দ্রব্য প্রসারকল্পে নিম্নলিখিত **বিশেষ** হার নির্দ্দিষ্ট হইল ঃ—

	এক সংখ্যা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲	১১০৲	২০০৲
অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	১১৲	৬০৲	১১২৲
সিকি পৃষ্ঠা	৬৲	৩২৲	৬০৲
আবরণ পৃষ্ঠা	৪র্থ ৪০৲	২য় ৩০৲	৩য় ২৫৲

"পথ"এ প্রকাশের জন্য নূতন বিজ্ঞাপন ৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে, পুরাতন বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ১লা তারিখের মধ্যে জানান চাই।

প্রবন্ধ লেখকগণের প্রতি ঃ—

"পথ"এ প্রবন্ধ প্রকাশ করার ভার সম্পাদকমণ্ডলীর উপর। সঙ্গে ডাক টিকিট দেওয়া না হইলে অমনোনীত কোন প্রবন্ধ ফেরত বা কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

পরিচালক "পথ"
২৮এ, মহারাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিজ্ঞাপিত কোন দ্রব্য ক্রয়কালীন "পথ" এর নাম উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপিত কোন দ্রব্য ক্রয়কালীন "পথ"এর নাম উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন।

সৌর জগতের ইতিহাস

পথ

২য় বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩৮ | ৩য় সংখ্যা

গল্প

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্জন

ও

শ্রীযুক্তা গিরিবালা মিত্র-মজুমদার

"শুনব না"

"শোনা হবে না"

"কিছুতেই নয়"

"কথখনো নয়"

"যদি জীবনও যায়"

"এবার আমাদের অভিযান"

"আমাদের রাজ্যে"

"আমরা পাল্লা দেব"

"আমরা আমাদের পথ দেখে নেব"

"We have started .....began"

"সমানে সমান"

"এক পা পিছু নয়"

"তারা মানুষ, আমরাও"

"নিশ্চয়"

"কেন আমরা ছোট হয়ে থাকব ?"

"Not for anything—"

".. ...No none"

"কেন অধীন হব"

"কেন হব ?"

"কিসে আমরা ছোট ?"

"কোন্ কথাতে ?"

"তাদের শাস্ত্র কি আমাদের শাস্ত্র ?"

"A fun, a joke"

"A buffoonery"

"A bond of slavery"

"Injustice... .."

"তাদের শাস্ত্র তাদের গড়া"

"চিরকাল ধরে' "

"কেবল তাদের মনোমত করে' "

"শুধু তাদের সুবিধের জন্য"

"অবিচার"

"নিতান্ত অন্যায়"

"বিসদৃশ"

"Certainly, a thousand times"

"সব উল্টিয়ে দিতে হবে"

"তা হলে যদি দেনার পরিশোধ"

"অনাদি যুগের দেনা "

"পাহাড়ের মত জমেছে"

"মানুষকে অধম করে রেখেছে"

"পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষকে চেপে রেখেছে, পঙ্গু করে'......"

"এবং সে মানুষেই !"

"পৃথিবীর সব দেশে।"

"ঘোর লজ্জা !"

"Barbarous, unhealthy"

"Unholy"

"ভাব্‌তেও নিদারুণ"

"মনুষ্যত্ব এ বেদনা আর বইতে পারে না"

"বইবে না কখ্‌খনো !"

"সব দেশেই আজ নারী মাথা তুলেছে"

"Long may they live !"

"আমাদের অন্তরতম অভিনন্দন !—"

"বিজয় পতাকা দ্রুত অগ্রসর হ'ক !"

"তুলেছে, যেখানে যেখানে নারী আছে, সবখানেই মাথা তুল্‌বে।"

"অবধারিত"

"অত্যাচারে, অবহেলায়"

"বলো—পীড়নে, লাঞ্ছনায়"

"অসাম্যে"

"কিন্তু এই জাগরণ সুমঙ্গল"

"আমরা কি অসহায় !"

"তারা অবলা নাম এঁকে দিয়েছে "

"Fie"

"কি ঘৃণ্য !"

"আমাদের নিজেদের জন্য দুঃখ হয়।"

"কিন্তু দুঃখের অবসান হয়ে আস্‌ছে"

"মরে যেতে ইচ্ছে হয়"

"আর সইব না"

"সওয়া অপমান"

"চরম দুর্দ্দশা"

"আর নয়"

"প্রান্তে এসে tide ঘুরেছে শেষ আঘাত খেয়ে"

"বুঝতে পেরেছে এবার !"

"It's now our turn"

"আমাদের দিন এসেছে"

"পৃথিবী এগুচ্ছে, সত্য সত্য"
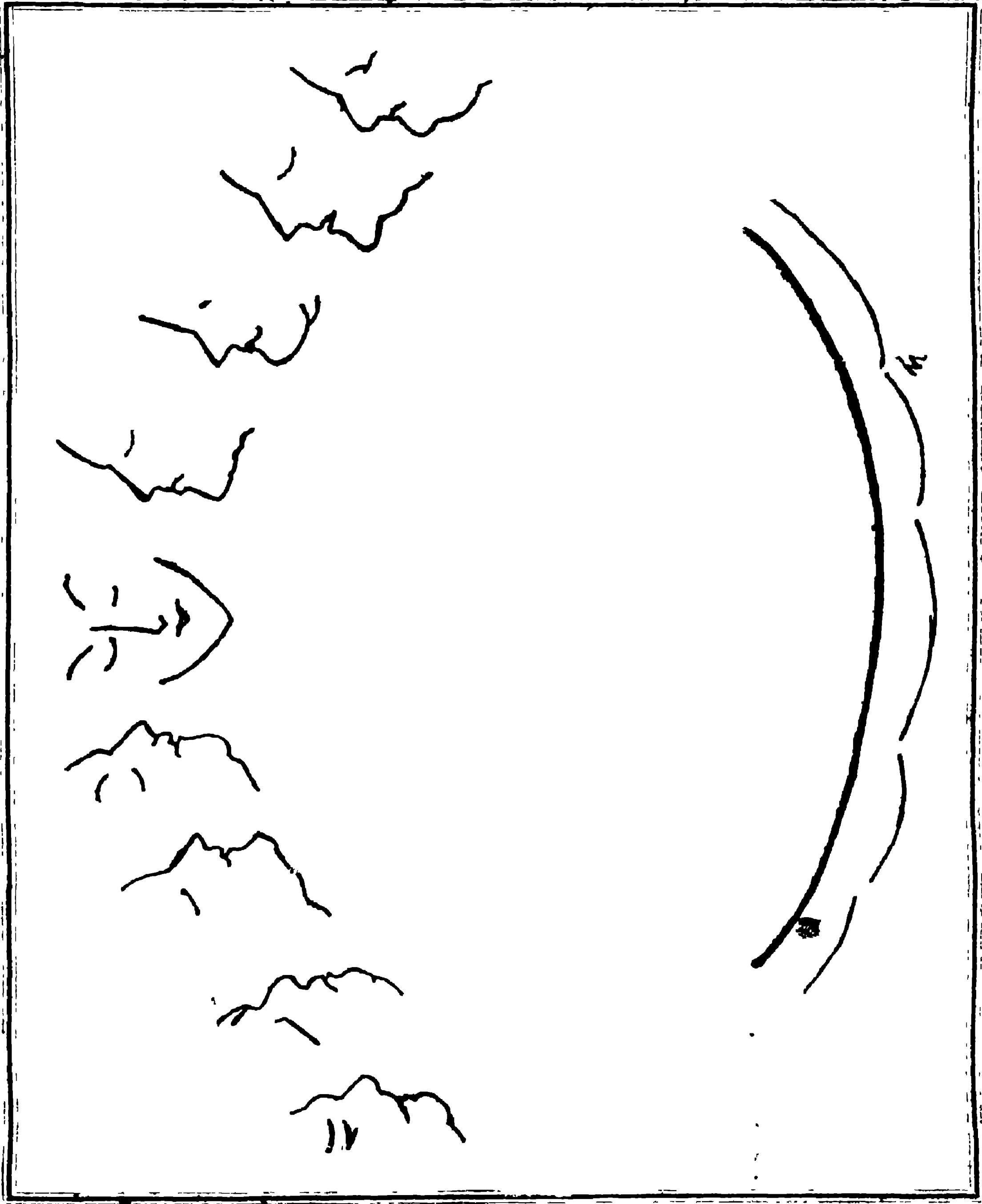
"It's nature's decree"
"Yes, আমরা প্রকৃতির সন্তান"
"জ্বলে উঠুক মনের আগুন "
"উঠুক .....কর্ত্তব্যে"
"আর নিভ্‌বে না"
"ধ্বংস করবে তাদের নিয়ম"
"তাদের শিকল"
"পুড়ে ছাই করবে"
"মুক্তির পথে—"
"তারা বলে—"
"Shame for them !"
"Nonsense"
"অনাবশ্যক"
"আর শুনে দরকার নেই"
"তারা বলেছে যে—"
"Stop their babbling"
"কি হবে ও দিয়ে ?"
"কাণটা তো আমাদের ? মাপ কর, আমরা আর শুন্‌তে ইচ্ছে করিনে।"
"তারা তো সবই বলে !"
"তাদের মুখের অমৃতে আমাদের তুলে রেখেছে মাথায় !"
"স্তোক !"
"The Paradise of untruth !"
"তাদের শ্লোক আর কাব্য ও আমরা আর পড়্‌ব না।"
"আমাদের রাজ্যে ও কাব্যের ঠাঁই আর নেই।"
"ও রকম Library আমরা আর চাইনে"
"আমরা জীবন চাই"
"That... is our goal."
"কাজের জীবন"
"সত্য জীবন"
"খাঁটি এবং—"
"সুমহিম"
"জ্ঞানের দিক দিয়ে, সম্পদের দিক দিয়ে, শান্তির দিক দিয়ে।"
"কর্ম্মে এবং ধর্ম্মে"
"স্বাস্থ্যে এবং শক্তিতে"
"এবং অনধীনতায়"
"A life,·· real, worthy"
"Yes, মনুষ্যত্বে"
"রীতিমত তৌলে ওজন করা"
"তারা বল্‌ছে সেই কথাই "
"Please, please don't ·· "
"আর বিরক্ত করো না।"
"কিন্তু সে কথার স্রোতটা তো জগতের উপর দিয়ে চল্‌বেই—"
"কোন্— ?"
"সেই জীবনের কথা"
"Damn it !"
"চুলোয় যাক্ !"
"Curse it "
"দোষ দিয়ে দরকার নেই, শুনো না।"
"তাদের দেওয়া জীবন তাদের থাক্।"
"Hang them !"
"তারা বল্‌ছে যে জীবন সবারই—"
"Is it ? .. . "
"How sil ...ly .. !"
"সজ্ঞানে ও সমূল্য ?"
"কথাটার দিকেও ? জীবনটার দিকেও ?"
"কিসে ?"
"বল্‌ছে, তারই ঐশ্বর্য্যে।"
"Hush ! "
" Bravo !"

"কি রকম !"
"পৃথিবীর সব দেশ কি মুক্তি করেছিল ?"...
"কিসের ?"
"অধীন করে রাখ্‌তে ?"
"সেই তো সভ্যতার পাপ"
"সভ্যতার ?"
"Of course !"
"হাঁ"
"কেন ?"
"অনেক অসভ্য পাহাড়ী জাতিদের মধ্যেও এর বিপরীত"
"জান্‌তেম"
"আমরা খুব জান্‌তেম"
"Who doesn't know ? "
"এমন কি, খাসিয়াদের মধ্যেও"
"বাস্কিজদেরও কতকটা"
"And such a many"..
"আরো অনেক জায়গায় আছে, আফ্রিকাতে এবং আরো ক'টা দ্বীপে"
"Yes, all over, round the globe."
"তাদের চাইতেও সভ্যেরা অধম ?"
"আমরা ওদের চাইতেও হীন ?"
"এ জীবন না রাখাই ভাল।"
"আমরা বরং জহরব্রত করব।"
"ছি, ছি, ওটাও অধীনতা"
"Certainly a shame to us."
"ভুল হয়েছে,—"
"উচিত, মাপ চাওয়া"
"এক লক্ষ বার"
"প্রতিজ্ঞা কর, জীবন নাশ করা হবে না"
"বিফল করা হবে না"
"Swear..... "
"প্রতিজ্ঞা কর,"
"তারা যা বলেছে,"
"এবং যা বল্‌বে "
"যেখানেই তা অন্যায্য, আমাদের ন্যায্য আইনমত আমরা সবার বিপরীত করব..."
"সমাজের ভুল আমরা সংশোধন করে নেব"
"And our rule shall be parallel to..."
"আমাদের আইন আমরা গড়ব"
"আমাদের ঘরের দীপ আমরা জ্বাল্‌ব..."
"আবার !"
"And— ?"
"What's the matter ?—"
"দীপ ! ছি ! ছি !"
"What—then "
"ওটাও অধীনতা"
"Oh ! we forgot"
"না না, দীপ নয়"
" .....thanks.. ..."
"ঘোর অধীনতা"
"দীপ নয়, ইলেক্‌ট্রিক লাইট"
"Why not Day light ?"
"রাত্রিও আর আমরা চাহি না"
"সন্ধ্যাও নয়"
"Not even mists"
"অন্ধকারের লেশও আর নয়"
"দীপ্ত সূর্য্য"
"কিন্তু যখন তারা বল্‌বে—"
"আবার কি ?"
"কেবলি সূর্য্যই থাক্‌বে, চন্দ্র নয় ?"
"নাই বা থাক্‌ল।"
"অমন cold একটা সামগ্রী !"
"তাদের কাব্যের—বিনিদামের—store"

"ওটার অস্তিত্ব না থাকলে ক্ষতি কি বিশেষ ?"
"মরুদেশের মত ?"
"হলই বা !"
"সেখানেই ত আর্য্যদের আদিস্থান ছিল"
"লোকমান্যের প্রমাণের পর এটা শিক্ষিত worldএ শ্রদ্ধায় গ্রাহ্য"
"একশ' বার, কে না মান্‌বে ?"
"আর ঠিক সেই যুগে অধিকারে নরনারী সমান ছিল।"
"কিন্তু শুনেছি সেখানে ছ'মাস রাত্রি আর ছ'মাস দিন।"
"ছ'মাসও আর রাত্রি হবে না।"
"ছ'মাস ? বারো ঘণ্টাও নয়।"
"যদি সমস্তই দিনই হয়, দোষ কি ?"
"The idea."
"Hear, hear"
"তারা বল্‌ছে, তা'হলে শেষে পৃথিবীতে আর বসন্ত আস্‌বে না, শীত আস্‌বে না, শরৎ হেমন্ত বর্ষা আর হবে ন —"
"না—আ—স্থ—"
"দাঁড়াও—
আচ্ছা,…… দিনটা মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা হবে ধর"
"Yes, Yes, that's it"
"তারা বলছে তা'হলে ছায়া চাই ?—এবং জলও চাই ?"
"না, না, তা রাখা হবে না"
"তা হলে সাগর ক্রমে শুকিয়ে যাবে"
"ভাব্‌ছি—"
"কেবল থাক্‌বে মাটি"
"ভেবে দেখ্‌ছি…"
"মাটির অনন্ত মরুভূমি—"
"থাম"
"এই সাগরমেখলা শস্যশ্যামলা ধরণী হবে—"
"আমরা বিজ্ঞানের সহায়তা নেব।"
"হাঁ, হাঁ, আমরা নূতন জগৎ গড়্‌ব"
"Let's have a new world"
"সে জগতে কি থাক্‌বে ?"
"কেন, আমরা থাক্‌ব আর আমাদের বিধানমত যা কিছু তাই থাক্‌বে"
"তাঁতের কাপড়ের জায়গায় মিলের কাপড় যেমন দাঁড়িয়েছিল ?"
"কি রকম ?"
"সোনার তাল এসে আনন্দের জায়গাখানি কেড়ে নেবে"
"মানে ?"
"ঐ ত, ওদের ঐ ধনের মত—একটাই জিনিষ শুধু তার সাম্রাজ্য গড়ে' জীবনের আর সবের উপর শিকড় ছড়াবে।"
"সে, কি ?"
"সেখানে আস্‌বে মান"
"সেই ত দরকার।"
"True ! The very thing we want."
"And we will have it."
"সে জগতে থাক্‌বে কেবল নর তা হলে"
"কেন ?"
"ওর জন্যে ঘুরবার জীব হচ্ছে ওরা"
"What does it mean ?"
"নর বাইরের জগতের জীবন্ত যশঃ, তার জন্যে সে তার আর সব লুটিয়ে নিজের কীর্ত্তিকে তৈরি কর্‌ছে……তার প্রাণ দিয়ে ছেনে"
"আচ্ছা, আচ্ছা"
"বেশ ত"
"জগতের জীবনযুদ্ধে সে প্রতি সেকেণ্ডে ভেঙে পড়্‌ছে, কিন্তু আবার সে গড়ে' উঠ্‌ছে"

"যুদ্ধ কি শুধু তারাই করবে—"

"রাখ, ধরে নিলেম।"

"এই জন্যে, যে, সে মানের ভিখারী হলে"

"Instance, please!"

"Knights, Heroes, বীরেরা, কর্মীরা 85 per cent, গৃহীরা 95 per cent."

"আচ্ছা, ধরে নিলেম।"

"ঐটুকুই তার সর্ব্বস্ব সম্পদ্"

"জগতের সব সম্পদ্ই সকলের সমান হওয়া চাই"

"আমরাও জীবনযুদ্ধে ঐ রকম খাটব, মান নেব।"

"আমাদেরও সম্মান হবে"

"Quite so. ......Right you are,"

"And in fact it should be."

"হবে।"

"কি হবে?"

"সম্মানের জন্য খাটলে সম্মান হবেই"

"তা হলে?"

"কিন্তু সম্মান দেবার কে-ই বা থাকবে?"

"তারা, আমরা।"

"সূর্য্য থাকবে, কিন্তু পৃথিবী না থাকলে যেমন হয় তেমন হবে"

"ধীরে বল"

"অশ্রু না থাকলে কান্নার যেটুকু মূল্য হয়, দেহের যদি রক্ত না থাকে, তবে যতটা।"

"কি রকম!"

"সে মান প্রাণহীন, শুষ্ক মান।"

"কেন?"

"তখন বিরোধ হবে দুয়ের মধ্যে মান নিয়ে"

"তখন যুদ্ধ করব!"

"যুদ্ধের spirit আমাদের generally নেই বলে,'—তারা আমাদের জন্যে যুদ্ধ করছে "

"Humiliating!"

"Downright insult."

"পাথর শক্ত, জল তরল, পশু গর্জ্জে, পাখী গায়, সবার মধ্যেই সব জিনিষ সমান নয়—"

"বরফ হয়ে শক্ত হতে পারে, সব পাখী গান গায় না ....."

"কিন্তু পিপাসা বারণ করতে গলতে হবে, পাখী উড়লেই তার পাখাতে হাওয়া সুর তুলবে—"

"কিন্তু আমরা সব সমান করব।"

"অন্যায্য মান ওদের আমরা দেব না।"

"Surely."

"মান না পেলে তারা সব সন্ন্যাসী হয়ে পালাবে।"

"Then the world will be ours."

"না, না, advanced যুগে যুদ্ধ থাকবে না, বিরোধও থাকবে না, উভয়ে উভয়কে peacefully মান সমান ভাগ করে দেব।"

"সেই বেঁটে নেওয়া মান, প্রাণের চেয়ে বড় হয়ে যাবে"

"—A fig!—"

"মানের জন্য প্রাণ সকলেই দিয়ে থাকে!"

"সেটা ত হল দাম দেওয়া"

"আর?"

"এ প্রাণ অমূল্য"

"মহামূল্য মানের চাইতেও?"

"Absurd!"

"কিন্তু, মান, really is not our property."

"How?"

"সাগর কিছু চান না, কিন্তু তাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে রক্ষে করছেন"

"কাকে?"

"মাটিকে"

"তা' ত"

"তার রসে বালুকণা থেকে পাষাণ, শ্বেত, হরিৎ,

সবুজ, কালো, পিঙ্গল, সব—"

"হুঁ"

"কবে, মা, মানের কাঙ্গালিনী ?"

"...ঝুণ্ ঝুন্, টুন্, ঠুন্, টুন্ খস্, খট্ .. .."

"পৃথিবীর তিন ভাগ জলের ত্যাগে এক ভাগ স্থলের রক্ষে হচ্ছে, নারীর অসীম স্বার্থের ত্যাগে জগতে নর সজীব রয়েছে"

"উঁ ।"

"নর শুষ্ক ধূলি, ঝড়ের মাতাল, নারী নীর, প্রেম, স্নেহ, জগতের যোগ্য করে' তাকে গড়্‌বার একমাত্র উপকরণ ; পুরুষ দেহ, নারী জগতের জীবনরস ।"

"উঁ ?"

"নারী সেবা, নারী মহিমময়ী সংগঠনী শক্তি"

"রাখ"

"তোমার এ কথাও কাব্য ।"

"তবে কেন পৃথিবীতে আমাদের ঠাঁই নাই ?"

"ঠাঁই যে সব আমাদেরই !"

"My God !"

"তাদের কাছে তথাপি হীন হয়ে ?"

"I wonder !"

"কেন হীন হব ?"

"তবে ?"

"জগৎ আমরা আপন কর্‌ব আমাদের আপন পথে, আমরা থাক্‌ব আমাদের আপন মনুষ্যত্বে, আমাদের কাজ আমরা সম্পূর্ণ কর্‌ব আমাদের আপন প্রাণের জ্যোতিঃতে,——নারীর মর্য্যাদাতে ।"

"Why ?"

"নারী—নারী ।"

"অসভ্যেরাও আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ তবে ।"

"অসভ্যদেরও সর্ব্বত্র এমন রীতি নেই"

"হবে"

"কি হবে ?"

"যেদিন তারা সভ্য হবে, তারাও এই রকম হবে ।"

" Wonder,.. "

"May it be !"

"এ কমল তাদের প্রাণেও ফুটবে"

"কেন ?"

"নৈলে তারা কখন্ বুঝ্‌তে শিখ্‌বে নারীর মর্য্যাদা কোথায়, নারীর ধর্ম্ম কি ?"

"Let me note it."

"তখন তারা বুঝ্‌তে শিখ্‌বে নারীর মর্য্যাদা কোথায়, নারীর ধর্ম্ম কি ।"

"Wonder... we live to see !"

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

অজৈব রসায়ন

[শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়]

(২৫)

বায়ু

পৃথিবীর উপরিভাগে প্রায় ৪০ মাইল ব্যাপিয়া একটি গ্যাস মিশ্রণের স্তর বর্ত্তমান। আমরা এই গ্যাসের তলদেশে বাস করিতেছি। ইহাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলিয়া থাকি। অভ্যাসবশতঃ বায়ুর উপস্থিতি আমাদের নয়নগোচর না হইলেও ব্যজনী প্রভৃতি সঞ্চালনে উহাদের সহজ গতিতে বাধা অনুভব করা যায়, বায়ুর প্রবাহও অনুভূত হইয়া থাকে।

একটি বোতল বায়ুপূর্ণ অবস্থায় অর্থাৎ চলিত ভাষায় যাহা "শূন্য" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে—তৌল করা হইলে, এবং উহা হইতে "পাম্প" সাহায্যে বায়ু নিষ্কাশনের পর উহাকে পুনরায় তৌল করিলে শেষবারের ভার নিম্নতর হইয়া থাকে। সুতরাং বায়ুরও ভার আছে। প্রকৃতপক্ষে বায়ুর ভার সম-আয়তন উদ্‌জানের ১৪.৪ গুণ।

জলের তলদেশে ও অভ্যন্তরে যেরূপ চাপের ক্রিয়া বর্ত্তমান, বায়ুমণ্ডলের ভিতরও তদনুরূপ চাপ ফলিত হইয়া থাকে। একটি ৩″।৪″ ব্যাসযুক্ত কাচনলের (৩৬নং চিত্র) এক প্রান্তে রবারনির্ম্মিত আচ্ছাদনী সংলগ্ন করিয়া অপর প্রান্ত হইতে পাম্পসাহায্যে অভ্যন্তরস্থ বায়ু নিষ্কাশন করিলে রবারটী বহির্দ্দেশের বায়ু-চাপবশতঃ ভিতর দিকে স্ফীত হইতে থাকে ও অবশেষে সশব্দে বিদীর্ণ হয়।
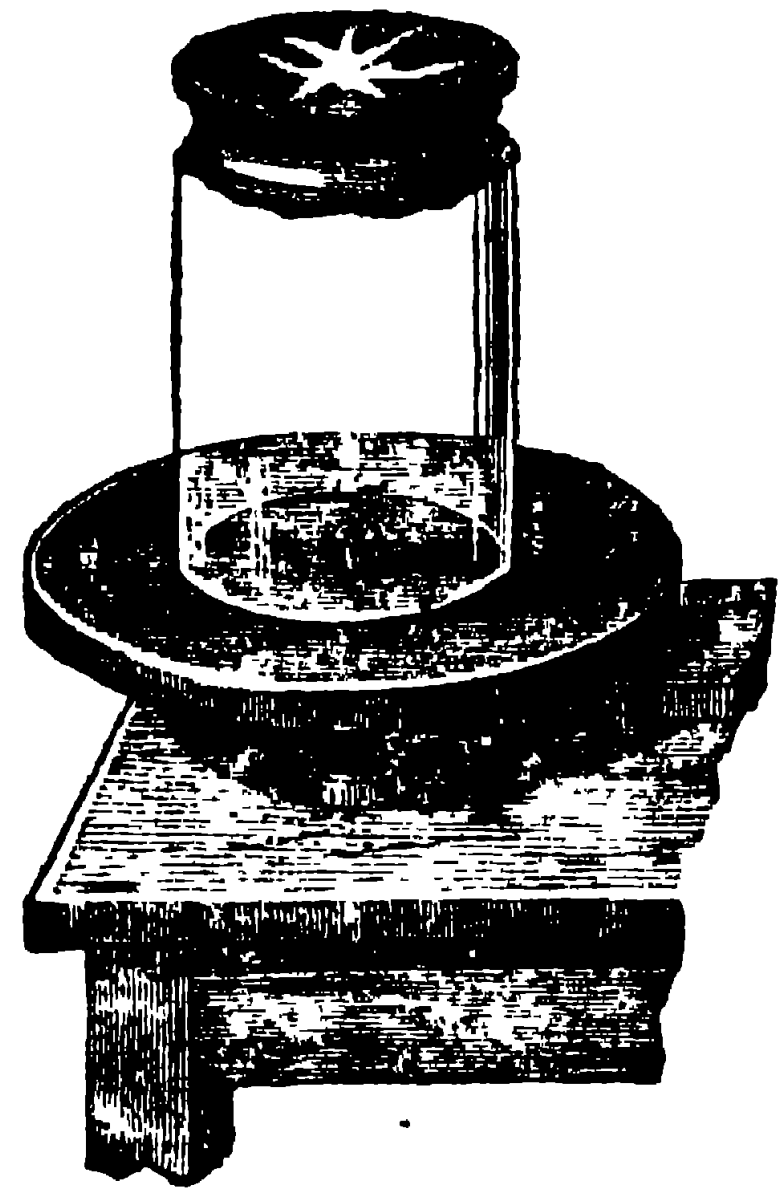
(৩৬নং চিত্র)

বহির্দ্দেশের বায়ু চাপবশতঃ রবারটী বিদীর্ণ হইল

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত চাপের পরিমাণ সমুদ্রকূলে ও তদনুরূপ তলগত স্থানে ৭৬ সেমিঃ, অর্থাৎ প্রতি বর্গ সেমিঃ ক্ষেত্রের উপর (৭৬ × ১৩.৬) = ১০৩৩.৬ গ্র্যাম ভারের সমান। সুতরাং প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর চাপের পরিমাণ (১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেমিঃ প্রায়) ২.৫৪ × ২.৫৪ × .০৩৩৬ কিলোগ্র্যাম ভারের সমান, অর্থাৎ প্রায় ৬.৭ কিলোগ্র্যাম।

এক কিলোগ্র্যাম=২'২০৪ পাউণ্ড; স্নতরাং বায়ুচাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চি ক্ষেত্রের উপর (৬'৭ ×২'২০৪)=১৪'৭৭ পাউণ্ডের সমান।

আমাদের দেহের ভিতরও বায়ুর অবাধগতি থাকায় দেহের ভিতরে ও বাহিরে সমতা বর্ত্তমান, কিন্তু কোনও উপায়ে ভিতরের বায়ু সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হইলে দেহের কি অবস্থা হইবে, তাহা নির্ণয় করা সহজ। আমাদের দেহের ক্ষেত্রপরিমাণ মোটের উপর প্রায় ১০ বর্গ ফুট, অর্থাৎ ১০×১২×১২= ১৪৪০ বর্গ ইঞ্চি। স্নতরাং বায়ুর চাপের পরিমাণ =১৪৪০×১৪'৭৭=২১২৬৮'৮ পাউণ্ড, অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৬০ মণ। আমাদের ব্যায়ামবীর রামমূর্ত্তি যে হস্তীটীকে বক্ষে ধারণ করিতেন, তাহার ভার ৭০ মণ মাত্র,—ইহা স্মরণ রাখিলেই দেহস্থ বায়ু নিঃসারণের ফল হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বায়ুচাপের সহায়তায় বর্ত্তমান কালে চলন্ত ট্রেণের গতিরোধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কতিপয় লৌহ-খণ্ড এই উপায়ে চক্র-পরিধির উপর এককালে প্রবল চাপ প্রদান করিয়া থাকে। অন্য কোন উপায়ে এক-কালে এত অধিক পরিমাণে বল বহুস্থানে প্রয়োগ করা দুঃসাধ্য।

ভূপৃষ্ঠ হইতে যতই উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ুচাপও ততই নিম্নমাত্রা হইতে থাকে। তরল অবস্থায় পারদের গুরুত্ব বায়ুর গুরুত্বের প্রায় ১০৬০০ গুণ বলিয়া চাপমান যন্ত্রের ১ সেমিঃ পরিমাণ চাপ ন্যূনাধিক ৩৫০ ফুট উচ্চ বায়ুস্তরের চাপের সমান; এক্ষেত্রে বায়ু-স্তরটীর গুরুত্ব সর্ব্বত্র সমান কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভূতল হইতে উর্দ্ধে ক্রমশঃ বায়ুর গুরুত্ব নিম্নমাত্রা হইতে থাকে। এই কারণে দুইটী বিভিন্ন স্থানে চাপমান যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট চাপমাত্রার প্রভেদ ১ সেমিঃ হইলে উভয় স্থানের সমুদ্রতল হইতে উচ্চতার প্রভেদ ৩৫০ ফুট না হইয়া প্রায় ৩৬০ ফুট হইয়া থাকে।

দার্জ্জিলিং ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে চাপমাত্রা ৫৬ সেমিঃ হয়, অর্থাৎ এই প্রদেশ সমুদ্রতল হইতে (৭৬—৪৬)×৩৬০=৭২০০ ফুট উচ্চ।

পূর্ব্বে (জল প্রসঙ্গে) বর্ণিত হইয়াছে যে, জলের স্ফোটনোত্তাপ ও স্থানীয় উচ্চতানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপে অন্যান্য তরল দ্রব্যের স্ফোটনো-ত্তাপের যে ব্যতিক্রম হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বায়ুর সকল প্রকার প্রবাহই চাপের বৈষম্যজাত। কোনও স্থানে বায়ুর চাপ কোন কারণবশতঃ (যথা—দিবাভাগের প্রবল তাপফলে) অস্বাভাবিক মাত্রায় নিম্নতর হইলে অন্যান্য স্থান হইতে বায়ু উচ্চতর চাপ বশে উক্ত স্থানে প্রবাহিত হইবে। উপরোক্ত চাপ বৈষম্যের পরিমাণানুসারে প্রবাহবেগের তারতম্য ঘটে। এইজন্যই চাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বাত্যার সম্ভাবনা সূচিত হইয়া থাকে।

বায়ু প্রধানতঃ অম্লজান ও নাইট্রোজেনের ১ : ৪ অনুপাতে মিশ্রণমাত্র। বায়ুতে যে উক্ত গ্যাস দুইটী সংযুক্ত অবস্থায় নাই—এই সিদ্ধান্ত কতকগুলি পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে। যথা, বায়ুকে শৈত্য ও চাপ-যোগে তরলাবস্থায় আনয়ন করিয়া উহাকে পুনরায় বাষ্পাকারে পরিণত হইতে দিলে উৎপন্ন বায়ুতে অম্লজানের অনুপাত উচ্চতর হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত গ্যাস দুইটী সংযুক্ত অবস্থায় থাকিলে এ প্রক্রিয়াফলে উহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইত না।

বায়ুর গুরুত্ব ১৪'৪। অম্লজান ২০ % ও নাইট্রো-জেন ৮০ % একত্রে মিশ্রিত হইলে এই ফল পাওয়া যাইবে :—

২০ % অম্লজান =১৬×২০= ৩২০
৮০ % নাইট্রোজেন=১৪×৮০=১১২০

মোট ১৪৪০

অর্থাৎ গুরুত্ব=১৪৪০   ১০০=১৪'৪।

গ্যাস দুইটী উক্ত অনুপাতে সংযুক্ত হইলে উৎপন্ন গ্যাসের গুরুত্ব ৭·২ হইত।

জলে বায়ু সামান্য পরিমাণে দ্রবণীয়। উহাতে তাপ প্রদান করিলে অল্পে অল্পে এই দ্রবমান বায়ু বুদ্বুদের আকারে নির্গত হইতে থাকে। উক্ত দ্রবমান বায়ু হইতেই জলচর মৎস্যাদি জীবদেহ ধারণোপযোগী অম্লজান আহরণ করে। ইহাদের শ্বাসযন্ত্র জল হইতে বায়ু আহরণের উপযোগী। কুম্ভীর, শুশুক, তিমি প্রভৃতির শ্বাসযন্ত্র এইরূপে গঠিত নহে বলিয়া ইহারা নিঃশ্বাস লইবার জন্য জলের উপর মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠিতে বাধ্য হয়।

জলে তাপ প্রদান করিলে উক্ত দ্রবীভূত বায়ু যে নির্গত হয়, তাহাতে অম্লজানের পরিমাণ উচ্চতর হইয়া থাকে। বায়ু যে মিশ্রণ মাত্র ইহা তাহার আরও একটি প্রমাণ।

প্রসঙ্গান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদ্ধ বায়ুতে ফস্ফরস দহন করিয়া অম্লজান ভাগ সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইতে পারে। অবশিষ্ট গ্যাস নিষ্ক্রিয়। এই গ্যাস প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ; কিন্তু ইহার সহিত 'আর্গন্' 'হিলীয়ম্' প্রভৃতি ১৪টী গ্যাসও অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। এই সকলের মধ্যে আর্গনের পরিমাণই উচ্চতম—আয়তনে ১০০ ভাগ বায়ুতে ১ ভাগ আর্গন বর্ত্তমান। গ্যাসগুলি সকলেই নিষ্ক্রিয়।

এতদ্ভিন্ন বায়ুতে অল্প অল্প পরিমাণ অঙ্গারাম্ল, নাইট্রিক অম্ল ও স্থানবিশেষে গন্ধকোদ্‌জান, গন্ধক-দ্বি-অম্লজান প্রভৃতি প্রাপ্তব্য। এ সকলের পরিমাণ স্থানভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। সমুদ্রের উপর ও উন্মুক্ত প্রান্তরাদিতে অঙ্গারাম্লের পরিমাণ আয়তনে ১০,০০০ ভাগ বায়ুতে ৩ ভাগ মাত্র। জলপূর্ণ ও কারখানা-পূর্ণ সহরে উক্ত পরিমাণ ৬ হইতে ৭ ভাগ পর্য্যন্ত হয়। অঙ্গারাম্লের অনুপাত ৮ ভাগের উচ্চ হইলে নিঃশ্বাস গ্রহণ অস্বাস্থ্যকর।

পূর্ব্বে ('জল') প্রসঙ্গান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, বায়ুমণ্ডলে প্রচুর জলবাষ্প বর্ত্তমান। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে। মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, তুষারপাত, কুজ্ঝটিকা, নীহারপাত—ইহারা সকলেই বায়ুস্থ জলবাষ্পজাত।

বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য জীবাণু বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের অপকারী নহে। কখনও কখনও নানাবিধ কারণে স্থানবিশেষে অপকারী জীবাণু অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিলে সেস্থানে 'মহামারী' প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অম্লজানের ভাগই বায়ুর কার্য্যকরী উপাদান। নাইট্রোজেনের কার্য্য মূলতঃ "সংবারক"রূপে। অম্লজানে প্রক্রিয়াদি তীব্রতেজে সংঘটিত হয় বলিয়া উহাতে জীবনধারণ অসম্ভব। উক্ত প্রক্রিয়া সংবরণ করিয়া জীবদেহ ধারণোপযোগী অবস্থায় আনয়নই নাইট্রোজেনের কার্য্য।

কোনও কোনও উদ্ভিদের মূলগত জীবাণু বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদের পুষ্টির সহায়তা করে। প্রকৃতিরাজ্যে বায়ুস্থ নাইট্রোজেনের নিয়োগের এই একমাত্র উদাহরণ বিজ্ঞানের গোচর হইয়াছে।

স্থানীয় বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ মূলতঃ (বা সংক্ষেপে "স্থানীয় উত্তাপ") তিনটি অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ স্থানটির ভৌগলিক অবস্থান ; দ্বিতীয়তঃ ঋতু ও তৃতীয়তঃ স্থানটির সমুদ্রতল হইতে উচ্চতা।

ভৌগলিক অবস্থানানুযায়ী উত্তাপভেদ—অর্থাৎ "বিষুবরেখা" সন্নিহিত প্রদেশ যে গ্রীষ্মপ্রধান ও "মেরু" সন্নিহিত প্রদেশ যে শীতপ্রধান এবং ঋতু পরিবর্ত্তনে উত্তাপ ভেদ—এ সকল তথ্যের সবিশেষ আলোচনা প্রকৃতপক্ষে খগোলশাস্ত্রের

অন্তর্গত। তৃতীয় কারণের অর্থাৎ সমুদ্রতল হইতে উচ্চতা অনুযায়ী উত্তাপভেদের উদাহরণ আমাদের দেশের দার্জ্জিলিং, শিমলা প্রভৃতি স্থান; এই সকল স্থান যে শীতপ্রধান, তাহার কারণ ইহাদের উচ্চতা। সমুদ্রতল হইতে যতই উচ্চে আরোহণ করা যায়, উত্তাপও ততই নিম্নমাত্রা হইতে থাকে, ক্রমশঃ উত্তাপ 0° ডিগ্রী সেঃ মাত্রায় উপনীত হয়। যে উচ্চতায় উক্ত উত্তাপমাত্রা বর্ত্তমান, সে স্থানের জলবাষ্প তুষারে পরবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থান চিরতুষারাবৃত বলিয়া ইহার উচ্চতা "চিরতুষার সীমা" বলিয়া উল্লিখিত হয়। আমাদের দেশে ১৫০০০ ফুট চিরতুষার সীমা। বলা বাহুল্য, ইহার উর্দ্ধেও সর্ব্বত্রই চিরতুষার। শীতপ্রধান দেশে (৭৫ ডিগ্রী দ্রাঘিমা অন্তর্গত) চিরতুষার সীমা ৩৮০০ ফুট মাত্র।

বায়ু—১৯০° সেঃ উত্তাপানুযায়ী শৈত্যে তরলাবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপ শৈত্য উৎপাদন অন্য উপায়ে অসম্ভব বলিয়া বায়ু ও অধিকাংশ গ্যাসই তরলাবস্থায় আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রবল চাপবশে চালিত বায়ুপ্রবাহকে হঠাৎ একস্থানে প্রসারিত হইতে দেওয়া হয়। এইরূপ প্রসারণ ফলে তাপ ক্ষয় হইয়া থাকে, সুতরাং বায়ুপ্রবাহের উত্তাপ নিম্নতর হয়। প্রবাহটি পরে যন্ত্রে (৩৭নং চিত্র) আগমনোন্মুখ বায়ুপথ বেষ্টন করিয়া চালিত হয়, এবং এজন্য উহা হইতে তাপ হরণ করে। শেষোক্ত শীতল বায়ুপ্রবাহ প্রসারিত হইবার সময় আরও শীতল হইয়া যন্ত্রে প্রবেশোন্মুখ প্রবাহকে শীতল করিতে নিযুক্ত হয়। এইরূপে বায়ুপ্রবাহটি ক্রমশঃ শীতল হইয়া অবশেষে তরলাবস্থায় পরিণত হয়।

তরল বায়ু ঈষৎ নীলাভ। ইহাকে ধারণ করিবার জন্য যে পাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা আমাদের নিত্য

ব→
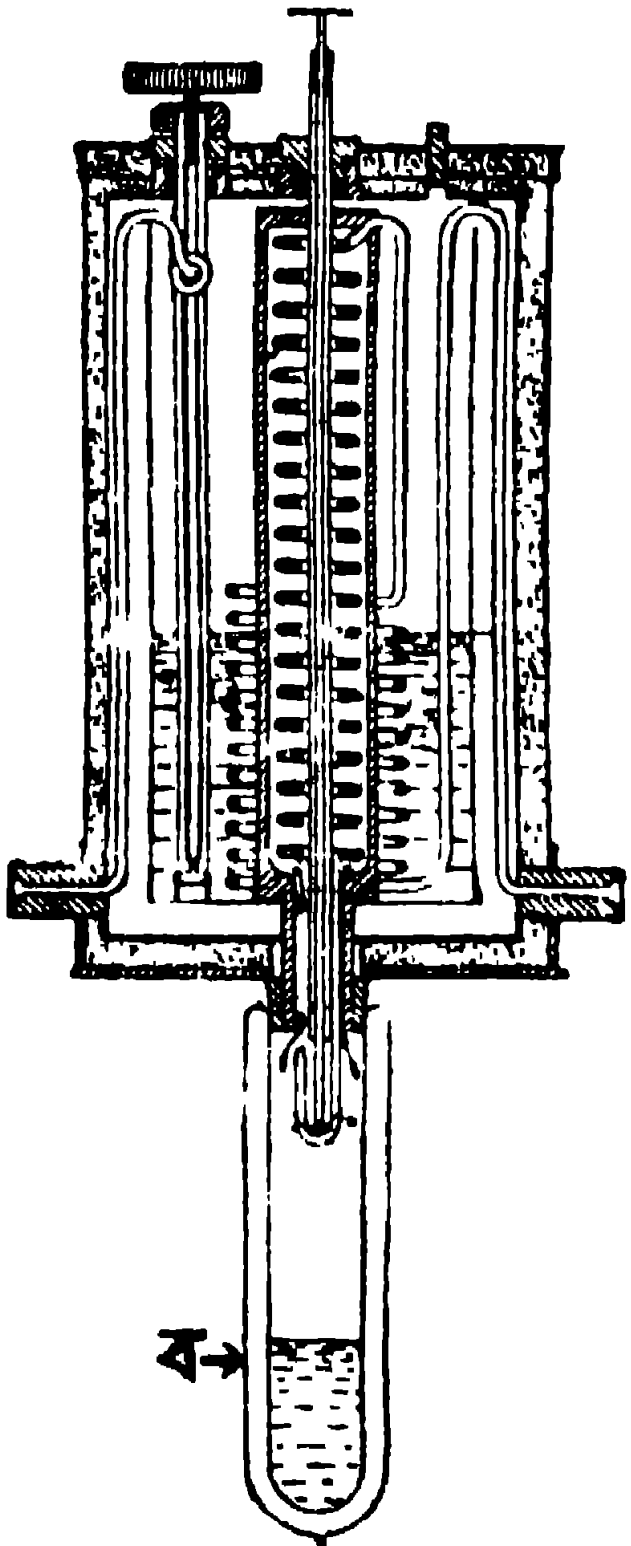
(৩৭ নং চিত্র)

"ব" আধারস্থ দ্রব্য—তরল বায়ু
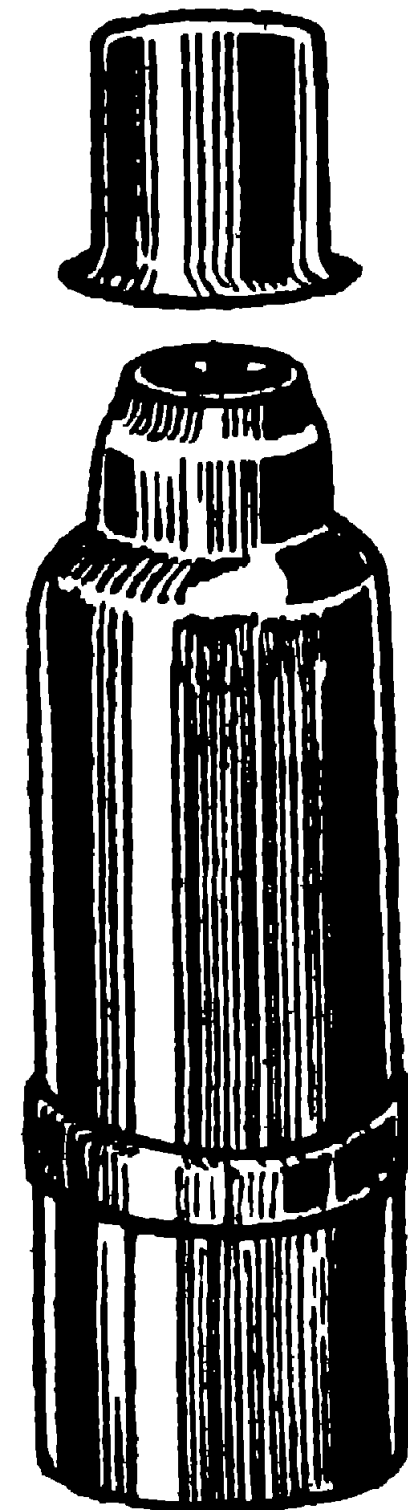
থার্ম্মো ফ্লাস্ক

(৩৮নং চিত্র)

ব্যবহার্য্য "থার্ম্মস্ ফ্লাস্ক" (৩৮ নং চিত্র)। ইহা আমাদের পানীয় উষ্ণাবস্থায় বা শীতলাবস্থায় বহুক্ষণ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সুপ্রচলিত। মূলতঃ একটি কাচের আধারের উপরিভাগে বায়ুশূন্য স্তর রচনা করিয়া এইরূপ পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তপ্ত বস্তু হইতে যে তাপ ক্ষয় হইতে থাকে, তাহার অধিকাংশই বস্তুটির সংলগ্ন বায়ু অবলম্বনে চালিত হয়। বায়ুশূন্য স্তর রচনায় তাপ সঞ্চালনের এই অবলম্বন দূরীভূত হইয়া থাকে। ডেওয়ার সাহেব এইরূপ যন্ত্র আবিষ্কার করেন বলিয়া তাঁহার নামেই ইহারা পরিচিত।

তরল বায়ুর প্রবল শৈত্যপ্রভাবে নানাবিধ দ্রব্যের ধর্ম্মাদি পরিবর্ত্তন বিচিত্র। একটি রবারনির্ম্মিত বেলুন তরল বায়ুতে নিমজ্জিত হইবার পর উহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে কাচনির্ম্মিত দ্রব্যের ন্যায় উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া থাকে। একখণ্ড সীসক নির্ম্মিত তার তরল বায়ু সংস্পর্শে আনয়ন করিবার পর উহা আকর্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় দীর্ঘতর হয় না।

একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে নির্গমনশীল উদ্‌জানে অগ্নি-সংযোগ করিয়া শিখাটি তরল বায়ুর মধ্যে নিমজ্জিত হইলেও গ্যাসটী জ্বলিতেই থাকে। উৎপন্ন জল বরফে পরিণত হয়। উদ্‌জানের পরিবর্ত্তে কয়লার গ্যাস ব্যবহার করিলে দহনোৎপন্ন জল ও অঙ্গারাম্ল উভয়ই কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ত্বকের উপর প্রবল শৈত্যের ক্রিয়া ও উচ্চমাত্রা উত্তাপের ক্রিয়া একই প্রকার। উভয় ক্ষেত্রেই ত্বক্ বিনষ্ট হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয়।

তরল বায়ুতে অম্লজান ভাগ বায়ুমণ্ডলের অম্লজান ভাগ হইতে উচ্চতর হইয়া থাকে (প্রায় ৫০ %)। এইজন্য একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠশলাকা উহার ভিতর নিমজ্জিত হইলে দহন তীব্রতর হয়।

আংশিক তির্য্যক্‌পাতনে তরল বায়ু হইতে অম্লজান ও নাইট্রোজেন বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক্ করা যাইতে পারে।

[ক্রমশঃ]

কলম্বসের অভিযান

[শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন]

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মানবদম্পতি কোন্ কেন্দ্রে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কোনও কালে সম্ভবপর হইবে কিনা বলা যায় না। তথাপি এটুকু খুবই বলা যায় যে, মানুষ কোনও কালে এক কেন্দ্রে স্থির হইয়া থাকে নাই। প্রাচীনকালে মধ্যএসিয়া হইতে চীন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ভারত, পারস্য, আরব, মেসো-পটেমিয়া এবং সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত মানব সভ্যতার অভিযান—পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অতি পুরাতন কাহিনী। এই ধারারই পূর্ণ পরিণতিতে বর্ত্তমানে জগৎ জুড়িয়া মানুষের কীর্ত্তি, ভূভাগের সর্ব্বত্র মানুষের গতায়াত।

মানুষের এই যে পৃথিবীর দিকে দিকে পর্য্যটন বা অভিযান করিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তি, তাহার মূল প্রেরণা ছিল সম্ভবতঃ জীবনধারণোপযোগী সুখ সুবিধার অন্বেষণ। আধুনিক যুগে তাতার, তিব্বত, বেলুচি-স্থান, পারস্য, আরব মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানের যাযাবর সম্প্রদায় সেই প্রাচীন ধারারই সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালের অভিযান ইত্যাদিতে কতকটা প্রকারভেদ থাকিলেও মূল ধারার যে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে এমন কথাও বলা চলে না। তবে পূর্ব্বকালে দেশ পর্যাটনে যেমন অসুবিধা এবং অনিশ্চয়তা ছিল, এখন সেদিকে পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনেক: মানুষ প্রকৃতির উপরে অনেকটা আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেই নিজের পথ করিয়া লইয়াছে। এক হিসাবে বলা হয় যে, প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া প্রকৃতির উপরে যতটা আধিপত্য বিস্তার করা যায় তাহাই সভ্যতার পরিমাপ। এই হিসাবে বর্ত্তমান মানব সভ্যতার অতি উন্নত স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে। সভ্যতার আর একটা লক্ষণ এই যে, এখন আর মানুষ শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া এবং গৃহতলে আশ্রয়মাত্র গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে চায় না। তাহার দৃষ্টি এবং চিন্তা এখন অন্তরে বাহিরে নানাপ্রকার শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশভ্রমণ এখন আর শুধু প্রয়োজনের অনুরোধে নয় —শুধু জ্ঞানলাভ এবং আনন্দলাভের জন্যও মানুষ বাহির হইয়া পড়িতেছে, প্রমাণ—মেরু আবিষ্কার, এভারেষ্ট অভিযান, হীডিনের তিব্বত ভ্রমণ এবং মধ্যএসিয়ার মরুভূমি পর্য্যটন। যে সব স্থলে পার্থিব সুখসুবিধা সম্প্রসারণের জন্য অভিযান প্রেরিত হয়, সে সব ক্ষেত্রেও পর্য্যটকের মনে শুদ্ধ আনন্দের অনু-প্রেরণাই অভিযানের অর্দ্ধেক শক্তি, প্রমাণ—কলম্বস, ভাস্কোডিগামা, লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্‌লি, স্যার জন ফ্রাঙ্ক-লীন, র‍্যাডল্‌ফ্ নর্‌ডেন্‌স্কিওল্ড, ফ্রীড্‌টিয়ফ্ ন্যান্‌সেন্ ইত্যাদি।

মানবজাতির পর্য্যটন প্রথমতঃ ভূভাগের উপরেই সীমাবদ্ধ ছিল, আর তখনকার ভূভাগও ছিল এসিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ। তখন রেল-

(প্রবন্ধটী গৌহাটী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত—লেখক)

পথ ত দূরের কথা, জেমস্ ওয়াট্ বা জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের জন্মও হয় নাই। তথাপি সেই সময়েও পশ্চিম ইউরোপ হইতে পূর্ব্ব এসিয়া পর্য্যন্ত লোকজনের যাতায়াত ছিল, অবশ্য স্থলপথে। তাহার একজন প্রধান সাক্ষী মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মারকো-পলো।

রেলপথে যাতায়াত তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা প্রাচ্যদেশের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য জলপথে ভারতবর্ষে যাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। এই সময় টস্কেনেলী নামে ফ্লোরেন্স নগরের একজন প্রসিদ্ধ গণিতবিৎ সিদ্ধান্ত করিলেন—একদিকে ইউরোপের পশ্চিমে সমুদ্র, অপরদিকে এসিয়ার পূর্ব্ব উপকূলেই স্থলভাগের শেষ সীমানা, সুতরাং পৃথিবী যখন গোলাকার, তখন পশ্চিম ইউরোপ হইতে সমুদ্রপথে সোজা পশ্চিমদিকে চলিয়া গেলে আশুই ভারতবর্ষে এবং চীন জাপানে পৌছান যাইবে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৪৭৫ সালে টস্কেনেলী এক মানচিত্র প্রকাশ করেন। এই মানচিত্র ভিত্তি করিয়াই কলম্বসের সমুদ্রযাত্রা এবং আমেরিকা আবিষ্কার।

কলম্বস ছিলেন জেনোয়া নগরীর এক তন্তুবায় পুত্র। পিতামাতার পাঁচটি সন্তানের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পৈতৃক ব্যবসায়ে সুবিধা না হওয়ায় তাঁহারা বিদেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। কলম্বস নাবিকের কাজে যোগ দিলেন—বাল্যকাল হইতে ভুগোলবিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। এই কাজে যথারীতি শিক্ষালাভ করিয়া তিনি পাকা নাবিক হইয়া উঠিলেন এবং নিজের চেষ্টায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও লাভ করিলেন। একবার ইংরেজদের এক জাহাজে তিনি আইস্লণ্ড পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন। সেই সময়ে এই আইস্লণ্ড যাত্রাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রা এবং অত্যন্ত সাহসিক কার্য্য বলিয়াও পরিগণিত হইত, কারণ মনে রাখিতে হইবে, সেই সময়ে জাহাজ পালে চলিত, তখনও 'ষ্টীম এঞ্জিন'এর কল্পনা হয় নাই। কলম্বস তারপরে আসিলেন পর্ত্তুগালে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে। এখানে তিনি সমুদ্রের মানচিত্র আঁকিয়া এবং ভূমধ্যসাগরে পর্ত্তুগীজ জাহাজসমূহে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজধানী লিস্‌বনে আসিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং সেখানকারই অধিবাসী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শ্বশুরও একজন প্রসিদ্ধ সাগরপর্য্যটক ছিলেন; কলম্বস তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন।

এখান হইতে কলম্বস টস্কেনেলীর সহিত চিঠিপত্র দ্বারা খবরাখবর করিতে লাগিলেন। টস্কেনেলী তাঁহাকে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া জাপান যাইবার পথের এক মানচিত্র পাঠাইয়া দিলেন এবং মারকোপলোর বিবরণ অনুসারে ওদিককার অনেক খবর দিলেন। এই সকল খবর এবং এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কলম্বসের কল্পনায় গাঢ় রেখাপাত করিল। তিনি টস্কেনেলীকে লিখিলেন যে, তিনি টস্কেনেলীর নির্দ্দেশ অনুসারে পশ্চিমাভিমুখে সমুদ্রপথে যাইয়া মারকোপলোর সেই সকল দেশ দেখিয়া আসিবেন। টস্কেনেলী ইহাতে স্বভাবতঃই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং কলম্বসকে বলিলেন যে, এই যাত্রায় তিনি যথেষ্ট লাভবান হইবেন এবং সমস্ত খৃষ্টীয় জগতে তাঁহার অসাধারণ খ্যাতিলাভ হইবে।

কলম্বসের এমন সামর্থ্য ছিল না যে, তিনি নিজ ব্যয়ে এরূপ অভিযানের আয়োজন করিতে পারেন, কাজেই তিনি রাজশক্তির নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ জেনোয়া হইতে কোন সহায়তা পাইলেন না। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রীর নিকট আবেদন করিয়াও ব্যর্থকাম হইলেন। পর্ত্তুগালে তখন রাজা ছিলেন দ্বিতীয় জন্। এই দেশের বিদ্বৎসমাজ

তাঁহার কথা মনোযোগসহকারেই শুনিলেন; কিন্তু তাহাকে কল্পনাকুশল এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টায় পরাঙ্মুখ বলিয়া স্থির করিলেন। আবার এই দেশেরই কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি কলম্বসের ব্যাখ্যা এবং প্রস্তাব অনেকটা বিচারসহ মনে করিলেন। ইঁহাদেরই পরামর্শ অনুসারে পর্ত্তুগালের রাজা কলম্বসের নিকট ব্যাপারটা গোপন রাখিয়া একখানা জাহাজ পশ্চিম অভিমুখে পাঠাইলেন, জাহাজখানা কিছুদিন পরেই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। কলম্বস তাহার প্রতি এই হৃদয়হীন ব্যবহারে অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া পর্ত্তুগাল ছাড়িয়া, এমন কি, স্ত্রীপরিবার সব ফেলিয়া রাখিয়া স্পেনে চলিয়া গেলেন। অদৃষ্টের এমনই বিধান যে, নিজ পত্নীর সহিত এ জীবনে তাহার আর সাক্ষাৎ হইল না।

স্পেনে আসিয়া কলম্বস আবার নিজ হস্তে অঙ্কিত সমুদ্রপ্রদেশের মানচিত্র বিক্রয় করিয়া নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি রাজসভায় তাহার দরবার উপস্থাপিত করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। সেখানে রাজদরবার এবং ধর্ম্ম পরিষদের নিকট তাহার প্রস্তাব এবং তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইলেন, কিন্তু স্পেন তখন মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত, কাজেই অভিযান মঞ্জুর করিবার মত অবস্থা তখন তাহাদের নয়। সুতরাং কলম্বসকে সুবহিবুকযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। দুই বৎসর পরে কলম্বস আবার রাজসভায় আহুত হইলেন, কিন্তু এবারেও তাহার বাগ্মিতা এবং তাহার উৎসাহে কোন ফল হইল না। আরও দুই বৎসর বৃথা অপেক্ষা করিয়া কলম্বস স্পেনের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া ফ্রান্সে গিয়া তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিবেন স্থির করিলেন। তখন স্পেনের রাজধানী ছিল গোয়াডেল-কুইভার নদীতীরে কর্ডোভা নগরীতে। কলম্বস কর্ডোভা ত্যাগ করিয়া প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে তাহার বালকপুত্র। বারংবার এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তিনি অবসন্ন চিত্তে কতকটা পথ অতিবাহন করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া একটা আশ্রমের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার আর্থিক অবস্থাও এমনই নিঃসম্বল যে, তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য এক টুকরা রুটীর জন্য আশ্রমের দ্বারে প্রার্থী হইলেন। তিনি যখন দ্বারবানের সহিত আলাপে ব্যাপৃত, সেই সময় মঠের যিনি অধ্যক্ষ তিনি তাঁহার কণ্ঠের স্বরভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এ ব্যক্তি ইতালীয়, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলম্বসের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখের কথা জানিয়া লইলেন। মঠাধ্যক্ষ ছিলেন চতুর লোক। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কলম্বসের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে হয়ত এসিয়ার পূর্ব্ব উপকূলে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করা সম্ভব হইবে, আর যদি কলম্বস স্পেন ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে সে সুযোগ লাভ করিবে অন্য যে কোন জাতি —স্পেন সে সুযোগ হেলায় হারাইবে। তখনও ধর্ম্মযাজকদের আভিজাত্য এবং আধিপত্য পূর্ণমাত্রায়ই ছিল। মঠাধ্যক্ষ রাণী ইসাবেলার নিকট এক পত্র লিখিলেন, তাহারই ফলে ১৪৯১ সালের শেষভাগে কলম্বস আবার স্পেনের বিদ্বৎসমাজের নিকট তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে চতুর স্বার্থান্বেষী বা জুয়াচোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, কিন্তু এবার অনেকে তাঁহার কথায় বিশ্বাসও করিলেন।

এই সময়ে স্পেনে মুসলমান রাজত্ব প্রায় অস্তমিত। দেশীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাহারা কর্ডোভা এবং গ্রেণেডা মাত্র তাহাদের হাতে রাখিতে পারিয়াছিল। ১৪৬৯ সালে যখন ক্যাথলিক ফার্ডিন্যাণ্ড্ কেষ্টিলার রাণী ইসাবেলার পাণিগ্রহণ করেন, তখন একমাত্র

গ্রেণেডাই যেন মুসলমান রাজত্বের শেষ নিঃশ্বাস বহন করিতেছিল। আল্‌হাম্‌ব্রার সুরম্য প্রাসাদে শেষ যুবরাজ বাস করিতেছিলেন। ১৪৯১ সালে দেশীয় সেনা এই গ্রেণেডা নগরীও অবরোধ করিল। ১৪৯২ সালের প্রারম্ভ দিবসে মুসলমানগণ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং আল্‌হাম্‌ব্রার প্রাসাদশীর্ষে কেষ্টিলীর পতাকা শোভা পাইতে লাগিল।

এইরূপে যুদ্ধ শান্তি হইলে রাজসভা কলম্বসকে অভিযানে পাঠাইতে স্বীকৃত হইল। রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড্ ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। রাণী ইসাবেলার সহানুভূতিতেই এই অভিযান মঞ্জুর হইয়াছিল। সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইতেছিল, কিন্তু শেসকালে কলম্বসের দাবীর প্রবলতায় সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা হইয়াছিল। কলম্বসের দাবী ছিল যে, তিনি অভিযানের সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিবেন। যে সকল নূতন দেশ বা দ্বীপ আবিষ্কৃত বা অধিকৃত হইবে, তিনি সে সকলের উপরে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন এবং রাজস্ব যাহা আদায় হইবে, তাহার আট ভাগের এক ভাগ তাঁহার এবং পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। অবশেষে যখন তিনি প্রচার করিলেন যে, তাঁহার লভ্যাংশ তিনি তুরস্কের হাত হইতে জেরুজালেমের উদ্ধারকল্পে ব্যয় করিবেন, তখন তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। অভিযানের জন্য তিন-খানা জাহাজ সজ্জিত হইতে লাগিল; সরকার হইতে সমস্ত ব্যয়ভার মঞ্জুর হইল।

এই তিনখানা জাহাজের প্রত্যেকেরই তিনটী করিয়া মাস্তল ছিল, কিন্তু এরূপ বিরাট অভিযানের পক্ষে জাহাজগুলি ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র। কলম্বসের নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল সান্তা ম্যারিয়া—শুধু এই জাহাজখানার সমস্তটা অংশের উপরেই ডেক নির্ম্মিত হইল, অন্য দুইখানা জাহাজের শুধু সম্মুখে এবং পেছনের দিকে ডেক ছিল। এই দুইখানা জাহাজের নাম পিণ্টা এবং নাইনা। পিন্‌জন্ নামে এক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় দুই ভ্রাতা এই দুইখানা জাহাজের ভারপ্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু নাবিক সংগ্রহ করা তত সহজ হইল না। ইউরোপের অথবা আফ্রিকার তীরে তীরে যাত্রা করিলে অনেক নাবিক জুটিত; কিন্তু এরূপ দুস্তর সাগরের অসীমতার দিকে অভিযানে যাইবার জন্য কেহই স্বীকৃত হইল না। কিন্তু রাজশক্তি যাঁহার সহায়, তাঁহার আর ভাবনা কি? রাজার আদেশে কারাগৃহ উন্মুক্ত হইল এবং বন্দীদের মধ্য হইতে ৯০ জন লোক সংগ্রহ করা হইল। এই নাবিক-দের নাম এখনও পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উহারা অধিকাংশই কেষ্টিলীর লোক। অভিযানের সঙ্গে দুইজন ডাক্তার লওয়া হইল, আর ছিলেন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত একজন ইহুদী—ইনি হিব্রু এবং আরবী এই দুই ভাষাতেই কথোপকথন করিতে পারিতেন। ইঁহাকে লওয়া হইল এই বিবেচনা করিয়া যে, প্রাচ্যদেশে গিয়া পৌছাইলে ইঁহাদ্বারাই দোভাষীর কাজ চলিবে। একটু আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হয় যে, ইহাদের সঙ্গে পাদরী বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের কেহই গেলেন না। অভিযান রওনা হইবার পূর্ব্বে একজন পাদরী দলের সকলকেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অনুসারে ভোজ-নিবেদন প্রদান করিলেন, কারণ অনেকেই ইঁহাদিগকে মৃত্যুপথযাত্রী বলিয়াই গণনা করিয়াছিলেন।

সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, ইঁহারা যদি সাগরের পরপারে তটভূমি পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে, তবে ইঁহারা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ, চীন বা মঙ্গোলিয়াতে গিয়া হাজির হইবে। মারকোপোলোর বিবরণ হইতে মঙ্গোলিয়ার কথা অনেকটা জানা ছিল। রাজসরকার হইতে মঙ্গোলিয়ার খাঁর নিকট এক পত্র প্রেরিত হইল, আর এই পত্রের বাহক হইলেন স্বয়ং কলম্বস। এইরূপে সজ্জিত হইয়া তাঁহারা অভিযানে অগ্রসর হইলেন—১৪৯২ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে পেলস্ বন্দর হইতে

তিনখানা জাহাজ তীর ছাড়িয়া অকূল সমুদ্রে আসিয়া পড়িল।

জাহাজের গতি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে। ছয়দিনে তাঁহারা ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পৌছিলেন। এইখানে জাহাজগুলির কিছু কিছু মেরামত করিবার প্রয়োজন হইল, এখান হইতে আবার পানীয় জল লওয়া হইল—এইরূপে এই দ্বীপেই এক মাস কাটিয়া গেল। ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা এই দ্বীপ হইতে রওনা হইলেন—বাস্তবিকপক্ষে এই স্থান হইতেই অভিযানের প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ হইল। যখন সুরম্য ক্যানারী দ্বীপ এবং টেনেরীফের গিরিশৃঙ্গ পশ্চাতের দিক্‌চক্রবালে ডুবিয়া গেল, তখন নাবিকেরা অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস যে বায়ুর গতি তাহাদিগকে চিরপরিচিত জগৎ হইতে কেবলই দূরে লইয়া যাইতেছে এবং পশ্চিম দিগন্তে আটলাণ্টিক সলিলরাশি ও উন্নত তরঙ্গের গ্রসমান মূর্ত্তি তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে।

কলম্বস প্রথম দিন হইতেই তাঁহার দৈনিক লিপিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল খবরই লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। টস্‌কেনেলীর মানচিত্রের উপরে তাঁহার অটল বিশ্বাস। যখন দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল অথচ দিগন্ত বিস্তৃত সলিলরাশি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের চিহ্নমাত্রও কোন দিকে দেখা যায় না, তখন নাবিকেরা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কলম্বস কিন্তু নাবিকদিগকে দূরত্বের কথা একটু কম করিয়াই বলিতেন, কারণ এই বিশাল সাগরের প্রকৃত বিস্তৃতির কথা শুনিলে তাহারা হয়ত একেবারে ভড়কাইয়া যাইত। সাতদিন পরে দেখা গেল যে, একপ্রকার জলজ তৃণাদিতে সাগরবক্ষ ছাইয়া গিয়াছে। তখন কলম্বস তাঁহার নাবিকদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই অনতিদূরে তটভূমির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

কলম্বসের সান্তা ম্যারিয়া ছিল ভারী জাহাজ—বাস্তবিকপক্ষে উহা মালের জাহাজই ছিল; কলম্বসের জন্য প্রয়োজন মত মেরামত করাইয়া এবং ডেক তৈয়ার করাইয়া ইহাকে অভিযানে পাঠান হইয়াছিল। এই জন্যই এই জাহাজখানা অনেক সময় পেছনে পড়িয়া থাকিত, কিন্তু মোটের উপর তিনখানা জাহাজই একসঙ্গে চলিত। অনেক সময় এতটা নিকটে নিকটে থাকিত যে, এক জাহাজ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিলে অন্য জাহাজে শুনা যাইত।

একদিন পিণ্টা জাহাজের কাপ্তান পিন্‌জন কলম্বসকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি কতকগুলি পাখী পশ্চিমাভিমুখে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছেন, কাজেই তাঁহার মনে হয় যে, রাত্রি হইবার পূর্ব্বেই কোন তটভূমি দেখা যাইবে। এই হিসাবে তাঁহারা সকলেই অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলেন, পাছে জাহাজ হঠাৎ কোন চড়াভূমিতে ঠেকিয়া যায় কিন্তু এক সময়ে জলের গভীরতার পরিমাপ করিতে গিয়া দেখা গেল যে, ২০০ 'ফেদম্' (১২০০ ফুট) দীর্ঘ সূতাও সাগরের তলদেশের স্পর্শলাভ করিতে পাইল না। কিছুদিন বায়ুপ্রবাহের শুষ্কতার দরুণ তাহাদের গতিও অনেকটা মন্দীভূত ছিল। ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্তও জলজ তৃণাদি দেখা গেল তারপরেই আবার সাগর জল পরিষ্কার হইয়া গেল এবং তাঁহারাও উন্মুক্ত সাগরে ভাসিয়া পড়িলেন। জাহাজ সোজা পশ্চিমাভিমুখে চলিতেছিল, বায়ুর গতিও ছিল বেশ অনুকূল। যে বায়ুপ্রবাহ বাণিজ্যবায়ু (Trade-wind) নামে খ্যাত সেই প্রবাহই তাহাদের চালাইয়া লইতেছিল। এক সময়ে কিছুকালের জন্য বায়ুপ্রবাহের দিক্ পরিবর্ত্তন হইল। নাবিকেরা কেবলই পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু বহিতেছে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল এবং ভাবিতেছিল যে, দেশে ফিরিবার জন্য হয়ত অনুকূল বায়ু পাওয়া যাইবে না, কাজেই বায়ুপ্রবাহের এই দিক পরিবর্ত্তনে তাহারা আশ্বস্ত হইল

টস্‌কেনেলীর মানচিত্রখানি কলম্বস এবং পিন্‌জন্ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল; কিন্তু তাঁহারা কেহই বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থান কোথায় এবং পূর্ব্বএসিয়ার দ্বীপাবলীই বা আর কত দূর! সেপ্টেম্বরের ২৫শে তারিখে পিন্‌জন্ পিণ্টা জাহাজ হইতে কলম্বসকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তীর দেখা যাইতেছে। তখন পিন্‌জন্ নিজে এবং তাঁহার জাহাজের নাবিকেরা সকলে নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইল এবং সমস্বরে বিভুর বিজয়গান গাহিল। অতঃপর সান্তা ম্যারিয়া এবং নাইনা জাহাজের নাবিকেরাও উপরে উঠিয়া তীর দেখিতে পাইল এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরের তরঙ্গান্দোলিত বক্ষের উপর তাহাদেরও সঙ্গীত স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এত উল্লাসধ্বনি পরদিন নৈরাশ্যে পরিণত হইল যখন দেখা গেল যে, তথাদৃষ্ট তীরভূমি অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই তীরভূমি আর কিছুই নয়—মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় একখণ্ড কুজ্ঝটিকার স্তরই তীরভূমির ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

অক্টোবরের প্রারম্ভে কলম্বসের মনে সন্দেহ হইল যে, তাঁহারা হয়ত টস্‌কেনেলীর মানচিত্রে নির্দ্দিষ্ট এসিয়ার পূর্ব্ব উপকূলের দ্বীপগুলি ছাড়াইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মতে এক হিসাবে ইহা ভালই হইল যে, তাঁহারা এই সকল দ্বীপে আকৃষ্ট না হইয়া একেবারে এসিয়ার উপকূলে গিয়া উঠিবেন।

অক্টোবরের ৭ই তারিখে তিন জাহাজের নাবিকেরাই নিশ্চিত হইল যে, এবার সত্য সত্যই তীর দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক জাহাজের প্রত্যেকটি পাল উঠাইয়া দেওয়া হইল। সকলেই মনে করিল যে, যে জাহাজ সর্ব্বপ্রথম গিয়া তীরভূমি স্পর্শ করিতে পারিবে তাহাদের পক্ষে উহা একটা গৌরবের বিষয় হইবে। নাইনাই সর্ব্বাগ্রে চলিতেছিল। সূর্য্যোদয় হইলে জাহাজের মাস্তুলে কেষ্টিলীর পতাকা উড্ডীন হইল এবং একটি তোপধ্বনি করা হইল। এত আশাভরসা এত আয়োজনের পরেও দিবাভাগে দেখা গেল যে, সেই তীরভূমি অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু এই সময় একটা শুভলক্ষণ এই দেখা গেল যে, দলে দলে পাখী সকল দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে চলিয়াছে, কলম্বসও জাহাজগুলি ঠিক সেই দিকেই চালাইবার জন্য হুকুম করিলেন। এই সময়ে সমুদ্র ছিল অনেকটা তরঙ্গহীন, শান্ত। বায়ুপ্রবাহও নাতিশীতোষ্ণ এবং আনন্দদায়ক।

এই তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজ অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর প্রভাতসূর্য্য পর্য্যন্ত একটানা চলিয়া আসিতেছে, এইরূপে দিনের পর দিন চলিতে চলিতে একটা মাসও পূর্ণ হইয়া আসিল, তথাপি তীরের কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। কলম্বসের কথা স্বতন্ত্র। তিনি জানিয়া শুনিয়া একটা বিশ্বাস লইয়াই বাহির হইয়াছেন যে, পশ্চিমদিকে এসিয়ার উপকূলে গিয়া পৌছিবেন। টস্‌কেনেলীর মানচিত্রের উপরে তাঁহার অটল বিশ্বাস। তিনি জানেন যে, অনেক দূরের পথ হইলেও—অনেক দিনের বিলম্বের কথা হইলেও—একদিন না একদিন তিনি অবশ্যই কূল পাইবেন। বিশেষ তিনি বাহির হইয়াছেন একটা নূতন পথ আবিষ্কার করিতে একটা কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে। এই যশের আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ সুখের আশ্বাস, এই অতুল আনন্দের প্রেরণাই তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেছিল. কিন্তু নাবিকেরা এই দিব্যদৃষ্টি কোথায় পাইবে। তাহারা দেখে চারিদিকে বিপুল জলরাশির বাধাহীন বিস্তার; পশ্চাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিতে পারিলে তবে দেশে পৌছান যায়, সম্মুখে কোন্ সুদূরে কোথায় কোন্ দেশ তাহার কোন উদ্দেশ নাই। তখনকার দিনে বর্ত্তমান যুগের মত মানচিত্রে সমস্ত সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না। কোথায় সাগরস্রোতের পথ, কোন্ দিকে বায়ুপ্রবাহের গতি, তাহা জানা ছিল না। কোথায় কোন্ দিকে কতদূরে গেলে কোন্ দেশ পাওয়া

যাইবে, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। এরূপ অজ্ঞানান্ধকারের অবস্থায় অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা যে কিরূপ সাংঘাতিক ব্যাপার এই ভাবিয়া তাহারা আকুল হইয়া পড়িতেছিল। ইতিমধ্যেই তাহারা কয়েকবার স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিল যে, তাহারা কলম্বসকে দেশের দিকে ফিরিবার জন্য বাধ্য করিবে; এমন কথাও হইয়াছিল যে, ইহাতে বাধা প্রাপ্ত হইলে তাহারা কলম্বসকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নিজেরাই জাহাজ লইয়া দেশে চলিয়া যাইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই অভিযানের নাবিকেরা সকলেই ছিল জেলের কয়েদী—এরূপ চরিত্রের লোকদের পক্ষে যে কোন প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা কিছুই অসম্ভব নয়। কাজেই বলিতে হয় কলম্বস যে এরূপ সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা শুধু বিধাতার বিধান।

আবারও তাহাদের মধ্যে চঞ্চলতার আভাষ দেখা যাইতে লাগিল। কলম্বস তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, ভবিষ্যতে তাহাদের এই কার্য্যের জন্য কত বড় সফলতা যে তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন। নাবিকেরা ইহাতে আশ্বাস না পাইলেও, তাহারা যতই কেন আপত্তি করুক না কলম্বস উহাতে কর্ণপাত করিবার পাত্র ছিলেন না; তিনি অভিযানে বাহির হইয়াছেন একটা নূতন পথ আবিষ্কার করিবার জন্য, তিনি একটা কিছু না করিয়া ছাড়িবেন না।

(ক্রমশঃ)

প্রাথমিক পদার্থ-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জড় ও অণু—সকল জড়পদার্থই যে অণুপরমাণু সংযোগে গঠিত—ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অণুই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাংশ, যাহা পদার্থের নিজস্ব ধর্ম্ম রক্ষা করে ; যেমন জলের অণু জলেরই অতি সূক্ষ্মকণা, এবং লবণের অণু লবণেরই সূক্ষ্মাংশ। কিন্তু জলের অণুকে আরও বিভক্ত করিলে উহা দুইটী উদজান ও একটি অম্লজান পরমাণুতে পরিণত হইবে এবং উদজান ও অম্লজান পরমাণর সহিত জলের ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। সেইরূপ লবণের অণুকে ভাগ করিলে সোডিয়ম্ ও ক্লোরিণ নামক দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে পরিণত করা যায়, কিন্তু উহাদের সহিত লবণের কোন সাদৃশ্য নাই।

যদিও অণু পরমাণু অপেক্ষা বৃহৎ, তথাপি ইহাও এত ক্ষুদ্র যে অত্যুৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও ইহা নয়নগোচর হয় না। একটি অণুর ব্যাস আন্দাজ $\frac{1}{৬৩০০০০০০}$ ইঞ্চি ; অর্থাৎ সাড়ে বাষট্টি লক্ষ অণু পাশাপাশি সজ্জিত করিলে তাহারা মাত্র এক ইঞ্চি দীর্ঘ স্থান অধিকার করিবে। যতদূর সূক্ষ্ম বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, ইহারা তদপেক্ষা প্রায় ছয়শত গুণ অধিক ক্ষুদ্র। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন বলিয়াছিলেন, একটি জলবিন্দুর আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীর সমান হইলে তাহার তুলনায় জলের অণুগুলি এক একটি ক্রিকেট বলের মত মনে হইবে।

কঠিন, তরল, বায়বীয় সকল পদার্থই অণুদ্বারা গঠিত বটে, কিন্তু অণুর সন্নিবেশের তারতম্যের উপর উহাদের বিভিন্ন অবস্থা নির্ভর করে।

কঠিন দ্রব্যের অণুগুলি খুব ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। তরল দ্রব্যের তদপেক্ষা শিথিল এবং বায়বীয় দ্রব্যের আরও অধিক অসংযত অবস্থায় আবদ্ধ থাকে।

অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি বর্ত্তমান আছে। পদার্থের কঠিন অবস্থায় এই শক্তি অধিক প্রবল থাকায় অণুগুলি খুব কাছাকাছি থাকে। সেজন্য কঠিন পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আকার ও আয়তন রক্ষা করা সম্ভব হয়। অধিক আণবিক শক্তির জন্য কঠিন পদার্থ সহজে ভেদ করা যায় না।

তরল পদার্থের আণবিক আকর্ষণী শক্তি অনেক কম। সেজন্য ইহারা নির্দ্দিষ্ট আকার রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, এবং ইহাদিগকে ভেদ করাও অনেক সহজ। একটি লোহার পেরেক জলের ভিতর অতি সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু কাষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করাইতে বিশেষ বলপ্রয়োগ করিতে হয়।

বায়বীয় পদার্থে অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে এত ব্যবধান থাকে যে, তাহাদের আকর্ষণী শক্তি নাই

বলিলেই হয়। এই শক্তির অভাবে বাষ্পাণুসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, এবং সেজন্য ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার বা আয়তন থাকিতে পারে না।

একটি জলকণার ভিতর অণুগুলি যেরূপ জড়াজড়ি করিয়া থাকে, তাহাতে এই শক্তিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি রবারের সূত্র বা নলকে সহজেই টানিয়া লম্বা করা যায়, কিন্তু একটি লৌহের তারকে টানিয়া লম্বা করা অতি কঠিন। ইহাতে দেখা যায় যে, কঠিন বা তরল একই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আণবিক আকর্ষণী শক্তিও বিভিন্ন। রবার অপেক্ষা লৌহের আণবিক আকর্ষণী শক্তি অধিক বলিয়া লৌহ রবার অপেক্ষা শক্ত এবং একই কারণে হীরক লৌহ অপেক্ষা আরও শক্ত।

একটি কাচদণ্ড জলমধ্যে ডুবাইয়া উঠাইয়া লইলে দেখিবে, উহার সহিত জলকণা আটকাইয়া আছে। ইহার কারণ এই যে, কাচের অণু ও জলের অণু মধ্যেও আকর্ষণী শক্তি বর্ত্তমান আছে। জলের মধ্যে অঙ্গুলি ডুবাইয়া উঠাইয়া লইলে একই কারণে অঙ্গুলির সহিত জলকণা আটকাইয়া থাকে, অর্থাৎ অঙ্গুলি ভিজিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একই পদার্থের অণু অথবা বিভিন্ন পদার্থের অণু উভয়ের মধ্যেই আকর্ষণী শক্তি বর্ত্তমান আছে। প্রথমটীকে আমরা 'আশ্লেষণ' ও দ্বিতীয়টীকে 'আসঞ্জন' বলিব। জলকণার সংহতি আশ্লেষণশক্তি ও কাচদণ্ড বা অঙ্গুলির সহিত জলকণার সংলগ্নতা আসঞ্জন-শক্তিজনিত। কাচদণ্ডের সহিত জলকণা নিজ দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে দেখিয়া বুঝা যায় যে, কাচ ও জলকণার আসঞ্জনশক্তি শুধু জলকণার আশ্লেষণ-শক্তি অপেক্ষা অধিক, নতুবা অঙ্গুলি বা কাচদণ্ড জলে ডুবাইয়া উঠাইবার পরে একেবারে শুষ্ক থাকিত। আবার শুষ্ক কাচদণ্ডটি জলের পরিবর্ত্তে পারদের ভিতর ডুবাইলে দেখিবে যে, দণ্ডের সহিত বিন্দুমাত্র পারদ-কণা আটকাইয়া নাই। এক্ষেত্রে পারদাণুর আশ্লেষণ-শক্তি কাচ ও পারদাণুর আসঞ্জনশক্তি অপেক্ষা অধিক

অণুমধ্যবর্ত্তী অবকাশ--

(১) ৪নং চিত্রে দেখ একটি কাচপাত্রে কতকগুলি ছোট ছোট সম আয়তনের মার্ব্বেল ভরা আছে এবং

মার্ব্বেল বালি
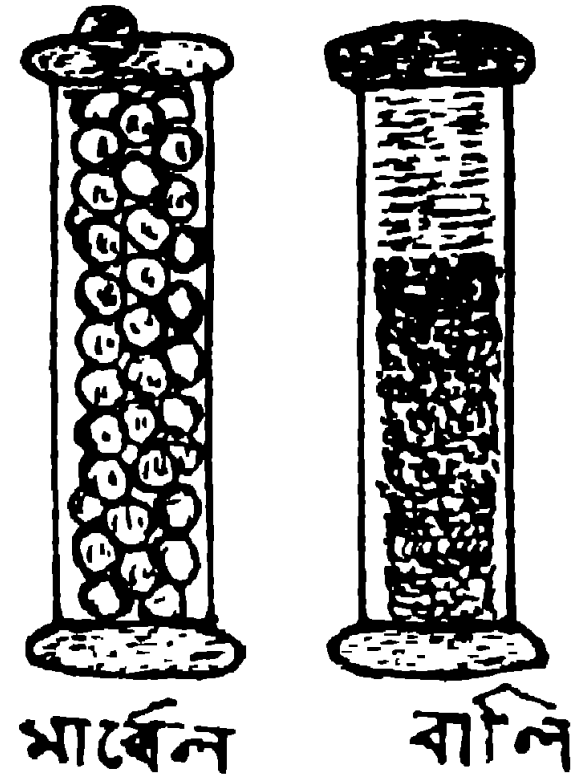
(৪নং চিত্র)

অপরটিতে বালি আছে। দ্বিতীয় পাত্র হইতে বালি লইয়া অল্প অল্প করিয়া প্রথম পাত্রে দিলে দেখিবে যে, উহা মার্ব্বেলগুলির পরস্পর মধ্যবর্ত্তী অবকাশ অধিকার করিবে, অর্থাৎ মার্ব্বেল দ্বারা ভরা প্রথম পাত্রের ভিতর দ্বিতীয় পাত্রের বালিকণাগুলিরও স্থান হইয়া যাইবে।

(২) দ্বিতীয় পাত্রটি পুনরায় বালিদ্বারা ভর্ত্তি কর। মনে হইবে যে, ঐ পাত্রে আর কোন জিনিষের স্থান হওয়া অসম্ভব। এখন ঐ পাত্রে ধীরে ধীরে জল ঢাল ও দেখ যে জল তৎক্ষণাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। জল কোথায় গেল বল ত? জল বালিকণাগুলির পরস্পর মধ্যবর্ত্তী অবকাশ অধিকার করিয়াছে।

(৩) একটি সম্পূর্ণ জলে ভরা কাচের গেলাস লও। মনে হইবে যে, উহাতে এবার কিছু যোগ করিলেই জল উছলিয়া বাহিরে পড়িবে। এখন কিছু

লবণ বা চিনি লইয়া অল্প অল্প করিয়া জলের মধ্যে দাও। দেখিবে যে, জল বাহিরে পড়িবে না, অথচ লবণ বা চিনি গেলাসের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়াছে। এ স্থান কোথা হইতে আসিল ?

এই সকল পরীক্ষাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সকল পদার্থেরই অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে অল্পবিস্তর অবকাশ আছে। প্রথম পরীক্ষায় বালিকণাসমূহ মার্ব্বেলগুলির পরস্পর মধ্যবর্ত্তী অবকাশ অধিকার করার ন্যায় দ্বিতীয় পরীক্ষায় জলকণাগুলি বালিকণা-সমূহের অন্তর্বর্ত্তী অবকাশ অধিকার করিয়াছে। জলে লবণ বা চিনি দ্রবীভূত করিলে লবণ বা চিনির অণু-গুলি জলের অণুমধ্যবর্ত্তী অবকাশের ভিতর ছড়াইয়া যায়। এইরূপে দুই বা ততোধিক তরল পদার্থ মিশ্রিত করিলে একের অণু অন্যের অণুমধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে।

অবশ্য প্রকৃতপক্ষে জড়পদার্থের অণুসমূহ মার্ব্বেল-গুলির ন্যায় স্থির থাকে না। নানা পরীক্ষায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইহারা সর্ব্বদাই গতিশীল। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে, মুখখোলা পাত্রে জল রাখিলে ঐ জলের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, সর্ব্বদাই গতিশীল জলের অণুগুলির মধ্যে কতকগুলি উহার উপরিতল হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া বাতাসের মধ্যে মিশিয়া যায়, সুতরাং অবশিষ্ট জলের আয়তন কমিয়া যায়। ইহাকে জলের **'বাষ্পীভবন'** বলা হয়। জল গরম করিলে উহার অণুগুলির গতিবেগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং আরও অধিক সংখ্যক অণু এইরূপে নিজের দল ছাড়িয়া পলায়ন করে, এবং জল আরও শীঘ্র বাষ্পাকারে পরিণত হয়। উত্তাপ দ্বারা অণুগুলির গতিবেগ বর্দ্ধিত করিলে উহাদের পরস্পর মধ্যবর্ত্তী অবকাশও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সেজন্য জলের আয়তনও বর্দ্ধিত হয়। কঠিন দ্রব্যকে উত্তপ্ত করিলে উহারও আয়তন একই কারণে বর্দ্ধিত হয়। বায়বীয় পদার্থের আণবিক আকর্ষণী শক্তি প্রায় নাই বলিলেই হয়; সেজন্য ইহারা সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ছুটাছুটি ও নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে। কোন পাত্রে ইহাদিগকে আবদ্ধ করিলে ইহারা বহির্গত হইবার জন্য পাত্রগাত্রে ধাক্কা-ধাক্কি করে, এবং ইহার ফলে পাত্রগাত্রের উপর **'চাপ'** সৃষ্ট হয়। পাত্রে আবদ্ধ কোন বায়বীয় পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে উহার অণুগুলির গতিবেগ বর্দ্ধিত হইবে, পাত্রগাত্রের উপর ধাক্কাধাক্কি এবং সেজন্য চাপের পরিমাণও বর্দ্ধিত হইবে। এই কারণে পাতলা রবারের বেলুনের ভিতর বাতাস ভরিয়া উহাকে রৌদ্রে রাখিলে আবদ্ধ বাতাসের চাপ বাড়িয়া বেলুনটির আয়তন বর্দ্ধিত করিবে।

এবার আশ্লেষণ ও আসঞ্জনের দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব

আশ্লেষণ—(১) মনে কর, একটি সরু মুখ কাচনলের ভিতর দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে (৫নং চিত্র)। একটু লক্ষ্য করিলেই

(১) (২) (৩)
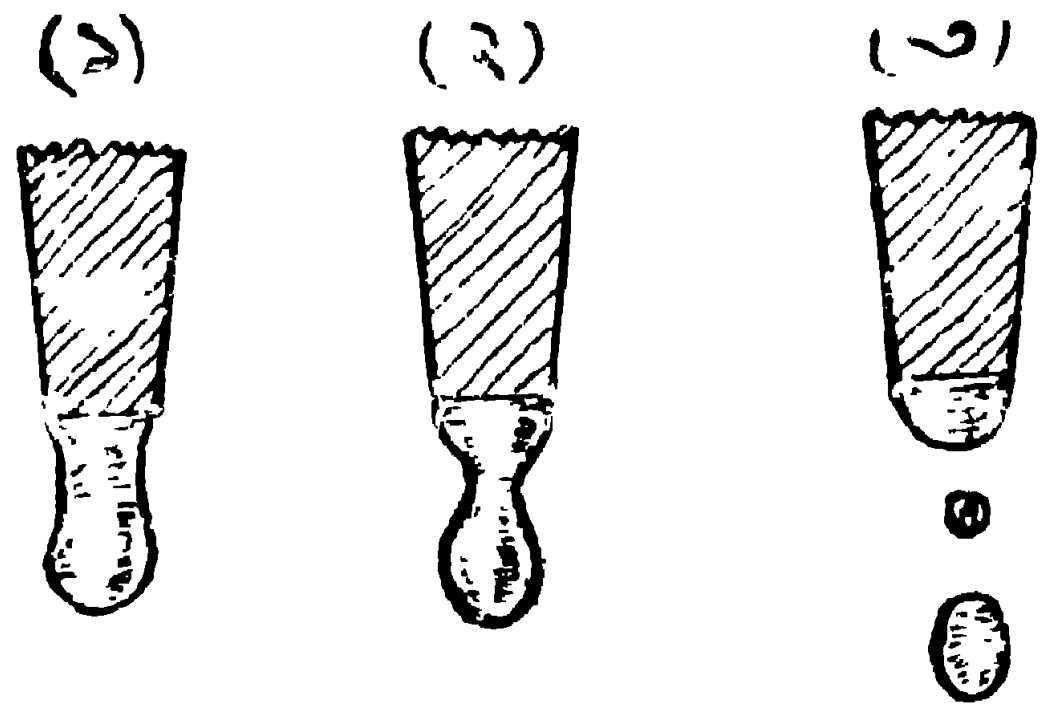
(৫নং চিত্র)

কাচনলের ভিতর দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে

দেখিতে পাইবে যে, চিত্রে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, জলের ফোঁটা ঐরূপ ক্রমশঃ বড় হইয়া অবশেষে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্নে পতিত হয়। ইহা দেখিয়া মনে হয়, যেন জলের উপরিভাগে খুব পাতলা রবারের আবরণ আছে

এবং রবার যেমন বেশী টানিলে অবশেষে ছিঁড়িয়া যায় জলের ফোঁটাও যেন নিজের দল হইতে ঠিক সেইরূপ ছিঁড়িয়া পড়ে। জলকণাগুলির পরস্পরের আকর্ষণী শক্তি বা আশ্লেষণই ইহার কারণ, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

(২) একটি সরু সূচিকে গলিত মোমের ভিতর ডুবাইয়া উঠাইয়া লও। একটি থালায় বা বড় বাটিতে জল রাখিয়া ঐ সূচিটিকে অতি ধীরে ধীরে জলের উপরিভাগে রাখিয়া দিলে দেখিবে যে, উহা জল অপেক্ষা ভারী হইলেও এখন জলের মধ্যে না ডুবিয়া ভাসিতে থাকিবে।

অনেক সময় দেখিতে পাইবে যে, ছোট ছোট পোকা মাকড় জলের উপর হাঁটিয়া বেড়াইতেছে।

ইহাতে দেখা যায় যে, জলের উপরিতল প্রসারিত রবারের পাতের ন্যায় কার্য্য করে। সকলের উপরে বা পৃষ্ঠে যে জলাণুগুলি আছে সেগুলি সর্ব্বদাই তাহাদের নিম্নতলের অণুগুলি দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সেগুলি জলের পৃষ্ঠদেশের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় তাহাদের উপরদিকে আর কোন অণু থাকে না, সুতরাং তাহারা উপরদিকে আকৃষ্ট হয় না। ৬নং চিত্রে দেখ যে ক চতুর্দ্দিক হইতে আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু খ একেবারে পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত থাকায় শুধু নিম্নদিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ইহারই জন্য জলের উপরিতলে বা
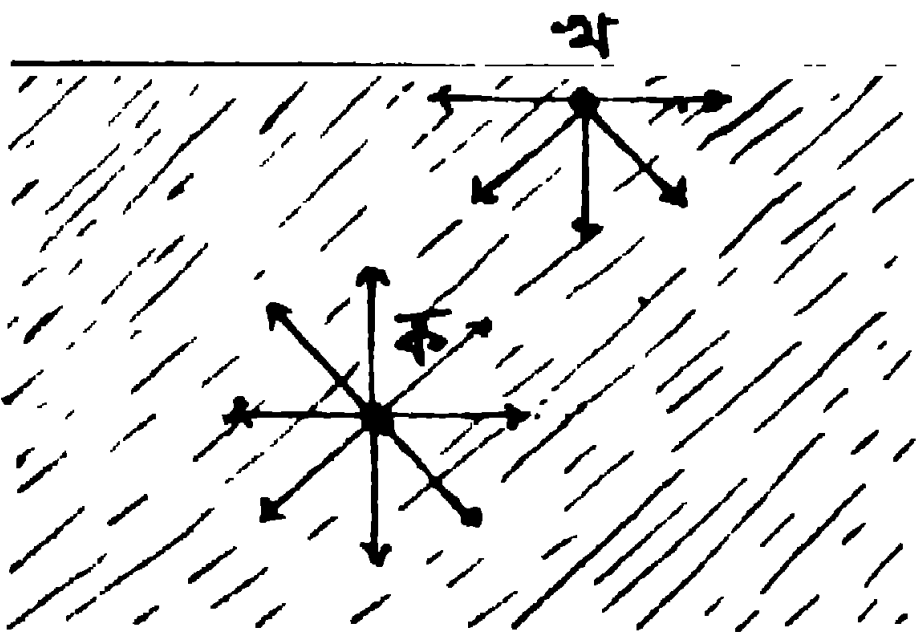
(৬নং চিত্র)
ক অণুটি জলের ভিতরে ও
খ জলের উপরিতলে অবস্থিত

পৃষ্ঠদেশে সর্ব্বদাই টান ভাব থাকে এবং রবারের পাতের ন্যায় কার্য্য করে। ইহাকে আমরা **'পৃষ্ঠ-টান'** বলিব। ইহার জন্যই বৃষ্টির জলের ফোঁটা বা শিশিরবিন্দু সর্ব্বদাই গোলাকার। খানিকটা পারদ সামান্য উপর হইতে কাগজের উপর ফেলিলে দেখিবে যে, উহা ছোট ছোট মুক্তাবিন্দুর ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া যাইবে।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, জড়-পদার্থের অণুসমূহ আশ্লেষণশক্তি হারাইলে কঠিন বা তরল সকল জিনিষের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। ঘর বাড়ী, পাহাড় পর্ব্বত সব তৎক্ষণাৎ ধূলিকণায় পরিণত হইবে এবং পৃথিবীতে জীব জন্তু, বৃক্ষলতা, নদী সমুদ্র কিছুই থাকিবে না। মোটের উপর পৃথিবীর চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

আসঞ্জন—কাচ ও জলের আসঞ্জন-শক্তির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত তোমরা এইবার লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। পুস্তকের পাতা উল্টাইবার সময় অঙ্গুলি ভিজাইয়া লইলে সহজেই এবং তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা হয়, তাহা জান ইহার কারণ, অঙ্গুলির উপরিস্থ জলকণাগুলির সহিত একদিকে অঙ্গুলির ও অন্যদিকে কাগজের কণাগুলির মধ্যে আসঞ্জনশক্তি। এই শক্তি না থাকিলে মাকড়সা গৃহকোণে জাল বুনিতে পারিত না, গৃহমধ্যে জিনিষপত্রের উপর বা দেওয়ালে ধূলি-কণা জমিতে পারিত না, শিক্ষক মহাশয় অঙ্ক বুঝাইবার সময় ব্ল্যাক-বোর্ডে খড়ির দাগ দিতে পারিতেন না, খামের উপর ডাক টিকিট আঁটিয়া থাকিত না, স্নান করিবার সময় জলে নিমজ্জিত হইয়া উপরে উঠিলেই কাপড় বা গাত্র কোথাও জলের চিহ্ন থাকিত না, সুতরাং শুষ্ক তোয়ালে দিয়া গাত্র মুছিবার আবশ্যক হইত না—এইরূপ আরও অনেক কৌতুকপ্রদ ব্যাপার সংঘটিত হইত।

এইবার আশ্লেষণ ও আসঞ্জন সম্বন্ধে অন্য একটি ব্যাপারের কথা বলিব। তোমরা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ।

(১) একটি পাত্রে জল ও অপরটিতে কিছু পারদ রাখ। একটি সরু কাচদণ্ড ও গোটাকয়েক দুই মুখ খোলা বিভিন্ন ব্যাসের সরু ছিদ্রবিশিষ্ট কাচনল লও। কাচদণ্ডটির কিয়দংশ জলমধ্য দিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, যেখানে দণ্ডটি জলের সহিত মিশিয়াছে, সেখানে দণ্ডের চারিধারে জল ঈষৎ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, কাচ ও জলের আসঞ্জনশক্তি শুধু জলকণার আশ্লেষণশক্তি অপেক্ষা অধিক, সেজন্য কাচ-গাত্রে জল উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

(২) এইবার দুই তিনটি সরু মোটা বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রবিশিষ্ট কাচনল ঐরূপভাবে জলমধ্যে রাখ। দেখিবে যে, জল নলগুলির ভিতর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত উঁচুতে ঠেলিয়া উঠিয়াছে (৭নং চিত্র) এবং সরু ছিদ্রের ভিতর জলের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহার কারণ শুন—নল জলে রাখিবার পর আসঞ্জনের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় জল নলের ছিদ্রমধ্যে ঈষৎ উঁচু হইয়া উঠে; কিন্তু জলের উপরিতলে যে পৃষ্ঠটানের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার জন্য জলের উপরিভাগ সমতল হইতে চেষ্টা করে, এবং এই চেষ্টার ফলে কিছু জল টানিয়া উপরে উঠায়। পরে আসঞ্জনের জন্য জল পুনরায় উহার চারিধারে বক্রভাবে উত্থিত হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় জলের স্তম্ভ কিছু উপরে ঠেলিয়া উঠে। এইরূপে জল ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে, কিন্তু কিছু উপরে ঐ সরু জলস্তম্ভের ভার এত বেশী হইয়া পড়ে যে, তখন জলের উপরিতলের টান উহাকে আর টানিয়া উপরে তুলিতে পারে না। সরু ছিদ্রের ভিতর জলস্তম্ভের ভার কম বলিয়া উহাকে টানিয়া কিঞ্চিৎ অধিক দূর উঠাইতে পারে। এই ব্যাপারের নাম **'কৈশিকাকর্ষণ'** এবং এইরূপ সরু নলকে কৈশিকনল বলে।

পারদকণার আশ্লেষণশক্তি পারদ ও কাচের আসঞ্জনশক্তি অপেক্ষা অধিক বলিয়া ফল বিপরীত হয়।

৭নং চিত্রে দেখ যে জল ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, কিন্তু পারদ নিম্নে নামিয়া গিয়াছে।
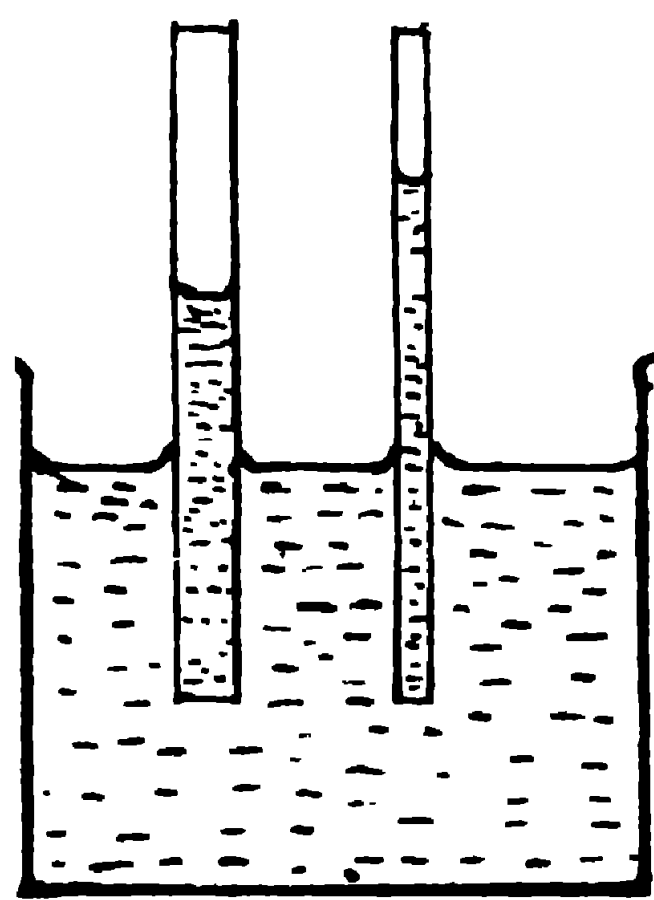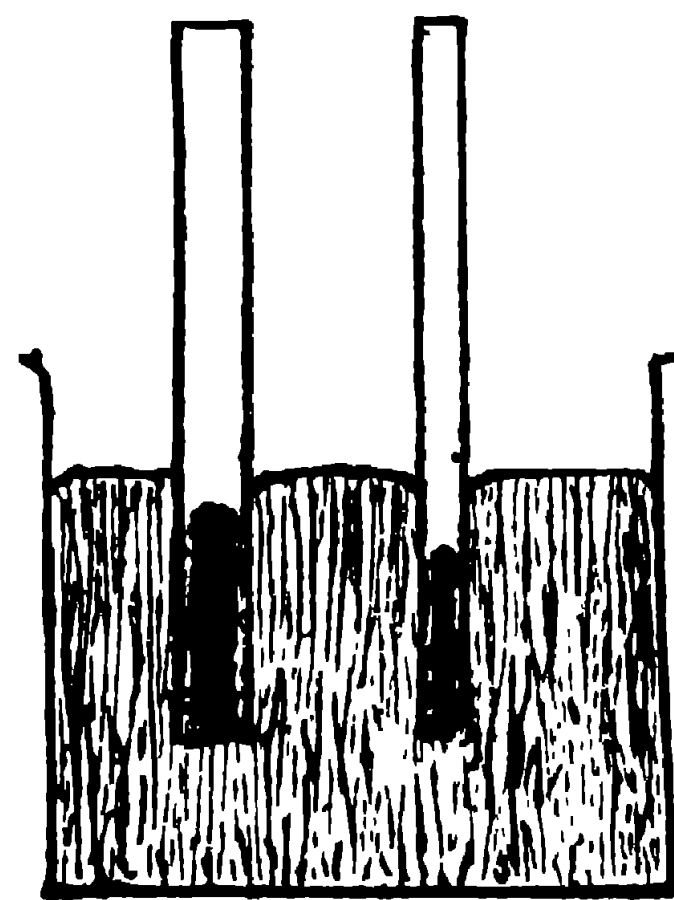
জল পারদ

(৭নং চিত্র)

কৈশিকাকর্ষণের ফল

অনেক কার্য্যে প্রত্যহ তোমাদের কৈশিকাকর্ষণের সাহায্য লইতে হয়। দোয়াত হইতে কালি লইয়া কাগজে লিখিয়া যখন ব্লটিং কাগজ দিয়া কালি শোষণ করিয়া লও, তখন দুইবার এই কৈশিকাকর্ষণের সাহায্য লইতে হয়। প্রথমতঃ নিব দোয়াতে ডুবাইলে কৈশিকাকর্ষণের জন্য কালি উপরে উঠিয়া আসে এবং একই কারণে কালি পুনরায় ব্লটিং কাগজের সূক্ষ্ম রন্ধ্র মধ্যে শোষিত হয়। ল্যাম্পের পলিতার ভিতর তৈল বা মোমবাতির পলিতার ভিতর গলিত মোম, ইহারই সাহায্যে উপরে উঠিয়া আলোক জ্বালাইয়া রাখে স্নানের পর তোয়ালে দিয়া গাত্র মুছিবার সময় জল-কণাগুলি কৈশিকাকর্ষণের জন্য তোয়ালের সূক্ষ্ম আঁশের ভিতর আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যায়, তাহা বোধ হয় এতদিন জানিতে না। ইহার জন্যই বৃক্ষলতাদি শিকড়দ্বারা রস শোষণ করিয়া সর্ব্বদেহে পরিচালিত করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। একটু লক্ষ্য করিলেই প্রত্যহ ইহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে।

(ক্রমশঃ)

পল্লীচিত্র ও দেশী চিনি

এক সময় বঙ্গদেশ ভারতের মধ্যে শর্করা প্রস্তুতের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল। বাঙ্গালীই ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টান্নপ্রিয় জাতি এবং বঙ্গদেশে যত প্রকার মুখরোচক মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, সমগ্র ভারতের কুত্রাপি আর সেরূপ দ্রব্য প্রস্তুত হয় না। বঙ্গের বাহিরে যে স্থানে গমন করা যায়, তথাকার মিষ্টান্ন বিক্রয় স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বিজ্ঞাপন ফলকে লিখিত রহিয়াছে 'Bengal sweetmeat shop' এবং তাহা হইতে তথাকার ধনিক ও বিলাসী সম্প্রদায় মিষ্টান্ন সাদরে গ্রহণ করেন।

বঙ্গবাসীর মিষ্টান্ন প্রিয়তার নিমিত্ত বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে শর্করা উৎপাদিত হইত। তাহার পরিমাণ প্রাচুর্য্য এরূপ ছিল যে, দেশবাসীর আবশ্যক সঙ্কুলান হইয়া দেশ বহির্ভূত স্থানে রপ্তানী হইয়া তথা হইতে প্রচুর অর্থ আনয়ন করিতে সমর্থ হইত। তাহার ফলে দেশ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বিরাজমান থাকিত।

এই চিনি বঙ্গদেশে উৎপন্ন ইক্ষু ও খেজুর রস হইতে উৎপন্ন হইত। খেজুর বৃক্ষ যে বঙ্গের একটি লাভজনক সামগ্রী, তাহা বোধ হয় বঙ্গবহির্ভূত লোকগণ অবগত নহে। এই অনাদরে বৰ্দ্ধিত পতিত ভূমিতে উৎপন্ন খেজুর বৃক্ষই এক সময়ে বাঙ্গালীর অন্নসংস্থানের অন্যতম উপাদান ছিল। এক্ষণে অনেকে বোধ হয় তাহা চিন্তার মধ্যেও আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে না।

এক্ষণে কিন্তু বাঙ্গালীর সেই অন্নসংস্থানের অন্যতম উপাদান খেজুর বৃক্ষ বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল বৈদেশিক শর্করার আমদানী এবং তাহাই দেশবাসী-কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত। বৈদেশিক চিনির ব্যবহারে

দেশবাসী যে বিশেষ লাভবান হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদ্বারা দেশমধ্যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু দেশবাসী এখনও তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না।

বঙ্গবাসীর এক্ষণে কর্ত্তব্য এই নষ্টপ্রায় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করা। তাহা হইলে দেশবাসীর পুনরায় কিছু অন্নসংস্থানের উপায় সঙ্ঘটিত হইতে পারে এবং তাহাতে দেশমাতার বদনও পুনরায় হাস্যবিকশিত হইয়া উঠিবে।

ইহার পুনরুদ্ধার বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে—কেবলমাত্র পুনরায় একাগ্রচিত্তে বৈদেশিক শর্করার পরিবর্ত্তে দেশীয় শর্করার ব্যবহার। দেশীয় শর্করা পুনঃ প্রচলিত হইলে তাহা উৎকর্ষ সাধিত হইয়া বাঙ্গালার একটি বিলুপ্ত বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। একমাত্র দেশীয় শর্করার ব্যবসায় নষ্ট হইয়া দেশ যে কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহা অনেকে অবগত নহেন।

আজকাল পল্লীসংস্কার, পল্লীসংস্কার রবে বাঙ্গালার গগন-পবন মুখরিত হইতেছে; কিন্তু পল্লীর যে কোন্ স্থানের সংস্কার করিলে তাহা সংস্কৃত হইবে সে সম্বন্ধে বড় কেহই কিছু বলিয়া দিতেছেন না, কিম্বা তাহার উপায় বিধান করিতেও বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন না।

চেষ্টার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ বলিতেছেন দেশের জঙ্গল পরিষ্কার কর, কেহ বলিতেছেন দেশের মরা হাজা জলাশয়গুলির পুনঃ সংস্কার কর, কেহ বলিতেছেন পল্লীর রুদ্ধ জলনিকাশের পথগুলি মুক্ত করিয়া দাও, কেহ বলিতেছেন পল্লীর শিক্ষিত সম্প্রদায় পুনরায় পল্লীমুখী হউন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বিষয় হইতে পারে, দেশের এই অভাবগুলি পূর্ব্বে ছিল—না এক্ষণে হইয়াছে? যদি এক্ষণে হইয়া থাকে, তবে কেন এরূপ হইল? তাহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কি চিন্তা করিয়াছেন? যদি চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই কারণেরই চিকিৎসা করা আবশ্যক, নচেৎ এই রোগ আরোগ্য হইবার অন্য উপায় নাই। ইহার "কারণ" দূর হইলে আর পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল পরিষ্কার, জলাশয় উদ্ধার প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যক হইবে না, আপনা হইতেই তাহা সম্পন্ন হইবে। তাহা সম্পন্ন হইলে বিলুপ্ত পল্লীশ্রী যে পুনরায় ভাস্বর মূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

এসম্বন্ধে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও বিপদাপন্ন অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছি। তাহা বর্ণিত হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সেই সঙ্গে দেশের যুবকগণেরও মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না।

একদা প্রভাতে আমি হুকাটী হস্তে লইয়া যে মুহূর্ত্তে বাটীর বহির্গত হইয়াছি, তখনই দেখিতে পাইলাম যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী অতি বিমর্ষ বদনে প্রভাতের ট্রেণে কলিকাতা হইতে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রটী ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় অবস্থান করিয়া বি, এ, পাস করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি তাহার কলিকাতায় অবস্থানের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হইয়া তাহাকে দেশে লইয়া আসিয়াছিলাম। পুত্রটী আমার অতি ভাল। সে আর বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধের ভার না হইয়া নিজের উপায়ের চেষ্টা করিতে ব্যস্ত।

তাহার এই ব্যস্ততার বিষয় জানিতে পারিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, তুমি যে নিজের উপায় নিজে করিতে চেষ্টিত তাহা অতি সুখের বিষয়। কিন্তু এক্ষণে আর কি করিবে তুমি বরং কিছু দিবস আমাদের গ্রামের শশী পোদ্দারের বড় গোলদারী দোকানে থাকিয়া ব্যবসায়কার্য্য শিক্ষা

করিয়া লও। পরে আমি মূলধনস্বরূপ তোমাকে কিছু অর্থ প্রদান করিব তাহা লইয়া কোন কিছু ব্যবসায় আরম্ভ করিও। পুত্রটী কিন্তু তাহাতে একেবারে নারাজ, সে দোকানদারীকে অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া মনে করে।

যদিও আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে ব্যবসায় করিতে রাজী হইল, কিন্তু সে তাহা শিক্ষা করিতে রাজী নহে। তাহার বিশ্বাস ব্যবসায়কার্য্যে শিক্ষা করিবার কিছুই নাই। টাকা হস্তে লইয়া বসিলেই ব্যবসায় করা যায়। এদিকে আমি যদিও পল্লীগ্রামের লোক তথাপি আমার এ জ্ঞান আছে যে. পিপাসার জল অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। সেই কারণ আমি পুত্রের ঐ বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া তাহার নিকট কোন অর্থ প্রদান করিতে সাহসী হই নাই।

তাহার উপর পুত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অনত যে, সে কখনও শশী পোদ্দারের নিকট অবস্থান করিয়া ব্যবসায়কার্য্য শিক্ষা করিবে না। কারণ জিজ্ঞাসায় অবগত হইলাম যে, শশী পোদ্দার যদিও দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা বিশেষ অর্থশালী হইয়াছে এবং নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেছে, বহু নিরন্নকে চাকরী প্রভৃতি প্রদানে অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেছে, তথাপি সে ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহে, কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়াছিল।

আমি কিন্তু দেখিতে পাই যে, বঙ্গভাষায় শিক্ষিত শশী পোদ্দারের জ্ঞান ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত যুবকের অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার কারণ কি আমায় কেহ বলিতে পারেন? আমার বোধ হয়, সে ব্যক্তি মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছে বলিয়াই আজ যেন অতি অল্পেই নানারূপ জ্ঞান শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমি সেদিন এক-খানি সংবাদপত্র পাঠ করিবার সময় দেখিলাম তাহাতে লিখিত আছে যে, ইউরোপখণ্ডের প্রায় সর্ব্বদেশেই শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু এদেশের শিক্ষার ব্যাপার অতি শোচনীয়।

তখন আমি সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে দেখিলাম যে, তাহাদের সেই শিক্ষা তাহাদের মাতৃভাষার দ্বারা সম্পাদিত হয়, আর এদেশের শিক্ষা বৈদেশিক ভাষার দ্বারা প্রদত্ত হয়—তাহাতে আর জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করিবে কি প্রকারে? একজন শিক্ষার্থীর অর্দ্ধ জীবন অতিবাহিত হইবে কেবলমাত্র ভাষা জ্ঞান আয়ত্ত করিতে, পরে ত তাহার জ্ঞানলাভ হইবার সূচনা হইবে? কিন্তু তখন সে ব্যক্তির জ্ঞান লাভের স্থান ত্যাগ করিয়া সংসারনদীর তীরে উপস্থিত হইবার সময় আগমন করিবে। যদি কেবলমাত্র একটা বৈদেশিক ভাষাজ্ঞানই শিক্ষার অঙ্গ হয়, তাহা হইলে শিক্ষার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই কি আজকাল শিক্ষার ধারা? আমার পুত্রটী কি সেই অভিমানে অভিমানী, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

পুত্রটির যখন ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ধারণা এবং ইংরাজী অনভিজ্ঞের প্রতি ঘৃণার বিষয় বুঝিতে পারিলাম, তখন তাহাকে ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে টানিয়া আনিয়া কৃষি-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাইতে মনস্থ করিলাম। পুত্রকে বলিলাম, যখন তুমি ব্যবসায় শিক্ষা না করিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে গমনে ইচ্ছুক, তখন আমি তোমাকে মূলধনস্বরূপ অর্থ প্রদান করিতে পারি না। তবে তুমি ব্যবসায় না করিয়া চতুর্দ্দিকে আমার যে অনেক জমি পরিদর্শকের অভাবে পতিত রহিয়াছে তুমি তাহাতে চাষ আবাদ কর।

চাষের নাম শ্রবণ করিয়া পুত্র আমার ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদাজল ভাঙ্গিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষকদের কার্য্য

পরিদর্শন করিতে যাইবে, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তাহাতে সর্পাদির ভয় আছে, ম্যালেরিয়ার ভয় আছে, সম্মানের হানি আছে, আরও কত কি আছে। তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, সর্পাদির হস্তে আর কয়টা প্রাণ হানি হয়, ভয় যাহা তাহা ঐ ম্যালেরিয়ার।

তুমি তোমার দরিদ্র পল্লীবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অমর হইবার জন্য এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে? কিন্তু তুমি একবারও চিন্তা কর না যে, তোমার জীবিকার উপায় এই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে লইতে হইবে। তাহা অপেক্ষা তুমি কেন এই স্থানে অবস্থান করিয়া এই স্থানকে ম্যালেরিয়া শূন্য করিয়া এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া আপনার করিবার চেষ্টা করিয়া এই স্থানে বাস কর না? সহরের ধূলিপূর্ণ বাতাস অপেক্ষা পল্লীর এই শ্যামল শীতল ছায়াপূর্ণ বায়ু কি ভাল নহে?

যদিও সহরে ম্যালেরিয়ার অংশ অল্প, কিন্তু তথায় তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর রোগ যক্ষ্মা, অম্বল প্রভৃতি বর্ত্তমান। পল্লীর কয়জন লোক যক্ষ্মা রোগে কিম্বা অম্ল রোগে আক্রান্ত হয়? সমস্তই ত সহর হইতে পল্লীতে ব্যাপ্ত হয়।

যাহা হউক, পুত্রের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম তোমার ধান্য চাষ করিতে হইবে না। তাহা অপেক্ষা তুমি উচ্চ ভূমিতে কদলী, নারিকেল, পেঁপে, বাঁশ প্রভৃতির চাষ করিয়া তাহাদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ কর। পুত্র আমার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যসংবরণ করিতে অক্ষম হইল এবং প্রকাশ করিল যে উপরোক্ত চাষের দ্বারা কিছু অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে, তাহা সে বিশ্বাসই করে না। এইরূপই আমাদের চিন্তার ধারা।

আমি পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, উপরোক্ত এক একটি দ্রব্যের চাষের দ্বারা কিরূপ অর্থাগম হইতে পারে। কেহ চেষ্টা করে না, নচেৎ এত দিবস বেকার সমস্যার অনেক সমাধান হইত।

আমি পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মনোভাব অবগত হইবার জন্য তাহার করণীয় বস্তুর বিষয় জিজ্ঞাসু হইলাম। পুত্র আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল যে, সে কোন চাকরী করিতে ইচ্ছুক এবং প্রত্যহ কোট প্যাণ্ট পরিধান করিয়া আফিসে যাতায়াত করিবে ইহাই তাহার মনোগত ভাব। তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতেই মত প্রদান করিলাম, কারণ বাল্যের অধীত চাণক্য পণ্ডিতের সেই শ্লোকের বিষয় এখনও ত বিস্মৃত হই নাই—"প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ"।

তাই পুত্রটিকে কিছু অর্থ প্রদানপূর্ব্বক কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার ইচ্ছাতথায় সে চাকরী সংগ্রহ করিবে। তাহার দুইমাস কলিকাতায় অবস্থানের পর অদ্য সে হতাশ হইয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সে নাকি তথায় একটি আফিসে ভাল চাকরী ঠিক করিয়াছিল, বেতন পঁচিশ টাকা; কিন্তু তাহা অপেক্ষা উচ্চ উপাধিধারী এম, এ, পাস যুবক সেই চাকরীর প্রার্থী হওয়ায় তাহার সেই চাকরীটী হইল না। ইহাই তাহার দুঃখের কারণ। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, পুত্র আমার পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়াছে; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে আমার যে ব্যয় হইয়াছে সেই অর্থের সুদ পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক।

যাহা হউক, পুত্রের নিজের অবস্থা পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গমনোদ্যত হইয়াছি এরূপ সময়ে আমার গৃহিণী আসিয়া জানাইলেন যে, অদ্য ঠাকুর ঘরে আমার ঐ

পাস করা পুত্রের কল্যাণে ডাব চিনি মানস আছে, সেই মানসের জন্য চিনি আবশ্যক। আমি শ্রবণ করিয়া বলিলাম, কেন দোকান হইতে তাহা আনা হউক, আমি আর তাহার কি করিব। গৃহিণী তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সে চিনিতে হইবে না, দেশী চিনি আবশ্যক। বিলাতি চিনির দ্বারা ঠাকুরের ভোগ নিবেদন হয় না।

আমি সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলাম, এতদিন তোমরা কোন্ চিনির ভোগ দিতে? গৃহিণী তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এতদিন জানিতাম না যে, যে চিনি আমরা দেশী বলিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিতাম, তাহা দেশী নহে, তাহা বিলাতি চিনি। কেবল তাহা কলিকাতার কাশীপুরে 'টার্‌নার মরিসন কোং' কলে দেশীর অনুরূপ পেষাই হইয়া দেশী নামে চলিতেছে। এক্ষণে তাহা জানিতে পারিয়াছি। আর তাহা ঠাকুরের ভোগে নিবেদন করিব না।

সেই কথা শ্রবণ করিয়া আমার সেই বৎসরের একটি ঘটনার কথা স্মরণ হইল এবং মনে হইল, ইহারা পল্লীমহিলা না জানিয়া যাহা করিয়াছে সেই জন্য অনুতপ্ত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার বিশ্বাসের মূলে আঘাত লাগিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে। সেবার আমাদের জেলার সহরে একটি বড় স্বদেশী সভা হইয়াছিল। বাঙ্গালার সকল স্থানের বহু বড় বড় স্বদেশী নেতার শুভাগমন হইয়াছিল। তথায় মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ নেতাগণের দোহাই দিয়া স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য নানারূপ উপরোধ অনুরোধ প্রভৃতি চলিয়াছিল।

আমি সেই সময় আমাদের গ্রামের নকড়ী মণ্ডলের বাকী খাজনার নালিশ করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। দেখিলাম সকলেই খদ্দর পরিহিত এবং সকলেই যাহাকে দেখিতে পায় তাহাকেই দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করেন। ঘটনাসূত্রে আমি কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য তথাকার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-বিক্রেতা গোবিন্দ মোদকের দোকানে প্রবেশ করিয়াছি, দেখিলাম এক গাড়ী বিলাতি চিনি উক্ত গোবিন্দ মোদকের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি একসঙ্গে এত চিনির আমদানী দেখিয়া কিঞ্চিৎ কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে গোবিন্দকে চিনির আমদানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। গোবিন্দ আমার কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বাবু আমাদের এখানে যে স্বদেশী সভা হইতেছে তাহাতে উপস্থিত বাবুগণের ভোজনের মিষ্টান্ন সরবরাহের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে নানারূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার জন্য এই চিনি আমদানী করিয়াছি।

গোবিন্দ মোদকের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলাম। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, গোবিন্দ, বাবুরা যে স্বদেশী সভা করিতে আগমন করিয়াছেন, তোমার এই মিষ্টান্ন সকল যে বিলাতি চিনিতে প্রস্তুত ইহাতে বাবুদের কোন আপত্তি হইবে না? গোবিন্দ বলিল, কৈ বাবু, তাহা ত কিছুই দেখি না। কল্য আমার তিন মণ চিনির খাবার বাবুরা লইয়া গিয়াছেন। অদ্য সকাল হইতে তাগিদ আসিতেছে যে, খাবার পাঠাও। বাবু, আমাদের এখানকার স্বদেশীর নেতা যে বাবু, তিনি ত প্রত্যহ আমার দোকান হইতে দুই তিন সের করিয়া এই চিনির খাবার লইয়া যান। বোধ হয়, গান্ধী মহারাজ বিলাতি চিনি খাইতে নিষেধ করেন নাই।

আমি বলিলাম, দেশী চিনি কি পাওয়া যায় না? তাহাতে খাবার প্রস্তুত করিলে কি হইত? গোবিন্দ বলিল, বাবু বর্ত্তমানে দেশী চিনি অল্পই পাওয়া যায়, কারণ কেহই তাহা গ্রহণ করে না। সেইজন্য দেশী চিনির কারখানা সকল প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সামান্য যাহা দুই একটি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যে

সামান্য চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক। কারণ এক্ষণে কেহ প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত করে না, সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত করে তাহাতে খরচ অধিক পড়ে। সেই জন্য তাহার মূল্যও অত্যধিক হইয়া উঠে। যদি অধিক পরিমাণে চিনির কাটতি হইত, তাহা হইলে ব্যবসাদারও অধিক পরিমাণ চিনি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিত, তাহাতে অল্প খরচায় অধিক মাল উৎপন্ন হইত এবং ব্যবসাদারও স্থলভে তাহা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত।

আমি তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলাম, এই স্বদেশী সভার বাবুরা চিনির খাদ্যের পরিবর্ত্তে গুড় ব্যবহার করিতে পারিতেন। গোবিন্দ তাহা শ্রবণ করিয়া বলিল, বাবুরা বোধ হয় তাহাকে ঘৃণিত খাদ্য বলিয়াই মনে করেন। গুড় খাইতে হইলে চিপিটক আবশ্যক, কিন্তু বাবুরা তাহা ভোজন করেন না। এরূপ সময়ে দেখি কতকগুলি যুবক এবং বালক মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিয়া দ্বিপ্রহরে জলযোগ করিবার জন্য গোবিন্দের দোকানে আগমনপূর্ব্বক সেই বৈদেশিক শর্করায় প্রস্তুত মিষ্টান্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিল।

আমি তাহাদিগকে সেই বৈদেশিক শর্করার দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলাম, তোমরা গাঁজা ও মদের দোকানে পিকেটিং করিতেছ অর্থাৎ যাহাতে আর দেশে গাঁজা ও মদ বিক্রয় না হয়। কিন্তু তাহা অপেক্ষা কি এই বিলাতি চিনির ব্যবহার কোন অংশে উৎকৃষ্ট বলিতে পার? বরং গঞ্জিকা, অহিফেন এবং দেশীয় মদ এই দেশেই উৎপন্ন হয়। ইহার সমস্ত টাকাই এই দেশে থাকিয়া যায়, কিন্তু এই বৈদেশিক শর্করার বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি। মদ গাঁজা কয়জন লোকে খায়, কিন্তু চিনি দেশের প্রত্যেক লোক ভক্ষণ করে, তাহাতে এত বড় বিরাট দেশ হইতে ইহার জন্য কত টাকা বহির্গত হইয়া যায়।

আজ এই বৈদেশিক চিনির ব্যবহারের নিমিত্ত দেশের কত লোক নিরন্ন হইয়া গিয়াছে একবার তাহা চিন্তা করা আবশ্যক নয় কি?

আমার সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বালকটি বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য; কিন্তু আমরা এসম্বন্ধে কি বলিব। আমাদের নেতারা নির্ব্বিকারে ইহাই ভক্ষণ করিতেছেন। অদ্য আমরাই প্রভাতে স্বেচ্ছাসেবক অবস্থায় নেতাদিগের চা প্রস্তুত করিবার সময় এই চিনির দ্বারাই চা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি এবং তাহারা সকলেই তাহা সাদরে পান করিয়াছেন। সেই কথা শ্রবণ করিয়া আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ইহাই কি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের একনিষ্ঠতা! সেই সময় আরও চিন্তা করিয়াছিলাম যে, আজ দেশ-নেতাগণ যেরূপ প্রচণ্ডভাবে বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া বেড়াইতেছেন, যদি সেইরূপ প্রচণ্ডভাবে বৈদেশিক চিনিও পরিত্যাগ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে আজ দেশের বহু নিরন্ন কৃষকের গৃহের অন্নাভাব দূর হইত। আজ কৃষক পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিয়া ব্যাপকভাবে ইক্ষু ও খেজুর গাছের চাষ করিতে বদ্ধপরিকর হইত।

যদিও সে কথা আমার স্মৃতিপথ হইতে লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু অদ্য গৃহিণীর দেশী শর্করা আনয়নের তাড়নায় পুনরায় সেই কথা স্মরণ হইল; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমি আর এ সম্বন্ধে কি করিব। যাহা হউক, গৃহিণীকে তখন নিরস্ত হইবার জন্য উপদেশ দিলাম যে, যদি একেবারে দেশী চিনি না

পাওয়া যায়, তাহা হইলে ডাব চিনির পরিবর্ত্তে না হয় ডাব গুড় প্রদান কর—গুড় ত দেশী।

গৃহিণী আমার সেই কথাকে বিদ্রূপ মনে করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তিনি আমাদের বাঙ্গালীর হিন্দুর ঘরের গৃহলক্ষ্মী। যাহা সনাতন সংস্কার তাহা হইতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না, তাহাতে প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত এবং তাঁহাদের নিজ সংস্কারই তাঁহাদের ধর্ম্ম, এই ত তাঁহাদের বিশ্বাস। তিনি বলিলেন, না তাহা হয় না। ঠাকুরঘরে ডাব গুড় দেওয়া যায় না। ঠাকুর গুড় খান না, চিনি আবশ্যক। আমিও তখন মনে মনে ভাবিলাম, ঠাকুর যে গুড় খান না, তাহা সত্যও হইতে পারে। কারণ আমরাই যখন গুড়কে অসভ্য খাদ্য মনে করি, তখন আমাদের ঠাকুরই বা কেন সেই সভ্যতার পদ হইতে বিচলিত হইবেন। তিনি ত আমাদেরই ঠাকুর।

তখন আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্কন্ধে একখানি চাদর ফেলিয়া দেশী চিনির অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বে আমাদেরই গ্রামে দশ পনরটি চিনির কারখানা ছিল। দেখিতাম, তথা হইতে বহু চিনি শকট বোঝাই হইয়া কলিকাতায় চালান হইতেছে এবং সেই সকল কারখানার মালিকগণের কেমন সচ্ছল অবস্থা। তাহাদের গৃহে সদাই হাস্যরোল, কত আনন্দ, কত ভোজনের ব্যাপার, কত উৎসব আমোদ; কিন্তু এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিদেশী চিনি আমদানী হইবার পর তাহাদের সেই হাস্য কোলাহল মুখরিত ভবন আজ নিরানন্দের অন্ধকারে আবৃত।

আমাদের গ্রামের রসিক মণ্ডল একদিন এই দেশী চিনির কারখানা করিয়া জমিদারী পর্য্যন্ত খরিদ করিয়াছিল এবং তাহার গৃহে বারমাসে তেরপার্ব্বণ সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। এক্ষণে কিনা সেই রসিক মোড়লের পুত্র এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই নিঃস্ব হইয়া লাঙ্গল স্কন্ধে রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে সামান্য কয়েক বিঘা জমি চাষ করিয়া কোন প্রকারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহার সেই বিস্তীর্ণ কারখানাবাটীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ হইয়া আজ তাহার উপর পাট হইতেছে।

একা রসিক মণ্ডলের যে কেবল এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা নহে। রসিক মণ্ডল, বৈকুণ্ঠ পাড়ুই, নবীন দালাল, ছমিরদ্দিন বিশ্বাস, তাছের গাজী প্রভৃতি আরও আট দশজন লোক একই কারণে সম অবস্থাপন্ন হইয়াছে। সকলেরই কারখানাবাটী এক্ষণে পাটের জমিতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ ইষ্টকভবন সকল এক্ষণে ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ইহা ছাড়াও গ্রামের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এই সকল কারখানার শ্রমিকের কার্য্য করিয়া অতি স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। সকলের সুন্দর সুন্দর গৃহ নানারূপ তৈজসপত্রে পূর্ণ ছিল এবং সকলেই মনের আনন্দে অবস্থানের নিমিত্ত স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহারা কার্য্যাভাবে দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদের সেই গৃহ সকল পর্ণকুটীরে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাদের সেই তৈজসপত্র বিক্রয়, বন্ধক প্রভৃতিতে প্রায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকের এক্ষণে ভোজনপাত্র ভগ্ন প্রস্তর ও থালা এবং জলপাত্র মৃত্তিকানির্ম্মিত ভাণ্ড, ইহাই তাহাদের সম্বল। তাহার উপর অন্ন চিন্তার জন্য মানসিক অশান্তির তাড়নায় সকলেরই প্রায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া এক্ষণে অকালবার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের গ্রামের এই চিনির কারখানা নষ্ট হইয়া গিয়া যে কেবলমাত্র শর্করা ব্যবসায়ীর এবং তাহাদের শ্রমিকগণের অবস্থা শোচনীয় করিয়াছে, তাহা নহে। গ্রামের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হওয়াতে,

আর গ্রামের গোপকুলের দধি দুগ্ধ বিক্রয় হয় না। তাহারা ক্রমশঃ দারিদ্র্যদশায় উপস্থিত হইতেছে। মোদকের মিষ্টান্ন বিক্রয় হয় না। নাপিতকুল আর গৃহস্থ বাটী হইতে পূর্ব্বের ন্যায় বিদায় প্রাপ্ত হয় না, তাহাদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইতেছে। বারুইয়ের পান বিক্রয় হয় না, জেলের মৎস্য খরিদ করার লোক আর বাজারে নাই। এমন কি, জমিদারের খাজনাই সময়ে আদায় হয় না। জমিদার দারিদ্র্যদশায় পতিত হইয়াছেন। গ্রাম্য চিকিৎসকও চিকিৎসাকার্য্য করিয়া আর সেরূপ পয়সা প্রাপ্ত হন না। অনেকে উদরান্ন সংগ্রহ করিতে অপারক, তাহাতে চিকিৎসকের পয়সা কোথা হইতে প্রদান করিবে।

গ্রাম্য জলাশয় সকল আর মালিকের অর্থাভাববশতঃ পঙ্কোদ্ধার হইতে বঞ্চিত। তাহারা যেন সেই লজ্জায় পানা, শেওলা প্রভৃতি দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া নানারূপ রোগের বীজাণু লইয়া বসিয়াছে। লোকে সেই জল পান করিয়া পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইতেছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে শ্রবণ করিতেছে, বঙ্গবাসী অসভ্য, তাহারা স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ।

ঠিক এই কারণেই গ্রামের পূর্ব্ব পরিষ্কৃত বাগান সকল এক্ষণে জঙ্গলাবৃত হইয়া ইহাদের অধিস্বামীবর্গের উপর ক্রোধ করিয়া ম্যালেরিয়ার বীজ ক্রোড়ে লইয়া অবস্থান করিতেছে। কেহ ইহাদের নিকট গমন করিলে অমনি ম্যালেরিয়ার বীজ ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করে। গ্রাম্য রাস্তা সকলও অর্থাভাবে সংস্কার বঞ্চিত হইয়া দিন দিন শীর্ণকায় হইয়া পাতালে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামের পয়স্বিনী এবং ভারবাহী বলদ সকল তাহাদের প্রভুগণের অবস্থাদৃষ্টে ক্ষোভে আকাশমার্গে উড্ডীন হইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। সেই নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে আর পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ কিম্বা কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুষ্করিণীর মৎস্য সকলও সেই পচা শেওলাবৃত জলের মধ্যে অবস্থান করিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে। সেই নিমিত্ত তাহারাও দিন দিন সন্তান প্রসব করিতে পারিতেছে না। ইহার পরিণাম যাহা হয়, এক্ষণে তাহাই হইতেছে।

ইহাই আমাদের গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা। এখন যে সময় গ্রামে মড়ক উপস্থিত হয়, তখন দেখি সেই মড়ক নিবারণ করিবার জন্য সরকার হইতে বড় বড় ডাক্তার প্রেরিত হয়। তাঁহারা মড়ক নিবারণের জন্য নানারূপ বৈদেশিক ঔষধের টীকা প্রভৃতি প্রদানান্তে তাঁহাদের জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গমনকালে আমাদিগকে বিশেষরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক উপদেশ প্রদান করিতেও ভুলিয়া যান না।

আমি কিন্তু তখন দূর হইতে তাঁহাদের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাস্যসংবরণ করিতে পারি না এবং মনে মনে বলি যে, যতই আমরা স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে অজ্ঞ হই তথাপি আমরা জানি যে এই স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার মূল কোথায় এবং তাহা কিরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। তোমরা বাহিরে যতই ঔষধের প্রলেপ দাও তাহাতে রোগের মূল দূরীভূত হইবে না। ইহার মূলদেশ অন্যস্থানে নিহিত।

অনেক দুঃখের কথা বর্ণনা করিয়াছি। এখন যে দুইটা সুসমাচার প্রদান করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া বোধ হয় সকলে সুখী হইবে। বিশেষতঃ এই নারী প্রগতির যুগে নারীগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা শুনিলে নিশ্চয় আমাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবে না।

পল্লীতে এক্ষণে আর সায়ংকালে পূর্ব্বের ন্যায় কাহারও চণ্ডীমণ্ডপে, গ্রীষ্মের সময় কাহারও প্রাঙ্গণে অথবা গ্রামের সরকারী পঞ্চাননতলায় সকলে মিলিত হইয়া সেই সান্ধ্যবৈঠক হয় না। কারণ ইহাতে জ্বালানী তৈল এবং তামাকে কিঞ্চিৎ

ব্যয় হয়। তৎকালে প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিত যে, সে সেই ব্যয়ভার বহন করিবে এবং তাহার বাটীতেই বৈঠক হউক।

কিন্তু এক্ষণে আর কেহই সেই ব্যয় বহনে ইচ্ছুক নহে। নাই, তা ব্যয় করিবে কোথা হইতে ? প্রত্যেকেই ইচ্ছা করে তাহার বাটীতে সান্ধ্যবৈঠক না বসিয়া প্রতিবেশীর বাটীতে বসুক। সে তথায় গমন করিয়া তাহার তামাক ব্যয়ের কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া আসে। সেই কারণে, এক্ষণে কেহ আর কাহারও বাটীতে আগমন করে না।

পূর্ব্বে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই বৈঠক বসিত বলিয়া বাটীস্থ পুরুষ ব্যক্তিগণ তথায় গমন করিয়া নানারূপ ক্রীড়া, গল্প প্রভৃতির দ্বারা সমস্ত দিবসের কর্ম্মক্লান্ত মনকে পুনরায় সতেজ করিয়া লইত। এদিকে সেই সময় গৃহস্থিত মহিলাগণ সমস্ত দিবসের গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া পুরুষগণের রাত্রিকালের আহার্য্য দ্রব্য আবৃত করিয়া তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে হইত বলিয়া সেই অবসর অতিবাহিত করিবার জন্য সামান্য সামান্য কুটীরশিল্পে নিযুক্ত হইত।

কেহ বা সেই অবকাশে গৃহের ব্যবহৃত পুরাতন বস্ত্রগুলির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিবার উপকরণ ক্ষণ-ভঙ্গুর কাচের বাসন খরিদ না করিয়া তাহাদ্বারা কন্থা প্রস্তুত করিবার জন্য তাহার সেলাই কার্য্যে নিযুক্ত হইত; কেহ বা গৃহস্থের ব্যবহারের নিমিত্ত এবং তাহার উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা সংস্থানের নিমিত্ত সম্মার্জ্জনীর কাটী প্রস্তুত করিবার জন্য নারিকেল পাতা কাটিতেন। কোন বর্ষীয়সী মহিলা সেই সময় গৃহের আবশ্যকীয় রজ্জুর জন্য এবং তাহার উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করিবার জন্য টাকুর দ্বারা পাট হইতে সূত্র প্রস্তুত করিতেন। কেহ কেহ বা সেই অবকাশে চরকা লইয়া বসিয়া তাহাদ্বারা সংসারের একটা আয়ের ব্যবস্থা করিতেন। কেহ কেহ বা সেই অবকাশে রামায়ণ কিম্বা মহাভারত লইয়া নিজেও পড়িতেন, প্রতিবেশিনী মহিলাবর্গকে শ্রবণ করাইয়া তৃপ্ত হইতেন এবং সময় সময় হয়ত বহিস্থ পুরুষদিগের বিলম্বের নিমিত্ত মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তিও প্রকাশ করিতেন।

এক্ষণে আর সেই রাত্রিজাগরণের বালাই নাই। এক্ষণে পল্লীর সেই সান্ধ্যবৈঠক বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সন্ধ্যার পর আর কেহ কাহারও বাটীতে গমন করে না। সকলেই নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় ব্যস্ত। আমোদ করিবে কখন ? সেজন্য সকলেই সান্ধ্য-সমাগমেই নিজ নিজ গৃহে তৈল পুড়িবার ভয়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করে। মহিলাগণেরও আর রাত্রিজাগরণ করিয়া কোনরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার আবশ্যক হয় না। কাঁথা সেলাই এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্মার্জ্জনীর জন্য নারিকেল পাতা কাটাও বন্ধ হইয়াছে। কেবল রামায়ণ মহাভারতের স্থলে কদাচ কোন স্থানে উপন্যাসের আমদানী হইয়াছে। ইহা কি পল্লীমহিলাগণের সুখ নহে ?

অনেকে বলে, এখন পল্লীগ্রামে চৌর্য্যভয় অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাতে সুশাসনের গুণকীর্ত্তন করেন। আমার মতে কিন্তু সুশাসনে যত হউক আর না হউক, গ্রামের পূর্ব্বাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আগমনের নিমিত্ত যে রোগ-বালাই উদ্ভব হইয়াছে—ইহা তাহারই সুখময় ফল। এক্ষণে অনেক সময় সন্ধ্যার পর চোরেরা উত্থান-শক্তিহীন হইয়া পড়ে। হয়ত সেই দিবস জ্বরের পালার দিন থাকাতে কন্থা আচ্ছাদিত গাত্রে সে কম্পনের কৌশল প্রদর্শন করিবে, না সেই দিবস সে চৌর্য্যকার্য্যের কৌশল দেখাইবে। কেহ বা চৌর্য্য-কার্য্য করিবার নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঁচ দিবস জ্বর ভোগ করিয়া অন্নপথ্য করিয়াছে তখনও তাহার ভালরূপ পাদচালনা করিবার ক্ষমতা হয় নাই।

আমাদের গ্রামের নরহরি বাড়ুর্য্যের বাটীতে সেবার জটে মুচি চুরি করিতে আসিয়াছিল। জটে অনেক কষ্টে গৃহদ্বারে সিঁদ কাটিয়া যে মুহূর্ত্তে গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার ম্যালেরিয়া জ্বরের পালা উপস্থিত হইল। জটে সেই স্থানেই উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। এদিকে গৃহস্থ নিশীথকালে বাহিরে মনুষ্যশব্দ শ্রবণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত ব্যাপার উপলব্ধিপূর্ব্বক জটেকে থানায় দিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া আসিতে হইল। ইহা কি পল্লীর একটা সুখ নহে? তাহার উপর চোরে এখন চুরি করিয়া একেবারে অধিক দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয় না। সে সামর্থ্যশূন্য হইয়া বহনশক্তিহীন হইয়াছে।

দেশী চিনির ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রামের কাহাদের জীবিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ দশ বারজন ধনী কারখানাওয়ালার, পরে দুই তিন শত মজুরের, পঞ্চাশ ষাটজন গোযানওয়ালার এবং অন্ততঃ পাঁচশত ঘর খেজুর গাছ ও ইক্ষু চাষীর। ইহা একটিমাত্র গ্রামের কথা বলিতেছি। এইরূপ এই বঙ্গদেশে আরও কত গ্রাম বিদ্যমান তাহাদেরও ঐরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

অনেকে বৈদেশিক চিনির সুলভ মূল্যের উল্লেখ করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিতে বলেন; কিন্তু সকলেই সুলভ মূল্যের দ্রব্য খরিদ করাতে দেশের যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে তাহার ফল সম্মুখেই দৃষ্ট হইতেছে। আর তদুপরি পৃথিবীর সকল সমাজই সব সময় কেবল অর্থনৈতিক দিক লক্ষ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সে সম্বন্ধে উপমাস্থলে বলিতে হয় দুই একটি সুলভ নিষিদ্ধ মাংস। সেইরূপ এস্থলেও একটু বিচার বিবেচনা আবশ্যক।

এক্ষণে চিনির অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া অনেক দুঃখের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আর সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। যখন আমার গ্রামে দেশী চিনি সংগ্রহ করা সম্ভব নহে দেখিলাম, তখন অন্য গ্রামে অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, এখান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে নিতাই হাতীর একটি চিনির কারখানা আছে। তথায় গমন করিলে দেশী চিনি প্রাপ্ত হইতে পারিব। তাহা শ্রবণ করিয়া সেই দুই মাইল পথ যাইতে প্রস্তুত হইলাম। আমরা পল্লীগ্রামের লোক, হাঁটিতে কষ্ট বোধ করি না। এখনও আমাদের সে স্বভাব অন্তর্হিত হয় নাই।

যাহা হউক, সেই দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিতাই হাতীর চিনির কারখানার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, একটি সুসজ্জিত যুবক তথায় দণ্ডায়মান হইয়া সিগারেট টানিতেছেন। পরিচয়ে অবগত হইলাম, তিনি নিতাইচন্দ্র হাতী মহাশয়ের পুত্র গজেন্দ্রনাথ হাতী। চিনি প্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইলাম, তাঁহার পিতা নিতাইচন্দ্র হাতী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পরেই দুই বৎসর হইল গজেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গজেন্দ্রনাথের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় কলিকাতার মেসে অবস্থান করিয়া কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। সেস্থানে বি, এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাতে সাফল্য-লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর পিতার মৃত্যুর পর হইতে দেশেই অবস্থান করিতেছেন। কারবার বন্ধ করিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, এ কার্য্য অতি শ্রমসাধ্য এবং সম্মানের হানিজনক, তাহা অপেক্ষা তিনি পুনরায় বি, এ, পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক আইন পরীক্ষা দান করিয়া

কোনস্থানে ওকালতি করিবেন কিম্বা কোনস্থানে কোন চাকরী গ্রহণ করিবেন।

তাহা না করিলেও তাঁহার স্বর্গগত পিতা নিঃস্ব অবস্থা হইতে চেষ্টা এবং পরিশ্রমের গুণে এই কারবার স্থাপন করিয়া যে দুই পয়সা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার সচ্ছলে দিনাতিবাহিত হইবে। তখন ভূয়োদর্শনের ফলে বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীমান্ গজেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের বঙ্গীয় যুবক, যুগধর্ম্মের প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ দেখা যায়, মাড়োয়ারী পিতা যদি মৃত্যুকালে একলক্ষ মুদ্রা রাখিয়া যান, পুত্র পরে তাহা যেমন করিয়াই হউক, সাত লক্ষে পরিণত করিবে। আর বর্ত্তমানে যদি বাঙ্গালী একলক্ষ মুদ্রা রাখিয়া যান, পুত্র তাহা ত কোন প্রকারে বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করিবেনই না, পরন্তু নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া তাহাই খাইয়া ফেলিবেন।

পূর্ব্বতন বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদের বংশধরগণ তাহা বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহারই দ্বারা কোনরূপে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করিতেছেন এবং তাঁহাদের সেই পিতা পিতামহের ব্যবসায়ের স্থানে মারবাড়দেশবাসী আগমন করিয়া সেইরূপ অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিতেছেন।

আজকাল বঙ্গীয় যুবকগণ মুখে যাহাই বলুন, অন্তরে কিন্তু তাঁহারা অনেকটা বদলাইয়াছেন। বাঙ্গালী যুবকগণ ক্রমশঃ ব্যবসায়াদি কার্য্যে রত হইতেছেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়কে ঘৃণ্য কার্য্য মনে করেন। তাঁহাদের মানসিক ভাব হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কোন স্থানে চাকরী কিম্বা ওকালতি গ্রহণ, নচেৎ আজ বাঙ্গালী অব্যবসায়ী নামে প্রচারিত হইত না।

যাহা হউক, আমি আর তথায় বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া অন্য চিনির কারখানার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে অবগত হইলাম, নিকটস্থ প্রায় সমস্ত কারখানাই ধ্বংসের পথে গমন করিয়াছে, কেবল সেই গ্রামের দিগম্বর মাইতির কারখানা মৃতকল্প অবস্থায় বর্ত্তমান। সেখানে গমন করিলে আমি বিশুদ্ধ দেশী চিনি প্রাপ্ত হইব।

কালবিলম্ব না করিয়া আমি দিগম্বর মাইতির কারখানায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ দিগম্বর নগ্নগাত্রে নগ্নপদে সেই রৌদ্রে তাহার নিয়োজিত শ্রমিকগণের সহিত তাহাদের কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার মন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। মনে করিলাম, এখনও বাঙ্গালা তাহার কর্ম্মশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এখনও যে দুই একজন লোক জীবিত রহিয়াছে, কালে তাহাদেরই আদর্শ লইয়া বাঙ্গালা পুনরায় ব্যবসাজগতের আদর্শ স্থানে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে। অবসাদের ঘোর একদিন কাটিবেই কাটিবে।

এদিকে দিগম্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে দিগম্বর অতি সমাদরে আমাকে আহ্বান করিল এবং আমার তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে আমার আগমনের কারণ জানাইয়া দেশীয় শর্করা সম্বন্ধে দুই একটি কথা অবগত হইতে চেষ্টা করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, দেশস্থ প্রায় সমস্ত কারখানাই বন্ধ হইয়া গিয়াছে তোমার কারখানা কি প্রকারে চলিতেছে ? তাহাতে দিগম্বর বলিল, ইহা সত্য দেশমধ্যস্থ সমস্ত কারখানাই প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আমি আর ইহা বন্ধ করি নাই। তবে পূর্ব্বের ন্যায় আর বেশী চিনি প্রস্তুত করি না সামান্য উৎপন্ন করি, তাহা কেবলমাত্র দেবপূজার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সেই নিমিত্ত নিশ্চেষ্টভাবে কালক্ষেপ না করিয়া

কিঞ্চিৎ লাভে চিনি প্রস্তুত করাই শ্রেয়। তবে বিলাতি শর্করার আগমনে যে দেশী চিনির ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে তাহা সত্য; কিন্তু তাহা ছাড়া বর্দ্ধিত আকারে পাট চাষের জন্যওই হার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। পাটের দর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একসঙ্গে কিছু টাকা হস্তগত হইবার লোভে কৃষককুল খেজুর গাছ নষ্ট করিয়া পাট বপন করিতে ব্যস্ত হয়, তাহাতেই অনেক সময় গুড় পাওয়া যায় না। সেই কারণেও চিনি প্রস্তুত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম।

নচেৎ আমাদের দেশীয় প্রথায় শর্করা প্রস্তুত করিলে বৈদেশিক শর্করা অপেক্ষা যে বিশেষ অধিক পড়্‌তা হয় তাহা নহে। তবে বৈদেশিক শর্করার ন্যায় শুভ্র করিতে কিঞ্চিৎ অধিক পড়্‌তা পড়ে। যাহা সামান্য অধিক পড়্‌তা হইবে, তাহা দেশেই থাকিয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া দিগম্বর দেশীয় প্রথায় শর্করা প্রস্তুত সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাপন করিল।

দেশী চিনির প্রস্তুত প্রণালী

চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে গুড় আবশ্যক। এ দেশে তিন প্রকার বৃক্ষের রস হইতে গুড় উৎপন্ন হয়—ইক্ষু, খেজুর এবং তাল। তন্মধ্যে তালের রসের গুড়ের কার্য্য অল্প পরিমাণ লোকেই করে। তাহা হইতে যে গুড় হয় তাহাদ্বারা মিছরি প্রস্তুত হয়; কিন্তু সাধারণের সাংসারিক জীবনযাত্রার আবশ্যকীয় চিনি ইক্ষু এবং খেজুর রসের গুড় হইতে উৎপন্ন হয়।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে এত চিনি প্রস্তুত হইত যে, সমগ্র দেশের অভাব সঙ্কুলান হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইত; কিন্তু এক্ষণে তাহা স্বপ্নমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেশবাসীর এক্ষণে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য যাহাতে বঙ্গদেশে এই নষ্ট বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার হয়।

দেশী চিনির প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে, চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আবশ্যক হয়। ইহাতে কোন মূল্যবান্ কলকব্জার কিম্বা ইঞ্জিন বয়লারের আবশ্যক হয় না। সামান্য সহস্র কিম্বা দেড় সহস্র মুদ্রা মূলধন লইয়া বসিলে এই কারবার আরম্ভ করা যায়। ইহাতে আবশ্যকীয় সরঞ্জাম হইতেছে কতকগুলি মাটির গামলা, বড় চুপড়ি, গুড় কাটিবার জন্য এবং চিনি উঠাইবার জন্য দুই রকম আকৃতিবিশিষ্ট দুইখানি বড় লৌহনির্ম্মিত ছুরি (১নং চিত্র), গুড় জ্বাল দিবার জন্য ৪খানি জেলো হাঁড়ি কিম্বা বড় লৌহ কড়াই এবং কতকগুলি চটের থলিয়া আর চিনি শুষ্ক করিতে দিবার জন্য কতকগুলি চাটাই, দরমা কিম্বা চট।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে দুইটি বড় মাটির গামলা একস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিতে হইবে। এদিকে কারখানা গৃহমধ্যে মাঝারি গামলা সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইয়া তাহাদের উপর বাঁকারিদ্বারা প্রস্তুত তেকাটা পাতিয়া তাহাদের উপর চুপড়িগুলি (২নং চিত্র) বসাইয়া দিতে হইবে।

তেকাটা

প্রথমে গুড়ের কলসীকে ভগ্ন করিয়া গুড়কাটা ছুরিকাদ্বারা তাহা হইতে গুড় কাটিয়া লইয়া সেই প্রোথিত গামলায় ফেলিতে হইবে। পরে তাহা হইতে উঠাইয়া লইয়া কারখানার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত গামলার উপরিস্থিত চুপড়িতে ফেলিতে হইবে। এই অবস্থায় গুড়কে আট দিবস অবধি তাহার উপর রাখিতে হইবে। এই আট দিবস সেই অবস্থায় চুপড়ির উপর গুড় থাকিলে, তাহার তরলাংশ অনেক নিঃসৃত হইয়া নিম্নের গামলায় পতিত হইবে এবং উপরের গুড় শুষ্ক হইয়া উঠিবে।

পরে আট দিবস এই অবস্থায় রাখিয়া দিবার পর সেই গুড়ের উপর পুষ্করিণীর টাট্‌কা শৈবাল (চলিত কথায় যাহাকে পাটা শেওলা বলে) আনয়ন-
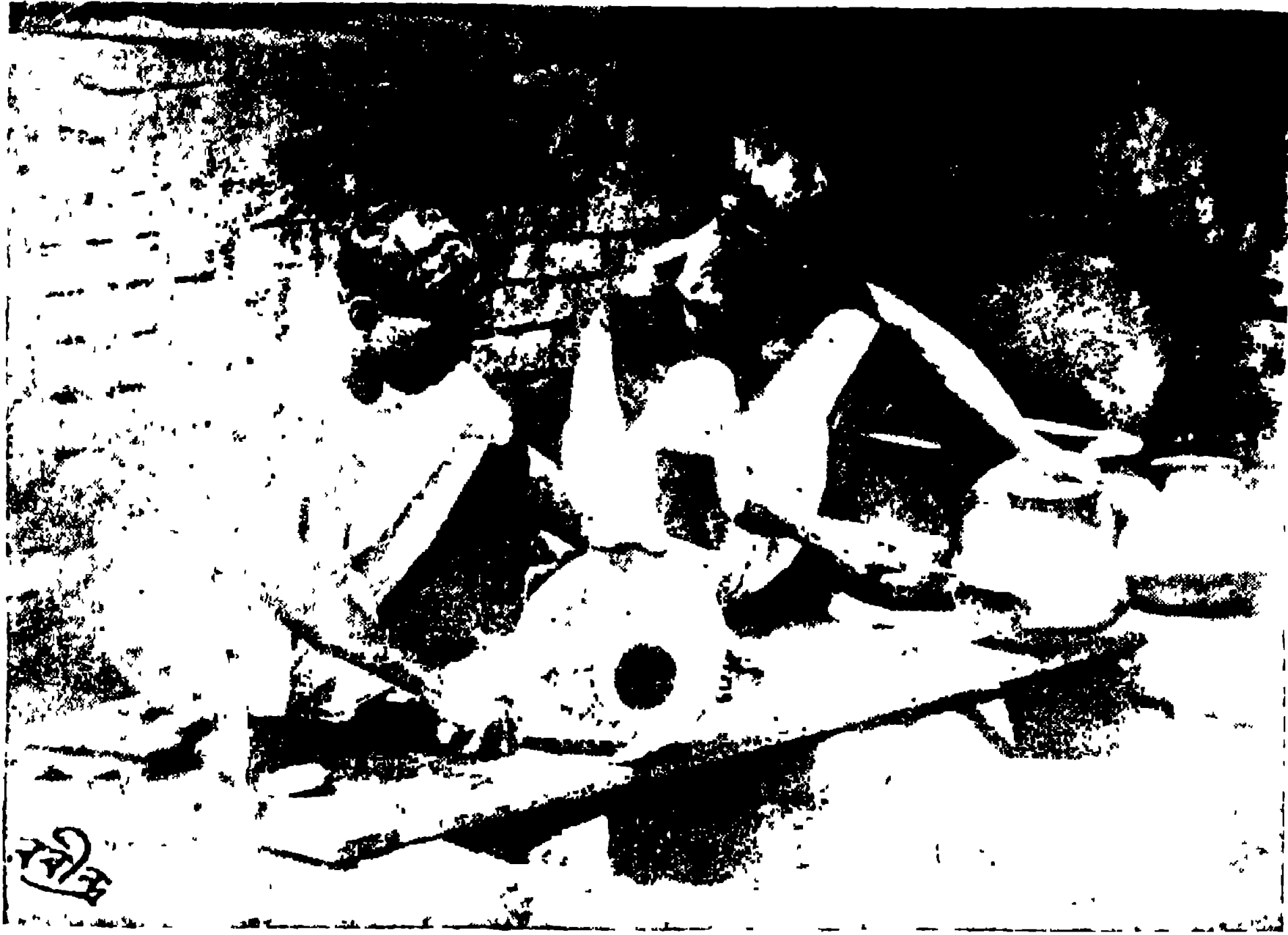
(১নং চিত্র)
কলসী হইতে ছুরিকাদ্বারা গুড় কাটিয়া লইতেছে

(২নং চিত্র)
তেকাটার সাহায্যে গামলার উপর চুপড়ি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে

পূর্ব্বক গুড়ের উপর আবৃত করিয়া দিতে হইবে। এই আবৃত শৈবাল অন্ততঃ তিন অঙ্গুলি স্থূল হওয়া আবশ্যক।

আট দিবস অবধি সেই গুড় উক্ত প্রকারে শৈবালাবৃত অবস্থায় থাকিবে। আট দিবস বাদে সেই শৈবাল উত্তোলন করিয়া ফেলিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গুড়ের উপরিভাগের অন্ততঃ তিন অঙ্গুলি পরিমাণ গুড় শর্করা হইয়া গিয়াছে। তখন সেই চিনি-কাটা ছুরিকা লইয়া সেই চিনিকে গুড়ের উপর হইতে কাটিয়া লইতে হইবে এবং তাহাকে এক দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে।

এদিকে সেই চুপড়িস্থিত গুড় পুনরায় নূতন শৈবালে আবৃত করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাকেও আট দিবস ঐ একই প্রকারে রাখিতে হইবে। আট দিবস বাদে তাহার উপর হইতে পুনরায় চিনি-কাটা ছুরিকা দ্বারা চিনি কাটিয়া লইতে হইবে। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক চিনি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে অর্থাৎ প্রথম শেবাল আবৃতির পর যে পরিমাণ চিনি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে পরে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে চিনি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

এই প্রকারে তিনবার শৈবাল আবৃতির পর চুপড়িতে যে অবশিষ্ট গুড় থাকিবে, এরূপ দুই তিন চুপড়ির গুড় এক চুপড়িতে আনয়ন করিয়া পরিশেষে শৈবালে আবৃত করা কর্ত্তব্য। কারণ গুড় দুই তিনবার শৈবালে আবৃত হইলে সেই গুড়ের অল্প অংশ পুনরায় শৈবালে আবৃত করিলে তাহা গলিয়া যায়, তাহা শৈবালের গরম সহ্য করিতে পারে না। পুনরায় ইহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, প্রতিবারই টাটকা নূতন শৈবাল আবশ্যক। একবার যে শৈবাল আট দিনের জন্য ব্যবহৃত হইবে, তাহা ফেলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

এইরূপে সমস্ত চিনি প্রস্তুত হইলে, পুনরায় এক দিবস তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একখানি তক্তার উপর রাখিয়া বাটিয়া ফেলিয়া এবং সেই সময় তাহাতে পতিত শৈবালের অংশ এবং অন্যান্য কাঠি প্রভৃতি বাছিয়া বস্তাবন্দি করিলেই হইল। ইহাই এক নম্বর উৎকৃষ্ট চিনি। একবার গুড় ভাঙ্গিলে তাহা হইতে সমস্ত চিনি উঠাইয়া লইতে একমাস অতিবাহিত হয়।

২নং চিনি বা গৌড় চিনি—ইহা ইক্ষু গুড় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইক্ষু গুড় হইতে কেবল ঐ এক নম্বর চিনিই প্রস্তুত হয় এবং অবশিষ্ট তরলাংশকে পুনরায় জাল দিয়া "দোজালা" কিম্বা "খাঁড় গুড়" নামে অভিহিত হইয়া আহারের জন্য বিক্রয় হয়। কিন্তু খেজুর গুড় হইতে এক নম্বর চিনি প্রস্তুত হইয়াও অবশিষ্ট তরলাংশ দ্বারা ২নং চিনি অর্থাৎ গৌড় চিনি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে।

ঐ গৌড় চিনি প্রস্তুত করিবার সময় চুপড়িস্থিত শৈবালাবৃত গুড় হইতে নিঃসৃত নিম্নের গামলায় পতিত পাতলা গুড়কে সেই গামলা হইতে উঠাইয়া লইয়া তাহাকে জালে চড়াইতে হইবে। এই গুড় জাল দিবার কার্য্য অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা সম্পন্ন করা আবশ্যক। কারণ এই জালের ফুট অর্থাৎ গুড় অগ্নির উত্তাপে ফুটিতে ফুটিতে কিরূপ অবস্থায় আসিলে তাহা নামাইতে হইবে সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক. লিখিয়া তাহা জানাইতে পারা যাইবে না।

যাহা হউক, এই জাল দিবার পর সেই গুড় কড়া হইতে নামাইয়া একটি মেছলায় (৩নং চিত্র) ফেলিতে হইবে এবং সেই মেছলায় ফেলিবার পর তাহাকে একটি তাড়ু দ্বারা উত্তমরূপে ঘুঁটিতে হইবে। ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে যখন সেই গুড় কিঞ্চিৎ শীতল হইবে,

(৩নং চিত্র)
কড়া হইতে গুড় মেছলায় ফেলিতেছে

তখন তাহাকে তথা হইতে লইয়া একটি "কোলা"র (বৃহৎ মাটির কলসী) মধ্যে ফেলিতে হইবে। সেই অবস্থায় তাহাকে আট দিবস ফেলিয়া রাখিতে হইবে।

পরে সেই গুড় "কোলা" হইতে বহির্গত করিয়া একটি চটের থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া সেই থলিয়াকে একটি গামলার উপর ঝুলাইয়া দিতে হইবে এবং সেই বস্তার দুইদিকে দুইটি বাঁশ দ্বারা উত্তমরূপে কষিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, যেন সেই বাঁশের বন্ধনের চাপে থলিয়ার মধ্যস্থিত গুড়ের তরলাংশ পুনরায় বহির্গত হইয়া যায়। আট দিবস এই প্রকারে রাখিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে সেই বাঁশ দুইটিকে কষিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

থলিয়া বাঁশ বাঁধা অবস্থায়

থলিয়া হইতে সেই গুড় বহির্গত করিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া চটকাইতে হইবে; পরে পুনরায় তাহাকে বস্তার মধ্যে পুরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাঁশ দ্বারা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় দুই দিবস রাখিলেই হইবে। অতঃপর তাহাকে বস্তা হইতে বহির্গত করিয়া পুনরায় মেছলায় ফেলিয়া জলে গুলিতে হইবে। এই জলে গুলিবার পর পুনরায় সেই জলসমেত গুড়কে জ্বালে চড়াইতে হইবে, এবার এরূপভাবে জ্বাল দিতে হইবে, যাহাতে সেই গুড়ের সহিত মিশ্রিত জলটি কেবল নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু এবার তাহাকে শৈবাল চাপা দিবার জন্য চুপড়িতে না ফেলিয়া একটি ছিদ্রযুক্ত গামলায় ফেলিয়া সে গামলাটিকে অপর অছিদ্র গামলার উপর স্থাপন করিয়া তাহার উপরে নূতন শৈবাল দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হইবে এবং চিনি প্রাপ্তির নিয়মানুসারে উহা উঠাইয়া লইতে হইবে।

ইহার বর্ণ কিঞ্চিৎ রক্তিমাভ হয় এবং ইহা প্রথম প্রস্তুত চিনির ন্যায় ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট হইয়া বহির্গত হয় না। ইহা খণ্ডে খণ্ডে গোল গোল পিণ্ডাকার ড্যালার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়। পরে তাহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাটিয়া লইলেই হইল।

চিনি প্রস্তুতের ব্যয়

১। আমাদের দেশীয় প্রথায় গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার সময় একেবারে যত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইবে লাভের অংশও সেই প্রকার অধিক হইবে; কারণ খরচও তাহাতে কম পড়িবে। সমপরিমাণ শ্রমিক দ্বারা ১০০/ মণ হইতে ১০০০/ মণ পর্য্যন্ত গুড় হইতে চিনি বহির্গত করিয়া লওয়া যায়।

২। চিনি প্রস্তুতের আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি একবার খরিদ করিলে আর দশ পনর বৎসরের মধ্যে তাহা খরিদ করিবার আবশ্যক হইবে না। মধ্যে ... দুই একটি দ্রব্য ভাঙ্গিলে কিম্বা নষ্ট হইলে তাহার আবশ্যক পূরণের জন্য সামান্য সামান্য খরিদ করিতে হয় মাত্র।

কোন্ দ্রব্য কত আবশ্যক

১০০্ মণ চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত সংখ্যক দ্রব্য আবশ্যক :—

১। ৩৫ খানা ছিদ্রহীন গামলা ৵০ হিঃ

২। ৩৫ খানা চুপড়ি ৵০ হিঃ

৩। ৩৫ খানা ছিদ্রযুক্ত গামলা ৵০ হিঃ

(গৌড় চিনি প্রস্তুতের জন্য)

৪। লৌহনির্ম্মিত ছুরিকা ৪ খানি ৵০ হিঃ

৫। থলিয়া ৩৫ খানি ।০ হিঃ

৬। চিনি রৌদ্রে শুষ্ক করিবার জন্য কিছু দরমা ও চট

৭। চিনি বাটিবার জন্য ৪ খানি তক্তা

৮। গুড় জ্বাল দিবার জন্য ৪ খানি বড় কড়াই কিম্বা জেলো হাঁড়ি

৯। কলসা হইতে গুড় ঢালিবার জন্য দুই তিন-খানি বড় মেছলা

ভাল খেজর গুড় ৩্ তিন মণ হইতে

১্ ভাল চিনি,

॥০ মণ গৌড় চিনি,

১।০ সের তামাকমাখা গুড় হইবে।

ভাল ইক্ষুগুড় ৩্ মণ হইতে ১্ ভাল চিনি,

১৸০ এক মণ ত্রিশ সের দোজ্বালা গুড় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আয়

হাজার মণ গুড় হইতে ৩৩৩্ মণ চিনি

৯্ হিঃ ২৯৯৭্

১৬৬্ মণ গৌড় চিনি ৮্ হিঃ ১৩২৮্

৪০০্ মণ তামাকমাখা গুড়

৪্ হিঃ ১৬০০্

৫৯২৫্ টাকা

ব্যয়

গুড় খরিদ	১০০০্ মণ	৫্ হিঃ	৫০০০্ টাকা
কারিকর	২ জন	২০্ হিঃ	৪০্ টাকা
শ্রমিক	৮ জন	১৫্ হিঃ	১২০্ টাকা
কাষ্ঠ	৪০্ মণ	১্ হিঃ	৪০্ টাকা
শৈবাল	১০০ গাড়ী	২্ হিঃ	২০০্ টাকা

৫৪০০্ টাকা

আয় ৫৯২৫্ টাকা

ব্যয় ৫৪০০্ টাকা

৫২৫্ টাকা লাভ।

(সাধারণ হিসাব) ব্যয়		আয়	
গুড় ৩্ মণ ৫্ হিঃ	১৫্	চিনি ১্ মণ	৯্
খরচা ॥০ হিঃ	॥০	গৌড় ॥০ মণ	৪॥০
		তামাকমাখা গুড়	
	১৫॥০	১।০ সের ৪্ হিঃ	৫্
			১৮॥০

লাভ লোকসান পাঠক বিবেচনা করুন। চিনি প্রস্তুত মাঘ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি চলে।

বর্ত্তমান বৈদেশিক চিনি বাজারে ৯্ নয় টাকা হিসাবেই বিক্রয় হইতেছে।

(জনৈক পল্লীবাসী)

বিজ্ঞান ও দর্শন

[শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্ঞানগর্ব্বী বৈজ্ঞানিকগণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদের আহৃত জ্ঞান ও গবেষণা প্রকৃতির সকল রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ নয়, তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া জড়জগতের অন্তরালে অন্য বিশেষ কোন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন—তাঁহাদের নাস্তিক্য বুদ্ধির মূল আন্দোলিত হইল, কিন্তু প্রকৃতির নিকট এরূপ পরাজয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ হতাশায় মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য ও দৃঢ়তাসহকারে অদম্য উৎসাহে পুনরায় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিলেন, আর এই প্রাণপাত সাধনায় সিদ্ধিও তাঁহাদের করায়ত্ত হইল। সিদ্ধি তাঁহাদের করায়ত্ত হইল—এই কথায় যে কেহ বুঝিবেন না যে, তাঁহারা প্রকৃতির সকল গূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইলেন। প্রকৃতির স্বরূপ মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, একথা জগতের শ্রেষ্ঠতম জড়বিজ্ঞানবাদিগণও বলিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত কথার অর্থ এই যে, জড়বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রকৃতির মধ্যে একটি সুন্দর শৃঙ্খলা ও বিবর্ত্তনের সন্ধান পাইলেন। জড়ের যে সকল গুণ পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল, এক্ষণে সেগুলি তাঁহাদের দৃষ্টিপথ এড়াইতে পারিল না—পণ্ডিতগণ সে সকলের মধ্যে একটা অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের সন্ধান পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, জড়ের মধ্যেও অনেক সময় জীবধর্ম্মের লক্ষণ প্রকাশ পায়; জড়জগতের অনেক নিয়ম জীবজগতের অনেক নিয়মের অনুবর্ত্তী। কি জীবজগৎ, কি জড়জগৎ সর্ব্বত্রই একটা অদৃশ্য শক্তি জীবের বা জড়ের সকল শক্তির উৎসরূপে বর্ত্তমান আছে। শক্তি অবিনশ্বর—ইত্যাদি অনেক তথ্য জড়বাদিগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন। একখণ্ড জড়বস্তুকে বহুক্ষণ কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করিলে দেখা যায় যে, বহুক্ষণ কার্য্য করিবার পর উহার কার্য্যকারিতা শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া যায়, আবার কিয়ংক্ষণ ঐ বস্তুটিকে বিশ্রাম করিতে দিলে দেখা যায় যে, সেটী আবার পূর্ব্বের ন্যায় ভালভাবে কার্য্য করিতেছে। "স্থিতিস্থাপ্যশ্রম" (elastic fatigue) ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও বস্তুর এই 'শ্রমধর্ম্ম' সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং ক্রমাগত পরিশ্রম করিবার ফলে যদি কোন জড়খণ্ডের বৈকল্য উপস্থিত হয় এবং কিয়ংকাল অবসর গ্রহণের পর যদি পুনরায় সেটী পূর্ব্বের মত কার্য্যক্ষমতা প্রদর্শন করে, তবে জড়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের অস্তিত্ব আমরা কিরূপে অস্বীকার করিব?

জড়বিজ্ঞানবাদিগণ দেখাইয়াছেন যে, কঠিন, তরল ও বায়বীয় সমস্ত বস্তুই অণু ও পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। কঠিন দ্রব্যে এই অণুগুলি কোন এক বিশেষ শক্তিদ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত আকৃষ্ট; দুইটি অণুর মধ্যস্থ স্থান খুবই অল্পপরিসর; তরল পদার্থে এই

আণবিক আকর্ষণ কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা কম এবং বায়বীয় পদার্থে সর্ব্বাপেক্ষা কম। সেইজন্য অতি অল্প পরিমাণ বায়বীয় পদার্থও অবস্থাভেদে বহু বিস্তৃত স্থান অধিকার করিতে পারে; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রত্যেক দ্রব্যের অণুর গঠন একই প্রকার। কোন বস্তুকে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিলেও তাহার মধ্যে হয়ত শত শত অণু থাকে, এই অণু-গুলিকে আমরা যন্ত্র সাহায্যেও দেখিতে পাই না। পরমাণু আবার অণুর অংশ; এই পরমাণু স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না, দুই বা ততোধিক জাতীয় অথবা ভিন্ন জাতীয় পরমাণু মিলিত হইয়া একটি অণুতে পরিণত হয়। রসায়ন শাস্ত্রমতে এই অণুই ক্ষুদ্রতম বস্তু, কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, অণুই মৌলিক পদার্থ নহে, ইহাও বিভাজ্য, অণুর মধ্যে তড়িৎকণা এবং ধন-তড়িৎকণা আছে। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে অক্ষ-পথে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, সেইরূপ এই সকল তড়িৎকণা 'ধন-তড়িৎকণা'কে কেন্দ্র করিয়া উহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে এবং ভিন্ন ভিন্ন অক্ষপথে বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আবার মনীষীপ্রবর রাদারফোর্ড প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, এই 'ধন-তড়িৎকণা'ও মৌলিক নহে, ইহার মধ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাপার চলিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত সন্দেহ করেন যে, তড়িৎকণাও মৌলিক নহে। অধুনা নিত্য নূতন নূতন আবিষ্কার হইয়া নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রাথমিক যুগে বৈজ্ঞানিক বলিতেন যে, তিনি প্রকৃতির সমস্ত অবগত হইয়াছেন; কিন্তু আজ এই বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিন বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। আলোকের আভাস পাইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন সত্য, কিন্তু আলোকের উৎস কতদূরে তাহা তাঁহারা ধারণাই করিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকের অবিশ্বাসী মন এক্ষণে অজ্ঞাতের অচিন্ত্যশক্তির চরণে শির নত করিয়াছে।

গুরুত্বই বস্তুর বোধক—বিজ্ঞানের ইহাই মূল সূত্র। কিন্তু আবার বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান এবং গণিত সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দ্রুতগতিশীল তড়িৎশক্তিই সকল দ্রব্যের গুরুত্বের হেতু (All masses are electro-magnetic in origin)। যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "জগৎ মায়াময়" অর্থাৎ আমরা "যাহা দেখিতেছি তাহা সত্য নহে" একথা উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুযায়ী প্রত্যেক বস্তুই শক্তির একটা বিশেষ বিকাশ। সুতরাং যাহা জড় অর্থাৎ যাহা আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা কিরূপে শক্তিমাত্র হইতে পারে? আর যদি তাহাই হয়, ভিন্ন ভিন্ন জড়ের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হয় কেন? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার উত্তর দানে অক্ষম, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র তাহা পারে। আমাদের ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"—জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি, সবই ব্রহ্মশক্তির বিভিন্ন বিকাশ।

"শক্তির বিকাশ নাই" দর্শনের একথা জড়বিজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই গ্রহণ করে। শক্তির রূপান্তর হয়, কিন্তু ক্ষয় হয় না। এইরূপ দর্শনের বহু তথ্য অধুনা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বাহিরের পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। অনেক দার্শনিক তথ্য যাহা কেবলমাত্র কল্পনা বলিয়াই এতাবৎ সাধারণের ধারণা ছিল, জগৎ-বরেণ্য জার্ম্মাণ মহাপণ্ডিত আয়েনষ্টিন্ কর্ত্তৃক বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার আপেক্ষিক তত্ত্বে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা সাধারণতঃ যে সকল ব্যাপার চাক্ষুষ অবলোকন করি, তাহা অনেক সময় নিরপেক্ষ সত্য নয়, ঘটনান্তর বা

বিষয়ান্তরের সহিত আপেক্ষিকভাবে সংশ্লিষ্ট। অনেক অগৃহীতপূর্ব্ব দার্শনিক সূত্রকে তিনি বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়া অচল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট দার্শনিক আজ আর দয়ার পাত্র স্বপ্ন বিলাসী নহেন ; দার্শনিক আজ বৈজ্ঞানিকের সহকারী, তাঁহার চিন্তাধারার গতি প্রবর্ত্তক, বৈজ্ঞানিক আজ দার্শনিকের বন্ধু, তাঁহার অপ্রমাণিত এবং অশরীরী সূত্রের দক্ষমূর্ত্তি শিল্পী। দার্শনিকের চিন্তার বাষ্প ঘনীভূত করিয়া বৈজ্ঞানিক আজ স্নিগ্ধ জলদের সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানের সূত্রের মধ্যে দর্শনের প্রভাব এক্ষণে আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর এই প্রভাবই আধুনিক বিজ্ঞানকে এরূপ মহিমান্বিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক এক্ষণে আর তাঁহার কল্পিত সর্ব্বজ্ঞতার বিশ্বাসে অসীমের অসীম শক্তির উপর আস্থাহীন হন না, সুতরাং দর্শন বৈজ্ঞানিকের অন্তরকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথ

[শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জীবনসংগ্রামের পথে

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রাজেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভের সমসাময়িক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিবার জন্যই যেন জগতে আগমন করিয়াছেন, কারণ তাঁহার পারিপার্শ্বিক লোক সকল যখন ব্যবসায়ের স্থান হইতে আপনাদিগকে দূরে অপসারিত করিতেছে, তখন তাঁহার মধ্যে ব্যবসায়ের এরূপ একান্ত আগ্রহ বিকশিত হইয়া উঠিল কেন? তিনি সেই আগ্রহকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নিজেকে সাময়িকভাবে নানারূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিতে কোনরূপ দ্বিধা করেন নাই।

তিনি সেই সময় যেরূপ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন, তাহা সামান্য নহে। সেই সময় তাঁহার সহায় ছিল একমাত্র ধৈর্য্য ও অমানুষিক হৃদয়বল। ইহা ছাড়া তখন তাঁহার মধ্যে আর বিশেষ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অর্থহীন, সহায়-হীন, বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীর গৃহস্থ তনয় বিরাট কলিকাতা নগরীর মধ্যে আগমন করিয়া দেশের এবং জাতির সাময়িক ভাবকে নিজের আদর্শ দ্বারা বোধগম্য করাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সেই প্রচেষ্টা এবং ধৈর্য্যশীলতার সম্বন্ধে এক্ষণে বর্ণিত হইলে তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

রাজেন্দ্রনাথ বাঞ্ছারাম অক্রূর লেনস্থ মেসে অবস্থানকালে সেই মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং কিরূপে আত্মপদে দণ্ডায়মান হইবেন তাহারই উপায় চিন্তা করেন। তিনি প্রায় এক

বৎসর পর্য্যন্ত সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ঈশ্বর রাজেন্দ্রনাথকে স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের একনিষ্ঠ সাধক দেখিয়া যেন তাঁহার উপর সদয় হইয়া তাহার উপায় বিধান করিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার মেসে অবস্থানকালীন তাঁহারা চারি বন্ধুতে একত্র হইয়া অবস্থান করিতেন। সেই চারি বন্ধু—রাজেন্দ্রনাথ নিজে, তাঁহার পূর্ব্ব সহপাঠী বাবু গগনচন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার পাইন এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন।

যে সময় রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত, সেই সময় এই দেবেন্দ্রনাথ সেন এফ, এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। দেবেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহার অভিভাবকগণ দেবেন্দ্রনাথের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। দেবেন্দ্রনাথ অভিভাবকগণের বিরক্তিতে নিজেও বিশেষ দুঃখিত এবং অসন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, আর পাঠাভ্যাস করিবেন না।

এইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একেবারে পাঠাভ্যাস পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি নানাস্থানে চাকরীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হওয়াতে কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় পুরুষসিংহ রাজেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথকে দারুণ হতাশগ্রস্ত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে নানারূপ সাহস প্রদানে উৎসাহিত করিলেন।

রাজেন্দ্রনাথের উৎসাহপূর্ণ বাক্যে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় হইতে যখন নৈরাশ্যের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া পুনরায় আশার আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি মূলধনস্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা দুইজনে মিলিতভাবে ঠিকাদারী ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। ইহা করিলে তাঁহাদের অর্থকষ্ট দূরীভূত হইবে।

দেবেন্দ্রনাথের বাটীর অবস্থা মন্দ ছিল না। তিনি সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাতেই আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন। তখন উভয় বন্ধু মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের এই কারবারের নাম হইবে ডি, এন, সেন এণ্ড কোং। ইহার লভ্যাংশ দুইজনে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন। এইরূপ অবধারিত হইলে তাঁহারা ঠিকা কর্ম্ম সংগ্রহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন।

কর্ম্মপিপাসু রাজেন্দ্রনাথ যখন কর্ম্মের এই প্রথম সূত্র প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি অদম্য উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি দিবারাত্র বিরামহীন অবস্থায় কর্ম্ম সংগ্রহের জন্য ইতস্ততঃ গমনাগমন এবং নানা লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সামান্য অনুসন্ধানেই তিনি একটি ঠিকা কার্য্য সংগ্রহ করিলেন। তাঁহাকে এ সম্বন্ধে প্রথম কার্য্য প্রদান করেন কলিকাতা পশুশালার তদানীন্তন অধ্যক্ষ রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়। আজ যে রাজেন্দ্রনাথ ভারতের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ সৌধ, বৃহৎ বৃহৎ সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপত্য-শিল্পের অদ্ভুত কর্ম্মকৌশল প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাহাতে কোটী কোটী মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছেন, তিনি প্রথমে কলিকাতা পশুশালার মধ্যে সামান্য মৃত্তিকা কাটিবার ঠিকা কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাই আনন্দিত চিত্তে অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য কার্য্য বলিয়া তাহাকে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করেন নাই।

এস্থলে ব্যবসায় ইচ্ছুক বঙ্গীয় যুবকগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে হয়। অনেক বঙ্গীয় যুবকের ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা থাকে; কিন্তু দেখা যায়, তাঁহারা প্রথমেই বৃহৎ কার্য্য অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্মুখে ক্ষুদ্র কার্য্য স্থান পায় না। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর

মধ্যে এরূপ লোক আছেন যাঁহারা জীবিকোপার্জ্জনের অন্য কিছু উপায় না পাইয়া অবশেষে ঠিকাদারী কর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হন। সেই সময় হয়ত বহু অনুসন্ধানে একটি ক্ষুদ্র ঠিকা কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় সেই কার্য্য ক্ষুদ্র বলিয়া তিনি ঘৃণা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন।

তাঁহাদের ইচ্ছা প্রথমেই একটি বৃহৎ কার্য্য হস্তগত হইবে। তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে আর ব্যবসায় করা হইল না।

এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়াও অনেক ব্যবসায় ইচ্ছুক ধনশালী বঙ্গীয় যুবক কোন কারবার আরম্ভ করিয়া হয়ত একেবারে বিলাতের সহিত কারবার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তিনি সামান্য মুদির দোকানের ব্যবসায়ের বিষয় অবগত নহেন, তাহাতে তাঁহার যে পরিণতি হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ব্যবসায় যে শিক্ষাসাপেক্ষ এবং তাহা যে সামান্য কারবার হইতেই শিক্ষা করিতে হয়, সে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নচেৎ তাহাতে বিফলতা অনিবার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই

রাজেন্দ্রনাথ সামান্য কারবার অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই আজ তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠি ক্ষুদ্র অবহেলার যোগ্য নহে, ক্ষুদ্র ঘৃণ্য নহে, ক্ষুদ্রই বৃহতে পরিণত হয়। সর্ষপ পরিমাণ বীজের পরিণতিই বৃহৎ বটবৃক্ষ।

রাজেন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবসায় আরম্ভ করেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এবং তাঁহার প্রথম কারবার আলিপুর পশুশালায় মৃত্তিকা খনন কার্য্যের ঠিকা লওয়া। যাহা হউক, এই কার্য্য করিয়া রাজেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ লাভবান হন। এই লাভে তাঁহার মন অধিকতর উৎসাহিত এবং আনন্দিত হইয়া উঠিল।

তখন তিনি দেবেন্দ্রনাথকে আরও উৎসাহ প্রদান করিয়া নবোদ্যমে নূতন কার্য্য সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। এদিকে পশুশালার অধ্যক্ষ রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয় রাজেন্দ্রনাথকে নিরূপিত সময়ের মধ্যে এবং নিয়মিতভাবে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় অন্য একটি ঠিকা কার্য্য প্রদান করিলেন।

সেই কার্য্য করিবার সময় তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত (বর্ত্তমানে রায় সাহেব) দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী আলিপুর ছোট লাট বাহাদুরের বাটীতে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনিও তথায় তাঁহাকে একটি ঠিকা কার্য্য প্রদান করিলেন। রাজেন্দ্রনাথ তাহাও করিতে লাগিলেন। এইরূপ কার্য্য করিতে করিতে আয়ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ঠিকাদারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াও রাজেন্দ্রনাথ দুই তিন মাস বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঠিকাদারী কার্য্যের লভ্যাংশ হইতে তাঁহার নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তখন তিনি সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথের জীবনে হঠকারিতার স্থান নাই। তিনি ভাবী সাফল্যের উপর বিশ্বাস করিয়া হস্তস্থিত নিশ্চিত জিনিষ পরিত্যাগ করেন না।

ঈশ্বর রাজেন্দ্রনাথকে সে প্রকৃতি প্রদান করিয়া পাঠান নাই। তিনি আবাল্য সতর্কসম্পন্ন। সতর্কতার পথ পরিত্যাগ করিয়া কখনই যথেচ্ছাচারের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হন নাই।

রাজেন্দ্রনাথের জীবনগতি যখন এইরূপ কর্ম্মের মধ্যে নিবদ্ধ, সেই সময় তাঁহাকে অতি কঠোর পরিশ্রমে দিন যাপন করিতে হইত। প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনস্থ বাসা হইতে আলিপুর ঠিকা কর্ম্মস্থলে কার্য্য পরিদর্শনের

জন্য গমন করিতেন। সাড়ে নয়টার সময় তথা হইতে বাসায় পুনরাগমনপূর্ব্বক স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য করিবার জন্য যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে গমন করিতেন, তৎপর তথাকার কার্য্যের অবসর প্রাপ্ত হইয়াই পুনরায় আলিপুরে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করিতেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই কর্ম্মের হিসাবাদি পরিদর্শনের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

তদুপরি মধ্যে মধ্যে সময় করিয়া নূতন ঠিকা কর্ম্মের অনুসন্ধানের জন্য নানাস্থানে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিতেন। এই সকল কার্য্যে রাজেন্দ্রনাথের কখনও আলস্য বা অবহেলা দেখা যাইত না। তাহার অংশীদার দেবেন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রনাথের উপর সম্পূর্ণ ভারার্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করিতেন, কেবল রাজেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশমত দুই একটি কার্য্য সমাপন করিতেন।

সেই সময় রাজেন্দ্রনাথকে একাধারে কর্ম্মসংগ্রাহক, কর্ম্মপরিচালক, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি সমস্ত শ্রমসাধ্য এবং চিন্তাযুক্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথ কেবল অর্থাদি রক্ষা করিতেন এবং আবশ্যকীয় ব্যয় প্রদান করিতেন। অর্থের সহিত রাজেন্দ্রনাথ কোন সংস্রব রাখিতেন না।

এই স্থানেই রাজেন্দ্রনাথের ব্যবসায় বুদ্ধির বিষয় বুঝিতে পারা যায়। সকলেই অবগত আছেন বাঙ্গালী যৌথভাবে ব্যবসায় পরিচালন করিতে অক্ষম। প্রায় বাঙ্গালীর যৌথ কারবার শৈশবে নষ্ট হইয়া যায়। কেন এরূপ হয়, তাহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ গবেষণা করিয়াছেন কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে যতদূর বুঝিতে পারা যায় যে, যৌথ কারবার বিনষ্টের হেতু অর্থঘটিত ব্যাপার।

আমাদের জাতির মধ্যে এখনও কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয় একমাত্র বিশ্বাসের উপর। যে ব্যবসায়ের মধ্য হইতে বিশ্বাস অন্তর্হিত হয়, তাহা অচিরেই নষ্ট হয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে অনেকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। সেই জন্য অনেক সময় বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের মধ্যে অবিশ্বাসের ভাব আসে।

অনেক সময় অংশীদারদিগের মধ্যে একজন লাভালাভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আগেই নিজের আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে হয়ত অর্থ সরবরাহকারী অংশীদার লোকসানের ভয়ে কারবার বন্ধ করিয়া দেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেক সময় আবার অর্থ সরবরাহকারী অংশীদার, কর্ম্মী অংশীদারের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়া সর্ব্বদা সংশয়চিত্তে অবস্থান করেন, তাহাতে কর্ম্মী অংশীদার বিরক্ত হইয়া কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু দেখা যায় অর্থ সরবরাহকারী অংশীদার যেস্থলে নিজের হস্তে অর্থ রাখিয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন, সেখানে বিশেষ মনোমালিন্য সংঘটিত হয় না।

প্রতিভাশালী রাজেন্দ্রনাথ ইহা বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি তখন কোনরূপেই অর্থের সংস্পর্শে নিজেকে রাখিতেন না। অর্থের ব্যাপার হইতে দূরে অবস্থান করিয়া কেবল কার্য্য সমাপনান্তে লভ্যাংশ নিজে গ্রহণ করিতেন

এইরূপে রাজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ মিলিত হইয়া এক বৎসর কারবার করিবার পর কিঞ্চিৎ লাভবান হইলেও উভয়ের সমস্ত অভাব দূরীভূত হইল। এদিকে সেই সময় তাহাদের হস্তস্থিত প্রায় সকল ঠিকা কার্য্যই সম্পাদিত হইয়াছে। তাহারা তখন নূতন কার্য্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত; কিন্তু কোনরূপেই তাহারা কার্য্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না।

সেই সময় যেন অকস্মাৎ পরম করুণাময় ঈশ্বর

তাঁহাদের উপর সদয় হইয়া তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কার্য্যের উপায় বিধান করিয়া দিলেন। এই ঠিকা কার্য্য তাঁহারা অসম্ভাবিত উপায়ে প্রাপ্ত হইলেন।

নূতন কার্য্যপ্রাপ্তি

একদা রাজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ দুইজনে যখন আলিপুর পশুশালার মধ্যে নিজেদের ঠিকা কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহারা দেখিলেন জনৈক সাহেব ঐ পশুশালার মধ্যে পুষ্করিণীর উপরিস্থিত একটি সেতু নির্ম্মাণের স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত কুলী ও মিস্ত্রীগণকে কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা দূর হইতে তাহা অবলোকন করিয়া সেই কার্য্যটী দেখিতে তথায় গমন করিলেন এবং দুইজনে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া অদূরে দণ্ডায়মান সাহেবকে শ্রমিকদিগের প্রতি করণীয় কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে আদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

প্রতিভাশালী রাজেন্দ্রনাথ কুলী ও মিস্ত্রীগণের প্রতি সাহেবের প্রদত্ত কর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, সাহেব ভ্রমক্রমেই হউক, কিম্বা এই কার্য্যে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্তই হউক, কার্য্য সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিতেছেন তাহা ভুল হইতেছে। এক্ষণে উক্ত সাহেবের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হইলে এই সেতু সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হইবে না।

স্পষ্টবাদী রাজেন্দ্রনাথ সেই দণ্ডায়মান অবস্থায় সাহেবের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গমন করিয়া অতি সম্ভ্রমের সহিত সাহেবের কর্ম্মোপদেশের ভ্রান্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

অকস্মাৎ একটি যুবক উপদেশ প্রদান করিতে আগমন করিয়াছে বলিয়া সেই সাহেব কোনরূপ বিরক্ত হইলেন না, বরং অতি আহ্লাদের সহিত সেই আরব্ধ কার্য্যের কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি রাজেন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সাহেব রাজেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত প্রণালীকে যখন কার্য্যোপযুক্ত এবং এইস্থানে তাহাই প্রযোজ্য বুঝিলেন তখনই তিনি রাজেন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ করিলেন, তাহাতে কোনরূপ দ্বিধা করিলেন না।

সাহেব সেই স্থলে রাজেন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে যথোপযুক্ত কর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে গমন করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার করণীয় কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক রাজেন্দ্রনাথের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রথমে তিনি যুবক রাজেন্দ্রনাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। বোধ হয়, সেই সময় সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কালে এই যুবক একজন অদ্ভুত কর্ম্মী হইবেন।

পরে রাজেন্দ্রনাথকে অতি সস্নেহে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সদা সত্যবাদী রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। সাহেব তাঁহার পরিচয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি চাকরী করিতে রাজী কি না? তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে কোন উচ্চ ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতির সম্ভাবনা আছে—তাহাতে উচ্চ বেতনও প্রাপ্ত হইবেন।

রাজেন্দ্রনাথ সাহেবের সেই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। রাজেন্দ্রনাথের চরিত্রের দার্ঢ্য, দৃঢ় হৃদয়বল এবং স্বাবলম্বনের দ্বারা আত্মোন্নতির ইচ্ছা যদি কিছু থাকে তাহা এই স্থানেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

যে যুবক তৎকালে প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া পুনঃ শয্যাগমন পর্য্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া মাসে পঞ্চাশ কিম্বা শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন এবং সম্মুখের ভবিষ্যৎ তখনও দারুণ অন্ধকারের গর্ভে

লুক্কায়িত, সেই সময় এইরূপ উচ্চ বেতনের উচ্চ কর্ম্মচারীর পদ অযাচিতভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া অতি তাচ্ছিল্যভরেই প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহা বোধ হয়, তাঁহার উপর সেই পরম করুণাময় পরমেশ্বরের পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই পরীক্ষা সম্বন্ধে পরে বলা হইবে

যাহা হউক, সাহেব যখন দেখিলেন যে, এই যুবকের মানসিক বল অতি অদ্ভুত এবং তিনি কোন প্রকারেই নিজেকে দাসত্বের পাদমূলে বন্ধন করিতে ইচ্ছুক নহেন, তখন সেই সাহেব তাঁহার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ঠিকাদারের কার্য্য করেন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একটি বড় ঠিকা কার্য্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। রাজেন্দ্রনাথ পর দিবস সাহেবের নির্দ্দেশমত স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই সাহেবটি অপর কেহ নহেন- ইনি স্যার বেডফোর্ড লেস্‌লী। তৎকালে ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত। পরে ইনি গভর্ণমেণ্টের আরও উচ্চ উচ্চ পদ এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভারতে যথেষ্ট সুনাম রক্ষা করিয়া প্রস্থান করেন।

রাজেন্দ্রনাথ তৎপর দিবস পূর্ব্বোক্ত সাহেবের নির্দ্দেশমত যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যার বেড-ফোর্ড লেস্‌লী।

সাহেব রাজেন্দ্রনাথকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই দিবসই তাঁহাকে পলতার জলের কল নির্ম্মাণের কিয়দংশের ঠিকা কার্য্য প্রদান করিলেন। রাজেন্দ্রনাথ সেই সময় যে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে তাহা তাঁহার পক্ষে প্রচুর বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই সময় প্রায় কোন দেশীয় ঠিকাদার এরূপ কার্য্য প্রাপ্ত হইতেন না।

জীবনসংগ্রাম আরম্ভ

রাজেন্দ্রনাথের দ্বারা অনায়াসে এরূপ বৃহৎ এবং লাভজনক কার্য্য প্রাপ্তিতে দেবেন্দ্রনাথও বিশেষ আহ্লাদিত এবং উৎসাহিত হইলেন। তখন দুই অংশীদারে মিলিতভাবে সেই কার্য্য সম্পাদান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময় রাজেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ অর্থকষ্টে পতিত হইলেন। তাঁহাদের যাহা মূলধন ছিল তাহাতে কোনক্রমে ছোট ছোট ঠিকা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু অকস্মাৎ কোন বৃহৎ কার্য্য সমাপন করা একরূপ অসম্ভব। কিছু দিবস সেই কার্য্য পরিচালন করিয়াই তাঁহাদের মূলধনস্বরূপ আরও কিছু অর্থের আবশ্যক হইল, নচেৎ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব।

রাজেন্দ্রনাথ প্রকৃতিদত্ত ব্যবসায়বুদ্ধি লইয়া জগতে আগমন করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, ঠিকাদারী কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন করা যায়, ততই তাহাতে লাভের পরিমাণ অধিক হয়। সেই সময় যদি কোন স্থানে কোন কার্য্য শেষ করিতে অপারক হওয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সেই স্থানে আর কোন কার্য্য প্রাপ্তির আশা থাকে না। ব্যবসায়ীর দুর্নাম একবার ঘোষিত হইলে তাহার ব্যবসায়ের পতন অনিবার্য্য।

রাজেন্দ্রনাথ এই সব চিন্তা করিয়া মূলধন বৰ্দ্ধিত করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। আলস্য-জয়ী পুরুষ তখন কোন অর্থসরবরাহকারী অংশীদার সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনু-সন্ধানের ফলে তিনি একজন অর্থসরবরাহকারী অংশীদার সংগ্রহ করিলেন।

এই নব অংশীদারের নাম শ্রীযুক্ত পরমাত্মা গাঙ্গুলী।

ইঁহার নিবাস শান্তিপুর। ইনি তৎকালে সিমলায় লাট দপ্তরে একজন উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সময় ইনি কিছুদিনের জন্য কর্ম্ম হইতে অবকাশ লইয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইয়া এবং তাঁহার নিকট লাভজনক ব্যবসায়ের কথা শুনিয়া তাহাতে কিছু অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন স্থির হইল, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথ দুইজনে লভ্যাংশের অর্দ্ধ এবং তিনি একাকী অপরার্দ্ধ লইবেন এবং তাঁহার পুত্র কিম্বা কোন আত্মীয়ের নামানুসারে এই কারবারের নাম এম. জি. গাঙ্গুলী এণ্ড কোং হইবে।

রাজেন্দ্রনাথের সহিত পরমাত্মাবাবুর এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে তাঁহার সারপেণ্টাইন লেনের বাসাতেই আফিসের কার্য্য হইবে স্থির হইল এবং তিনি রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে বাঞ্ছারাম অক্রূর লেনের মেস ত্যাগ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সকলেই তাঁহার বাক্যে তথায় নূতন মেস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদবধি পরমাত্মা গাঙ্গুলী মহাশয় সপরিবারে ভিতর বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রাজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গগনচন্দ্র প্রভৃতি কয়জন বন্ধু বহির্বাটীতে রহিলেন।

জীবনসংগ্রামের মধ্যে

পরমাত্মা গাঙ্গুলীর সহিত রাজেন্দ্রনাথের এই যৌথ কারবার পাঁচ ছয় মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। কারণ, এই পরমাত্মা গাঙ্গুলী অব্যবসায়ী এবং চাকরিজীবী লোক। স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের সুখ তিনি কখনও উপভোগ করেন নাই। তাহার উপর তিনি অস্থিরচিত্তের লোক ছিলেন। এই সব কারণে তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরাগ শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এদিকে লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ ভবিষ্যৎদর্শী রাজেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, এরূপ লোকের সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে সে ব্যবসায় দ্বারা কখনও উন্নতির সম্ভাবনা থাকিবে না। সেইজন্য তিনিও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কারবার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এদিকে পরমাত্মাবাবুও আফিসের ছুটি ফুরাইয়া গেলে পুনরায় সিমলাশৈলে প্রস্থান করিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ পরমাত্মাবাবুকে ত্যাগ করাতে অর্থকৃচ্ছের ক্রোড়ে পতিত হইলেন। তখন রাজেন্দ্রনাথের পলতায় জলের কলের কার্য্য ছাড়া আরও দুই তিন স্থানে ঠিকা কর্ম্ম চলিতেছিল। সকল স্থানেই কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য অর্থের আবশ্যক, কিন্তু তখন অর্থ সংগ্রহের সেরূপ কোন উপায় নাই।

তদুপরি রাজেন্দ্রনাথ সে সময় অন্য দায়েও পড়িলেন। রাজেন্দ্রনাথের অংশীদার দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অমিতব্যয়ী এবং বিলাসী ছিলেন। কেবল অর্থাভাব নিবন্ধন তাঁহার সেই প্রবৃত্তি বিশেষভাবে চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইতেন না। এক্ষণে রাজেন্দ্রনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বুদ্ধিকৌশলে ব্যবসায় হইতে তাহার হস্তে অর্থ আসাতে তাঁহার সেই অমিতব্যয়িতা ও বিলাসলালসা বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিল এবং সেই বিলাসতৃষ্ণা ক্রমশঃ পানদোষেও পরিণত হইল। তাহার এই সুরাপান প্রবৃত্তি এরূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, সেই ক্রমবর্দ্ধমান প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনেক সময় দিবারাত্র সুরাপানে মত্ত থাকিতেন। চিরসংযত চরিত্র কর্ম্মযোগী রাজেন্দ্রনাথ তাহাতে আরও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই সময় রাজেন্দ্রনাথের সহিষ্ণুতার সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। কারণ, একে ব্যবসায়ে অর্থের অপ্রতুল, তাহার উপর অংশীদার সুরার

মাদকতায় মুগ্ধ হইয়া ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য করিতে অসমর্থ। ব্যবসায় রক্ষা করিতে না পারিলে জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত উদ্দীপনা, মানসম্ভ্রম পর্য্যন্ত চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় আপনাকে নৈরাশ্যের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইবে। এই সকল চিন্তায় মগ্ন হইয়াও রাজেন্দ্রনাথ অচল অটল ভাবে চতুর্দ্দিক রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যখন দেখিলেন যে, অংশীদারের উপর নির্ভর করিলে আর চলিবে না—সমস্তই নষ্ট হইবে, তখন তিনি ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য অর্থ সরবরাহকারী অংশীদার দেবেন্দ্রনাথের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেই অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি তখন কারবার পরিচালনের জন্য তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং দেশস্থ পরিচিত ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ঋণস্বরূপ অর্থ লইতেন এবং নিজের কার্য্যের টাকা আদায় হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের ঋণ সুদ সমেত পরিশোধ করিতেন।

এস্থলে ব্যবসায় সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক, নচেৎ ব্যবসায়ীর উন্নতির সোপান সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যাইবে না। জগতে যাঁহারা ব্যবসায় দ্বারা ধনশালী হইয়া নিজের এবং জাতির ধনবৃদ্ধির উপায় বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই প্রচুর অর্থ অর্থাৎ ব্যবসাতিরিক্ত অর্থ লইয়া কারবার আরম্ভ করেন নাই —সকলেই সামান্য সামান্য মূলধন লইয়া কারবার স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদের এই ধন-বৃদ্ধির মুখ্যকারণ হইতেছে তাঁহাদের হৃদয়নিহিত ধর্ম্মভাব। তাঁহারা সকলেই প্রবঞ্চনার পথ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া আপাতলাভকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিয়াছেন

একটা প্রচলিত বাক্য আছে,—"ব্যবসাদার কখনও অধার্ম্মিক হয় না এবং অধার্ম্মিক কখনও ব্যবসাদার হইতে পারে না।" প্রকৃত ব্যবসায়ের মূলভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত হয়। ব্যবসাদার যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ব্যবসায়ের মূলদেশ শিথিল হইতে পারে না। আর যে মুহূর্ত্তে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে. তাহার ব্যবসায়ের মূলদেশ শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে কোনও ছিদ্রপথে পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, নচেৎ তাহার ব্যবসায় কখনই নষ্ট হইত না।

অনেক অব্যবসায়ী তাহা স্বীকার করেন না এবং তাহা বিশ্বাসও করেন না। তাঁহাদের আরব্ধ ব্যবসায়ের অবস্থাও পরিণামে ধ্বংসের পথে গমন করে। ব্যবসা-দারের সর্ব্বদিক হইতে ধর্ম্মশীল হইতে হইবে, কারণ ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, এই কার্য্য সাধনার একটি অঙ্গ-বিশেষ। তাহা কেহ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

ব্যবসাদারের নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া দেখিতে হইলে তাহা নিস্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, উদার, উন্নত এবং সংযত হওয়া আবশ্যক। রাজেন্দ্রনাথের উন্নতির মূলেও যে তাহা বর্ত্তমান, তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। যাহাতে জগতের কাহারও মনে কোনরূপ ব্যথার উদ্রেক না হয়, সেইরূপ মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যে মহাজনের নিকট হইতে পণ্য কিম্বা অর্থ লইয়া কারবার করা যাইতেছে, তাহাকে অথবা খরিদ্দারকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার মনে কষ্ট দিয়া আপাততঃ কিঞ্চিৎ লাভবান হওয়া যায় বটে, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সেই অর্থ কখনও স্থায়ী হয় না—আপনা হইতেই তাহা তিরোহিত হইয়া যায়।

গত মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতা সহরের অনেক ব্যবসাদার উল্লিখিত যুদ্ধে লিপ্ত বর্ত্তমান রাজসরকারকে বহু দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত মার্টিন কোম্পানীও বহু মাল সরবরাহ করিয়াছিল। যুদ্ধ নিবৃত্তির পর দেখা

গেল যে, অনেকের নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে তাঁহারা সেই মাল সরবরাহের সময় সরকারকে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন, কিন্তু সে অপবাদ মার্টিন কোম্পানীর নামে কেহ দিতে সমর্থ হয় নাই।

আজ কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেই ন্যায়পথচ্যুত অর্থ উপার্জ্জনকারী বহু ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহাদের মালিকগণের মধ্যে অনেকে দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর আজ এই মার্টিন কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী রাজেন্দ্রনাথ পূর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী এবং ধনশালী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা ন্যায়নিষ্ঠা এবং ধর্ম্মাশ্রয়ের ফল কি না তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ।

দেখা যায়, অনেক মাড়বার দেশবাসী এ দেশে কেবলমাত্র "লোটা-কম্বল" সম্বল করিয়া আগমন করে, পরে কোটী কোটী মুদ্রার মালিক হইয়া উঠে। ব্যবসায়ই তাহাদের এই উন্নতির মূল। কিন্তু সেই ব্যবসায়ের প্রথমে তাহারা কিছু কিছু বস্ত্র কিম্বা সামান্য কোন দ্রব্য স্কন্ধে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে। এই ব্যবসায়ে কোন মূলধনের প্রয়োজন হয় না। কারণ বিক্রেয় দ্রব্য তাহারা কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ধারে পায়। সারা দিনের বিক্রয়ান্তে সন্ধ্যাকালে সেই মহাজন ব্যবসায়ীর নিকট গমন করিয়া নিজের লভ্যাংশ নিজে গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্রব্যমূল্য তাঁহাকে দিয়া আসে।

অনেকে বলেন যে, কোন নূতন মাড়োয়ারী এদেশে আগমন করিলে অন্যান্য ধনী মাড়োয়ারী স্বজাতি-বাৎসল্যপ্রযুক্ত তাহার সাহায্য করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী সেরূপ স্বজাতির সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। মাড়বার দেশবাসী সহায়তা প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু তাহা স্বজাতীয় প্রীতির জন্য নহে—তাহা প্রাপ্ত হয় মূল ধনীর লাভের জন্য। ব্যবসায়ীর কার্য্য হইতেছে পণ্য বিক্রয়। ব্যবসায়ী সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতে থাকে যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে তাঁহার বিক্রয়ের বস্তু বিক্রীত হয়। যদি ব্যবসায়ী তাঁহার পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হন, তাহাকে কখনই ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

এস্থলে মূল ধনী জানেন যে, এই ব্যক্তি তাহার নিজের জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আগমন করিয়াছে কেবল ব্যবসায় দ্বারা নিজের জীবিকানির্ব্বাহ এবং আত্মোন্নতির জন্য। সেই ব্যক্তি নিজের জীবিকার পথ সামান্য লোভে কখনই চিরতরে রুদ্ধ করিবে না। সে মহাজনের মনে কষ্ট প্রদান করিয়া নিজে পুনরায় দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে পতিত হইতে চেষ্টা করিবে না। ইহাকে বিক্রেয় বস্তু প্রদান করিলে তাহাতে তিনি লাভবান হইতে পারিবেন।

এদিকে সেই দরিদ্র উন্নতিকামী ব্যক্তি মনে মনে অবগত আছে যে, আজ যদি লোভপ্রযুক্ত সে তাহার অসময়ের সাহায্য-কর্ত্তাকে প্রবঞ্চনা করে, পরিণামে সেই বিপত্তির মধ্যে পড়িবে। ভবিষ্যতে কেহই তাহাকে কোনরূপ ব্যবসায়ের সামগ্রী প্রদান করিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না। তাহার ব্যবসায়ের দ্বার চিররুদ্ধ হওয়াতে সে দারিদ্র্যের ক্রোড়ে পতিত হইবে। এইরূপ উচ্চ মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে ব্যক্তি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়া লয়।

পরে সেই ব্যক্তিই আবার ধনশালী হইয়া তাহার দেশবাসী বহু ব্যবসাকামীর আশ্রয়স্থল হইয়া বহু লোকের ব্যবসায়ের সাহায্য করে। এইরূপে তাহাদিগকেও ধনশালী হইবার উপায় করিয়া দেয়। ইহার মধ্যে স্বজাতীয় প্রীতির স্থান নাই। ইহার মধ্যে আছে লাভালাভের সম্বন্ধ, ন্যায় ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ, আর নিজের সদ্ভাবে আত্মোন্নতির সম্বন্ধ।

এস্থলে লিখিতে কুণ্ঠাবোধ হয় যে, যেদিন বাঙ্গালী জাতি ব্যবসায়ের মূলসূত্র এই ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় করিতে অগ্রসর হইবে, সেই দিন হইতেই বাঙ্গালী জগতের ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে গণনীয় হইয়া বঙ্গজননীর দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা দূরীভূত করিয়া অতুল বিত্তসম্পদের অধীশ্বর হইবে। সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

রাজেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ীর এই মহৎ গুণের মূর্ত্তি-প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান। ব্যবসায় দ্বারা বিপুল ধনের অধীশ্বর হইয়া নিজের, প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণের এবং জগৎবাসীর যে মঙ্গল সাধন করা যায়, তাহা তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, বর্ত্তমানে তাহা দেখিবারই লোকের অভাব।

রাজেন্দ্রনাথ দারুণ অর্থকষ্টের সময় বহু পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন। আবার ঠিক নিরূপিত সময়ে তাঁহাদিগের অর্থ তাঁহা-দিগকে প্রদান করিতেন। এই জন্যই সেই দারুণ অবস্থাবিপর্য্যয়কালে কারবার পরিচালন করিবার জন্য অর্থাভাব সংঘটিত হয় নাই। তিনি কোনও ক্রমে কারবার পরিচালন করিতেন

ব্যবসায়কার্য্য পরিচালন করিতে সকলকেই সময় সময় ঋণস্বরূপ অপরের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ আজ ঋণদানের জন্য পাশ্চাত্যপ্রথায় এত ব্যাঙ্ক চলিত না।

ব্যাঙ্ক সকল কেবলমাত্র ব্যবসায়ীকে ঋণদানে সাহায্য করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। আর সেই সাময়িক ঋণ প্রাপ্ত না হইলে পাশ্চাত্য দেশবাসী ব্যবসায় দ্বারা ধনশালী হইতে সক্ষম হইত না। কিন্তু ব্যবসায়ীর পক্ষে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই ঋণকে আবার পরিশোধ করা আবশ্যক, নচেৎ আর কখনও অর্থাভাবের সময় অর্থ প্রাপ্তির আশা থাকিবে না—তাহাতে ব্যবসায়ও অচল হইয়া পড়িবে।

রাজেন্দ্রনাথের এই জ্ঞান স্বতঃই স্ফুরিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন,বাজারে সম্ভ্রম রক্ষা করিলে ব্যবসায় রক্ষা পাইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এই সময় তিনি ঋণস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন এবং উপযুক্ত সময়ে তাহা পরিশোধ করিতেন। এই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, রাজেন্দ্রনাথ কাহারও কাছে ঋণী আছেন। আজ তিনি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বর-পুত্র। তাঁহার ঋণ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু যখন তিনি জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত, তখনও তিনি নিজেকে ঋণমুক্ত রাখিতে সদাই চেষ্টা করিতেন। জগতে তাঁহার জয়যুক্ত হইবার ইহাও অন্যতম কারণ।

(ক্রমশঃ)

জগৎ-কথা

[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্জন]

২

জগৎ-কথার ভূমিকায় আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সৃষ্টিবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে, মানুষ এই বিশ্বসৃষ্টিতে কত যে ক্ষুদ্র এবং কত যে বড়, এ দুটি কথাই জানিতে পারে। কথা দুইটি জানাই বিজ্ঞানের এই শাখার চর্চ্চার লাভ এবং বড় লাভ। সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধি বা কৌতূহল তৃপ্তি, এ দুইটি ছাড়াও জীবন পরিচালন বা জীবনের কাজের সঙ্গে ইহার অত্যন্ত যোগ আছে। মানুষের অন্তর হইতে বিজ্ঞান-বিদ্যা যে জন্য জন্মলাভ করিয়াছে, এই সৃষ্টিতত্ত্ব বা মানুষের দিক দিয়া হিসাব করিলে, ভূতত্ত্ব, বোধ হয় সকলের অপেক্ষা সহজ পথে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার ভাণ্ডারটি উন্মুক্ত রাখিয়াছে। মানুষের নিজের এবং তাহার পারিপার্শ্বিক সমুদায় জিনিষের জন্মবিবরণ বলিয়া, বিজ্ঞান হইলেও, ইহার মধ্যে যেন একটা মাধুর্য্যভরা মমতামাখা সম্পর্ক আছে। সে রসের আস্বাদনে মানুষ অনেকটা যেন সবিস্ময়ে সবল হয়। নিজের বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম যে কথাটুকু জানা দরকার, দর্শন তাহার যে আভাস দেয়, সৃষ্টিবিজ্ঞান বা ভূতত্ত্ব সেটুকু চোখের একেবারে সম্মুখে আনিয়া ধরে। ইহাতে মানুষের এই লাভ হয় যে, পরে তাহার আর কি ঘটিবে না ঘটিবে সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা অর্থাৎ দুশ্চিন্তা করিয়া সময়ক্ষেপ না করিয়া, মানুষ নির্ব্বিঘ্নে ও নিঃসন্দেহে আপনার কাজ বা উপস্থিত কাজ করিয়া যাইতে পারে। মানুষের জীবনের গতিতে এইরূপ বিষয়টির মূল্য, সবার অপেক্ষাই প্রধান। যখন মানুষের মনে ঐ সুন্দর অবস্থাটি আসে, তখন মানুষের সত্য আত্মবল আসে, দায়িত্ববুদ্ধি আসে এবং মানুষের মন নির্ভয় ও আশঙ্কাশূন্য হয় এবং আকাঙ্ক্ষাশূন্যও হয়, নিরাশাশূন্যও হয়—অর্থাৎ ঠিক খাঁটি কর্ত্তব্যজ্ঞানটি বা সেই বিষয় সম্বন্ধে ঠিক সত্যবোধটি আসে। এই অবস্থাটাকেই আমরা প্রকৃত **জানা** বা জ্ঞানের প্রথম ধাপ বলিতে পারি। বিজ্ঞানবিদ্যার বা বিজ্ঞানশিক্ষার অন্য যাহা কিছু উদ্দেশ্য আছে, সকলেরও উপরে, এইটিই বাস্তবিক মূল উদ্দেশ্য।

কথাটা বোধ হয় আর একটুকু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে গেলে, দোষের হইবে না। আমরা জানি গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন যে, এই মহাসৃষ্টিতে কত যে ধরণী, কত কোটি কোটি সৌরজগৎ, কত অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি রহিয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। জগৎ ও জীব সৃষ্ট হইয়াছে, সৃষ্ট হইতেছে, ধ্বংস হইয়াছে, ধ্বংস হইতেছে এবং সৃষ্ট হইবে যে কত, তাহারও সীমা সংখ্যা নাই। কাজেই মানুষ যে কাজটুকু করিতেছে তাহার মূল্য কিছুই নয়। আবার, সে কাজের কর্ত্তাও সে নয়। বিচিত্র জগতের সৃষ্টি ও সব কাজ কোন্ এক অজ্ঞানা মহাশক্তির ভিতর দিয়া ঘটিয়া চলিতেছে। অথচ, সেই মহাবিরাট জগৎ কাজের অংশস্বরূপ, তাহার সেই কাজেরই বা

মূল্যের সীমা কোথায়? কিছুই নয় মানুষ, যে কাজ সে করিয়া যাইতেছে তার সেই কাজও, সে করে না, তবু সে-ই সব! ক্ষুদ্র শিশু মায়ের কিছুই করে না, মা-ই সব করেন, শুধু সে যে আছে, এইটুকুই যেন তার কাজ! অথচ, মায়ের শিশুই সর্ব্বস্ব। মহাবিশ্বসৃষ্টির এই যে আনন্দরূপটি এইটি তিনি অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা যে শিশুর দৃষ্টান্ত দিয়াছি, ঠিক ঐরূপ, শিশু যে আছে, ঐ যে থাকাটি বা জগতে সকল বিষয়ের ভিতর দিয়া, থাকিয়া চলাটি, এইটিই সৃষ্ট-জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ—উহাই সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ স্বভাবধর্ম্ম। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিদারুণ শূন্যতা, নিদারুণ ভয়, নিদারুণ পরিবর্ত্তন, নিদারুণ অসীমতা, সমস্তই আছে, তাহা ছাড়া, সৃষ্ট জড়বস্তু ও জীব, সকলেরই কর্ত্তব্যও আছে জীবনব্যাপী, নিয়মে বাঁধা ও অফুরন্ত; কিন্তু তবু তাহা চিরনশ্বর হইয়াও অবিনশ্বর আর আনন্দে ভরা এবং মুক্ততাও তাহার অসীম।

বিশেষরূপে ইহা দেখাইতে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে দিব্যচক্ষু দিলাম।" আমরা যখন সৃষ্টিবিজ্ঞানক্ষেত্রে উপস্থিত হইব, তখন দেখিব যে, ইহাই 'দিব্যচক্ষু'; গীতার কথাটি দর্শন এবং বিজ্ঞান, এ দুয়েরই কথা। মহাবিশ্বের রূপটি আমরা এইখানে মনে এবং চোখেও সত্য সত্যই বিশেষ নূতন-ভাবে দেখিতে পাই। আমরা যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখি বা সাধারণতঃ যাহা চিন্তা করি, তাহার অপেক্ষা আরও একটু উঁচুতে গেলে, যেমন, দূরবীক্ষণে কি অণুবীক্ষণে দেখিলে বা নিবিড়ভাবে চিন্তা করিলে কিছু আরও বেশী দেখি বা বেশী জানি। আবার তাহার অপেক্ষাও উচ্চতর বিজ্ঞান বা পরীক্ষা, এবং দর্শন বা চিন্তা স্বরূপ-কথাটিকে আরও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া, দেখাইয়া বা বলিয়া দেয়, এই বিশেষ করিয়া বলা বা দেখানই দিব্যচক্ষু দেয়। আর তাহারও অপেক্ষা উঁচু স্তরে যাইতে পারিলে, যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাকে বলিব,—চরম চক্ষু।

জানার এই সব অবস্থাতে মানুষের ভ্রম সকল দূর হইয়া যায়, সৃষ্টির রহস্য, জীবনের রহস্য সমস্ত আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। অন্ধকার চলিয়া যাওয়ার পর, মন এবং হাত উভয়ই আপনার কাজে এবং আপনার সম্মুখে আরও সুদূর অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত পথে ভবিষ্যতের খোঁজে উৎসুক হয়। যাহার শেষ নাই তাহারও যেন শেষকে খুঁজিতে খুঁজিতে মানুষ জ্ঞানের সীমানাকেও এবং কাজের সীমানাকেও সীমাহীন করিয়া দেয়। ইহাতে মানুষ হিসাবে মানুষ ক্রমেই বড় হইয়া উঠে। সমস্ত জগতের মানবজাতি এইরূপে দর্শন, বিজ্ঞান বা চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া, মানবলোকের অপেক্ষাও ভবিষ্যতের আরও উচ্চতর লোকের জীবে পরিণত হইয়া সৃষ্টির ভিতরের গূঢ় উদ্দেশ্যটিকে সার্থক করিবার দিকে চলিয়াছে।

সে কথা বিজ্ঞানকথা আলোচনার সময় যথাস্থানে দেখা দিবে।

কিন্তু এই যে চলিয়াছে, চিন্তায়, কাজে, পরিবর্ত্তনে মাখামাখি হইয়া জীবজগৎ ও জড়জগৎ, এইটিই দর্শনেরও এবং বিজ্ঞানেরও সত্য ও তাহাদের প্রমাণেরও অক্ষয়ত্ব। জগৎ-কথার এইটিই প্রথম ও শেষ কথা। কিছু ছিল না অথচ সমস্তই ছিল, কিছুই থাকিবে না অথচ সমস্তই থাকিবে, কিছুই নাই অথচ সমস্তই আছে, দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ে মিলিয়া, অনুমানে প্রমাণে ও প্রত্যক্ষে দেখাইয়া দিতেছে যে,—অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল এই যে কাজটি, নিরন্তর এই কাজটি চলিতেছে। পদে পদে তাহার চিহ্নগুলি মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া চলিয়াছে। কেহ এই ফুটিয়া উঠাটিকে 'আনন্দ' বলিয়াছেন, কেহ 'মায়া' বলিয়াছেন, কেহ কোন অর্থে 'কর্ম্ম' বলিয়াছেন, কেহ কোন অর্থে 'বিবর্ত্তন' বলিয়াছেন। এইরূপ কেহ অন্য কিছু। দর্শন

বা বিজ্ঞানের যে পথেই যিনি যাহা বলিয়াছেন, সকলেই বুঝাইয়াছেন, এই ব্যাপারটি জানা, শুধু, সেই "দিব্যচক্ষু"টিকেই পাইবার জন্য।

এই দিব্যচক্ষু বা **জ্ঞানাঞ্জন** জন্য মানব জগৎ উতলা। সব দেশেই মনীষীরা এই ধনে যাহাতে নিজেরা ধনী হইতে পারেন এবং সকলকে ধনী করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। তাঁহাদের তপস্যার কল্পবৃক্ষ হইতে ফলগুলি পাওয়া এখন সকলেরই সুলভ হইয়াছে।

কি জন্য ও কেন সেই 'জ্ঞানা'টিকে মানুষ চায়, সেই দিব্যচক্ষুটিকে কেন চাই, এবং তাহা পাওয়ায় কি লাভ, তাহা একটু একটু বলা হইয়াছে। মনে হয় যে, এখন স্বরূপকথাটিকে বলিবার ঠিক সময় আসিয়াছে।

৩

আমরা যেখানে বাস করি আমরা সেই গৃহকে প্রথম জানি। তাহার পর গ্রাম, প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ এবং অবশেষে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়। ভূতত্ত্বও এইরূপ, বর্ত্তমান কাল হইতে অতীত কালের সিঁড়ির পর সিঁড়ি বা যুগের পর যুগ অতিক্রম করাইতে করাইতে আমাদিগকে এক অপূর্ব্ব অপরিচিত রাজ্যের সহিত পরিচিত করায়। যে বিরাট রাজ্যটি আমাদেরই এবং আমাদের চারিপাশেই! কেবল যে চারিপাশের এবং বর্ত্তমান ও অতীতের কথাটি বলিয়াই ভূবিদ্যা ক্ষান্ত হয়, তাহা নয়। বর্ত্তমান ও অতীতকে সে প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখাইয়া দেয়, আর ভবিষ্যতেরও আর একটি বিরাট রাজ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে।

অনাদি অতীত ··· (১) ··· ···অনন্ত ভবিষ্যৎ
[ক] চলৎ [খ]
বর্ত্তমান

এই তিনটি অসীম কালকে লইয়া ভূবিদ্যার সীমানা।

বর্ত্তমান কালটিও যে স্থির নয়, উহাও যে চলৎ বা চলিতেছে এবং সমস্ত জগতের বর্ত্তমান কালটিও যে অসীম, অর্থাৎ, এই যে লিখিতেছি, এই মুহূর্ত্ত সময়টুকুর মধ্যে কোথায় যে কত অনন্ত জগতের সৃষ্টি বা অনন্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা, ভূবিদ্যা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া দেখাইয়া দেয়।

আর, এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর বাহিরে দূর হইতে দূরতর অন্তহীন আকাশে আমরা যাহাদিগকে দেখি, সেই সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের বিপুল রাজ্যটা কি, উহাদের মধ্যে কে কি এবং উহাদের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক, ভূবিদ্যা তাহারও এক প্রধান অংশ আমাদিগকে জানাইয়া দেয়।

সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহ সকল	[১]	সুদূরে সংখ্যাহীন নক্ষত্রের জ্যোতিঃ রাজ্য
[ক]	পৃথিবী	[খ]

এই সমুদয় লইয়া আমাদের ভূবিদ্যার সম্পর্ক।

এই জন্য, ভূবিদ্যার নাম আমরা দিতে পারি—**জগৎ-কথা**।

'গম্' অর্থাৎ যাইতেছে বা যাহা কিছু চলিতেছে এই কথা হইতে জগৎ। ইহার মধ্যে চলৎ কাল, চলৎ সৃষ্টি, চলৎ নক্ষত্র (নক্ষত্রগুলি, যাহাদিগকে বাস্তবিক স্থির দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহারাও চলিতেছে) চলৎ গ্রহ উপগ্রহ,—এবং আমাদের ভূ বা পৃথিবী। সকলই পড়ে। যাহা অস্থায়ী বা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, তাহারও আর এক নাম জগৎ।

'ভূ' বা পৃথিবীর তত্ত্ব তো ভূতত্ত্ব বটেই, 'ভূ'র সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, ভূতত্ত্বের নিমন্ত্রণে একবার সকলেরই না আসিয়া উপায় কি ?

ভূতত্ত্ব, বিজ্ঞানের একটি বিভাগ। একটি বড় বিভাগ। এ বিভাগ পৃথিবীর কথাটিকে বিস্তার করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসুকে বলিয়া দেয়, আর অনুসন্ধিৎসুর কাছে সকল খোঁজটিই আনিয়া দেয়। পৃথিবীর সৃষ্টিকথা, বিশেষতঃ অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের বা

ভূতত্ত্ব কি ?

সৌরজগতের সহিত ইহার সম্পর্কের কথা, ইহার সমুদ্র, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, দেশ মহাদেশের গঠনের কথা, আকাশের আলোতে বাতাসে এবং পৃথিবীর নিজের ভিতরের আগুনে লক্ষ লক্ষ বৎসরে পৃথিবীর কিরূপ কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, পৃথিবীর জীবজগতের ও উদ্ভিদ্জগতের ইতিকথা, কি কি পদার্থে এই ধরিত্রী গঠিত, তাহার মূল কথা, কিসে, বা পাহাড় পর্ব্বতে, মাটির নীচে যেসব চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে তাহার কোন্ কোন্গুলি হইতে, আমরা ঐ সব কথার প্রমাণ পাইতে পারি এবং আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কিভাবে কি উদ্দেশ্যে জড় ও জীবের সৃষ্টিধারা চলিয়াছে এবং—ইহার পর আরও কি হইতে পারে,—এই সমস্ত কথা সুনিয়মে ও উপযুক্ত প্রমাণের সঙ্গে বলার কাজ—**ভূবিজ্ঞানের।**

সত্য সত্য বলিতে গেলে, ভূবিদ্যাকে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান নাম দিলেই ভাল হয়। কোন জিনিষের গোড়ার কথাটা কি এবং কিরূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এই জগতের জিনিষ চলে, পৃথিবীর বুক খুঁড়িয়া, পাহাড় পর্ব্বত খুঁড়িয়া, পাথর-কয়লা বা পাথরে-জমা-(পাথর হইয়া যাওয়া) গাছপালা ও পাথরে জমা কঙ্কাল (Fossil—প্রস্তরীভূত জীবাবশেষ) বাহির করিয়া, মাটির স্তর খুঁজিয়া, তাহারই আশ্চর্য্য ইতিকথা—বা স্বরূপ-কথাটিই রহিয়াছে এই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে।

এই সকল কথা বলিতে গেলে অসংখ্য কোটি কোটি বৎসরকে মুঠার মধ্যে লইতে হয়। কেননা, বহু কোটি কোটি বৎসরে, এই সব ব্যাপার ঘটিয়াছে ও সেই অতি সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া আজিকার এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। আর সেই অসংখ্য কোটি কোটি বৎসরের বিপুল কথা বলিতে হইলে আরও অন্যান্য বিজ্ঞান শাখার ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে যেসব বিষয় ও যেসব জ্ঞান জমান রহিয়াছে বা জমান হইতেছে, সে সকলেরও সাহায্য লইতে হয়।

এই জন্য, ভূবিজ্ঞান যখন স্বরূপ-কথা বলিতে বসেন, তখন সেই যুগযুগান্তের অপূর্ব্ব রহস্যকাহিনীর বৈঠকে, তখন, কথার কতক কতক মালমশলা গুছাইয়া ও যোগাইয়া দিতে, সকলেই ইঁহারা আসিয়া তাঁহার সঙ্গী হন—

ভূবিদ্যার সঙ্গী

ধর্ম্মশাস্ত্র
দর্শন
পুরাণ

খগোল বিজ্ঞান ও গণিত (Astronomy and Mathematics), পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন (Physics and Chemistry), বায়ুবিজ্ঞান (Meteorology), প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূগোল (Physiography and Geography), শৈলবিজ্ঞান (Petrology), খনিজ-বিদ্যা (Mineralogy), পুরাজীববিজ্ঞান (Paleontology), অর্থনৈতিক ভূবিজ্ঞান (Economic Geology), জীববিজ্ঞান (Biology), প্রাণিবিজ্ঞান (Zoology), নৃবিজ্ঞান (Anthropology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology) প্রভৃতি।

এই প্রধান সঙ্গীদের সঙ্গে আরও ছোট ছোট সঙ্গীরাও থাকেন। সঙ্গীসভার মধ্যে কেহ বা চিন্তার খোরাক যোগান, কেহ বস্তুর খোরাক যোগান, কেহ কার্য্য পরিচালনের উপায়টিই যোগাইয়া দেন। সঙ্গীসভার সভ্যেরা পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য) সব দেশ হইতেই আসেন। এই সভাতে

ভাল করিয়া দেখিতে গেলে মনে হইবে যে, দার্শনিক ভাগ এবং প্রাচীন জ্যোতিষ (খগোল) ও বিজ্ঞান ভাগ ও প্রাচীন ইতিহাস ভাগ বিশেষ করিয়া যেন পূবের এবং আধুনিক কালের বিখ্যাত প্রামাণ্যস্বরূপ—বিবিধ বিজ্ঞান ভাগগুলি—বিশেষ করিয়া যেন পশ্চিমের। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে, দুয়েরই সাহায্যে আসল কথাটি স্পষ্ট হইবার উপায় ক্রমেই সহজ হইয়া উঠিতেছে।

এই যে স্বরূপ-কথা, ভূবিদ্যার এই স্বরূপকথাটির ঠিক যেন স্বপ্ন ও সত্যের মত দুইটি সুন্দর ভাগ আছে। স্বপ্ন বলিলাম, এজন্য উহার স্বপ্নের ভাগটি যে মিথ্যা, তাহা নয়। 'কল্পনা' যেমন 'কার্য্যে' পরিণত হয়, কোন কোন 'স্বপ্ন' যেমন 'সত্যে' পরিণত হয়, ভূবিদ্যার স্বপ্ন-ভাগটিও তেমনি দিনরাত্রি সত্যে পরিণত হইয়া যাইতেছে। একেবারে শূন্য হইতে, কি করিয়া অনির্ব্বচনীয়া শক্তি (Eternal Energy) আসিল ও মহাপরমাণুর সূত্র ধরিয়া সৃষ্টির আদি বিকাশ ঘটিল, বা বিদ্যুতিন (Electron) ও নভোধারার (Ether) স্পন্দন হইতে এই বিরাট পরিদৃশ্যমান —প্রত্যক্ষ জগতের সৃষ্টি হইল, ইহা স্বপ্ন সত্য হওয়া ভিন্ন আর কি? এমন কি, পদার্থবিদ্যা বলেন যে, এই যে এমন প্রত্যক্ষ জগৎ, ইহার যত কিছু যাহা, সমস্তই, শুধুই স্পন্দন (কম্পন) ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাহা হইলে, সত্যকেই স্বপ্ন এবং স্বপ্নকেও সত্যই বলা যায়। ভূবিদ্যা অতটা না বলিয়াও, বলেন যে, জগৎ-কথার মধ্যে দুইটি জিনিষ আমরা পাই,—একটি হইতেছে এই যে, জগতের প্রকৃতিটি কি ভাবে চলিতেছে বা কাজ করিতেছে, পৃথিবীর দেহটাতে পাহাড় পর্ব্বতাদি যাহা কিছু আছে, কিসে ইহারা গঠিত, ইহাদের সহিত অন্যান্যের কিরূপ কি সম্পর্ক, কিভাবেই বা ইহারা সব অবস্থিতি করিতেছে এবং জল, বাতাস, বরফ, আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস, এই সবের গতিবেগ কিরূপে জন্মিয়া এবং কোন্ নিয়ম ধরিয়া পৃথিবীর উপরে আপন পথে উহার ভাঙ্গা গড়া ইত্যাদি করিয়া চলিয়াছে, এই পৃথিবীকে ও বিশ্ব-সৃষ্টিকে জানিতে হইলে, ইহা, জানিবার একটি প্রধান বিষয়। বরং ইহাই হইল কর্ম্মশীল ও বর্ত্তমান প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ বিষয়।

ভূবিদ্যার দুইভাগ

—প্রথম—

প্রাকৃতিক ভূবিজ্ঞান [Physical Geology] প্রকৃতি-প্রবাহে ও প্রাকৃতিক গঠনে [Dynamical & Structural]

সুতরাং, এই ভাগকে **'প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা'** এই নাম দেওয়া যাক্।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, পাথর ইত্যাদির স্তরে এবং পাথর হইয়া যাওয়া প্রাচীন কঙ্কাল বা জীবাবশেষ প্রভৃতি যাহা আমরা পাইতেছি, তাহা লইয়া আলোচনা ও চিন্তা করিতে বসিলে, পৃথিবীর অতীত ও অতি-অতীতকালের জল, মাটি, জীব ও উদ্ভিদ্ জীবনের যে সুপ্রমাণযোগ্য অথচ অজানা ছবিটি অপূর্ব্বভাবে, সত্যেরই যেন একটি স্বপ্নকাহিনীর মত আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠে, গল্পকথার মত হইয়াও তাহা অত্যন্ত জলন্ত প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা। পৃথিবীর আদি দিন হইতে 'দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা' এই বিচিত্র বিবরণী এবং আজিকার দিন হইতে সুদূর মহা-অতীতের এই যে বিস্ময়কর সত্য ইতিকথা,—জগৎ সৃষ্টি এবং এই পৃথিবীকে জানিতে হইলে, ইহাই এই ধরণীর পরম সুন্দর, ভাবময়, গতিস্মৃতিভরা, আশ্চর্য্য ও অতুল উদ্দেশ্যময় ইতিহাস। এবং তাহার ভবিষ্যতও গতিশীল।

ইহাকে, সুতরাং, **ঐতিহাসিক ভূবিদ্যা** এই নাম দেওয়া যাক্।

তাহা হইলে, এই দুই পথে অনুসন্ধানে বাহির হইলে, চলিতে চলিতে ধাপে ধাপে আমরা গিয়া সেই

পৃথিবীর দশ কোটি বৎসর

জগৎ-কথা

পৃষ্ঠা — ২৯৩

[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে]

মূল সত্যটিতে পৌঁছিব। পদার্থবিদ্যা যাহার কথা বলেন এবং যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

মানুষ অকস্মাৎ-বিস্ময়ের অসীম রাজ্যে সহসা যাইতে চাহে না বড়। এই জগৎ নিজের সৌন্দর্য্য ও সত্তার পূর্ণ শোভায় থাকিয়া আপনার কণ্ঠের কল-গীতিতে এবং স্নিগ্ধ কোল পাতিয়া যদি মানুষকে জ্ঞানের পরম স্থানে নিয়া পৌঁছাইয়া দেন, তাহা মানুষের কতই লোভনীয়!

ভূবিদ্যা এই কার্য্যটি বাস্তবিক সযত্নে সমাধা করিয়াছেন।

এইরূপে, প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা ও ঐতিহাসিক ভূবিদ্যা এই দুইভাগে ভূবিজ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে।

দুইটি ভাগে মিলিয়া, এই বিশাল জগতে পুঞ্জে পুঞ্জে যে কিছু পদার্থ, মাটি, জল ও পাথর হইতে জীবজন্তু এবং নক্ষত্রের আলো ও নীহারিকার বাষ্পরাশি পর্য্যন্ত সমুদয়, বিবিধ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া কিরূপে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, কোন্ শক্তি কিরূপে কাজ করে, ঐসব পদার্থের ও শক্তির এবং তাহার কাজের স্বভাব এবং পরিণাম ফল কি, এই সকল বিষয়েরই ধারণায় এবং জ্ঞানে ইহা (ভূবিদ্যা) মানুষের হৃদয় পূর্ণ করে।

এই সাহায্য পাইয়া, মানুষ বিশ্বসৃষ্টিকে এবং আপনাকে সুস্পষ্ট করিয়া জানিয়া লয়।

ভূবিদ্যার প্রাকৃতিক ভাগটি বিজ্ঞানবিৎ ও অধ্যয়নার্থী ছাড়া, সাধারণ পাঠকের নিকট কিছু অসহজ এবং কিছু শুষ্ক বলিয়াই মনে হয়। তাহা খুব স্বাভাবিক। কেননা, উহাই এ বিজ্ঞানের অস্থি বা প্রকৃত বিজ্ঞানভাগ। সাহিত্যে প্রবেশ করিতে যেমন ব্যাকরণ, ইহা যেন তাহাই। ভূবিদ্যায় এই ভাগই প্রথম ভাগ; প্রথমে ইহা জানিলে সুবিধা হয়। তবে সাধারণতঃ বর্ত্তমানকে লইয়াই অধিক কাজ কারবার ইহার, এজন্য, বিজ্ঞানরসিক ছাড়া অন্যের নিকট উহার রস হঠাৎ ধরা দেয় না। প্রাকৃতিক ভূবিদ্যাই বর্ত্তমান হইতে অতীতে এবং বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে, দুইদিকেরই শেষ সীমায় মানুষকে লইয়া যাইতে পারে।

আর, ঐতিহাসিক দিকটা বড়ই ভাবময় বলিয়া, সরস। প্রাকৃতিক দিক্‌কে যদি অস্থি বলিয়া থাকি, তবে ইহাকে ভূবিদ্যার জীবন্ত শরীরটি বলিলে ভুল হইবে না। ভূতত্ত্বের ইহা, তুলনায়, সাহিত্য ভাগ। সত্য উহাতে যেন উপন্যাসেরই আকারে তরল হইয়া রহিয়াছে। আর তাহারই ঢেউ যেন অনন্ত বিস্তৃত হইয়া অপারের এপারে ওপারে লাগিতেছে। প্রত্যক্ষ জিনিষ যে কৌতূহল জন্মায় তাহা এক প্রকারের, আর অজানা জিনিষ যে কৌতূহল জন্মায় তাহা অন্য প্রকারের। বর্ত্তমান সূর্য্য এবং গ্রহাদি আমাদের কাছে নিত্য বিস্ময়ের বস্তু, কিন্তু এই সৌরজগতের আদি ইতিহাস, মনে হয়, আরও কৌতূহলের বস্তু! এই পৃথিবীর প্রতিটী জিনিষই আমাদের অসীম কৌতূহলের জিনিষ, ভুল নাই। কিন্তু কত কোটি বৎসর ধরিয়া যে পৃথিবী বাষ্প হইতে আজের এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা যদি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহা যেন আরও বিস্ময়ের!

এই জন্য, আমরা ভূবিদ্যার প্রাকৃতিক জগতের অপেক্ষা উহার ঐতিহাসিক ভাগটিই আগে বা প্রথম-বারে আরম্ভ করিব। ইহারই কৌতূহল রসের উপর দিয়া যেন পাঠকের চিত্ত ভূবিজ্ঞানের অপর পারটিকে লক্ষ্য করে।

(ক্রমশঃ

ভারতবর্ষের ইতিহাস

[শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ]

(৪র্থ প্রস্থ)

ত্রেতাযুগ

যে বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সত্যযুগে যে ভাবধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাও উক্ত নিয়মে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল, আর তাহার ফলে ত্রেতাযুগের ভাবধারার আবির্ভাব হইল। ত্রেতাযুগের ভাবধারার, সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজের আচার ব্যবহার, মানবের আয়ুঃ বলবীর্য্য সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ত্রেতাযুগের পরিমাণ ও রাজবংশ

সত্যযুগের ১৭২৮০০০ সতের লক্ষ আটাশ হাজার বৎসরের পর, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সোমবারে এই ত্রেতাযুগের আরম্ভ হয়—এইরূপই ঋষিগণ স্থির করিলেন। এই যুগ ১২৯৬০০০ বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর থাকে। এ সময় সূর্য্যবংশীয় রাজগণ প্রাধান্য লাভ করেন। চন্দ্রবংশীয় রাজগণ এ সময় প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। সূর্য্যবংশের বহু রাজগণের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ অতীব বিখ্যাত হন—ইহা সকলেই বিদিত আছেন। এই সব রাজগণের ইতিহাস অতি বিস্তৃত। তাহার বর্ণন প্রবন্ধ মধ্যে সম্ভবও নহে সঙ্গতও নহে। অতএব সে প্রয়াস এক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইল।

ত্রেতাযুগের প্রকৃতি

এ সময় মানবগণ ৩০০ তিনশত বৎসর জীবিত থাকিত। প্রাণ অস্থিগত ছিল, অর্থাৎ অস্থি নষ্ট না হইলে আর মানবের প্রাণ বহির্গত হইত না। মানবের দেহ ১৪ চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত ছিল। ঋগ্বেদ, প্রধান অবলম্বন ছিল, অর্থাৎ ঋগ্বেদ অনুসারে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। লোকে রৌপ্যপাত্র ব্যবহার করিত। প্রধান তীর্থ ছিল নৈমিষারণ্য। ধর্ম্ম ত্রিপাদ বর্ত্তমান, অর্থাৎ সত্যযুগের ধর্ম্ম মধ্যে সিকিভাগ অধর্ম্ম প্রবেশ করিল।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ

সামাজিক ইতিহাসে এসময় বহু প্রধান প্রধান ঘটনার মধ্যে একটি প্রধান ঘটনা ছিল—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ। এই বিবাদের ফলে উভয় পক্ষই বহু হতাহত হন, বহু বংশ নির্ব্বংশ হয়, বহু কুল উচ্ছন্ন হইয়া যায়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রধান ছিলেন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য ভৃগুমুনির তপোবলে পরশুরামের আবির্ভাব হয়। এই পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে যুদ্ধে নিহত করেন। কেবল তাহাই নহে, ক্ষত্রিয়গণের উপর তাঁহার ক্রোধ শান্তির জন্য তিনি ২১ একুশ বার পৃথিবী প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করেন।

কায়স্থোৎপত্তি

ইহারই ফলে কায়স্থজাতির উৎপত্তি হয়। একজন ক্ষত্রিয় রমণী গর্ভবতী অবস্থায় প্রাণভয়ে এক ঋষির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরশুরাম তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিবার জন্য ঋষির নিকট আসেন। ঋষি আশ্রিতের প্রাণরক্ষার জন্য বলেন—এই ক্ষত্রিয় রমণীর সন্তান কায়স্থ নামে অভিহিত হইবে, আর ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইবে না এবং অসি চালনার পরিবর্ত্তে মসিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে, সুতরাং ইহাকে বধ করিও না। ইহাতে পরশুরাম নিবৃত্ত হন, সেই ক্ষত্রিয় সন্তান কায়স্থজাতির পূর্ব্বপুরুষ।

অবশ্য ব্রহ্মার পুত্র ধর্ম্মরাজ যমের সাহায্যার্থ ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন চিত্রগুপ্তকেও কায়স্থজাতির আদি-পুরুষ বলা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কারণ, যদি বলা যায় যে, চিত্রগুপ্ত হইতে উৎপন্ন যে কায়স্থজাতি, সেই কায়স্থজাতির মধ্যে উক্ত ক্ষত্রিয় রমণীর সন্তানকে, উক্ত ঋষি পরিগণিত করিয়া দিলেন, তাহা হইলে কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না। যাহা হউক, এই ত্রেতাযুগের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিবাদ ও তাহার ফলে কায়স্থজাতির বিস্তৃতি একটি প্রধান ঘটনা বলা যাইতে পারে।

ক্ষত্রিয় প্রাধান্য

তাহার পর শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার নিবৃত্তি হয় না—এই সত্যটী তখন অতি ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই বলিয়া বহুদিন হইতে উক্ত বিবাদ সমভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। ভগবান্ নারায়ণ এজন্য রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া পরশুরামের শক্তি হরণ ও তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া উভয় সমাজ মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিলেন এবং মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন।

যাগযজ্ঞ প্রাধান্য

অসুরগণের যাগযজ্ঞাদি অ

এই যুগে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অতি প্রবল থাকায় লোকের ইহপারলৌকিক সুখভোগের বাসনাই সাধারণতঃ প্রবল হইয়া উঠে ইহার ফলে ব্রাহ্মণেরই বংশে রাক্ষস প্রকৃতি রাবণ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। ইহারা সেই বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিরই দ্বারা দেবতাগণকে তুষ্ট করিয়া সেই দেবতাগণেরই উপর আধিপত্য করিতে থাকেন। কিন্তু ক্রমে রাবণের এই প্রতাপ এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, জগতের প্রাণিবর্গের তাহা অসহনীয় হইয়া উঠে। ভগবান্ রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া এই রাবণেরও ধ্বংসসাধন করিলেন। কিন্তু রাবণের জাতির ধ্বংসসাধন করিলেন না। রাবণের জাতির মধ্যে যেটুকু নিন্দনীয় ভাব ছিল তাহারই সংস্কার সাধন করিলেন মাত্র। আজকালকার পাশ্চাত্য শক্তি-সমূহ যেমন পরাজিত জাতিকে ছলে বলে কৌশলে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকেন—তাহাদের নিজত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া থাকেন—শ্রীরামচন্দ্র সেরূপ কিছুই করিলেন না।

ভারতের পূর্ত্ত-বিজ্ঞান প্রভাবে আকৃতি পরিবর্ত্তন

অতঃপর এই ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে মানববাসের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের আকৃতিগত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা হয়। এই সময় গঙ্গা এবং ঝিলাম নদীর প্রবাহ ভারতের সমতলক্ষেত্রে আনীত হয়। ঝিলাম নদীর উৎপত্তিতে জলময় কাশ্মীর প্রদেশটীর আবির্ভাব হয় এবং গঙ্গা নদীর আগমনে গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশসমূহ মনুষ্যবাসের যোগ্য হয়। এখনও পর্য্যন্ত কাশ্মীরে প্রবাদ এই যে, মহারাজ কার্ত্তিকের পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান বারামুলা নামকস্থানে পর্ব্বতশ্রেণী কাটিয়া

দিলে ঝিলাম নদীর উৎপত্তি হয় এবং কাশ্মীর হ্রদটী কাশ্মীর ভূভাগে পরিণত হয়। সেই কাশ্মীর হ্রদেরই অংশবিশেষ এখনও উলার হ্রদ বিদ্যমান ইত্যাদি। তদ্রূপ হরিদ্বার দেখিলেও বেশ বোধ হয় শিবালীক শৈলশ্রেণী কাটিয়া দেওয়ায় গঙ্গা সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমের পর্ব্বত ও চণ্ডীর পাহাড়ের মধ্যস্থলটী বোধ হয় কাটা হয়। সম্ভবতঃ মহারাজ ভগীরথ এই কার্য্য সমাধা করেন। তৎপরে এই সময়ই মহর্ষি অগস্ত্যের দক্ষিণ ভারতে গমন, এবং পরিশেষে রামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয় প্রভৃতি উপলক্ষে দক্ষিণ ভারতের মানব বসতির বিস্তার সাধিত হয়। এইরূপে এই সময় ভারতে জড়বিজ্ঞান ও পূর্ত্ত-বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয়---ইহাও বুঝিতে পারা যায়।

তবে এই সকল জড়বিজ্ঞান আজকালকার মত নাস্তিকতার মধ্য দিয়া লব্ধ নহে। এ সকলই ভগবানের উপাসনা ও তপস্যার দ্বারা লব্ধ হইত। আজকাল যেমন পণ্ডিতগণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া একমনে পরীক্ষাগারে ধ্যানমগ্ন থাকিয়া প্রকৃতিরাজ্যের নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া থাকেন—এ সময় কিন্তু সেরূপ করা হইত না। এ সময়ে জড়বিজ্ঞানের জন্যও ভগবানের উপাসনা ধ্যান ধারণা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হইত আর তাহার ফলে দেবতার বরে যে বুদ্ধির বিকাশ হইত সেই বুদ্ধির দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। আজকালকার চেষ্টা আর সেকালের চেষ্টার মধ্যে ইহাই প্রভেদ। সেকালের চেষ্টা আস্তিক চেষ্টা, আর একালের চেষ্টা নাস্তিক চেষ্টা। কেবল তাহাই নহে, আজকাল আমরা এতই স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছি যে, একালের এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণকে ঋষি নামে অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। অধিক কি, কেহ কেহ বলিয়াই থাকেন যে, অলঙ্ঘনীয় ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে আমরা সেকালের ঋষিগণ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে জ্ঞানী হইয়াছি---ইত্যাদি।

ত্রেতাযুগের উপসংহার

যাহা হউক, ১২৯৬০০০ বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসরের ত্রেতাযুগে বহু ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। এ সময় রাবণের ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্য দেখিলে বুঝা যায়, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি যথেষ্ট মাত্রায় উঠিয়াছিল। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল। প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিবার কালে এসব কথা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এক্ষণে দেখা যাউক, দ্বাপরযুগের অবস্থা কিরূপ ?

দ্বাপরযুগ

। পরযুগের পরিমাণ ও রাজবংশ

ত্রেতাযুগের অবসানে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি শুক্রবার দ্বাপরযুগের আরম্ভ হয়। ইহার পরিমাণ ৮৬৪০০০ আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর। এ সময় পাপ ও পুণ্য সমান সমান ছিল। ত্রেতাযুগের যেমন তিন পাদ পুণ্য এক পাদ পাপ ছিল, এ যুগে কিন্তু দুই পাদ পাপ এবং দুই পাদ পুণ্য হইল, অর্থাৎ ত্রেতা-যুগ হইতে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল।

দ্বাপরের প্রকৃতি

এই পাপের মাত্রা বৃদ্ধির তাৎপর্য্য এই যে, সত্যযুগে লোকের ভোগের দিকে লক্ষ্য ছিল না। যাহাদের ভোগের দিকে লক্ষ্য ছিল, তাহাদিগকে অসুর বলিয়া অভিহিত করা হইত—যেমন শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি। এই অসুরগণ মানববিশেষ হইলেও এই যুগে ধর্ম্মাধিক্যবশতঃ অসুরদিগকে অনেকটা পৃথক্ শ্রেণীর মানব মধ্যেই পরিগণিত করা হইত। ত্রেতাযুগে সাধারণ মানবেরই মধ্যে ভোগের দিকে লক্ষ্য একটু অধিক হইয়া উঠে। আর তাহার ফলে জড়বিজ্ঞানের বিকাশ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। আর তাহার পরিণামে ভোগ ও ভোগা-

সক্তি উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর ভোগাসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যে স্বার্থপরতা এবং লোভাদি হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই জন্য সত্যযুগ হইতে এই যুগে পাপের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ দ্বাপরে সেই ভোগ ও ভোগাসক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর তাহার ফলে পাপ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ কলিযুগে এই জড়বিজ্ঞান এবং ভোগাসক্তি আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সময় তিন পাদ পাপ এবং এক পাদ পুণ্য বলা হয়। সুতরাং জড়-বিজ্ঞানাদির উন্নতি আর পাপ প্রবৃত্তি ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহচরী। ত্যাগে ধর্ম্ম বা ভোগে পাপ এই বিষয়টীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া সত্য হইতে ত্রেতা, ত্রেতা হইতে দ্বাপর এবং দ্বাপর হইতে কলিযুগে পাপের মাত্রা অধিক বলা হইয়া থাকে। আমরা আজকাল জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যেন পাগল হইয়া ছুটিয়াছি, কিন্তু ঋষিগণের দৃষ্টি অন্যরূপ ছিল। তাঁহারা ত্যাগকেই সুখের পথ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আর বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে নানা কৌশলে এই ত্যাগের পথে আনিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এই দ্বাপরযুগের মানবের পাপ পুণ্যের প্রবৃত্তি সমান সমান হইল। ে সময় মানবগণ ২০০ দুই শত বৎসর জীবিত থাকিত দেহ সাত হস্ত পরিমিত হইত। প্রাণ রুধিরগত ছিল যজুর্ব্বেদ প্রধান অবলম্বন ছিল অর্থাৎ যজুর্ব্বেদ অনুসারে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রধানতঃ হইত। কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ হয়। লোক সকল তাম্রপাত্র ব্যবহার করিত।

দ্বাপরে রাজগণ

ভগবান্ এ সময় শ্রীকৃষ্ণ বলরামরূপে অবতীর্ণ হয়েন। এ সময়ের রাজগণের মধ্যে প্রধান শাম্ব, বিরাট, হংসধ্বজ, কংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বভ্রুবাহন, রুক্মাঙ্গদ, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, বিষ্কসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন, কংস প্রভৃতি। পুরাণ মধ্যে এই সব রাজার এবং অপরাপর রাজগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে এবং তাহা হইতে শিক্ষণীয় বিষয়ও বহুই আছে হিন্দুর জন্য যদি ভারতের ইতিহাস রচনা করা আবশ্যক হয়, তবে এই সকল রাজচরিত্র হইতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিয়া প্রদর্শন করা আবশ্যক।

তাহার পর এই যুগে চন্দ্রবংশের প্রাধান্য হয়। ত্রেতাযুগে যেমন সূর্য্যবংশের প্রাধান্য ছিল, এযুগে কিন্তু সূর্য্যবংশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং চন্দ্রবংশেরই প্রাধান্য ঘটে। এই বংশের কুরুপাণ্ডব, কৃষ্ণ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। এই যুগেই ম্লেচ্ছগণের উৎপত্তি। এই যুগেই হুন্, চীন, তাতার, পারস্য প্রভৃতি ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বেদও ব্রাহ্মণহীন হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। যযাতি রাজার অতৃপ্ত ভোগ বাসনার ফলে ভারতেও এই ম্লেচ্ছগণের আবির্ভাব হয়। তিনি যোগবলে অপরের যৌবন গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর তাহার ফলে পুত্রগণকে একে একে ডাকিয়া তাহাদের যৌবন প্রার্থনা করেন। কিন্তু এক পুত্র ব্যতীত সকলেই ইহাতে অস্বীকৃত হন, আর তাহাতে যযাতি তাহাদিগকে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির অভিসম্পাত প্রদান করেন। এই বৃত্তান্ত মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। হিন্দুর জন্য ভারতেতিহাসে এ সকল বিষয় পরিস্ফুট থাকা উচিত।

কুরুক্ষেত্র মহাসমর

এই দ্বাপরের শেষে কুরুক্ষেত্র মহাসমর হয়। এই সময়ে ভারতের ক্ষাত্রিয়শক্তি চিরতরে অস্তমিত হয়। আর তাহার ফলে অচিরে ভারত ম্লেচ্ছগণের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয়। কুরুক্ষেত্র সমর পর্য্যন্ত বীরগণ মন্ত্রপূত বাণ প্রয়োগে পটু ছিলেন। মন্ত্রপূত বাণের অভাবনীয় শক্তির নিকট জড়বিজ্ঞান বলদৃপ্ত ম্লেচ্ছগণের

অস্ত্রশস্ত্র সর্ব্বদাই বিফল হইত। আর তাহার ফলে ভারত স্বাধীন ছিল এবং ভারতীয় রাজগণ মধ্যে মধ্যে অপর দেশ দিগ্বিজয় ছলে জয় করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রিয় ধ্বংসের পর হইতে এই মন্ত্রপূত বাণযুদ্ধের বিদ্যা বিলুপ্ত হইল। ভারতের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে পরিণতির সূচনা হইল।

ত্রেতা ও দ্বাপরের ধর্ম্মভাবের তুলনা

বাস্তবিকপক্ষে ত্রেতাযুগের ধর্ম্মভাব ও দ্বাপরযুগের ধর্ম্মভাব তুলনা করিয়া দেখিবার জিনিষ। এ সময় ভোগলালসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি এত বৰ্দ্ধিত হইয়া ছিল যে, সহজ বুদ্ধিতেই তাহা বুঝা যায়। মহাভারতে ইহার চিত্র অতি পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। উপাসনা, ধ্যানধারণা, যোগযাগাদির অনুষ্ঠান থাকিলেও ভোগলালসাদি খুবই প্রবল ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়।

বেদ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা

তাহার পর দ্বাপরের শেষে বেদবিদ্যারও দুর্দ্দশা কম হয় নাই। এ সময় যজ্ঞকালে পুরোহিতগণের নিজ পাঠ্য বেদভাগ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। আর তাহার ফলে পৃথক্ পৃথক্ পুরোহিতগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইত না। আর তাহার পরিণামে যাগ-যজ্ঞাদির ফলও পূর্ণমাত্রায় লব্ধ হইত না। ধর্ম্মের মূল বেদের এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান নারায়ণ বেদব্যাস-রূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ বিভাগ করিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞকালীন বিভিন্ন পুরোহিতগণের পাঠ্য বেদ ভাগের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কেবল তাহাই নহে, বহু শিষ্য করিয়া এক এক শিষ্যকে এক এক শাখা শিক্ষা দিয়া বেদবিদ্যার বিস্তার সাধন করিলেন। এই সময় বেদ-ব্যাস এ কার্য্য না করিলে আজ অধিকাংশ বিলুপ্ত বেদের বর্ত্তমান আকারও দেখিতে পাওয়া যাইত না।

বেদব্যাসের মহত্ত্ব

অবশ্য বেদব্যাস কেবল যে বেদ রক্ষা করিলেন তাহা নহে। তিনি সাধারণ লোকশিক্ষার জন্যও যথেষ্ট মনোনিবেশ করিলেন। স্ত্রীশূদ্রগণের বা অল্পবুদ্ধি দ্বিজগণের জন্য ইতিহাস ও পুরাণাদি রচনা করিয়া বেদবিদ্যার সার মর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিলেন। জন্মশুদ্ধি না থাকিলে শাস্ত্রীয় সংস্কার প্রভৃতির অনুষ্ঠান না হইলে বেদবিদ্যা ফলবতী হয় না, এজন্য ইতিহাস পুরাণ দ্বারা কতক পরিমাণে সেই অভাবমোচনের চেষ্টা হইল। ফলতঃ মহর্ষি বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্য-গণ, বেদবিদ্যা যথাযোগ্য অধিকারে যথাবিধি প্রচারে যেরূপ প্রয়াস করেন, তাহারই ফলে আজও ভারতবাসী জগতে পূজনীয় ও মাননীয় হইয়া রহিয়াছেন, আজও ভারতবাসী ধর্ম্ম বিষয়ে জগতের গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

এই বেদব্যাসই বেদের শেষ ভাগ বেদান্ত বা বেদের উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত আছে, তাহা প্রচার করিবার জন্য বেদান্ত, দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র নামক গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মুনি বেদের প্রথম ভাগ কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রম বিষয়ক যে সংশয় ও ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল তাহার মীমাংসা করিয়া পূর্ব্ব মীমাংসা বা কর্ম্ম মীমাংসা নামক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিলেন। অপরাপর শিষ্যগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হইয়া বেদব্যাসের পুরাণ কথা প্রচার দ্বারা লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি অপর দার্শনিক সম্প্রদায়ও এসময় নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের প্রচারে ও সংস্কারে বদ্ধপরিকর হন। এইরূপ মহর্ষি বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্যগণ মানবসমাজে ধর্ম্ম

শিক্ষার জন্য যথাসম্ভব প্রযত্ন করিলেন। কিন্তু কালের গতি অলঙ্ঘনীয়, উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অতএব এসময় মহর্ষিগণের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কলির প্রভাব অন্তরাল হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

জীব-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ]

জীব-বিজ্ঞান—যে শাস্ত্র পাঠ করিলে জীব সকলের বিষয় ভাল করিয়া জানা যায়, তাহাকে জীব-বিজ্ঞান বলে।

আমরা যে সকল জিনিষ দেখিতে পাই তাহাদিগকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—**চেতন** বা **সজীব** এবং **অচেতন** বা **নির্জীব** পদার্থ। যে সব জিনিষের চেতন বা জীবন আছে, তাহাদিগকে চেতন বা সজীব পদার্থ বলা হয়; আর যাহাদের তাহা নাই তাহারা অচেতন বা নির্জীব পদার্থ। আমরা যত প্রাণী ও উদ্ভিদ্ অর্থাৎ গাছপালা দেখিতে পাই, তাহারা চেতন বা সজীব পদার্থ; এ ছাড়া যে সকল জিনিষ আছে, যেমন—মাটি, পাহাড়, খনিজদ্রব্যাদি, তাহারা অচেতন বা নির্জীব পদার্থ।

কেন আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সকলকে চেতন বা বা সজীব পদার্থ এবং অন্যান্য জিনিষকে অচেতন বা নির্জীব পদার্থ বলি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে আমাদের সজীব পদার্থের প্রকৃতি অর্থাৎ তাহার কি কি গুণ আছে তাহা আমাদের জানিতে হইবে, কারণ ঐ সকল গুণ অচেতন পদার্থে থাকে না।

প্রথমতঃ, **সজীব পদার্থের আকৃতি ও গঠন** আমরা যে সব প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকের আকার এক এক রকম; কেবল তাহাই নহে, তাহাদের একটা গঠন আছে। প্রাণীদের হাত, পা, মাথা প্রভৃতি নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, গাছের গুঁড়ি, ডাল, পাতা, ফুল ও ফল দেখা যায়। এই রকম দেহ কোনও নির্জীব পদার্থে দেখা যায় না। তাহার উপর, সব সজীব পদার্থের দেহ এক প্রকার পদার্থে গঠিত; ইহাকে জীববস্তু (protoplasm) বলা হয়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এই পদার্থ দেখিতে পাই। ইহার ভৌতিক প্রকৃতি, অর্থাৎ যাহা সাদাসিদাভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং রাসায়নিক প্রকৃতি, অর্থাৎ ইহা কি কি মৌলিক পদার্থে গঠিত এবং কি ভাবে সেগুলি ইহাতে থাকে, তাহা আমাদের জানা থাকিলেও ইহার প্রকৃত গঠন আমাদের জানা নাই। জীববস্তু সম্বন্ধে আমরা পরে ভাল করিয়া আলোচনা করিব। এই জীববস্তু অতি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হইয়া জীব সকলের দেহ নির্ম্মাণ করে। ঐ এক একটি অংশের নাম কোষ (Cell)। ভিন্ন ভিন্ন জীবগণের দেহে এক হইতে বহু বহু কোষ একত্র থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, **সজীব পদার্থের খাদ্যগ্রহণ, দেহবর্দ্ধন এবং চেষ্টা ও অন্যান্য কার্য্যশীলতা**—জীবগণ কতকগুলি জিনিষ দেহের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়, সেইগুলিকে খাদ্য বা খাবার বলা হয়। এই সকল খাবারের দেহের সহিত কোনই মিল নাই—তাহারা দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণের খাবার লওয়া এক রকম নয়, সে বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। জীবগণ যে খাবার খায় তাহা দেহের ভিতর যাইয়া নানারকমে বদলাইয়া গিয়া জীববস্তুতে পরিণত হয়; তাহার ফলে দেহের আয়তন বাড়িতে থাকে। আমরা সকলেই জানি, ছোট একটি প্রাণী এবং ছোট একটি গাছ কেমন আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকে। তা'ছাড়া ঐ খাবারের জন্য ও জীববস্তুর প্রকৃতির জন্য আমরা জীবগণের দেহে নানারকম গতি দেখি, ইহাকেই ভাল কথায় চেষ্টা বলা হয়। আবার প্রাণিগণকে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখি। যদিও অধিকাংশ গাছকে আমরা ঐ রকম বেড়াইতে দেখি না, তবুও আমরা পরে জানিতে পারিব যে, তাহাদেরও দেহের ভিতর নানারকম চলাফেরা আছে। এই সকল চলাফেরা এবং আরও অন্যান্য দেহের কাজের শক্তির দরকার। এই শক্তি প্রধানতঃ জীববস্তু হইতেই আইসে এবং এই শক্তি জন্মাইতে জীববস্তুর যে অংশ ক্ষয় বা নষ্ট হয়, তাহা খাবারের দ্বারা পূরণ হয়।

জীববস্তু হইতে কি রকমে শক্তি আসে, তাহার বিষয় কিছু বলা দরকার। তাহা বুঝিতে হইলে শক্তি সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। অবশ্য যে জোরের দ্বারা কোন কাজ করা যায়, তাহাই শক্তি (energy)। শক্তি কিন্তু দুই ভাবে থাকে—ব্যক্ত শক্তি এবং অব্যক্ত শক্তি। যে শক্তির কার্য্য দেখা যায়, তাহাই ব্যক্ত শক্তি (Kinetic energy) এবং যে শক্তি কিছু কাজ করে না,—চুপ করিয়া লুকাইয়া থাকে, তাহাকে অব্যক্ত শক্তি (Potential energy) বলা হয়। এক রকম শক্তি অন্য রকম শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। যৌগিক পদার্থে (অর্থাৎ যে পদার্থ দুই বা বেশী মৌলিক পদার্থে গঠিত) শক্তি লুকাইয়া থাকে; বলা যাইতে পারে যে, ঐ শক্তি যেন মৌলিক পদার্থগুলিকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যখন ঐ যৌগিক পদার্থটা ভাঙ্গিয়া যায় এবং মৌলিক পদার্থগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে, তখন ঐ শক্তিও ছাড়ান পাইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এখন দেখা যা'ক, জীববস্তু হইতে কি রকমে শক্তি আসে। জীববস্তু একটি যৌগিক পদার্থ, বহু পদার্থে গঠিত। জীববস্তু বায়ু হইতে অম্লজান লইয়া নিজের দেহ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ঐ সঙ্গে কতকটা শক্তি ছাড়িয়া দেয়। ঐ শক্তি দ্বারা দেহের নানা কাজ সম্পাদিত হয়। জীববস্তু নিজের দেহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সঙ্গে দেহ হইতে অঙ্গারাম্ল বায়ু এবং জলীয় বাষ্পও ছাড়িয়া দেয়। মোট কথা, জীববস্তু বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করে এবং নিজের দেহ হইতে অঙ্গারাম্ল বায়ু (Carbon dioxide) এবং জলীয় বাষ্প বাহির করিয়া দেয়। এই কাজে দরকার মত শক্তিও ছাড়িয়া দেয়। এই কাজের নাম শ্বাসক্রিয়া (Respiration)। প্রত্যেক জীবই বায়ুর সহিত অম্লজান গ্রহণ করে, ইহাকে প্রশ্বাস লওয়া বলে; আবার বায়ুর সঙ্গে প্রায় সেই পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বায়ু ও জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে, ইহাকে নিঃশ্বাস বলে। এই কার্য্যে জীববস্তু দেহের যে ক্ষয় হয়, তাহা খাদ্য দ্বারা পূরণ করা হয়। সুতরাং দেখা গেল যে, শ্বাসক্রিয়া একটি বিশ্লেষণ ক্রিয়া, কারণ ইহার দ্বারা জীববস্তুর দেহ ভাঙ্গিয়া যায় এবং খাদ্য গ্রহণ দ্বারা তাহা পূর্ণ হয়।

এই রকমে যখন জীববস্তুর দেহ ভাঙ্গিয়া নূতন

পদার্থ সকল দেখা দেয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শরীরের পক্ষে ক্ষতি করে এবং সে কারণ সেইগুলি শরীর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া দরকার হয়; সেও একটা দেহের বড় কাজ এবং তাহাকে প্রস্রাব ক্রিয়া বলা হয়। এই সকল জিনিষ সোরাজানযুক্ত। আমাদের মূত্রে এই পদার্থগুলি থাকে। সমুদয় প্রাণীর এই কাজ দরকার, কিন্তু উদ্ভিদ্‌গণের জীবনধারণ কিছু অন্য রকম বলিয়া তাহাদের এই প্রস্রাব ক্রিয়া দরকার হয় না। এ বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। দেহ মধ্যে ক্ষয় ও পূরণ এই যে দুই কাজ ক্রমাগত চলিতেছে, তাহাকে গঠন-ভঞ্জন বা পরিণাম ক্রিয়া (Metabolism) বলা হয়।

জীবদেহের ব্যক্ত শক্তির কাজ দুই রকমের—কতকগুলি আপনা আপনিই দেহ হইতে জন্মায় তাহাদিগকে স্বতঃজাত ক্রিয়া (Automatic action) বলে, আর অধিকাংশ ক্রিয়াই বাহিরের কোন উত্তেজনায় ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রতিক্রিয়া (Reflex action) বলা হয়। স্বতঃজাত ক্রিয়া বলিয়া কোন ক্রিয়া আছে কি না, তাহাতে কিছু সন্দেহ আছে। প্রতিক্রিয়া জীববস্তুর একটি প্রধান ধর্ম্ম এবং হয়ত সকল কাজই এই রকমের। আমরা জীবদেহের ব্যক্ত শক্তির কাজ চলা রূপেই দেখিতে পাই। জীববস্তুর যে ধর্ম্মে ইহা কোন উত্তেজনা পাইলে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহাকে উত্তেজনাপ্রবণতা (Irritability) বলে। ইহার বহু উদাহরণ দেওয়া যায়,—খাবার দেখিলে মুখে জল আসা, ধুলা পড়িলে চোকের পাতা পড়িয়া চোক বন্ধ হওয়া, গায় চিমটি কাটিলে গা সরাইয়া লওয়া ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, **জীববস্তুর ক্রিয়া ও বিশ্রামের পর্য্যায়**—যদি আমরা জীববস্তুর দেহের কাজগুলি ভাল করিয়া দেখি, আমরা জানিতে পারিব যে, জীববস্তু উল্টে পাল্টে কাজ করিতেছে এবং বিশ্রাম লইতেছে। ইহার কারণ, যে কাজ করিতে যা ক্ষয় হয়, বিশ্রামের সময় তাহার পূরণ হয়। খাদ্যগ্রহণ, শ্বাসগ্রহণ, হৃদয়ের স্পন্দন, জাগরণ, নিদ্রা প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

চতুর্থতঃ, **জননক্রিয়া অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন**—জীববস্তু মাঝে মাঝে নিজ দেহ হইতে একটু খণ্ড পৃথক্ করিয়া দেয়। ঐ টুক্‌রাটি ক্রমে বড় হইয়া একটি স্বতন্ত্র জীববস্তুতে পরিণত হয়। এইরূপে এক জীববস্তুর বহু সন্তানসন্ততি জন্মিয়া থাকে। আমরা পরে দেখিব যে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ হইতে এইরূপে একটু টুক্‌রা পৃথক্ হইয়া একটি প্রাণী বা উদ্ভিদে পরিণত হয়। উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদের সন্তান উৎপাদন একটু অন্য রকম। দুইজনের দেহ হইতে দুইটি কোষ পৃথক্ হইয়া মিলিত হয় এবং ঐ মিলিত কোষ হইতে একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চমতঃ, **বার্দ্ধক্য প্রাপ্তি**—জীববস্তু কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবার পর বুড়া হইয়া মরিয়া যায়; তখন তাহার দেহ নষ্ট হইয়া তাহার আর কিছু অস্তিত্ব থাকে না।

এ ছাড়া জীববস্তু জল ও পরিমিত উত্তাপ ভিন্ন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

আমরা সজীব পদার্থের যে সব প্রকৃতি উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহার কোনটীই নির্জীব পদার্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাথর দিয়াই পাথরের পরিমাণ বাড়ান যায়, অন্য কোন পদার্থ দিয়া পাথরকে বড় করা যায় না। খাদ্যগ্রহণ ও দেহবৃদ্ধি এ সব নির্জীব পদার্থে দেখা যায় না।

(ক্রমশঃ)
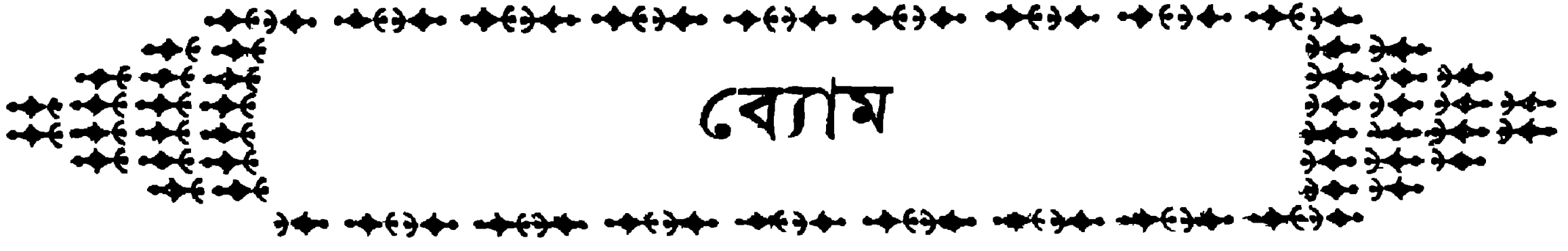
ব্যোম

[শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী]

(১)

কেহ বলে, কক্ষে তব
ঘুরিছে সতত
জ্যোতির্ম্ময়, সংখ্যাহীন
গ্রহ আদি যত।
তারা নাকি একে অন্যে
রেখেছে টানিয়া
কেন্দ্রীভূত মিলনের
আকর্ষণ দিয়া।
তুমি শুধু আবরণে
আছ ঢেকে সবে
মুছে যায় তারা যদি
তুমি তবু রবে।

(২)

আবার এদিকে শুনি
পঞ্চভূত মাঝে
সবার উপরে তব
আসন বিরাজে।
ব্রহ্ম যবে সৃষ্টিরূপে
হ'লেন প্রকাশ,
তুমি তাঁর গতি পথে
প্রথম বিকাশ।
প্রণবের ধ্বনি বেজে
তোমার মাঝেতে
এনেছে অনন্ত বিশ্ব
রূপের সাজেতে।
মরুৎ তোমার গায়
লেগে আছে, তাই
তেজ, জল, মাটিরূপে
ক্রমে দেখা পাই।

(৩)

কত আশা কত ভাব
মিলিছে নিয়ত
অন্তহীন তব বুকে
নিত্য, অবিরত।
মেঘরাশি কতবার
চেয়েছে তোমার
ঢাকিতে সুনীল মুখ
ঘটা দিয়ে তার।
পারেনি কখন কেহ
ক্ষণিকের তরে
নিভাতে আলোক রেখা
তব চক্ষু পরে।
কালের সমান তুমি
রয়েছ ব্যাপিয়া
"আছে", "নেই" উভয়ের
সীমাটি ঘেরিয়া।

স্বাস্থ্যকর বাসস্থান

[শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়]

বাসগৃহের জন্য ভূমি নির্ব্বাচন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। ভূমিটি ঈষৎ ঢালু এবং সমান তলবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে গর্ত্ত থাকিবে না।

২। ভূমিটি একদিকে ঢালু হইলেই ভাল হয়, এবং যাহাতে সহজে জল নিকাশ হইতে পারে এরূপ ঢালু হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩। মৃত্তিকাস্তরের জল শোষণের ক্ষমতা কিরূপ আছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ঢিলা কঙ্করময় জমিতে সত্বর জল শোষিত হয়। দোআঁশ মাটি গৃহনির্ম্মাণের বেশ উপযোগী। কর্দ্দমস্তরের উপর পাতলা বালুকা বা কঙ্করের স্তর থাকিলে তাহা গৃহনির্ম্মাণের বিশেষ অনুপযোগী; কারণ, ঐ কর্দ্দমস্তরের জল শোষণক্ষমতা না থাকায় জমি সর্ব্বদাই ভিজা ও সেঁৎসেতে থাকিবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ পলি মাটির উপর গৃহনির্ম্মাণেও এই অসুবিধা বর্ত্তমান থাকে; ভরাট মাটির উপর গৃহ নির্ম্মিত হইলে পিচ্ অথবা জল অবরোধক অন্য কোনও পদার্থের একটি স্তর তাহার উপর বিছাইয়া দেওয়া ভাল যাহাতে জল নিম্নস্থ মাটিতে না বসে এবং সহজে নিষ্কাশিত হইতে পারে।

৪। সমুদ্র হইতে যে বায়ুপ্রবাহ পৃথিবীর স্থলভাগের অভিমুখে সঞ্চারিত হয়, বাসগৃহের মুখ সেই প্রবাহের অভিমুখী করিতে হইবে। বাংলা দেশে এই জন্য দক্ষিণদ্বারী গৃহ নির্ম্মাণই স্বাস্থ্যকর।

৫। সমস্ত গৃহটি যাহাতে খররৌদ্রে তপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং যথেষ্ট ছায়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। যথেষ্ট মুক্ত বায়ুসঞ্চালন যেরূপ গৃহের পক্ষে হিতকর, অতিরিক্ত ঝটিকা-প্রবাহ হইতে গৃহটিকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

৭। গৃহের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাদি থাকিলে গৃহটি ঠাণ্ডা থাকে। পক্ষান্তরে, বাসগৃহের অতি সন্নিকটে বৃক্ষাদি থাকিলে গৃহ সেঁৎসেতে হইবার এবং আলো ও বাতাসের অবরোধ হইবার সম্ভাবনা। কোনও বৃক্ষের ডাল গৃহের ৬।৭ হাতের মধ্যে যাহাতে না থাকে এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার।

৮। ভূগর্ভস্থ জলের সংস্থান যদি অগভীর হয়, তাহা হইলে ভূমির অভ্যন্তরে জল নিকাশের প্রণালী নির্ম্মাণ আবশ্যক হইতে পারে। এই জলের সংস্থান অন্ততঃ জমির উপরিভাগ হইতে ৬½ হাত নীচে হওয়া দরকার।

৯। বাসগৃহের ভূমি গোশালা, অশ্বশালা, ধানক্ষেত ও জলাভূমি হইতে দূরে অবস্থিত হইবে।

১০। ভূমির সর্ব্বোচ্চস্তর অথবা তাহার নিম্নস্তর যেন বিষ্ঠা মূত্রাদি দ্বারা অথবা কোন অস্বাস্থ্যকর পঙ্কিল জলস্রোতের দ্বারা কলুষিত না হয়।

১১। উত্তম বাসগৃহ ঘন বসতি, বাজার অথবা ভৃত্যগণের আবাসস্থল হইতে দূরে অবস্থিত হইবে।

১২। ভূমির উপরিস্তরের জল নিকাশের ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট হইবে।

১৩। ভূতলসঞ্চারী জলের উপরিতলের একটা স্থায়িত্ব থাকা দরকার যেন ঋতুভেদে উহার হ্রাস বৃদ্ধি না হয়। ঐ তল ভূতল হইতে ৬½ হাত নিম্নে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৪। কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলে বাসগৃহের উচ্চতার জন্য যাহাতে জল সরবরাহের ব্যাঘাত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নতুবা জল সরবরাহের জন্য জল উত্তোলন (পাম্প) যন্ত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৫। বাসগৃহের পোতা প্রায় ১¾ পৌনে দুই হাত হইতে দুই হাত উচ্চ হইবে।

খনার বচন অনুসারে বাটীর দক্ষিণ দিক্ খোলা রাখিবে অথবা দক্ষিণে ফুলবাগান করিবে। পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী খনন করিবে। পশ্চিমদিকে বাঁশবাগান রাখিবে এবং উত্তরে ফলের বাগান রাখিবে।

প্রত্যেকটি ঘরের মধ্যে যথেষ্ট স্থান থাকার দরকার। প্রহরী অথবা সৈনিকের জন্য নির্ম্মিত গৃহে জনপ্রতি ৬০০ শত ঘন ফুট বাতাস দরকার। সাধারণ দরিদ্রের জন্য সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে জনপ্রতি ৩০০ শত ঘন ফুট বায়ুর আবশ্যক। পক্ষান্তরে, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ৮০০ শত হইতে ১২০০ ঘন ফুট বায়ুর আবশ্যক।

সংক্রামক রোগের হাসপাতালে জনপ্রতি ১৪০০ হইতে ২০০০ ঘন ফুট বায়ু আবশ্যক।

যাত্রীনিবাসের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক জনপ্রতি ৩০০ শত ঘন ফুট এবং দশ বৎসরের কম বয়স্কগণের জনপ্রতি ১৫০ বর্গ ফুট বায়ুর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বাসস্থানযুক্ত পাঠশালাগুলিতে ছাত্রপ্রতি অন্ততঃ ৩৬০ ঘন ফুট বায়ুর ব্যবস্থা করা উচিত।

এই বায়ুর পরিমাপ মেঝে হইতে মাত্র ১২ ফুট উচ্চ খাটাল (সিলিং) পর্য্যন্তই ধরিতে হইবে। তাহার অধিক উচ্চ স্তরের বায়ু বিশেষ কোনও উপকারে আসে না, কারণ কূপের উপরিভাগে বহুদূর বিস্তৃত বায়ুস্তর থাকা সত্ত্বেও কূপপ্রবিষ্ট ব্যক্তির বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে।

জনপ্রতি যত ঘন ফুট বায়ু নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহাকে ১২ দিয়া হরণ করিলে জনপ্রতি কতটা মেঝে আবশ্যক তাহার পরিমাণ বাহির হইবে

স্কুলের ঘর নির্ব্বাচনে ছাত্রপ্রতি অন্ততঃ ৬ বর্গ ফুট মেঝের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মেঝে হইতে খাটাল পর্য্যন্ত ঘরটি ১২ ফুট উচ্চ হইবে এবং কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ-ফলক হইতে শ্রেণীর দৈর্ঘ্য ২০ হাতের বেশী হইবে না। স্কুলের বাতায়নগুলি মেঝের ভূমি পরিমাণের পঞ্চমাংশ হইবে এবং সাধারণ গৃহের বাতায়নগুলি মেঝের ষষ্ঠ বা সপ্তমাংশ হইলেও চলিতে পারে।

[এই প্রবন্ধটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র প্রামাণিক কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'সাবর্ডিনেট্ ইঞ্জিনীয়ার্স্ কম্পেনিয়ন্' নামক হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে লিখিত।]

জলসেচন প্রণালী

[রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বঙ্গদেশে জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় ধান্যের চাষ প্রথা প্রসিদ্ধ। ঐরূপ ধান্যের চাষ কোন কোন স্থানে উক্ত নদী হইতে বানের জলসেচন ব্যতীত সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে জমিগুলি বানের জল না পাওয়াতে অনুর্ব্বর হইয়া যায় এবং ম্যালেরিয়া বন্ধ করিতে পারে না, বরঞ্চ ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি করিতে পারে। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ধান্যগুলি বৃষ্টির জলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সময়েই প্রায় নদীগুলিতে বান আসিয়া থাকে এবং কখনও কখনও ঐ বানগুলি বহু উচ্চ হইয়া থাকে এবং কখনও কখনও নিম্ন হইয়া থাকে। যদি উক্ত বানগুলিকে নিজের ইচ্ছামত প্রবাহিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা কখনও কখনও নদীতীরস্থ বাঁধ ভাঙ্গিয়া জমিগুলিকে উৎসন্ন বা ধ্বংস করিতে পারে এবং কখনও কখনও ধান্য বৃষ্টির জলে মিশ্রিত হইয়া সারের কার্য্য করিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে এবং মশা, মাছি প্রভৃতি ম্যালেরিয়া-প্রবর্ত্তক কীটের অপকারিতা শক্তি হ্রাস করিয়া ম্যালেরিয়া নাশ করিতে পারে। আর তুমি যদি নদীর উভয় পার্শ্বে মজবুত বাঁধ বাঁধিয়া জমিতে জল প্রবেশের কোন ফাঁক না রাখিয়া বানের প্লাবনশক্তি হ্রাস করিয়া দেও, তবে তাহাতে কি ফল হইতে পারে ভাবিয়া দেখ।

তাহাতে প্রথমতঃ তোমার জমির উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস হইতে পারে, ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ হয়ত বানের জল ফাঁপিয়া বাঁধের উপর দিয়া বা বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল প্রবলবেগে জমির উপর প্রবাহিত হইয়া উহাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। শুধু যে এই দুইটী অনিষ্ট সাধন হয়, তাহা নহে। কারণ নদীতে ঐরূপ উচ্চ বান বাঁধ ভাঙ্গা পর্য্যন্ত বদ্ধ করিয়া রাখিলে নদীতে বহু পরিমাণে জল আবদ্ধ থাকায় শেষে প্রবল বন্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশের অনিষ্ট করিতে পারে। প্রাচীন বঙ্গের শাসনকর্ত্তারা কিরূপে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, কিরূপে ম্যালেরিয়া নাশ করা যাইতে পারে, কিরূপে নদীতে জল সঞ্চয় দ্বারা বান বৃদ্ধি হইয়া দেশের অনিষ্ট না হইতে পারে,—এই সকল বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন এবং যখন এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইত, তখনই তাহারা সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রতিকার সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন।

মিশরদেশে ও ব্যাবিলনে যখন পুরাতন জলসেচন প্রণালী বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, তখন মিশরদেশের লোক-সংখ্যা এক কোটী বিশ লক্ষ হইতে মাত্র বিশ লক্ষে পরিণত হইয়াছিল এবং যে সময় হইতে বান দ্বারা জল-সেচন প্রণালীর পুনরুদ্ধার হইয়াছে, সেই সময় হইতে তাহার লোকসংখ্যা এক্ষণে এক কোটী চল্লিশ লক্ষ হইয়াছে। ব্যাবিলনের দশাও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল

এবং এক্ষণে বানের জলে জলসেচনের পুনরুদ্ধার হওয়ায় লোক সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে বন্যার সময়েই জলসেচনের আবশ্যক হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার পুনরুদ্ধার সহজ, যদি ঠিক প্রণালী অবলম্বন করা যায়। প্রধান প্রতিবন্ধক এই যে, গত ৭০ বৎসর ধরিয়া যে ভুল প্রণালীতে বঙ্গদেশে জলসেচন হইয়া আসিতেছে সেই ভুল প্রণালী সংশোধন করিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করা, এবং সে প্রণালীর পুনরুদ্ধার করাও সহজ। আমরা জানি, কি প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমাদের সেই প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, যাহা প্রাচীন বঙ্গবাসীরা সকলেই অবগত ছিলেন।

প্রথম প্রণালী

আমাদিগকে নদী হইতে আড়ভাবে (দেশের যে স্বাভাবিক ঢালুভাবে জমি আছে, সেই দিকে) সোজা নূতন লম্বা খাল খনন করিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বানের জল চালাইয়া বৃষ্টির জলের সহিত মিশাইয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ম্যালেরিয়া নাশ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রণালী

ঐ সকল খাল এরূপ দূরে স্থাপিত করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত দেশ (ক) নদীর জলে প্লাবিত হইতে পারে, (খ) যাহাতে সমস্ত পুষ্করিণী নদীর জল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া তদ্দ্বারা আগাছা, শাক ও শেওলা প্রভৃতিকে নষ্ট করিতে পারে ও স্বাস্থ্যকর পানীয় জল সরবরাহ করিতে পারে, এবং (গ) যাহাতে দেশের ভূমির নিম্নস্থ জল সরবরাহের অভাব মোচন করিতে পারে।

তৃতীয় প্রণালী

ঐ সকল প্লাবিত খাল এরূপ চওড়া ও অগভীরভাবে নির্ম্মিত করিতে হইবে, যাহাতে নদীর উপরিস্থ ভাসমান পলি মাটিসংযুক্ত জল ঐ সকল খালে প্রবেশ করিতে পারে এবং নদীর নিম্নস্থ বালুমাটিসংযুক্ত জল নদীর নীচে রহিয়া যায়, অর্থাৎ খালে প্রবেশ করিতে না পারে।

চতুর্থ প্রণালী

আমাদের খালগুলি এরূপভাবে স্থাপিত করিতে হইবে যাহাতে খালের কাটামুখ দ্বারা নদী হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জল খালে প্রবেশ করাতে নদীতে বন্যার জল আবদ্ধ হইয়া নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশ ধ্বংস করিতে না পারে।

আমাদের জলসেচন প্রণালীর বিশেষ লক্ষণ এই হইবে যে, এতদ্দ্বারা আমরা লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচন করিব, কিন্তু তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির জলের সহিত নদীর জল মিশাইয়া তাহাতে এরূপ সার উৎপাদন করিব যাহাতে ধান্য গাছগুলির মূল শক্ত হইয়া যাইবে, যদিও প্রধান জলসেচন বৃষ্টির জলে হইবে।

বঙ্গদেশে বর্ষা কখনই বিফল হয় না। যদিও কখনও কখনও ইহা অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়, তথাপি একেবারে বর্ষা বন্ধ হয় না। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কেবল বৃষ্টির জলে ধান্য রোপণ করিলে তাহাদের মূল দুর্ব্বল হইয়া থাকে এবং আশ্বিন মাসে জল না পাইলে মরিয়া যায়; সুতরাং সে সময়ে নদী হইতে বহু ব্যয়ে জলসেচন প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধান্য বাঁচাইতে হয়। কিন্তু শরৎকালে নদীর জল প্রায়ই পরিষ্কার হইয়া থাকে, বিশেষতঃ শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আশ্বিন মাসের জলে কিছুমাত্র ময়লা বা পলি মাটি না থাকায় ঐরূপ জলসেচন দ্বারা জমিতে সারের কোন কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং জমিতে ধান্যের পরিমাণ কম হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তুমি আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের প্রথমে নদীর জল ও বৃষ্টির জল মিশাইয়া

ধান্য রোপণ ও জলসেচন করিতে পার—যখন নদীর জলে বহুল পরিমাণে পলি মাটি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তোমার ধান্যের গোড়াগুলি এরূপ শক্ত হইয়া যাইবে যে, শ্রাবণ মাসের শেষ বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলেও তোমার ধান্য কখনই মরিয়া যাইবে না এবং আশ্বিন মাসে কোনরূপ সামান্য জলসেচন করিতে পারিলেই ধান্যের পরিমাণ কম হইবে না। নদীর জল বর্ষার প্রারম্ভে স্বর্ণতুল্য জানিবে। ইহাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ম্যালেরিয়া নাশ করিবে এবং তোমার ধান্যগুলির শ্রাবণ মাসে বর্ষা বন্ধ হইলেও এবং আশ্বিন মাসে জল না পাইলেও বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবে না। শ্রাবণ মাসে বর্ষা বন্ধ হইলে, আশ্বিন মাসের অর্থাৎ শরৎকালের নদীর পরিষ্কার জলে হয়ত দেশের সমস্ত জমিতে জলসেচন করিতে পারিবে না, জমিগুলির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিবে না এবং ম্যালেরিয়া নাশ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ শরৎকালের নদীর জলের সহিত বর্ষার প্রারম্ভে নদীতে পলিসংযুক্ত বন্যার জলের সহিত তুলনাই হইতে পারে না।

এইরূপ জলসেচন প্রণালীর আর এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, এইরূপ বন্যার জলপ্লাবিত জলসেচন প্রণালীর দ্বারা খালগুলি যথার্থই জলসেচন 'কেনাল'রূপে পরিণত হইলে খালের মুখের উভয় পার্শ্বস্থ জমি উচ্চ থাকিবে এবং পুচ্ছস্থ বা নিম্নস্থ জমি নীচু থাকায় দেশের বৃষ্টির জল ও জমির জলসেচনের উদ্বৃত্ত জল ঐ খাল দ্বারা নির্গত হইবে এবং তখন ঐ খাল সকল উত্তম পয়ঃপ্রণালী বা 'ড্রেনেজে'র কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

(ক্রমশঃ)

ইঞ্জিনীয়ার ভগীরথ

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এস্‌সি]

ফাল্গুন (১৩৩৭) মাসের 'পথে' "মহাভারতের যুগে ইঞ্জিনিয়ারিং" নামে একটি ক্ষুদ্র আলোচনা আছে। তাহাতে লেখক মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"অন্যে চিনাইয়া না দিলে আমরা আমাদের অতি আদরের ও গৌরবের বস্তুকে চিনিতে পারি না।" স্যার উইলিয়ম্ উইলকক্স্ ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়নের যে ভূগোল-বিজ্ঞানসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বলিবার আছে।

১৯১৫ সালে কার্য্যোপলক্ষে কাতরাসগড়ে অবস্থানকালে আমি এক বৃহৎ কার্য্যের আয়োজন দেখি। কয়লার খনিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল আনয়ন করিয়া কুলী ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব নিবারণের জন্য পরেশনাথ পাহাড়ের উপরে 'রাজদহ' নামক সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। ভূমির উপরে স্থাপিত নলের সাহায্যে সেই বাঁধ হইতে জল প্রবাহিত করিয়া ২৫।৩০ মাইল দূরবর্ত্তী কয়লার খনিতে জনসাধারণের পানার্থে দেওয়া যাইবে। তখন আমার মনে ধারণা জন্মিল, এই প্রকারের ব্যাপার, ইহাইত ভগীরথের তপস্যার ক্ষুদ্র অনুকরণ!

আবার নূতন দৃষ্টিতে রামায়ণ, মহাভারতও পুরাণ পাঠ করিলাম। ১৯১৭ সালে কলিকাতা মর্টন স্কুলের* সৎপ্রসঙ্গ সভায় আমি "ভগীরথের তপস্যা" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে আমি যাহা বলি, তাহার সারমর্ম এই,—"ভগীরথ একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ইঞ্জিনীয়ার, ভৌগলিক তত্ত্ববিশারদ এবং পূর্ত্ত গণিত বিজ্ঞানবিদ্ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও দেবগণের শত্রুতায় হিমাচল ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী তাঁহার বিশাল রাজ্য বৃষ্টিহীনতায় ও জলাভাবে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল। উচ্চ প্রদেশে সঞ্চিত জলরাশি নিম্নভূমির অভিমুখে প্রবাহিত করিবার চেষ্টায় সেই প্রজাবৎসল নবীন রাজকুমার এক বিশাল অভিযানের নেতৃস্বরূপ হিমাচলের দিকে যাত্রা করেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপী অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পর তাঁহার সমুদয় সাধনা সার্থক করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রের গলিত জলধারা ভীষণ বেগে অবতরণ করিয়া নানা শাখাপ্রশাখায় মধ্য-আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ ভাসাইয়া দিল†। ভারতবর্ষের স্বর্ণপ্রসবিনী হইবার সুযোগ ঘটিল। ইহাই ভগীরথের তপস্যা। বর্ত্তমান যুগের সুয়েজ পানামা খাল, রাইন দানিয়ুব ক্যানেল, সুক্কর ব্যারেজ্ ভগীরথের তপস্যার ফলের নিকট কত ক্ষুদ্র!"

সেই বৎসরেই (১৯১৭ কি ১৯১৮ সালে, আমার ঠিক মনে নাই) হাওড়াতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয়। পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহার প্রধান সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী তাহার সম্পাদক ছিলেন। আমি নোয়াখালী জেলার প্রতিনিধিস্বরূপ উক্ত সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখায় আমার সেই "ভগীরথের তপস্যা" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করি। বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু উক্ত বিজ্ঞানশাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রবন্ধটিতে অভিনব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সভাতে প্রশংসা, অপ্রশংসা দ্বিবিধ মতই ছিল। দুঃখের বিষয় উক্ত প্রবন্ধের কোন প্রতিলিপি বর্ত্তমানে আমার কাছে নাই।

বিগত ১৩৩১ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯২৪, ১২ই জুন) তারিখের 'সঞ্জীবনী'তে "বঙ্গদেশে জলকষ্ট" নামক এক প্রবন্ধে আমি পুনরায় ভগীরথেরই কথা উত্থাপন এবং তৎকর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আভাস দান করি। কিন্তু স্থানাভাবে পূর্ব্বের প্রবন্ধের মত ইহাকে বিস্তৃত করিয়া উঠিতে পারি নাই। সগর রাজার যজ্ঞ, তাঁহার ষষ্ঠীসহস্র সন্তান, পাতাল খনন, কপিলের অভিশাপ, ব্রহ্মার কমণ্ডলু, বিষ্ণুর পদকমল, মহাদেবের জটা, ইন্দ্রের ঐরাবত, জহ্নুর গঙ্গাপান, ত্রিপথগামিনীত্ব ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার রূপকের একটি বৈজ্ঞানিক অ-কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা আমি উহাতে দিয়াছিলাম উক্ত ১৩৩১ সালের সঞ্জীবনীতে ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৯২৪, ১৪ই আগষ্ট) আমি "সলিল সমস্যা" নামক আর একটি প্রবন্ধেও ভগীরথের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম।

অতঃপর ১৯২৮ সালে স্যার উইলিয়ম্ উইলকক্সের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার মতে বঙ্গদেশের উত্তর ও দক্ষিণ সমান্তরাল সমস্ত নদীগুলি গঙ্গার পূর্ব্ববাহিনী প্রধান স্রোত হইতে কাটাইয়া ভগীরথ বাহির করিয়া আনেন। আমি বলিয়াছিলাম, মানস সরোবর হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার সমগ্র প্রবাহ ভগীরথ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই জরীপ ও গণনা অনুসারে এই দীর্ঘ পথ রচিত হইয়াছিল।

* ৫০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এই স্কুলটি ছিল। রামকৃষ্ণ কথামৃত লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইহার পরিচালক ছিলেন: বর্ত্তমান সময়ে স্কুলটি আর নাই।

† যদিও কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, অনেকটা এই ধরণের ব্যাপার মঙ্গলগ্রহের বিবরণেও পাওয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে মঙ্গলগ্রহের অধিবাসিগণের একান্ত তীক্ষ্ণ শিল্পবিদ্যা (ইঞ্জিনিয়ারিং) জ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করেন।

অবশ্য, পদ্মাবতীর শঙ্খের ধ্বনি তিনি কোথায় পাইলেন, জানি না। রামায়ণে ও মহাভারতে দেখিলাম না। বোধ হয়, কোন প্রচলিত কাহিনীতে শুনিয়া থাকিবেন।

স্যার উইলিয়ম্ উইলকক্সের ঠিক ১১ বৎসর পূর্ব্বে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভগীরথ ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন কৌশলী ইঞ্জিনীয়ার, আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা এবং নির্ভীক অধ্যবসায়শীল বীরপুরুষ; কিন্তু আমার সে কথা সর্ব্বত্র বহু প্রচারিত হয় নাই। স্যার উইলিয়মের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মস্তক অবনত হয়। তাঁহাদের মত বিচক্ষণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পাশ্চাত্য মনীষিগণই গভীর চিন্তা দ্বারা আমাদের প্রাচীন গৌরব যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন। তাঁহারা হাতে-কলমে কাজ করা লোক। কোন প্রকার রূপকের আবরণে তাঁহাদের দৃষ্টি অবরোধ করিতে পারে না। আমরা যাহা কল্পনার ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তিনি তাহা স্বীয় বিচক্ষণতার গভীর দৃষ্টি ও তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জন্যই এখনও আমাদের দেশে কোন কোন স্থলে আমাদের কল্পনার ভিত্তি তাঁহাদের মত লোকের পাকা কথার দ্বারা মজবুত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বোধ হয় খুব অগৌরবের কারণ নাই। ভবিষ্যতে আমরা হয়ত এইরূপ সাহায্য লাভের পথেই উজ্জ্বলতর দৃষ্টিলাভ করিতে পারিব। এইরূপ আমাদের নিকট হইতে অন্যেরাও বহুতর বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন।

———

চয়ন
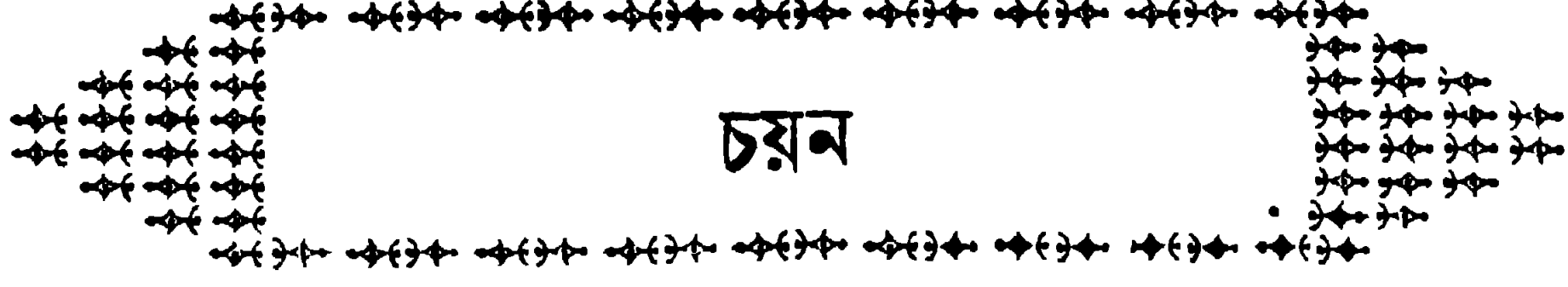
আমেরিকার এলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ এলান গ্রেট্ বেয়ার হ্রদের তটে প্রচুর রেডিয়ামের স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই-খান হইতে বহুপরিমাণ খনিজ গুঁড়া বেলজিয়ামে পরিষ্কার করিবার জন্য প্রেরিত হইতেছে। এই পরীক্ষা কৃতকার্য্য হইলে কর্কট রোগ আরোগ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে, কারণ রেডিয়ামের মহার্ঘ্যতাপ্রযুক্ত অনেক হাসপাতালই উহা রাখিতে পারে না। আবার আমেরিকায় ৬,৫০,০০০ ভোল্ট শক্তির রঞ্জেনরশ্মির নল আবিষ্কৃত হইয়াছে—যাহার রশ্মির কর্কট রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা রেডিয়ামের সমতুল্য। বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা এইরূপে ক্রমশঃ মানবের নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, গঙ্গার জলের রোগজীবাণু নাশ করিবার ক্ষমতা আছে। গঙ্গার জলে মানবনয়নের অগোচর এমন একপ্রকার জীবাণু আছে যাহারা রোগজীবাণুগুলির সহিত সংগ্রাম বাধাইয়া দেয় এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করে। এই কারণে গঙ্গার জলে স্নান, গঙ্গার জল পান এত উপকারী, তাই প্রাচীন আর্য্যগণ গঙ্গার এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কলিতে গঙ্গা যুগতীর্থ। কলির ব্যাধিগ্রস্ত, অন্নগত প্রাণ, স্বল্পায়ু মানবের পক্ষে গঙ্গা প্রকৃতই অমৃতধারা। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মানব গঙ্গায় অবগাহন ও গঙ্গা জল পান করিয়া মুক্ত হউক।

আমেরিকায় নিউইয়র্ক প্রদেশের লং আইল্যাণ্ড সহরের ইউনিয়ন কার্বাইড্ এবং কার্বন রিসার্চ লেবরেটরীদ্বয়ের শ্রীযুক্ত এ, বি, কিন্‌জেল্ শৃঙ্গযন্ত্র (ষ্টেথস্কোপ্) কাণে দিয়া উত্তাপের সাহায্যে জোড়া নলের উপর হাতুড়ির আঘাত হইতে উত্থিত শব্দ শুনিয়া জোড়টি ঠিক হইয়াছে, কি তাহাতে কোনও গলদ আছে—তাহার পরীক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমেরিকার বস্তুপরীক্ষা সমিতির সভায় তিনি এবিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। এখন হইতে এই শৃঙ্গযন্ত্র ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ার উভয়েরই ব্যবহার্য্যে পরিণত হইল।

রবারের ইষ্টক দ্বারা রাস্তা বাঁধান এখন লণ্ডন, গ্ল্যাসগো, চিকাগো, সেণ্ট্ প্যানেরাস্, সাউথ ওয়ার্ক্, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বহু যায়গায় চলিতেছে। ইহার ব্যবহারে সুবিধা এই যে, ইহাতে আওয়াজ কম হয়, ইহার ধাক্কা সহিবার ক্ষমতা যথেষ্ট এবং ৩ বৎসর ব্যবহারের পরও বিশেষ কোনও রূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। কাজেই ইহার প্রস্তুত রাস্তার মেরামত খরচা অকিঞ্চিৎকর। যেখানে যানবাহনের বড়ই বেশী, সেই সকল স্থানে ইহার ব্যবহার চলিতে পারে। ভারতে রবারের চাষ হয়। কাঁচা রবার বিদেশে চালান যায়।

ভারতীয় মূলধনে এখানে রবারজাত দ্রব্য প্রস্তুতের একটি কারখানা খুলিতে পারিলে বহু অর্থ বিদেশে যাওয়া বন্ধ হয়। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতায় রবার একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও ধনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রতি বৎসর রবারজাত দ্রব্য খরিদ করিতে দেশের প্রভূত অর্থ সাগরপারে চলিয়া যাইতেছে, তাহা অচিরে বন্ধ করা দরকার।

সেফিল্ডের মিঃ এইচ্, সাইক্‌স্ নামক একজন ইঞ্জিনীয়ার কারখানার চোঙ্ হইতে নির্গত কৃষ্ণবর্ণ ধূমকে পুনরায় দহন করিয়া ইন্ধনের খরচ এবং বায়ুমণ্ডলের আবর্জ্জনা হ্রাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে এবং সমপরিমাণ কয়লা হইতে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত কার্য্য আদায় হইবে।

রেল ইঞ্জিনের চোঙ্ হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তাহার দ্বারা অনেক সময় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। আমেরিকায় ইহার প্রতিকারের নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইয়াছে। তারের জাল দ্বারা ইহা অনেকটা প্রশমিত হইলেও একেবারে বন্ধ হয় নাই। আমেরিকার জঙ্গলে প্রতি বৎসর গড়ে রেলওয়ে ইঞ্জিনের চোঙ হইতে ধূমের সহিত নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে ১০,০০০টি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়. সম্প্রতি তথাকার একটি রেলওয়ে ইহার পার্ব্বত্য অঞ্চলের ৩০০ ইঞ্জিনে এক প্রকার নূতন কেন্দ্রবিমুখ ধরণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিবারক যন্ত্র বসাইয়া তাহার ক্ষতিপূরণের দাবীর মাত্রা ২০,০০০ ডলার হইতে মাত্র ১৮০ ডলারে নামাইয়া আনিয়াছে। আর এক প্রকারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিবারক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ঐ স্ফুলিঙ্গগুলি একটি ঢোলকের মধ্য দিয়া ঘূর্ণায়মান হইয়া চূর্ণীকৃত ও শীতলীকৃত হইয়া চোঙ্ পথে নির্গত হইয়া যায়। ১/৪ ইঞ্চির চেয়ে বড় কয়লাখণ্ড এই যন্ত্র হইতে নির্গত হয় না। ইহাও বেশ কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। ভারতের রেলওয়ের ইঞ্জিনগুলিতে ধূম এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিবারক যন্ত্র বসাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য।

বিলাতের ইন্ধন সভার এক বক্তৃতায় মিঃ আর্ণল্ড্ মার্শ বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের ধূমজনিত জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ বার্ষিক ৮,০০,০০,০০০ পাউণ্ড।

বিলাতের পাথুরিয়া কয়লা হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিয়া ইঞ্জিনে দগ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হইবে।

হল্যাণ্ডদেশে বস্ত্রবয়নের কলের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, কলগুলিতে প্রায় আপনা আপনিই কাজ হয়। তথায় মাত্র ১ জন কারিকর ২৪টি কল চালায়। ফলে মজুরী বাড়া সত্ত্বেও এই জন্য ওলন্দাজ কলওয়ালা মাল বেচিয়া লাভ করে, কিন্তু ল্যাঙ্কেশায়ার লোকসান দেয়। আমাদের দেশের কলের মালিকদের পুরাতন মান্ধাতার যুগের কলগুলির স্থানে এই প্রকার নূতন ধরণের উন্নত প্রণালীর কলকব্জা ব্যবহার করিবার মত মনের জোর দরকার, নচেৎ দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা কঠিন হইবে। নূতন নূতন আবিষ্কারের সাহায্য যিনি লইতে বিলম্ব করিবেন, তাঁহাকে ক্রমশঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে হইবে। হেন্‌রি ফোর্ড নিত্য নূতন আবিষ্কারগুলিকে গ্রহণ ও পুরাতন যন্ত্র পরিত্যাগ করেন বলিয়াই তাঁহার ব্যবসায়ে

আজ এত সাফল্য। দুনিয়ার যে কোনও দেশের মানুষ তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যে যে কোনও উন্নত প্রথা আবিষ্কার করিবে, অন্য দেশের বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী যদি তৎপর সেই প্রথা আপনার করিয়া লইতে না পারে, তবে প্রতি-যোগিতায় সে আর ক'দিন বাজারে টিঁকিবে? অতএব ভারতের কলের মালিক ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ সাবধান! সদা সজাগ প্রহরী না থাকিলে যেমন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না, দুনিয়ার সর্ব্বত্র নজর রাখিতে না পারিলে তেমনি ব্যবসায়ক্ষেত্রেও বাজার বেহাত হইয়া পড়ে।

উত্তর রোডেশিয়ায় আনুমানিক ৪৪,৯০,০০,০০০ টন তামার খনিজ গুঁড়া (ore) আছে। ঐ গুঁড়ার শতকরা ৪ ভাগ ধাতু আছে এবং শীঘ্রই এই স্থানের প্রস্তুত তাম্র ইউরোপে ৩২ পাউণ্ড ১০ শিলিং টন দরে বিক্রয় হইবে।

পূর্ব্ব আফগানিস্থানের টন্ধী নামক স্থানে কতক-গুলি অভ্রের স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ব্রিটিশ কোলম্বিয়া প্রদেশে ৭৫০০,০০,০০,০০০ টন (আনুমানিক) কয়লা আছে। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বৎসরে মাত্র ৩০,৫০,০০,০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। কাজেই একমাত্র ব্রিটিশ কোলম্বিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ২৫০ বৎসর কয়লা যোগাইতে পারে।

রুসদেশের কোনও লোক কোনরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা কলকব্জার উন্নতি করিয়া তাহার আবিষ্কার বিদেশীর নিকট বিক্রয় করিলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় এবং সে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পক্ষান্তরে, তাহাদের আবিষ্কারগুলি সর-কারে গৃহীত হয় এবং তাহাদিগকে এক একখানি অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়—যাহার বলে তাহারা বাসস্থান প্রভৃতি কতকগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বিনামূল্যে পাইয়া থাকে।

সম্পাদকীয়

জাতির ইতিহাস ধীরে ধীরেই গড়িয়া উঠে। নানা জাতির সংস্রবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সম্পর্ক-সূত্রে জাতির জীবন ক্রমে ক্রমে অগ্রগতি লাভ করে। বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন জাতিই সহসা দ্রুত উন্নত হইয়া উঠে না। কোনও খুব শক্তিশালী লোকের আবির্ভাবে হয়ত এরূপ হইতে পারে। জাতি এইরূপ শক্তিশালী লোকের জন্য কখনও কখনও অপেক্ষা করে বটে; কিন্তু তথাপি তাহার জীবনধারার গতির অগ্রগমনে নিত্য তাহাকে নিজ দৈনন্দিন অথবা সাময়িক কার্য্যানুষ্ঠানের পথ দিয়াই চলিবার উপায় খুঁজিতে হয়। নহিলে জাতি অচল হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে সাধারণ শিক্ষাগার একটি প্রধান ক্ষেত্র। কিন্তু যে দেশে শিক্ষা অতি বিস্তৃত নহে অথবা অধিকাংশ লোককেই নানাবিধ শ্রমোপায়ের উপরই নির্ভর করিতে হয়, সেইরূপ জাতির গঠনে, জ্ঞানের পথটি প্রবহমান শ্রমেরই শাখাপ্রশাখা-বহুল নদীর তীরেও ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এ কাজটি খুব ধৈর্য্যসাপেক্ষ ও খুব কঠিন। কিন্তু কোন সমগ্র জাতিকে সচেতন করিতে হইলে ইহার অপেক্ষা সুচিন্তিত পথ এখন পর্য্যন্ত আর জানা যায় নাই।

শ্রমের ভিতর দিয়াই যেখানে উন্নয়ন খুঁজিতে হইবে, সেখানে প্রথম উপায় জ্ঞানের ধারাটিকে সহজ করিয়া লওয়া। তাহার কারণ, জ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয়েই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে। এজন্য, বর্ত্তমানে এই দেশ যে অবস্থায় আছে, তাহাতে, উচ্চতর কর্ম্মচারী শিক্ষাগুলিকে বহুপরিমাণে সরল ও তরল করিয়া না দিলে, সমগ্র জাতির সাড়া পাইতে বহু বিলম্ব হইবে।

সুখের বিষয় বিগত কলিকাতা শিল্প বিদ্যাপীঠের উপাধি বিতরণ সভাতে এই বিষয়ে পর্য্যাপ্ত আলোচনা হইয়াছে। উক্ত বিদ্যাপীঠের কার্য্যবিবরণী হইতে এবং বাৎসরিক কার্য্য পরিণাম হইতে একটি বিষয় সুন্দর জানা গিয়াছে যে, অতি সাধারণ অবস্থার ভিতর দিয়া এবং অতি সাধারণ শিক্ষার জ্ঞান লইয়া দেশের যুবকেরা কতদূর উত্তমভাবে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, বিষয়টির প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক বিশেষজ্ঞের নিকটেও বিস্ময় উৎপাদনের বস্তু হইয়াছে। সাধনা যে সত্যই সাধনা; এবং ঐরূপ সাধনা যে শুধু দুইটি প্রধান উপায়ে অর্থাৎ আড়ম্বর হীনতায় এবং মাতৃভাষার কল্যাণেই সম্পাদিত হইয়াছে, ইহাও সহজভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও উৎকৃষ্ট প্রমাণে বিশেষজ্ঞগণ একটা প্রকৃত পথের সন্ধান পাইয়া সত্য উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহাদের অন্তরস্ফূর্ত এইরূপ উল্লাসের কারণ এই যে, যে পরিমাণ অর্থ এবং যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় পূর্ব্বেকার ক্ষেত্রে করা হইত, তাহার অপেক্ষা উভয়েরই বহু অল্প ব্যয়ে আশারও অত্যন্ত অতিরিক্ত সুফল পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, কেবল যে বিশেষজ্ঞগণই এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন, তাহা নহে, যাঁহারা নিজে-দিগকে নিতান্ত অক্ষম ভাবিয়া এবং আয়োজন ক্ষেত্রটিকেও একান্ত অপ্রচুর মনে করিয়াই নিরাশা এবং সন্দেহকে সম্বল লইয়া সাধনার পথে তথাপি আসিয়া-

ছিল, তাহারাও জীবনক্ষেত্রে একটা নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া প্রবল স্বস্তি পাইয়াছেন বলিয়া মনে করি।

সুতরাং বিষয়টি এখন, সর্ব্বসাধারণের এবং বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয় বলিয়া মনে হয়।

দেশে বর্ত্তমানযুগে অন্নসমস্যা খুবই প্রবল। এ সমস্যা যে শুধু দরিদ্রের নিকটই প্রবল, তাহা নহে। ধনীদের নিকটেও। বিশেষতঃ, বাঙ্গালার প্রশ্ন কঠিনতর। এ দেশের প্রধান সম্পত্তি ভূমি প্রভৃতি একটা বাঁধা নিয়মের ভিতরে থাকায়, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার এবং চেষ্টা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। ঐ একই কারণে, তথাকথিত উচ্চ ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অথবা অভিজাত এবং শ্রমিকের মধ্যে যেমন সামাজিক তেমনই আর্থিক সম্পর্কের ও সামঞ্জস্যের সুপ্রচুর অভাব। অবশ্য কিছুকাল হইতে, বাংলার জাতীয় প্রগতি, উভয় শ্রেণীকে কতকটা নিকটতর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাও দেশের প্রকৃত অবস্থাবোধে অকিঞ্চিৎকর। দেশের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার প্রকৃত সংশোধন হইবে তখনই, যখন উভয় শ্রেণীর কার্য্যের সীমা দুইটি, দুই শেষ সীমানায় না থাকিয়া, একটি সাধারণ সীমানায় আসিয়া মিলিত হইবে। আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কার্য্যকরী বিদ্যার ক্ষেত্রে ঐ উভয় শ্রেণীর সংযোগ পথের কথাই বলিতেছি। বাংলা দেশের অধিকাংশ ধনই প্রধানতঃ ভূম্যধিকারে এবং সাধারণতঃ কৃষক প্রভৃতি শ্রমিকের গৃহে ন্যস্ত। ভূম্যধিকারিগণ যদি নিজ নিজ ভূম্যধিকারের প্রজাদিগকে কার্য্যকরী বিদ্যার জ্ঞান অল্প অল্প করিয়া দিবারও কোন বাস্তবিক চেষ্টা করেন এবং এই পথাশ্রয়ে কৃষকের যদি ক্রমশঃ ভূম্যধিকারিগণকে কেবলমাত্র প্রভু বা করগ্রাহীরূপে না জানিয়া, তাঁহাদিগকে বন্ধুস্বরূপেই জানিবার কোন উপায় পায়, তাহা হইলে, কঠিনতম সমস্যার বিষয়টি নিরাকৃত হইবার পন্থা অচিরে বাহির হইতে পারে। জগতের নব নব উন্নতির জ্ঞান হইতে শ্রমিকেরা একরূপ চিরবঞ্চিত। এ দেশের অভিজাত-বর্গ ও ধনিকেরা সাধারণতঃ বহুপ্রকারে জড়ীভূত হইয়া জীবনধারাকে জটিল করিয়া তুলিতে হয়ত বাধ্য হইয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা আধুনিক জীবন্ত জগৎ হইতে একপ্রকার অনেক দূরেই রহিয়াছেন। তাঁহাদের শক্তি ও ইচ্ছা যদি আজ এই পথে বিস্তৃত হয়, তবে, দেশের নিষ্কর্ম্মতা এবং অর্থনৈতিক বিপদ কাটিয়া যাওয়া—খুব দূরের কথা হইয়া থাকিবে না। ইহাতে উভয় সম্প্রদায় নিজেদের আসন একটা যোগ্য স্থানে স্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন। দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সে বিষয়টি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিতে বাধ্য হইবে। বিশেষ করিয়া অভিজাতবর্গের।

মনে হয় যে, এইরূপ বিষয় এখন দেশের ধনিকদের বা ভূম্যধিকারিদের চিন্তনীয় বিষয় হইবার সময় হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে চাষীর ঋণপরিমাণ ১০০ কোটী টাকা। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন বলেন যে, ইহার অর্থ বাঙ্গালায় প্রতি বিঘায় ১৫৲ হারে উদ্বৃত্তির অর্দ্ধ অংশ "মহাজন" গ্রহণ করে। "বাঙ্গালার চাষীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের পরিশ্রম ও শস্যোৎপাদন ক্ষমতার নিয়মিত প্রয়োগে এই মহাজন সমস্যার প্রতিকার প্রয়াস কর্ত্তব্য, না যথাপূর্ব্ব বিশৃঙ্খল, অর্দ্ধাহারী জীবনমৃত অবস্থায় চাষীদের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য?"

যদি চাষীর অবস্থা উন্নত-করাই কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা হইলে সমবায় প্রণালীর ব্যাপক প্রসারণে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্যার ড্যানিয়েলের

প্রস্তাব অনুযায়ী কর্ত্তৃপক্ষ দুইটি সমবায় প্রণালী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়াছেন। একটি প্রতিষ্ঠান বোলপুরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনাধীন হইবে ও অপরটি সুন্দরবনে গোসাবা নামক হ্যামিণ্টন সাহেবের জমিদারীতে তাঁহার পরিচালনাধীন হইবে। এইরূপ বাঙ্গালার রুক্ষতর ও আর্দ্রতর উভয় প্রকার জলবায়ুই পর্য্যবেক্ষণের অন্তর্গত থাকিবে।

হ্যামিণ্টন সাহেব বলিতেছেন—"বৃটিশ ভারতে সমবায় প্রণালী প্রচারের জন্য অনুমান ৫০,০০০ লোক প্রয়োজন হইবে। ইহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে দ্বিগুণ সংখ্যক চিকিৎসক ও বিশগুণ শিক্ষকের কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৃষ্ট হইবে। এই সকল চিকিৎসক ও শিক্ষকের বৃত্তি কৃষকেরাই বহনে সমর্থ হইবে। ইহার জন্য কোনও প্রকার কর বসাইতে হইবে না—বা মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে না। তখন কর্ম্মই কর্ম্ম সন্ধান করিবে,—এখনকার মত কর্ম্মীকে কর্ম্মের পিছনে পিছনে ফিরিতে হইবে না। ভারতীয় যুবকবৃন্দের উদর খাদ্যপূর্ণ থাকিবে ও মস্তকে দুশ্চিন্তা স্থান পাইবে না।

"এই প্রণালী অবলম্বনে স্কট্‌ল্যাণ্ডের চাষী সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছেন, ভারতের চাষীও এই পথে সমৃদ্ধি-লাভ করিবেন।"

কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিণ্টন দুই লক্ষ টাকার নোট (অর্থাৎ যাহার প্রকৃত মূল্য যৎ-সামান্য) ধার চাহিয়াছেন। ইহার অবলম্বনে সুন্দর-বনে ৩০,০০০ বিঘা জমি উদ্ধার ও চাষোপযোগী করিবেন। এই জমিতে এককালে জনবসতি ছিল। এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু পুনরায় ইহাকে চাষোপযোগী করা সম্ভবপর। কর্ত্তৃপক্ষের ঋণ স্বর্ণে পরিশোধ করা যাইবে। জমি বাসোপযোগী হইলে উহাও কর্ত্তৃপক্ষের অধিকারে আসিবে ও জমি ২০০০ পরিবারের বাসোপযোগী হইবে এবং বৎসরে ৪ লক্ষ টাকার ধান্য উৎপাদন করিবে। ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতির বৃত্তি চাষীরাই বহন করিবে। ভদ্র-শ্রেণীর যুবকেরা নিঃসঙ্কোচে চাষবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন ও গ্রামবাসী পুনরায় আত্মকর্ত্তৃত্ব ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। গোসাবায় এক্ষণে পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। গ্রামবাসীর বিবাদ-বিতণ্ডা ইহার সাহায্যে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

সমালোচনা

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত]

জয়শ্রী

—বাংলার মহিলাদের মুখপত্র—

সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগ, এম, এ। ৩নং বক্সীবাজার (ঢাকা) এন, এম, প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৪॥০, প্রতি সংখ্যা।৵০।

এই মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য মহৎ। প্রত্যেক প্রথিতনাম্নী লেখিকার কর্ত্তব্য তাঁহার অমর লেখনী-নিঃসৃত সুধাধারায় জয়শ্রীকে পরিপুষ্ট ও শ্রীমণ্ডিত করা। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া নারীদের প্রচেষ্টার সহানুভূতি দেখাইয়াছেন।

তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর "আজি আষাঢ়ের প্রথম দিবস" নামক কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কাব্যরসপিপাসু মাত্রেই ইহার ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্য সমস্ত অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্তা আশালতা সেন "বিক্রমপুরে নারী-আন্দোলন" সম্বন্ধে যে বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দেশের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ এবং বিভিন্ন প্রদেশের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এ বিবরণ পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে, নারীগণের কর্ম্মশক্তিতে আজ দেশ জাগ্রত ও বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে। "কাশীর মেয়েদের কথা"র লেখিকা শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী, শিক্ষিতা মহিলাদের কর্ত্তব্যের যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা পালিত হইলে এ দেশের নারীসমাজের আভ্যন্তরীক সুপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ মহাশয়ার "ঝড়ের বাতাস হঠাৎ দিল দোলা" নামক গল্পটি সকল পাঠককেই মোহিত করিবে। শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবীর "শুশ্রূষা" প্রবন্ধ সাধারণ্যে ও নারী-জাতির অমূল্য ভাণ্ডারে একটি শ্রেষ্ঠদান।

আলোচ্য পত্রিকার ত্রিবর্ণরঞ্জিত কাজরীর চিত্রটি মনোরম হইয়াছে এবং শ্রীযুক্তা নিভাননী দেবীর কাঠের খোদাই চিত্রটিতেও বেশ একটুকু নৈপুণ্যের পরিচয় রহিয়াছে। পত্রিকাখানির ছাপা, কাগজ ও মলাট সুন্দর। এই মাসিক পত্রের বহুল প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

পরিভাষা

Anthropology—নৃ-বিজ্ঞান
Astronomy—খগোলবিজ্ঞান
Automatic action—স্বতঃজাত ক্রিয়া
Biology—জীব-বিজ্ঞান
Carbon dioxide—অঙ্গারাম্ল বায়ু, অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান
Cell—কোষ
Dynamical—প্রকৃতি-প্রবাহে
Economic Geology—অর্থনৈতিক ভূ-বিজ্ঞান
Elastic fatigue—স্থিতিস্থাপ্যশ্রম
Electron—বিযুক্ত তাড়িতন, তড়িৎকণা, বিদ্যুতিন
Ether—নভোধারা
Irritability—উত্তেজনাপ্রবণতা
Kinetic energy—ব্যক্ত শক্তি, গতিশক্তি
Meteorology—বায়ুবিজ্ঞান
Metabolism—গঠন-ভঞ্জন বা পরিণাম ক্রিয়া
Mineralogy—(খনিবিজ্ঞান), খনিজ বিদ্যা
Palaeontology—পুরাজীব-বিজ্ঞান
Petrology—শৈলবিজ্ঞান
Physiography—প্রাকৃতিক ভূগোল
Potential energy—অব্যক্ত শক্তি, স্থিতিশক্তি
Proton—যুক্ততাড়িতন, ধনতড়িৎকণা, কেন্দ্রিন
Protoplasm—জীববস্তু
Respiration—শ্বাসক্রিয়া
Reflex action—প্রতিক্রিয়া
Snowline—চিরতুষার সীমা
Structural—প্রাকৃতিক গঠনে
Vibration—স্পন্দন
Zoology—প্রাণিবিজ্ঞান

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৬	২	১৭	'বৈজ্ঞানিকের'	চৈতন্যের
২৭৭	২	২২	'বিকাশ'	বিনাশ

শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট—"পুরাণ প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও
২৮এ, মহারাণী হেমন্তকুমারীর ষ্ট্রীট—"পথ কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত।
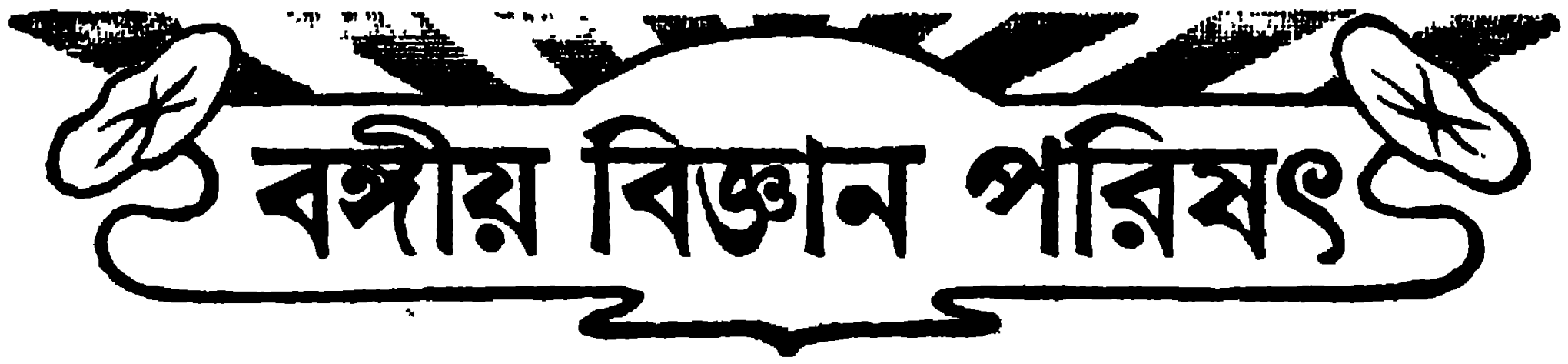
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ

পরিচালকমণ্ডলীর অধিবেশন

স্থান—৭৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড

সময়—সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

তারিখ—১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৮

১৬ই আষাঢ় বুধবার স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোডস্থ ভবনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালকমণ্ডলীর এক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

১। ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে—সভাপতি
২। „ হেমেন্দ্রকুমার সেন
৩। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার
৪। ডক্টর যতীন্দ্রনাথ বসু
৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী
৬। „ ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
৭। „ সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
২। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম

ঐ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটী সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের অনুষ্ঠাতৃবর্গের সভ্যরূপে গ্রহণ করা হউক।

প্রস্তাবক—ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন   সমর্থক—শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

(২) নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একটি অর্থ-ভাণ্ডার সমিতি গঠন করা হউক।

১। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—সভাপতি
২। „ ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
৩। রায় গিরীশচন্দ্র দাস বাহাদুর
৪। ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে
৫। „ হেমেন্দ্রকুমার সেন
৬। শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী—কর্ম্মসচিব

উক্ত সভায় স্থির হয় যে, কলিকাতা বিজ্ঞান মন্দিরের সনন্দ বিভাগটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হউক। তজ্জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, এখন হইতে তাহা আরম্ভ করা হউক।

নবগঠিত অর্থভাণ্ডার সমিতির প্রথম অধিবেশন আগামী ২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময় স্থির করা হয়।

অতঃপর ঐ দিনের সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে—সভাপতি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

কলিকাতা বিজ্ঞান মন্দির

(Calcutta Science College)

অনুষ্ঠানপত্র
ও
নিয়মাবলী
(১৩৩৮-৩৯)

কার্য্যালয় —
২৮এ, মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সূচীপত্র

:*:—

Pooran Press, Calcutta

কলিকাতা বিজ্ঞান মন্দির

উপক্রমণিকা

বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানের অনুশীলন ভিন্ন কোন জাতির পক্ষে কর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করা সহজ নহে। বিজ্ঞানবিদ্যা জাতির মধ্যে বহুল প্রচার করিতে হইলে, মাতৃভাষাতে উহার চর্চ্চা ভিন্ন উপায় নাই। মাতৃভাষার সহায়তায় স্বাভাবিক সহজভাবে ও সুলভে যাহাতে দেশময় বিজ্ঞানের প্রসার হয়, তজ্জন্য বিশিষ্ট সভ্যগণের সমবায়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে।

উক্ত পরিষদের উদ্যোগে দেশে সুষ্ঠুরূপে এবং বহুল ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের জন্য কলিকাতাতে ও বাঙ্গালার প্রধান প্রধান নগরে ও মফঃস্বলে কার্য্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা নিকেতন সমূহ স্থাপিত হইবে। বর্ত্তমান কলিকাতা বিজ্ঞান মন্দির এই সমুদয় বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপিত হইল।

উদ্দেশ্য

পৃথিবীর সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞান অতি উচ্চ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে গণিত, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভেষজ প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানবিদ্যা ভারতে সুপ্রচলিত রহিয়াছে। যুগে যুগে ইতিহাসে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাতে কোনও সময়ই ভারতবাসী আপন বিজ্ঞান হৃদয়কে বিস্মৃত হয় নাই। বৈদিক হইতে বৌদ্ধ, বৌদ্ধ হইতে মোগল, মোগল হইতে বর্ত্তমান বৃটিশযুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুগেই ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ বিবিধপ্রকারে নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যজ্ঞবেদীতে, রসায়নাগারে, চিকিৎসাক্ষেত্রে, গবেষণা গৃহে, ধাতু ও রত্ন সংগ্রহে, কৃষিতে, যানে, নগর নির্ম্মাণে, শিল্পে ও মন্দিরে এবং জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে, অথবা নব নব আবিষ্কারে ভারতের নানা শাখায় বিজ্ঞান-জ্ঞান চিরকাল অতি প্রশংসাযোগ্য প্রমাণ দিয়া আসিতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞান ধারার উৎপত্তিতে এবং নূতন বিজ্ঞানধারার সংমিশ্রণে ভারতের বিজ্ঞানবিদ্যা এইরূপে ক্রমে বিস্তৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। নিজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা রক্ষা করিয়া বা ভিন্ন সংস্পর্শের যাহা সুন্দর বা কার্য্যকর তাহা গ্রহণ করিয়া, ভারতের বৈজ্ঞানিকদের সজীব সাধনা চিরকালই অগ্রসর হইয়াছে।

তথাপি গভীর দুঃখের বিষয় যে নানা কারণে দেশের বহু বিজ্ঞানবিদ্যা স্থানে স্থানে জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কোন কোন বিষয় একেবারে বিলুপ্তও হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কোনও মিলিত ভাবের চেষ্টা দেশের বিজ্ঞানের পোষকতার সুযোগ পায় নাই বলিয়া এইরূপ হইয়াছিল। জাতির মহাক্ষমতা কোনও স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া উল্লেখযোগ্যভাবে দেশের মূল্যবান স্থায়ী সুপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে নাই এবং দেশব্যাপী সর্ব্বশ্রেণীর বিশেষতঃ বিপুল জনসাধারণের প্রকৃত ও বিস্তৃতরূপে মহদুপকারে আসিবার সুযোগ পায় নাই ; এইজন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃত বিকাশে, সাংসারিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে, সাহস ও স্বাস্থ্যের অনুশীলনে, সভ্যতার প্রত্যক্ষ উপায় এবং জীবনের আনন্দ ও অন্নদানের লক্ষ্মীরূপে যে বিজ্ঞানবিদ্যা জাতির সকল অভাব দূর করিয়া জাতিকে স্বাবলম্বী ও সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারে এবং দেশে ও বিদেশে জাতির সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারে তাহার পর্য্যাপ্ত বিস্তৃতি না হওয়াতে দেশের সর্ব্বপ্রধান মহাক্ষতি হইয়াছে। বিশেষতঃ উহার অধিকাংশই সর্ব্বকাল অতি অল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্কে সুপ্ত রহিয়া এবং কোন কোন পল্লীবাসী বিশেষ গুণী বৈজ্ঞানিকের স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়া ব্যর্থ হইয়া গেলে ইহাতে যেমনি জাতির গৌরবের তেমনি জাতির দুঃখ মোচনের শ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক অমূল্য উপায় বিনষ্ট হইয়া যায়।

জাতীয় জীবনে জগতের প্রশংসার্জ্জন, চিরকাল অসীম গৌরবের কথা। কিন্তু জাতির কর্ম্মসংস্থান ও অন্নসংস্থান প্রভৃতি উপায়ে জাতিকে সুসংগঠিত করা উক্ত গৌরবলাভের প্রথম এবং কোনও কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর পথ। বিজ্ঞান-জ্ঞান মানবের চর্চ্চাসাপেক্ষ হইলেও একটী সহজাত জ্ঞান। নীতিজ্ঞানাদি বিষয়ে অন্তরের ধনে ধনী হওয়া এবং বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্পাদি পথে সাংসারিক সম্যক্ উন্নতিলাভ করা মানুষের জীবনে এই দুইটীই চরম উপায়। জীবন পরিপূর্ণ করিতে প্রথমটীর ন্যায় দ্বিতীয়টীকেও কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারা যাইবে না। জাগতিক হিসাবে দেখিতে গেলে, অর্থাৎ সংসারে মনুষ্যের স্বচ্ছন্দভাবে টিকিয়া থাকিতে গেলে, নীতির ন্যায় বিজ্ঞানও অন্য প্রধানতম অবলম্বন।

দেশে জ্ঞানার্জ্জনের বহু পথ এখন অনেকটা সরল হইয়াছে। কিন্তু মানুষের কার্য্যকরী বিশেষ জ্ঞানের ক্ষুধা পূরণের উত্তম ব্যবস্থার আমাদের দেশে একান্ত অভাব রহিয়াছে। জগতের সকল জাতির সহিত সংস্পর্শ হওয়াতে জীবন যুদ্ধও জটিলতর হইয়াছে। কিরূপে প্রত্যেকে কার্য্যকরী বিদ্যার সাহায্যে নিজেকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিবে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুণে কিসে জীবনপথ সহজ ও সুন্দর করিয়া তুলিবে এবং জাতির অভাব কিসে পূরণ হইবে, বর্ত্তমান যুগের কঠোর

জীবন সংগ্রামের সম্মুখে এই আকাঙ্ক্ষাই এখন সকলের প্রধান এবং প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে একান্ত ব্যাকুল এই প্রশ্ন।

বাংলার সহস্র সহস্র নরনারীর প্রশ্ন আরও কঠিন। বাংলার অপটু স্বাস্থ্য, সাধারণতঃ কেবলমাত্র অনুন্নত কৃষির উপরে নির্ভর জীবন, পারিপার্শ্বিক নানা সামাজিক বাধা, অপ্রচুর সম্বল অভিভাবকের খর্ব্ব আশাভরসা, ঘরমুখো বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ হৃদয়, এই সকল মিলিয়া বাঙ্গালীকে কর্ম্মজীবনে এবং বিশেষ উন্নতির জীবনে একান্তরূপে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। মস্তিষ্ক থাকিলেও বাঙ্গালার নরনারী কর্ম্মজগতে এইজন্যই এত অধিক নিরুপায়। অথচ যে দেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার জগদীশ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ভারতের অনন্ত গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার হইলে, এই দেশের অন্তর হইতে সক্ষম অনুরূপ কত কৃতীসন্তানের উদ্ভব সুনিশ্চিত ও সম্ভব হইতে পারে আজ তাহা কে বলিতে পারে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন---

"মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে···
···রেখেছ বাঙ্গালী করে' মানুষ করনি"

বাঙ্গালী বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী ভারতীয়। চিত্তসম্পদে তাহারা কেহই ক্ষুদ্র নহে। তাঁহাদের সম্মুখে বিবিধ জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বার খুলিয়া দিয়া কর্ম্মপথে তাহাদিগকে মানুষ করিতে হইবে।

বাঙ্গালী যাহাতে স্বভাব প্রদত্ত ক্ষমতার সহজ অনুশীলন দ্বারা কর্ম্মজীবনে যোগ্যতালাভ করিয়া জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের অন্ধকার দূর করিতে পারে এবং ভারতের বিজ্ঞানবিদ্যা-সম্পর্কিত গৌরব ও ঐশ্বর্য্যলাভের অধিকার যাহাতে জ্ঞানী ও অজ্ঞান এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই করায়ত্ত হইতে পারে তাহার আয়োজন করিতে হইবে। এই প্রকারে জাতির জীবনে যাহাতে বহু সমস্যার সমাধান হয়, জগতে বাঙ্গালীর অন্ন ও ঐশ্বর্য্য, কর্ম্ম ও সম্মান যাহাতে প্রচুর, সুপ্রতিষ্ঠিত ও উন্নততর হইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহার সহায়তা করাই এই বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দেশ্য।

ছোট ও বড় প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রতিটি নিঃশ্বাসের মধ্যে এই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বিবরণ

যাহাতে বাঙ্গালীর গৃহে নূতন কর্ম্মজীবন জাগিয়া উঠে, কার্য্যকরী শিক্ষা এবং কাজের ডাক যাহাতে বাঙ্গালীর গৃহকে আশ্বস্ত করে এবং মূর্ত্তিমান কর্ম্মকে আনিয়া সকলের গ্রহণযোগ্য করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, এই বিদ্যামন্দির এই প্রকার শিক্ষা প্রদানের সর্ব্বপ্রকার আয়োজনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষাদান করা হইবে।

১। **বিজ্ঞানতত্ত্ব**

(ক) প্রাথমিক বিভাগ (**সনন্দ**)

(খ) উপাধি বিভাগ (বিজ্ঞানপ্রাজ্ঞ)

২। **বিশেষ জ্ঞান** (বিজ্ঞানবিশারদ)

(ক) রসায়ন-শাস্ত্র

(খ) পদার্থ-বিজ্ঞান

(গ) তড়িৎ-বিজ্ঞান

(ঘ) কৃষি-বিজ্ঞান

(ঙ) খনিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব

(চ) জীবতত্ত্ব

(ছ) জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

(জ) বিবিধ শিল্প

বিজ্ঞান মন্দিরের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাদান কার্য্য মাতৃভাষার সাহায্যে সম্পাদিত হইবে।

পরিচালকমণ্ডলী

১। ডক্টর হেমেন্দ্র কুমার সেন, এম-এ, ডি-এস-সি (লণ্ডন) ডি-আই-সি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

৯২নং আপার সার্কুলার রোড—সভাপতি।

২। ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে, ডি-এস্‌সি, ইঞ্জিনিয়ারিং (গ্লাসগো), এম-এ-ই, এম-আই-ই, কলিকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ কর্ম্মচারী ও পূর্ত্ত-সচিব; ৮৭বি, পার্ক ষ্ট্রীট।

৩। ডক্টর একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-ডি; কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক।

৬৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

৪। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বানীরঞ্জন।

"সাহিত্যাশ্রম", পি ৭৭ লেক রোড, বালীগঞ্জ।

৫। ডক্টর যতীন্দ্রনাথ বসু, ডি, ইঞ্জ (বার্লিন), এ-এম-এম-ই, এ-এম-ই-ই, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যন্ত্র-শিল্প অধ্যাপক, ১৬সি, ফার্ণ রোড, কলিকাতা।

৬। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, এম-এ (ক্যাণ্টাব), প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান অধ্যাপক; শশিভূষণ ভিলা, বরাহনগর।

৭। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এস্‌সি, ভারত গভর্ণমেন্টের শুল্ক বিভাগের রসায়নবিৎ, সহকারী-সভাপতি।

৬৭।১, বেনিয়া পুকুর লেন, ইণ্টালী, কলিকাতা।

৮। শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, এম-আই-এম-এ, কর্ম্মসচিব কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট।

২৮এ, রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

অধ্যয়নার্থীর নিয়মাবলী

১। **প্রাবেশিক যোগ্যতা ঃ—**

(১) বাংলা ভাষায় নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান।

(২) অঙ্কশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান

(ক) প্রত্যেক প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রকে একটী প্রাবেশিক পরীক্ষা দিতে হইবে। উক্ত পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন কেবলমাত্র সেই সকল ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা হইবে। এই পরীক্ষার বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(খ) ছাত্রবৃত্তি বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে এই পরীক্ষা দিতে হইবে না।

২। **প্রাবেশিক পরীক্ষার বিষয় ঃ—**

(ক) বাংলা সাহিত্য ঃ— বাংলা সাহিত্য পুস্তক হইতে লিখন, পঠন ও ব্যাখ্যা।

(খ) অঙ্কশাস্ত্র ঃ— পাটীগণিত দশমিক পর্য্যন্ত ; জ্যামিতি ; প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; বীজগণিত ; সাধারণ গুণক (Simple factor)।

৩। **বয়স** ঃ— অধ্যয়নার্থীর বয়স অন্যূন ১৩ বৎসর হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে ১২ বৎসর বয়স্কের ছাত্র গ্রহণ করা হইবে।

৪। **পাঠকাল** ঃ—

প্রাথমিক পাঠ ঃ— দুই বৎসরে শেষ হইবে (সনন্দ)।

উচ্চাঙ্গের পাঠ ঃ— পরবর্ত্তী দুই বৎসরে শেষ হইবে (উপাধি)।

অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাঠ চার বৎসরে শেষ হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— প্রাথমিক পাঠ সমাপন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলিকাতা শিল্প বিদ্যাপিঠের (Calcutta Engineering College) নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবেন।

১। ওভারশিয়র বিভাগ

২। সাব-ওভারসিয়র বিভাগ

৩। যন্ত্র ও তড়িৎ শিল্প বিভাগ

৫। **পরীক্ষা ও সনন্দ** ঃ—

(১) যাহারা দুই বৎসরকাল পাঠ সমাপনান্তে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগকে একটী সনন্দ প্রদান করা হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে সক্ষম হইবে। যে ছাত্রের এইরূপ উদ্দেশ্য আছে তাহাকে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইবে। ইহার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

(২ যাহারা চার বৎসরকাল পাঠ সমাপনান্তে শেষ পরীক্ষায় ণ হইতে পারিবেন তাঁহাদিগকে **বিজ্ঞান প্রাজ্ঞ** উপাধি দান করা হইবে (এই উপাধি Bachelor of Applied Scienceএর তুল্য হইবে)।

(৩) উপরোক্ত উপাধিধারী যে কোন ছাত্রকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গবেষণার ও আরও উচ্চাঙ্গের পাঠের ও কার্য্যকরী জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে। উপযুক্ত কৃতিত্ব দেখাইলে দেড় বৎসর অন্তে তাঁহাকে **বিজ্ঞান-বিশারদ** উপাধি প্রদান করা হইবে (এই উপাধি Master of Applied Scienceএর তুল্য হইবে)।

(৪) যাঁহারা প্রকৃত উচ্চাঙ্গের গবেষণা ফলে বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্বের মীমাংসা এবং প্রকৃত কার্য্যকরী কোন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহাদিগকে **বিজ্ঞানাচার্য্য** উপাধি প্রদান করা হইবে (এই উপাধি Doctor of Applied Scienceএর তুল্য হইবে)।

৬ **বেতনাদি** ঃ— (১) প্রাবেশিক দেয় মোট ১৫৲

(ক) আবেদন পত্রের সহিত ৫৲ প্রেরণ করিতে হইবে।

(খ) আবেদন গ্রাহ্য হইলে প্রবেশের সময় ১০৲ দিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— (ক) আবেদন পত্রের সহিত প্রাবেশিক দেয় ৫৲ না পাঠাইলে সে আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

(খ) আবেদন পত্র গ্রাহ্য না হইলে ঐ ৫৲ টাকা প্রত্যর্পণ করা হইবে।

(গ) অন্য কোন কারণে প্রথম প্রাবেশিক ৫৲ প্রত্যর্পণ করা হইবে না।

(২) প্রাথমিক পাঠকাল (২ বৎসর)—মাসিক বেতন ৮৲

(৩) তৎপরে ২ বৎসর পর্য্যন্ত (উপাধি)—মাসিক বেতন ১০৲

বিবিধ নিয়মাবলী

৭। **পাঠারম্ভঃ**— প্রতি বৎসর শ্রাবণমাসে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে। আগামী বৎসরের ভর্ত্তি হইবার তারিখ বিশেষ বিজ্ঞাপন পাঠে অবগত হইতে পারা যাইবে।

৮। **জমা** ঃ— প্রত্যেক ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার সমূহে কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ১০৲ গচ্ছিত রাখিতে হইবে। যদি বিদ্যামন্দির সংক্রান্ত দ্রব্য অথবা পরীক্ষাগারেরযন্ত্রাদি তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার নষ্ট হয় তাহা হইলে ঐ টাকা হইতে তাহার মূল্য উদ্ধার করা হইবে ও তাহাকে পুনরায় ঐ গচ্ছিত টাকা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। বিদ্যামন্দির পরিত্যাগকালে অবশিষ্ট অর্থ পাঠার্থীকে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

৯। **ছাত্রাবাস** ঃ— বিদ্যামন্দিরের সংশ্লিষ্ট একটী ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রাবাসে থাকিবার ব্যয় মাসিক ৫৲ হইতে ৬৲। আহারাদির আনুমানিক ব্যয় ১৪৲। ছাত্রাবাসে থাকিতে হইলে ইহার নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইবে।

১০। খেলা ও ব্যায়ামাদি ঃ— প্রত্যেক ছাত্রকে খেলাধূলা ও ব্যায়ামাদি করিতে হইবে।

১১। **অবকাশ কাল** ঃ— গ্রীষ্মকাল—১ মাস
পূজার ছুটি—১ মাস।

উপরোক্ত দুইটী ছুটি ব্যতীত সাধারণ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত দিবসে বিদ্যামন্দির বন্ধ থাকিবে।

অনুশাসন বিধিসমূহ

(১) **আবেদন ও অভিযোগাদি** ঃ—যদি কোন ছাত্র বিদ্যামন্দির বা ছাত্রগণের সম্বন্ধে আবেদন বা অভিযোগাদি করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহা স্বহস্ত লিখিত আবেদন পত্রে করিতে হইবে। ঐ আবেদনের অভিযোগ সম্বন্ধে অধ্যক্ষের বা অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) যে সকল ছাত্র পাঠে অবহেলা করিবে তাহাদিগকে সে বিষয় সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে। তৎসত্ত্বেও যদি কোন ছাত্র অনবরতই পাঠে অমনোযোগী হয় তাহা হইলে তাহাকে বিদ্যামন্দির পরিত্যাগ করিতে হইবে। কোন ছাত্র বিনা কারণে বা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত হইলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। বিশেষ হীন রূপে অন্যায় রকম কার্য্য করিলে যে কোন ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।

(৩) ছাত্রাবাসে যে সকল ছাত্র থাকিবে তাহারা ছাত্রাবাসনিবাসী কার্য্যাধ্যক্ষকে সকল বিষয়ে মান্য করিয়া চলিবে ।

পাঠ নির্দ্দেশ (প্রাথমিক বিভাগ)

১

বিশ্ব-জগৎ। পৃথিবী। আকাশমণ্ডল। তারকাদির সঞ্চার বিচার। সূত্রাদি নির্ণয়; বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান। জল ও স্থল। ভৌগলিক বিবরণ ও ইতিহাস। জীব আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ। সভ্যতার উন্মেষ। ঐ সভ্যতা ও বিজ্ঞান চর্চ্চা সহগামী। ঘটনাদির সম্যক্ অবলোকন, বিচার ও তথ্য নিরূপণ। পুরাণ কথা। ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

২

বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রাদি; দৈর্ঘ্য; ক্ষেত্রফল ও আয়তন; সত্ত্বা ও ভার; মাধ্যাকর্ষণ; গুরুত্ব; কাল পরিমাণ।

কোণ পরিমাণ; ক্ষেত্র পরিমাণ ও আয়তন পরিমাণ পদ্ধতি অঙ্কন। শুভঙ্করী। জ্যামিতিগত ও বীজগণিতগত সূত্রাদি। ত্রিকোণ-মিতি-গতসূত্রাদি। লগারিথিমের প্রয়োগ শিক্ষা।

৩

বস্তু ও দ্রব্য; দ্রব্যের ত্রিবিধরূপ; দ্রব্যের অবিনশ্বরতা; বস্তু বিজ্ঞান ও রসায়ন।

৪

গতি; গতিমাত্রা; গতিফল; ঘাত; যুগ; শক্তি; বল; কার্য্যকারীতা; যন্ত্র ও যন্ত্রবিজ্ঞান।

নিমজ্জন, ভাসন; তরল বস্তুর মধ্যে চাপের উৎপত্তি; চাপ ও ভারের সম্পর্ক; তরল বস্তু ও বায়ব্য বস্তুর সম্পর্ক; ব্যোমজান; খপোত।

৫

তাপ ও উত্তাপ; তাপ উৎপত্তি; পরিচালন; বিকীরণ; তাপ প্রয়োগে বস্তুর প্রসার;

তাপ প্রয়োগে রূপভেদ ; প্রচ্ছন্ন তাপ ; তাপের কার্য্য ক্ষমতা ; শক্তির অবিনশ্বরতা ; বায়ুমণ্ডলের তাপ ; পর্ব্বতশিখরের শৈত্য ; ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনা ; এঞ্জিন।

মিশ্রণ ও সংযোগ ; সংযোগ-সূত্রাদির পর্য্যালোচনা ; গ্যাসের আয়তন পরিবর্ত্তন।

অণু ও পরমাণু। যৌগিক ও মৌলিক দ্রব্য। সঙ্কেত। অণুভার ; পরমাণু ভার ; সংযোগভার। দ্রবণ। পরিসরণ। উপসরণ। তির্য্যক্‌পাতন।

রসায়নিক পরীক্ষায় নিযুক্ত যন্ত্রাদির বর্ণনা। রাসায়নিক দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী ও উহাদের ধর্ম্মাদি পর্য্যালোচনা।

H, O, H_2O ; Cl, Br, I, HCl, HBr, HI ; N, N_2O, N_2O^2, N_2O^4, N_2OS_5, HNO_3, NH_3, S, SO_2, SO_3 ; H_2SO_4 P, PH_3, P_2O_5, HPO_3 ; C, CO_2, CO. অঙ্গারঘটিত দ্রব্য। Al, Si, Na, K, Mg, Cu, Zn, Sn, Au, Hg, Ag, অম্ল, ক্ষার ও লবণ প্রসমন।

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ। গণনাদি।

৬

রসায়নিক প্রক্রিয়াদি—সর্ব্বব্যাপী ; জীবদেহের প্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা ; খাদ্য ও পানীয় ; খাদ্য জীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া ; জীবকোষ ; উদ্ভিদ্ ও প্রাণী ; নিম্নশ্রেণীর জীব ; ক্রমবিকাশ।

৭

শব্দতত্ত্ব ; উৎপত্তি ; পরিবাহন। গতিবেগ ; প্রতিধ্বনি ; সঙ্গীততত্ত্ব। সুর ও সঙ্গতি। অসঙ্গতি ও কম্পন ; সঙ্গীত যন্ত্র। কর্ণ ও তাহার অনুভূতির সীমা। গ্রামোফোন।

৮

জীববিজ্ঞানের মূলসূত্র। চেতন ও অচেতন পদার্থ। কোষ। জীবদেহের কার্য। প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রভেদ।

নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ্।

ভারতীয় (বাংলার) প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সঙ্ঘের বিশেষ সম্পর্কে প্রাণী ও উদ্ভিদের নিবন্ধ।

জীবের ক্রমবিকাশ। জাতির উৎপত্তি।

কৃষি বিজ্ঞানে জীববিজ্ঞানের প্রয়োগ।

৯

• আলোকতত্ত্ব ঃ—উৎপত্তি ; পরিবাহন ; পরিচালন ; স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা ; প্রতিফলন ; প্রতিসরণ ; বিক্ষেপ ; বিশ্লেষণ ; আলোকচিত্র ; নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর আলোকের প্রভাব। জীবদেহের পুষ্টির সহিত আলোকের সম্পর্ক।

১০

চুম্বকতত্ত্ব ; চুম্বক ; সূচিচুম্বক ; বিচ্যুতি ও বিনতি ; চুম্বক ও তড়িৎপ্রবাহের সম্পর্ক ; শক্তিরেখা ; চৌম্বকত্ব উদ্দীপন ; ভূ-চুম্বক ; দিক নির্ণয়। চৌম্বক ও অচৌম্বক দ্রব্য।

১১

তড়িৎতত্ত্ব ; স্থিরতড়িৎ ; উদ্দীপ্তি ; পরিচালন ; নির্ব্বাণ ; বজ্র ; তড়িৎমান ; তড়িৎ উৎপাদন যন্ত্র ; বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ ; তড়িৎ আঘাত নিবারণের উপায় ; তড়িৎচাপ ; তড়িৎপরিমাণ ; তড়িতাধার। তড়িৎপ্রবাহ ; উৎপত্তি ; মূলপ্রবাহ কোষ ; প্রবাহমান ; সঞ্চার ; সঞ্চার-ধর্ম্ম নিয়োগে বিভিন্ন যন্ত্র-নির্ম্মাণ কৌশল। নানাপ্রয়োজনের উপযোগী প্রবাহ ; প্রবাহ সঞ্চয় কোষ ; প্রবাহবেগ ; প্রবাহ চাপ ; প্রবাহ পরিচালক দ্রব্য ও তাহা হইতে ধাতুপ্রভৃতির বিচ্যুতি ; পরিমাণ ; নিয়োগ ; শক্তি-পরিমাণ ; তড়িৎতরঙ্গ উৎপাদন ও উহার ধর্ম্মাদি। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার।

১২

জ্ঞানের একত্ব ; জ্ঞানের সুব্যবহার ও অপব্যবহার। কার্যকরী নিয়োগ ; আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে যে সকল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় তাহাদের স্থূল বর্ণনা ; দেশে ঐ সকল প্রস্তুত করিবার উপায় আলোচনা ; কারখানার কথা ও কুটীর শিল্পের কথা। চাষে উন্নত প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা। সার প্রয়োগ বিচার। মৃত্তিকা পরীক্ষা, কৃত্রিম সার প্রস্তুত।

১৩

প্রাথমিক অঙ্কন ; বাংলা সাহিত্য, সরল ব্যবসায় বিজ্ঞান। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা (ইচ্ছাধীন)

পাঠ নির্দ্দেশ
(উপাধি বিভাগ)

(১)

উচ্চ জ্যামিতি ; জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি ; লগারিথিম্ ; ক্যালকুলাস্ ; ত্রিকোণমিতির মতে পরিমাণ ও তাহার প্রয়োগ ।

(২)

উচ্চ যন্ত্রবিজ্ঞান ও বারি-বিজ্ঞান ; গঠনোপকরণ ও তাহাদের স্থায়িত্ব নিরূপণ ; গঠন পরিকল্পনা ও সম্পাদন ; জলের চাপ ও তাহার নিয়োগ ; ব্যোমযান ; বিমান পরিকল্পনা ও পরিচালনা ।

(৩)

তাপ ; তাপমান ; কেলরিমান ; রূপ পরিবর্ত্তন ; পরিচালনা ; বিকীরণ ; তাপের কার্য্য ক্ষমতা ; তাপ-গতি-বিজ্ঞান ; তাপ চালিত ইঞ্জিন ।

(৪)

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উৎপাদন ও তাহাদের ধর্ম্ম চর্চ্চা ঃ—

O_3 ; H_2O_2 ; ClO_2 ; $HClO_3$; F ; H F ; HNO_2 ; $(NH_2)_2$; এমিড্ শ্রেণীর দ্রব্য সকল ; ইউরিয়া ; H_2SO_3 ; $H_2S_2O_8$; গন্ধক অম্ল প্রস্তুত ; নাইট্রিক অম্ল প্রস্তুত ; বিস্ফোরক উৎপাদন ও প্রয়োগ ; ফস্‌ফরাস্ ঘটিত দ্রব্য সকল ; Sn ; Sb ; Ba ; Ca ; Sr ; Ti ; Si ; Bi ; B ; Pt ; Mn ; Cr ; Ni ; Co ; অঙ্গার ঘটিত দ্রব্য সকল ; রেডিয়াম ; রেডিয়াম ঘটিত দ্রব্য সকল ।

যোজনীয়তা ; আকৃতিক রসায়ন ; আকৃতিক রসায়নের মূল সূত্র ; কণাদল ; বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ; দ্রব্যাদির পরিচয় ; ধাতু নিষ্কাষণ ও অপর ধাতু উৎপাদন ।

(৫)

পৃথিবীর উৎপত্তি ; তারকাদির সঞ্চার বিচার ; মেরু ; সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহ ; তারকার গতি বিচার ; দ্রাঘিমা ও লঘিমা ; গ্রহণ ; বর্ণ বিশ্লেষণ যন্ত্র হইতে শিক্ষা ।

ভূতত্ত্বের যুগ বিভাগ ; ভারতীয় ভূতত্ত্ব ও খনি তত্ত্ব ; খনিজ দ্রব্য আহরণ ও ব্যবহার ; যে সকল খনিজ দ্রব্য এখন ব্যবহৃত হয় না তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিচার ; ম্যাপ প্রস্তুত ও ম্যাপ পাঠ ; খনির মূল্য নিরূপণ। খনিজ আকর হইতে ধাতু নিষ্কাশন।

(৬)

জীববিজ্ঞানের মূল সূত্র ; চেতন ও অচেতন পদার্থ ; কোষ ; জীবদেহের কার্য্য ; প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রভেদ ; নিম্ন ও উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ ; ভারতীয় (বাঙ্গালার) প্রাণী ও উদ্ভিদ সঙ্ঘের বিশেষ সম্পর্কে প্রাণী ও উদ্ভিদের নিবসন ও জীবের ক্রমবিকাশ ; জাতির উৎপত্তি : কৃষি বিজ্ঞানে জীব বিজ্ঞানের প্রয়োগ।

(৭)

শব্দতত্ত্ব ; তরঙ্গগতি ; গতিমাত্রা ; তীক্ষ্ণতা ; সঙ্গীত ; প্রতিফলন ; সংমিশ্রণ ; কম্পন ; দণ্ড, তার, ধাতুপাত্র ও গ্যাসস্তম্ভের কম্পন ; শব্দবৃদ্ধি ; কর্ণ ও তাহার সীমা ; কণ্ঠস্বর ;

(৮)

আলোক ; উৎপত্তি ; প্রতিফলন : পরিমাণ ; আলোকের গতিমাত্রা ; আপেক্ষিক বাদ ; বাধা ; শোষণ ; বর্ণবোধ ; আলোক তরঙ্গের তল-পরিবর্ত্তন ; দ্বি-পরিসরণ ; বিবিধ প্রকারের আলোক ; অজানা রশ্মি।

(৯)

চুম্বক তত্ত্ব ; চুম্বক ক্ষেত্র ; চুম্বকের পরিমেয় ; চুম্বকের ফলিত বল ; চুম্বকক্ষেত্রে কম্পন ; চুম্বক ক্ষেত্রের বল ; ভূচুম্বক ; চুম্বক ঘটিত ঝটিকা।

(১০)

স্থির তড়িৎ ; পরিচালক ও অপরিচালক দ্রব্য ; উদ্দীপনা ; কুলম্বের সূত্র ; তড়িৎক্ষেত্র ; তড়িৎ বাহীতা ; শক্তি ; তড়িৎমান ; তড়িৎযন্ত্র ; বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ।

(১১)

তড়িৎ প্রবাহ ; পরিমেয় ; প্রবাহমান ; প্রবাহজনিত ক্ষেত্র ; প্রতিরোধ ;

(১৪)

ভোল্ট, ওহম, এম্পিয়ার ; জুল সূত্র ; ফ্যারাড়ে সূত্র ; মোটর ; তড়িৎকোষ ও প্রবাহ, অর্থাৎ গ্যাসের ভিতর প্রবাহ সঞ্চালন ; তড়িৎ কম্পন ; বেতার টেলিগ্রাম ও টেলিফোন ।

(১২)

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত নিয়োগ ; মানবের আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদন ; ঔষধ ও রসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ; কাঁচ ; পরিসাধনের দ্রব্যাদি ; আমদানি দ্রব্যের তালিকা ; ইহাদের মধ্যে যে সকল আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না তাহার প্রস্তুত আলোচনা ; যন্ত্র শিল্প ; রঞ্জনশিল্প ; আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য বিচার ; কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তনের বাঞ্ছনীয়তা ; কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার উপায় ; কারখানা পরিকল্পনা ; স্থাপন ও পরিচালনা ।

(১৩)

ইংরাজী বা জার্ম্মান ভাষা ।

Syllabus of Studies

(Diploma Course)

The Universe ; the Earth ; the Skies ; Observation of Heavenly Bodies and Idea of Time ; Inference and Deduction of Laws governing these ; the Earth and its place in the Universe ; Land, Water and Life ; Civilisation ; Geographical divisions.

Civilisation :— origin of ; synonymous with scientific culture , World's first scientist ; Scientific Observation and Inference. The Epics and outlines of History.

2.

Primary Conception ; Length : Area ; Volume ; Mass ; Weight ; Gravity ; Density ; Time.

Measurement of Angles, Areas, Volumes ; Geometry ; Algebra , Subhankari ; Trigonometrical Ratios ; Use of Logarithms

3.

The Three States of Matter ; Body ; Physics , Chemistry . Indestructibility of Matter ; Chemical Combination ; Elements and Compounds ; Atoms and Molecules

4

Simple Mechanical Laws ; Hydrostatics ; Aeronautics and Aeroplanes

5.

Heat : Temperature ; Convection, Conduction, Radiation , Expansion ; Change of State ; Latent Heat ; Mechanical Equivalent of Heat, a form of Energy , Conservation of Energy ; Climatic Changes.

6.

Chemical Elements and Compounds ; Combination Laws ; Gas Laws ; H ; O ; H_2O ; Cl ; Br ; I ; HCl ; HBr ; HI ; N , N_2O ; N_2O_2 , HNO_3 ; NH_3 ; S ; SO_2 ; SO_3 ; H_2SO_4 ; P ; PH_3 ; P_2O_5 ; HPO_3 ; C ; CO_2 ; CO ; Carbon Compounds. Fe ; Al ; Si ; Na ; K ; Ca ; Mg ; Cu ; Zn ; Sn ; Au ; Ag ; Hg. Acids ; Bases ; Salts ; Neutrallisation ; Analysis ; Synthesis and Calculations.

7.

Sound : Production ; Propagation : Velocity : Reflection : Music ; Human

Ear ; Limits of Audibility ; Applications : Gramophone.

8.

Light : Production, Propagation, Transmission, ; Transparency and Opacity ; Reflection ; Refraction ; Dispersion ; Photography ; Spectroscopy : Franhoffer's lines ; X'Rays ; Value in Metabolism.

9.

Principles of Biology ; Living and Non-living ; Cell ; Functions of Living Body ; Difference between Animal and Plant.

Elementary and Higher forms of Animal and Plant Life ; Distribution of Animals with special reference to Fauna and Flora of India (Bengal).

Evolution of Life. Origin of Species. Application of Biology to Agriculture.

10.

Magnetism : the Magnet : the Compass Needle : Declination ; Dip ; Effect of Current on a Magnetic Needle ; Magnetisation ; Lines of Forces ; Earth as a Magnet ; Magnetic Pole.

11.

Electricity : Static : Production, Conduction, Discharge, ; Electroscope ; Electrical Apparatus : Atmospheric Electricity ; Lightning Conductors ; Potential and Quantity ; Condenser ;

Dynamic ; Primary Cells : Potential : Polarisation : Effects of Electric Currents ; Galvanometer : Induction ; Induction Coil ; Dynamo ; Electro deposition of Metals ; Electrolysis : the Secondary Cells

Bell ; Telephone ; Telegraph ; Wireless Telegraphy.

12.

Unity of knowledge ; Use and Misuse ; the Doctor and the Warrior,

Application : articles of daily use imported by us ; consideration about their manufacture ; the factory and cottage industry ; the necessity of introducing scientific knowledge into agriculture, manuring soil testing ; natural and artificial manures ; Manufacture of artificial manure.

13.

Elementary Drawing ; Bengali Literature. English language, (Optional) Principles of Economics).

SYLLABUS OF STUDIES

(Degree Course).

Higher Geometry ; Conics and Trigonometry ; Logarithm ; Principles of Calculus ; Trigonometrical Measurements and their practical application.

2.

Higher Mechanics and Hydrostatics ; Building Materials and Strength of Materials ; Design and Plan of Buildings ; the Principles of Hydraulics and Power-Transmission ; Aeronautics and Aeroplanes.

3.

Heat ; Thermometry ; Calorimetry ; Changes of State , Conduction ; Radiation , Mechanical Equivalent ; Thermodynamics ; Heat Engines

4.

Preparations, properties and uses in arts and manufactures of :—
O_3 ; H_2O_2 ; ClO_2 ; $HClO_3$; F ; HF ; HNO_2 ; $(NH_2)_2$; Amides ; Eurea ; H_2SO_4 ; Manufacturing process of H_2SO_4 , HNO_3 ; Oxides and oxyacids of P, Sn ; Sb ; Ba ; Ca ; Sr, Ti, Si, Bi, B, Pt, Mn, Cr, Ni, Co ; Carbon Compounds ; Radio Activity.

Valency ; Physical Chemistry ; Colloid ; Analysis and detection of Elements and Compounds ; Metallurgy.

5

The Origin of the Earth ; Motion of the Heavens ; Poles ; The Sun and Planets ; Star Observations ; Latitude and Longitude ; The Moon ; Eclipses ; Equation of Time ; Lessons of Spectrum Analysis.

Geological Periods ; Indian Geology and Mineralogy ; Exploitation of Minerals Possibilities ; Geological Tours ; Mapping and Map-reading :- both surface and underground ; Evaluation of Deposits.

6.

Principles of Biology ; Living and Non-living ; - Cell ; Functions of Living Body ; Differences between Animal and Plant ; Higher Forms of Animal and Plant Life.

Distribution of Animals and Plants, with special reference to Founa and Flora of India (Bengal). Evolution of Life ; Origin of Species. Application of Biology to Agriculture.

7.

Sound ; Wave Motion ; Velocity ; Pitch ; Musical Scale ; Reflection ; Interference ; Vibrations of Rods, Strings, Plates, Columns of Gas ; Supply of Energy to the Vibrating Body ; Resonance ; Audition ; Vocal sound.

8.

Light ; Propagation ; Reflection ; Refraction ; Photometry ; Velocity of Light and Relativity ; Dispersion ; Interference ; Special Kinds of Light ; Florescence ; Phosphoresence ; X' Rays.

9.

Magnetism ; Magnets and Magnetic fields ; the Unit Magnetic Pole ; Magnetic Moment ; Vibration in a Magnetic Field ; Terrestrial Magnetism ; Magnetic Records ; Magnetic Storms.

10

Electro Statics ; Conductor and Non-conductors ; Electrification ; Coulomb's Law ; Electric field ; Capacity ; Energy ; Electrometers ; Electrical Machines ; Atmospheric Electricity

11.

Current Electricity ; Units ; Galvanometer ; Field due to a current ; Resistance ; the Volt, Ohm, Amphere ; Joule's Law ; Faraday's Laws ; Induction ; Induced Current ; Motors ; Electro-magnetic Units ; the Primary Cell ; the Secondary Cell ; Passage of Electricity through Gases ; Electromagnets ; Theory of Light ; Electrical Oxillation ; Wireless Telegraphy and Telephony.

12.

Application of the knowledge of science ; Provision for necessities of life ; Manufacture of Drugs and Chemicals ; Food-stuff ; Paper ; Pottery ; Glass and Toilet requisites.

Statistics of Import ; Possibilities of manufacture of such articles ; Manufacture of textiles, dyes and dyeing ; Study of the difference in conditions prevailing here from those prevailing in Western countries ; Necessity of encouraging Home Industries rather than establishment of big factories on the Western ideals ; Development of a Cottage Industry. Planing and Erecting Factories.

13.

Language (English or German).

বিশেষ নৈশ বিভাগ

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা এদেশে নাই; কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা-পিপাসু লোক আছেন। এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ ব্যবসায় প্রভৃতি ব্যপদেশে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধা না পাওয়ায় অনেকে বাধ্য হইয়া চাকুরী জীবন বা অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহারা সহজে নিজেদের বর্ত্তমান কাজ বজায় রাখিয়াও বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, সেই জন্য এই বিজ্ঞান মন্দির একটী বিশেষ নৈশ শ্রেণীর ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহার নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

পাঠ সময় ঃ—সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত। ঋতুভেদে ঐ সময়ের অল্প পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

পাঠকাল ঃ—ইহার পাঠকাল ২৷৷০ (আড়াই) বৎসর কাল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল।

বেতনাদি ঃ—(১) প্রাবেশিক মোট ১৫৲ টাকা

(ক) আবেদনপত্রের সহিত দেয় ৫৲ টাকা

(খ) ভর্ত্তি হইবার সময় দেয় ১০৲ টাকা

২। মাসিক বেতন ৬৲ টাকা

বৈদ্যুতিক আলোক মাসিক ৷৷০ আনা

পরীক্ষাগারে কার্য্য করিবার সময় ১০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

প্রাবেশিক সময় ঃ—শ্রাবণ মাসের শেষভাগে ও বৎসরে মাত্র একবার অধ্যয়নার্থী গ্রহণ করা হয়।

এই বিভাগে কেবলমাত্র প্রাথমিক পাঠ দান করা হইবে। উপাধি বিভাগে উচ্চাঙ্গের পাঠ গ্রহণে কেহ ইচ্ছুক হইলে—তাঁহাকে বিদ্যামন্দিরে ভর্ত্তি হইতে হইবে।

পরীক্ষাগারের স্থান অনুযায়ী কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করা হইবে।

পথ

২য় বর্ষ | বৈশাখ—১৩৩৮ | ১ম সংখ্যা

নববর্ষ

[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্জন]

বঙ্গবাণীর

উদয়শঙ্খ বাজে

মুক্তিনদীর ধারে

কিরণের ঐ পুষ্পভবন রাজে

অন্ধকারের অস্তগিরির সারে।

অঞ্জলি আজ পূর্ণ করো !
জীবন এল তরুণতর
প্রভাত-স্বর্ণরথে
অন্তবিহীন
আনন্দবন
যাত্রারি
জয়পথে !

চূর্ণ ধূলায় আজ মিশে যায়
চৈত্র মেঘের দল,
অঙ্কুরিয়া ধরণী চায়
আনন্দ-চঞ্চল,
হে বীর ! শোনো ! বিষাণ-গানে
যাত্রী চলে অভিযানে
স্বপ্নপারের কূলে,
চির অধীর
কর্ম্মভূমির
ঝঞ্ঝানিলের দোলে !

রৌদ্র ছায়ার ঊর্ম্মিমায়ার
সবুজ দেশের বাসী !
এই গগনে ঢালো তোমার
অসীম জীবনরাশি !
তাপস ওগো ! চাহিছে আজ
সাধন তোমার, কে মহারাজ
অমৃত রাজধানী,
তুমিই শুধু
খুলিবে তাঁর
পূর্ব্ব তোরণখানি !

নিখিল ভূমির মর্ম্মী তুমি ;
কি সে তোমার পণ ?
কর্ম্মগহন বহ্নি চুমি'
ব্রতের উদ্‌যাপন ?
তপস্বি ! তাই তোমার সাজে,
তোমার ধর্ম্ম জগত মাঝে
সবার ধর্ম্ম হবে,—
দৈন্য-দহন
মন্ত্রে তোমার,
পরম রণোৎসবে !

রৌদ্র মেঘের পূর্ণবেগের
সবুজ অধিবাসী !
টঙ্কারিয়া তোল সবের
হৃদয়-ধনুর হাসি !
নগর প্রাসাদ পল্লী কুটীর
ভরুক তার ঐ ফুল-মুঠির
সংগ্রামেরি বাণে
জলে স্থলে
অনিল নীলে
সার্থক এ সন্ধানে !

বন মরু আর সাগর পাহাড়,
জানা ও অজানা,
সকল নিয়ে বুকে, তোমার
রণেরি আস্তানা !
সকল জাতির ঘামের জলে
ফুটবে তীর্থ-কমল-দলে
হৃদয় দেহে মনে
শক্তি-অভয়
সাধন তোমার
অক্ষয় ও যৌবনে !

মুক্ত করো মুক্তিধর ! ও
তপোতলোয়ার
স্পর্শে তারি ভিন্ন করো
কর্ম্মশালার দ্বার !
ঐ অসিতে সন্ধ্যা প্রাতে
জাগাবে প্রাণ মৃত্তিকাতে,
সঞ্চারিয়া স্নেহ,
সঞ্জীবনীর
নির্ঝরিণীর
ঘুচায়ে সন্দেহ !

কন্যারূপে, বধূরূপে
সকল ক্ষতের দাগ
মুছিয়ে, নাও প্রাণ স্বরূপে
কর্ম্ম যজ্ঞ ভাগ!
মাতৃরূপে অনুপম ও
হও মা! হোমের হবি সম,
দগ্ধি আপনারে,
সকল ধ্রুব
দাও বিতরি'
অমর এ সংসারে!

তোমার নামে মর্ত্ত্যধামে
মূর্ত্ত হবে সবি,
চেতন-গানের স্বরগ্রামে
নইবে উপদ্রব-ই!
অণু হতে নভোধারায়
আঁধার গুহায়, সূর্য্যে তারায়
স্বচ্ছন্দ গৌরবে
রথচক্র
চলবে, তোমার,
নিঃশব্দে নীরবে!

মানব লোকের চির দুখের
চির শোকের তটে
শ্যামল! বাজাও তূর্য্য, দেশের
প্রতি বংশীবটে!
নরনারীর অশ্রুধারা,
উজানে আজ বহুক তারা,
বক্ষশোণিত হয়ে,
ফুটে উঠুক
রত্নমালায়
কর্ম্মেরি সঞ্চয়ে!

ভাষা তোমার আশা তোমার
তোমার নিবিড় গৃহ
অলুণ্ঠনে নিক উপহার
অনন্ত সমীহ !
বন্দী রবে প্রেমজালে
বসুন্ধরা, চিত্তশালে ;
তোমার অস্ত্রাগারে
পূর্ণ রবে
জ্ঞান ও কর্ম্ম,
আনন্দ সম্ভারে

জীবনসূত্র হে রাজপুত্র !
রইবে মালার তরে !
গাঁথবে তাতে সাত সমুদ্র
কৌতূহলের ভরে !
অশথেরি ছায়ার তলে
গাঁথবে সে হার প্রতিপলে,
সিক্ত প্রতি ক্ষণে
অরূপেরি বন্দনারি
আরতি চন্দনে !

হে সন্ন্যাসি ! বিশ্বগ্রাসী
সাম্রাজ্য সে হবে !
কেউ রবেনা ক্ষুদ্র, আসি'
মিলিবে আহবে !
অখিল প্রাণের শান্তি খানি
গচ্ছিত সে রবে জানি
তব সিংহাসনে,
তোমার বিপুল
কর্ম্ম সভার
পুণ্য তপোবনে !

চলো চলো দ্রুত চলো
এই জগতের পথ,
ছুটুক তোমার সুনির্ম্মল ও
রণের মনোরথ !
বজ্র হাতে রশ্মি তুলি
চালাও উজল অশ্বগুলি,
পৃথ্বিখানি ঘিরে'
শ্বেতকেতন
উড়াও
ভুবন-বেদন-সিন্ধুনীরে !

উদয়াচল গঙ্গারি জল
কল্লোলিয়া গায়,
পাষাণ ভেদি ঝরে উতল
সহস্র ধারায় !
সেই ধারারি প্রাতঃস্নানে
উঠুক ধ্বনি তোমার গানে
এই বরষের বুকে,
মরণ হরণ পুণ্য আলো
অভিষেকের দীপ জ্বালালো
মহোৎসুক ঐ সুখে !
হে মোর সাধক ! প্রাণ আরাধক !
মানবেরি মুক্তি পাবক !
তোমার নবীন
কর্ম্মবরণ
কালের জ্যোতিলোকে !

রঞ্জেন রশ্মির ইতিহাস

[শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী]

বর্ত্তমান যুগে 'এক্স-রেজ' বা রঞ্জেন রশ্মির নাম কাহারও নিকট অবিদিত নয়। ইহার গুণের সহিত জগতের সভ্যসমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই সুপরিচিত। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহা এত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যে কোন আধুনিক হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম রঞ্জেন রশ্মির যন্ত্রপাতি ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না। যুদ্ধে মানবজীবন নষ্ট করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের দরকার, আবার আহতের জীবন রক্ষার নিমিত্ত রঞ্জেন রশ্মিও অত্যাবশ্যক। গত মহাযুদ্ধে ইহা কত আহত সৈনিকের যন্ত্রণা লাঘব করিয়াছে ও কত সৈনিকের প্রাণদান করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অস্ত্রচিকিৎসা বিভাগে ইহা একরূপ অপরিহার্য্য, তাহা ছাড়া সাধারণ রোগ নির্ণয় কার্য্যেও ইহা চিকিৎসকগণের বিশেষ সহায়ক। এই কল্যাণকর অদৃশ্য রশ্মির প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয়ের ইতিহাস এবং যে মহাপণ্ডিত এরূপ অপূর্ব্ব বস্তু জগতকে দান করিয়া সমস্ত মানবসমাজকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সেই উইল্‌হেল্‌ম্‌ রঞ্জেনের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

১৮৪৬ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে জার্ম্মানীর লেন্যেপ্‌ সহরে উইল্‌হেল্‌ম্‌ রঞ্জেন (১নং চিত্র) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইত। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি হলাণ্ডের ইউট্রেক্ট্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য গিয়াছিলেন। ইউট্রেক্ট্‌ রাইন্‌ নদীর তীরে অবস্থিত, এবং ইহার অপর পার হইতে রঞ্জেনের জন্মস্থান লেন্যেপ্‌ সহরের ব্যবধান সামান্য বিশ মাইল মাত্র। ইউট্রেক্টের শিক্ষা শেষ হওয়ার পর রঞ্জেন সেই সময়কার শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র সুইজর্‌লাণ্ডের জুরিক্‌ সহরে গমন করিয়া ১৮৬৯ সালে জুরিক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের

১নং চিত্র।

উইল্‌হেল্‌ম্‌ রঞ্জেন

ডি, এস্-সি উপাধি গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন হইতে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের বিশেষতঃ তাড়িতবিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, এবং ঐ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জুরিক্ ত্যাগ করিবার পর কিছুদিন ভ্যুর্জবুর্গ ও ষ্ট্রাস্‌বুর্গ্ সহরে পদার্থ-বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় ষ্ট্রাস্‌বুর্গ্ সহর ফ্রান্সের অধিকার মুক্ত হইয়া পুনরায় জার্ম্মানীর হস্তগত হওয়ার পর নানাবিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছিল। ১৮৭৬ সালে রঞ্জেন ষ্ট্রাস্‌বুর্গ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইলেন ও এখানে তিন বৎসর কার্য্য করিবার পর পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়া 'গিছেনে' গমন করিলেন এবং সেখানে নানাবিষয়ে গবেষণার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৮৫ সালে তিনি পুনরায় ভ্যুর্জবুর্গ সহরে চলিয়া গেলেন। এখানে দশ বৎসরকাল অধ্যাপনা ও নানাবিষয়ে গবেষণা করিতে করিতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি জগদ্বিখ্যাত রঞ্জেন রশ্মি আবিষ্কার করিলেন।

কিরূপে এই অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কৃত হইল তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে সেই সময়কার বৈজ্ঞানিক জগতের সংবাদ জানিবার বিশেষ আবশ্যক। এই সময়ে সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় বায়ুশূন্য কাচনলের ভিতর তাড়িতপ্রবাহ চালাইলে যে এক নূতন রশ্মির উদ্ভব হয়, তাহারই বিষয়ে নানা গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপারটি এইরূপ,— ২নং চিত্রে দেখুন একটি কাচের নলের দু প্রান্তে কাচের ভিতর দিয়া দুইটি তার সংযুক্ত আছে, এবং ঐ নলমধ্যে তারের সহিত একটি করিয়া ক্ষুদ্র ধাতুফলক সংলগ্ন আছে। এখন ঐ নলের ভিতরে তাড়িতপ্রবাহ সহজে চলিবে না, কারণ বায়ু তাড়িত-অপরিচালক; কিন্তু বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রদ্বারা নলকে ক্রমে বায়ুশূন্য করিলে নলমধ্যস্থ বায়ুর চাপ কমিয়া আসিবে, এবং তখন নলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করিবে। ক্রমে নলমধ্যস্থ বায়ুর চাপ হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেহারাও পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। প্রথমে নলের অভ্যন্তর রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রভায় ভরিয়া যায়। অবশ্য এই রং অবরুদ্ধ বাষ্পের উপর নির্ভর করে। বায়ুর পরিবর্ত্তে উদ্‌জান্ বা অঙ্গারক ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বাষ্প হইতে বিভিন্ন রঙের আলোক বাহির হয়। তাহার পর বায়ুর চাপ আরও হ্রাস করিলে ক্রমে রঙ্গীন আলো অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং 'ব্যাটারী'র বিযুক্তাত্মক প্রান্তের সহিত সংলগ্ন

২নং চিত্র।

নলমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ধাতুফলক (যাহাকে আমরা বিযুক্ত-তাড়িতদ্বার বলিব) হইতে বেগুনী রঙের আলোক-রশ্মি নির্গত হইয়া বিপরীত প্রান্তে ধাবিত হয়। এই আলোক নলগাত্রে পড়িলে সেস্থান হইতে একরূপ সবুজ প্রভা নিঃসৃত হয়।
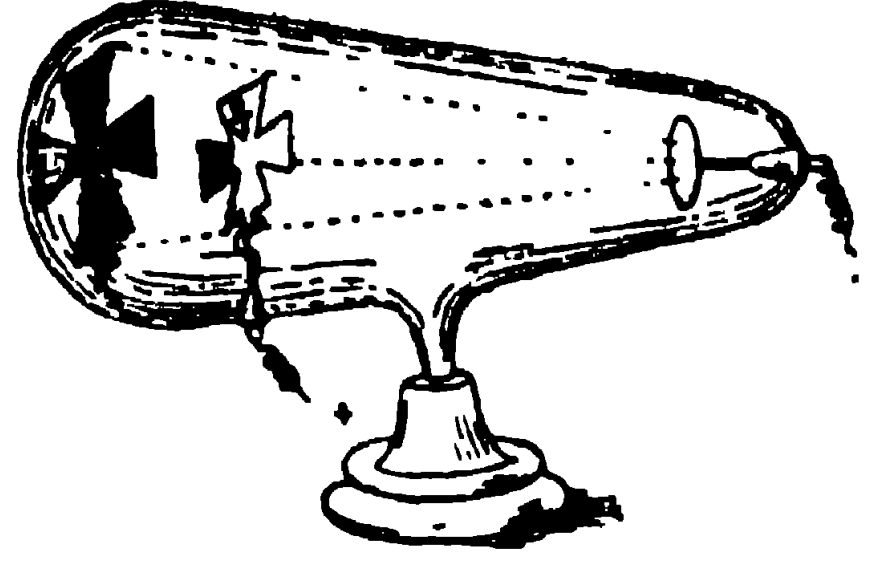
খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উইলিয়ম্ মর্গান্ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডেভি, ফ্যারাডে, প্ল্যাকের, হিটর্ফ, গোল্ডষ্টাইন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই অদ্ভুত আলোকরশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় বিষয়ে নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। বিযুক্ত-তাড়িতদ্বার হইতে নির্গত বলিয়া গোল্ডষ্টাইন্ ইহার নাম দিলেন বিয়োগরশ্মি। ১৮৭৯ সালে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ ইহার বিষয় অনেক আবশ্যকীয় তথ্য আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার নামানুযায়ী এই রশ্মি উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচগোলকের নাম হইল ক্রুক্স্-গোলক। উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ দেখিলেন যে, এই রশ্মি কাচের উপর পড়িলে উহা হইতে এক প্রকার আলোক নির্গত হয়, এবং ক্রুক্স্-গোলক মধ্যে ঐ রশ্মিপথে রক্ষিত 'ধ' ধাতু-ফলকের পশ্চাতে ঐ ফলকের সুস্পষ্ট 'চ' ছায়া পড়ে (৩নং চিত্র)। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই রশ্মি সরল পথে ধাবিত হয়। তিনি আরও দেখিলেন যে, চুম্বকদ্বারা এই রশ্মিপুঞ্জকে সরলপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারা যায়। ইহাই অতি আবশ্যকীয় পর্য্যবেক্ষণ। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিয়োগরশ্মি বিযুক্ততাড়িত ভারবাহী সূক্ষ্মজড়কণা সমষ্টিমাত্র। আমরা সকল জড়দ্রব্যকে সচরাচর কঠিন, তরল ও বায়ব্য এই তিন অবস্থায় দেখিয়া থাকি, কিন্তু এই জড়কণাগুলিতে ইহাদের কোন অবস্থার লক্ষণই দেখা যায় না। সেজন্য ক্রুক্স্ ইহাদের এক নূতন অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থার কল্পনা করিলেন।

৩নং চিত্র।
ক্রুক্স্-গোলক।

ক্রুক্সের আবিষ্কার লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল। সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণই ইহা লইয়া নানা পরীক্ষায় ব্যস্ত রহিলেন। বিয়োগ-রশ্মি বিষয়ে ক্রুক্সের পর্য্যবেক্ষণগুলি সম্বন্ধে যদিও কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত কেহই স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। বিয়োগরশ্মি যে জড়কণার সমষ্টি ইহা হিটর্ফ স্বীকার করিলেন না, এবং অনেক জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকই তাঁহার মতে মত দিলেন।

বেহালার তারের উপর ছড় টানিলে ঐ তার কম্পিত হইয়া ঐ কম্পনদ্বারা বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই বায়ুতরঙ্গ আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ে আঘাত করিলে আমরা শব্দ বা সুর শুনিতে পাই। বায়ু কম্পনদ্বারা যেমন শব্দের উৎপত্তি, ঈথর নামক এক প্রকার দ্রব্যের কম্পনদ্বারাও সেইরূপ দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল প্রকার আলোকই উৎপন্ন হয়, ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের মত। তাঁহারা বলেন যে, ঈথর একটি সম্পূর্ণ ভারহীন ও স্থিতিস্থাপক দ্রব্য যাহা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র এমন কি সকল দ্রব্যের অণুপরমাণুর অন্তরাল পর্য্যন্ত অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। কোন দ্রব্য উত্তপ্ত বা প্রজ্বলিত হইলে তাহার অণু-পরমাণুগুলি কম্পিত হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান ঈথর-

সমুদ্রে কম্পনের সৃষ্টি করে। এই কম্পনদ্বারা উৎপন্ন ঈথরতরঙ্গ ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর পতিত হইলে আমরা দেখিতে পাই। অবশ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঈথর-তরঙ্গই আমাদের দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না। যে সব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ৭২০০০ হাজার অংশের এক অংশ অর্থাৎ ৭২০০০ সংখ্যক যেরূপ তরঙ্গ পাশাপাশি রাখিলে মাত্র এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান অধিকার করে সেই তরঙ্গদ্বারা আমাদের চক্ষু বেগুনী রঙের আলোক উপলব্ধি করে; এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $\frac{১}{৪০০০০}$ ইঞ্চি হইলে তাহাদ্বারা লাল আলোক দেখি। নীল, সবুজ, পীত ইত্যাদি অন্য রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এই দুই সংখ্যার মধ্যবর্ত্তী। অবশ্য ঈথর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য $\frac{১}{৪০০০০}$ ইঞ্চি অপেক্ষা বৃহৎ ও $\frac{১}{৭২০০০}$ ইঞ্চি অপেক্ষা ক্ষুদ্রও হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু ঐ সকল ঈথরতরঙ্গ তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না। সেজন্য উহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। সত্যই অদৃশ্য ঈথরতরঙ্গের তুলনায় দৃশ্য তরঙ্গ সংখ্যা নগণ্যমাত্র। চক্ষুদ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব না ধরিতে পারিলেও অন্য উপায়ে জানিতে পারা যায়। যেমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\frac{১}{৪০০০০}$ ইঞ্চি অপেক্ষা বৃহৎ হইলে তাহাদের অস্তিত্ব তাপ উৎপাদন এবং অন্য উপায়দ্বারা জানা যায়, এবং $\frac{১}{৭২০০০}$ ইঞ্চি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে তাহাদের অস্তিত্ব ফটোগ্রাফের কাচের উপর রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা ও অন্যান্য উপায়েও জানিতে পারা যায়।

যাহা হৌক হিট্‌র্ফ, গোল্ডষ্টাইন্ প্রভৃতি জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন যে, বিয়োগরশ্মি সাধারণ আলোকের ন্যায় ঈথরতরঙ্গ উদ্ভূত। তাঁহারা ক্রুক্‌সের মতে মত দিলেন না। পরে জার্ম্মান অধ্যাপক হার্‌ত্জ্ ও তাহার ছাত্র লেনার্ডের পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাদের মতই সমর্থিত হইল। ১৮৯৪ সালে লেনার্ড্ দেখাইলেন যে, বিয়োগরশ্মি খুব পাতলা স্বর্ণ বা য়্যালুমিনিয়ম ফলক ভেদ করিয়া যাইতে পারে। তাঁহারা বলিলেন, ইহা যদি জড়কণা সমষ্টি হইবে তবে ধাতুফলক কি প্রকারে ভেদ করিবে? বরং ঈথরতরঙ্গের পক্ষে ধাতুফলক ভেদ করা সহজ। সুতরাং লেনার্ডের পরীক্ষা বিয়োগরশ্মি ঈথরতরঙ্গ উদ্ভূত এই মতবাদিগণের ধারণা আরও বদ্ধমূল করিল। কিন্তু ১৮৯৫ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক জীন পেরীণ্ ক্রুক্‌সের মত সমর্থন করিলেন। তিনি তাড়িতশক্তিদ্বারা বিয়োগরশ্মিপথ বক্রীকৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে ইহা বিযুক্ত-তাড়িতযুক্ত জড়কণার সমষ্টি। যদিও অনেকেই পেরীণের পরীক্ষায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, তথাপি ঈথরতরঙ্গবাদী একদলের সন্দেহ ঘুচিল না, সুতরাং তর্কবিতর্কও থামিল না।

বৈজ্ঞানিক জগতে সকলেই যখন এই অদ্ভুত রশ্মির প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট সেই সময়ে জার্ম্মানীর ভ্যুর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক উইল্‌হেল্‌ম্ রঞ্জেন্‌ও একই বিষয় লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৯৫ সালে একদিন ক্রুক্‌স্-গোলক (৪নং চিত্র)
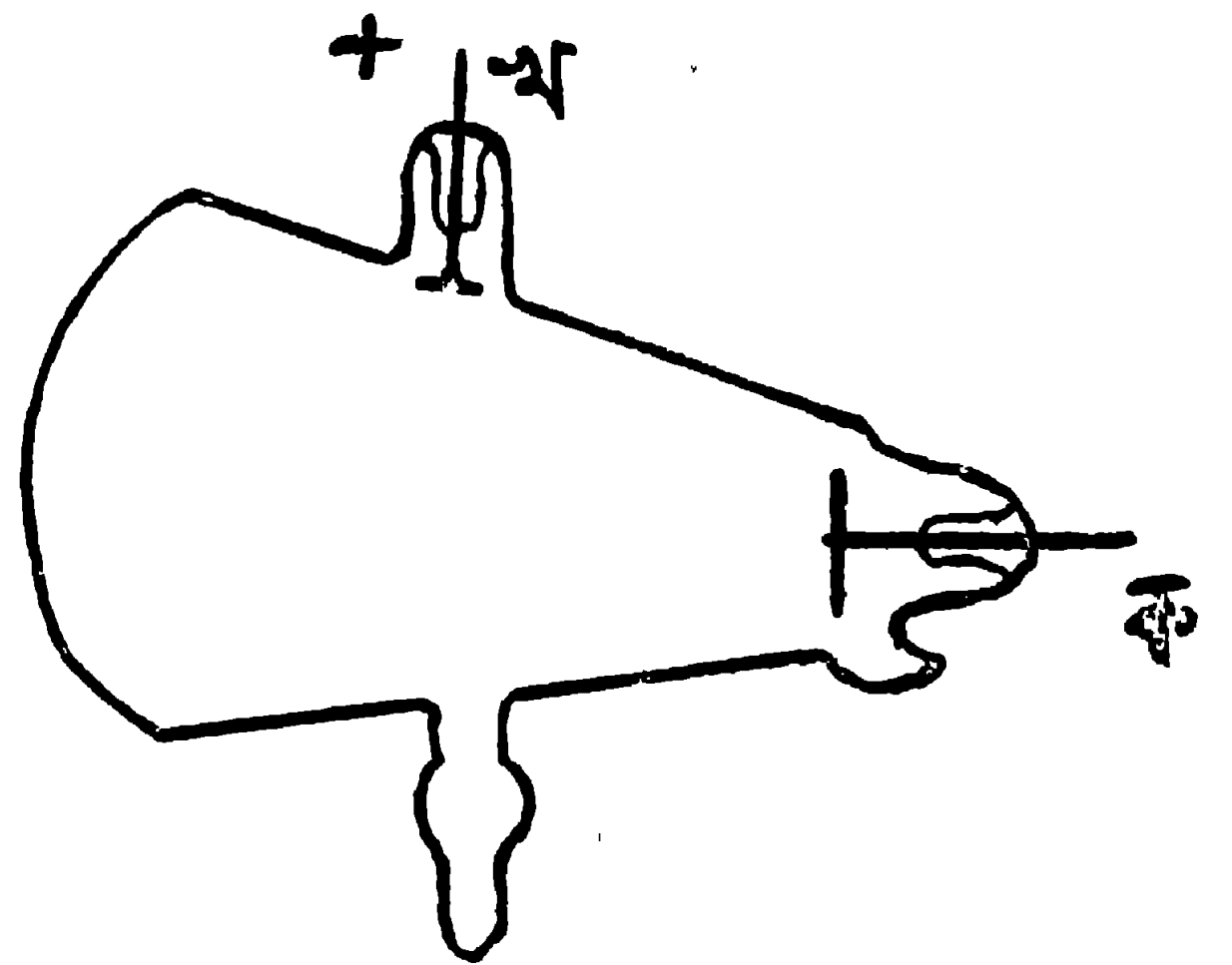
রঞ্জেনের ব্যবহৃত কাচগোলক (৪নং চিত্র)।

লইয়া পরীক্ষাকালে তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন যে, গোলকপার্শ্বে রক্ষিত 'বেরিয়ম্ প্লাটিনোসাইনাইড্' নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ বিলেপিত একখণ্ড মোটা কাগজ দীপ্তিমান হইয়া উঠিল; কিন্তু কোথা হইতে আলোক আসিয়া উহাকে উজ্জ্বল করিল তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না। পরীক্ষা-গৃহের দরজা জানালার প্রত্যেক ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া এবং রশ্মিগোলককে কৃষ্ণবর্ণ কাগজে আচ্ছাদিত করিয়াও কোন ফল হইল না। শেষে দেখিলেন যে রশ্মিগোলক ও কাগজখণ্ডের ভিতর কিছু রাখিলেই কাগজের উপর তাহার ছায়া পড়িতেছে। এইরূপে তিনি স্থির করিলেন, গোলক নিঃসৃত রশ্মিই ইহার কারণ। এইবার ঐ রশ্মিগোলক আরও স্থুল কাগজে আচ্ছাদিত করিয়া এবং গোলক ও কাগজখণ্ডের ভিতর মোটা বই রাখিয়া দেখিলেন যে কোনই পার্থক্য নাই, কাগজখণ্ড পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্তিমান আছে। ইহা অতি আশ্চর্য্য মনে হইল। রঞ্জেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এইরূপ অদ্ভুত রশ্মি কিরূপে আসিল কাল কাগজ বা মোটা পুস্তক প্রভৃতি অস্বচ্ছ দ্রব্য যাহার পথ রোধ করিতে সমর্থ হয় না! আরও কৌতূহলী হইয়া তিনি চামড়া, কাষ্ঠ ও নানাবিধ ধাতব দ্রব্য রশ্মিপথে রাখিয়া দেখিলেন যে কিছুই সম্পূর্ণরূপে ইহার পথ রোধ করিতে সমর্থ হয় না। অবশেষে ঐ রশ্মিপথে (৫নং চিত্র) তাঁহার হাত রাখিয়া দেখিলেন 'বেরিয়ম্ প্লাটিনোসাইনাইড্' বিলেপিত কাগজখণ্ডের উপর উহার ছায়াচিত্র পড়িয়াছে। চিত্রে দেখিলেন যে ঐ অদৃশ্য রশ্মি হস্তের অস্থি ভেদ করিতে পারে নাই বলিয়া উহার ছায়া মাংসল অংশের ছায়া অপেক্ষা গাঢ়তর। মাংসল অংশের ভিতর দিয়া রশ্মি ভেদ করিয়া যাওয়ায় ঐ অংশের ছায়া হাল্‌কা হইয়াছে। এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার যে জগতের মহদুপকারে লাগিবে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন।

৫নং চিত্র।
লর্ড কেলভিনের হস্তের আলোকচিত্র

রঞ্জেন এই নূতন রশ্মির নানা বিস্ময়কর ধর্ম্ম দেখিলেন বটে, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ইহার নামকরণ করিলেন "এক্স-রেজ্" বা অজ্ঞাত রশ্মি।

(ক্রমশঃ)

বিদেশী ভাষার বিষময় ফল

[শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী]

বিদেশী বস্ত্র, বিদেশী কলকব্জা, বিদেশী লবণ, চিনি, গাড়ী, খেলনা ও বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্যে ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছে। তাহাতে কি পরিমাণ অর্থ দেশ হইতে চিরতরে চলিয়া যাইতেছে তাহার সীমা নাই। তথাপিও আমরা সরকারী দপ্তরখানা হইতে ইহার পরিমাণের একটা হিসাব কোন রকমে দাড় করাইতে পারি। কিন্তু বিদেশী ভাষার লোণা-জল আমাদের দেশের, সমাজের ও ব্যক্তির জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ইহাকে যে পরিমাণে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে-তাহার হিসাব আজ আমাদিগকে করিতে হইবে। 'এ, বি, সি,' ফার্ষ্ট বুক রীডার হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন স্তরের সাহিত্যের, বিজ্ঞানের ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যে মূল্যবান পুস্তক সকল ইংরাজী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত এবং বিলাতের পুস্তকবিক্রেতাগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া ভারতবর্ষের সুদূর পল্লীগ্রামের পর্ণকুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক মহকুমা, নগর ও সহরের প্রাসাদ পর্য্যন্ত প্রচলিত হইতেছে তাহার জন্য বৎসরে যে কয়েক কোটী টাকা বিদেশে চিরতরে নির্ব্বাসিত হই-তেছে তাহার হিসাব না হয় কোন রকমে কাগজে কলমে বাহির করা গেল! কিন্তু তাহার জন্য দেশের জনগণের যে রক্তস্রোত জলস্রোতে পরিণত হইয়া আমাদের জীবনকে হীনবীর্য্য করিয়া দিতেছে তাহার হিসাব কে দিতে পারে? চাকুরীর জন্য যে ইংরাজীভাষা বা ফরাসী-ভাষা শিখিল সে না হয় আত্মবলি দিলই। কিন্তু যে সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত যুবকগণ জড় বিজ্ঞান ও পূর্ত্ত-শিল্পাদি কার্য্য শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পুস্তকের অভাবে আর একটি নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টী কাটাইয়া দিয়াও অভীষ্ট ফললাভে সক্ষম হইল না তাহার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা যাহারা ইংরাজের নিকট হইতে কেবলমাত্র তাহাদের দোষগুলি গ্রহণ করিয়া তাহাদের গুণগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

আমরা যদি দেশের কোন এক ব্যক্তির এখনকার জীবনযাত্রার ও শিক্ষার প্রণালী অনুধাবন করি, তাহা হইলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে বিদেশী ভাষার ক্ষয়বিষ কি ভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। অবশ্য আমাদের জাতীয় জীবনের অদ্ভুত শক্তি ইহাকে কতকটা হজম করিয়া লইয়া কার্য্যে লাগাইলেও অধিকাংশস্থলে পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইয়া ইহার বিষক্রিয়ায় সমাজ-জীবন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে ৫ বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ হইল। ৭।৮ বৎসর বয়সে বাংলা ভাষায় "কথামালা" বা চতুর্থ শিক্ষা শেষ হইতে না হইতেই আমাদের দেশের ছেলেদের পণ্ডিত (?) (পণ্ডিতই বলিতে হইবে, কারণ এত অল্প বয়সে দুইটী ভাষা শিক্ষা আর কোথাও হয় না) করিবার জন্য চক্‌চকে এ, বি, সি, ডির পুস্তক ঘরে আসিল। প্রথম অবস্থায় ছেলের মুখে, ছেলের মাতাপিতার মুখে

হাসির রেখা দিল। ছেলে মানুষ হইতেছে; কারণ ছেলে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে। যাঁহাদের টাকা আছে ও মুসাবিদার জোর আছে তাঁহারা ভাবিলেন ছেলে "মুন্সেফ" বা "সাব ডেপুটী" হইবে। পরে জজও হইতে পারে। আর যাঁহারা আফিসের কেরাণী তাঁহারা ভাবিলেন ছেলে বড়বাবু হইবে। কিন্তু কেহ কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কি বিষপাত্র তাঁহারা স্বহস্তে তাঁহাদের সন্তানের মুখে তুলিয়া দিলেন। ছেলে বড় 'বৈজ্ঞানিক' হইবে, ধনী 'ব্যবসাদার' হইবে, উচ্চাঙ্গের 'দেশসেবক' বা ইঞ্জিনিয়ার হইবে এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নাই। নিজেদের ছেলেদের তাঁহাদের ক্ষুদ্র অভিলাষ বা চিন্তার ডোরে বাঁধিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না। যে সময়ে ইংরাজের ছেলেরা নিজেদের মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মনের আনন্দে ও ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া জীবনের দিনগুলি কাটায়, তখন আমাদের দেশের ছেলেরা নিজেদের মা বোনদের অবোধ্য ভাষা চর্চ্চা করিতে করিতে গলদ-ঘর্ম্ম হইয়া তিলে তিলে নিজ নিজ জীবনীশক্তি বিসর্জ্জন দিতে থাকে। ইংরাজের ছেলেরা যখন ১৩/১৪ বৎসর বয়সে কোন একটি বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জনে মনোযোগী এমন কি, তাহাদের অনেকে ঐ বয়সে উপার্জ্জনক্ষম হয় সেই সময় আমাদের দেশের ছেলেরা হয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজীভাষার ইংরাজীতে, অথবা সংস্কৃতভাষার ইংরাজীতে কিম্বা অঙ্কশাস্ত্রের ইংরাজীতে অকৃতকার্য্য হইয়া আত্মীয়স্বজন ও সমাজের নিকট লাঞ্ছনা ও অসম্মান প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া দিন কাটাইতে থাকে। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে, সে সময়ে তাহাদের মধ্যে যাহারা যে পরিমাণ মনুষ্যত্ব ও জীবনীশক্তি বজায় রাখিয়া বহির্গত হইল সে সেই পরিমাণেই জীবনকে সফল করিয়া তুলিল। তারপর ১৮ হইতে ২২ বৎসর বয়সে যখন ইংরাজ তাহার জীবনের পূর্ণ বৃদ্ধির গৌরবে যৌবনের পরিপূর্ণ আনন্দে মাতিয়া তাহাদের প্রাণের স্পন্দনে ও কর্ম্মশক্তিতে সারা দুনিয়া কম্পিত করিয়া তুলিল, তখন আমাদের দেশের ভাল ছেলেরা 'টবে' রক্ষিত অর্দ্ধ-শুষ্ক পত্রাদি শোভিত বৃক্ষের ন্যায় অগঠিত দেহকান্তি লইয়া বি, এ, পাশ করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণান্ত প্রয়াস করিতেছে। তারপর ইংরাজের যুবক ও প্রৌঢ়গণের প্রাণের উপর স্বাধীন বৃষ্টিপাতে জীবনের অদম্যলীলা, প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় সগর্ব্ব জীবনযাত্রা ও পরিণত বয়সে মৃত্যু। আর এদেশের ছেলেদের তখন চাকুরীর দরখাস্ত হাতে ছুটাছুটি, জীবনের কয়টা দিবস কোনরকমে কাটাইয়া ৪০ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুচিন্তা আরম্ভ হয়। উপরে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল তাহা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলেও সাধারণ ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ একটি জীবনযাত্রার আশায় পণ্ডিত আমরা ৮ বৎসর বয়স হইতে দুইটী ভাষা সমানভাবে শিক্ষা করিয়াও অন্নহীন। কিন্তু মূর্খ বিদেশীরা, কেবলমাত্র নিজেদের ভাষায় শিক্ষিত (অধিকাংশস্থলে অশিক্ষিত) আমাদের মুখের অন্ন লইয়া গিয়া নিজেরা সমৃদ্ধ হয়।

ইহাও বিষক্রিয়ার একটি লক্ষণ। অপরপক্ষে এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করায় আমাদের মধ্যে জনসাধারণের ও এই ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে একটি যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে তাহারও একটি ধ্বংসকারী পরিণাম আছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজ জীবনের ৫২ বৎসরব্যাপী সাধনার দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে পুস্তক হইতে লাভ করা যায় না। ভগবানের যে বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার রহিয়াছে কোনরূপ পুস্তক পাঠ না করিয়াও প্রত্যেক মানবই প্রকৃত সরল, সজীব ও মনুষ্যোচিত জীবনযাপন দ্বারা সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। পুস্তকে কেবলমাত্র সেই অসীম জ্ঞান-

ভাণ্ডারের কণিকা সকল লিপিবদ্ধ থাকে। তাহাতে নিজেদের উপলব্ধ জ্ঞানের সহিত পূর্ব্বেকার কোন ব্যক্তির উপলব্ধিকে মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। অথবা অপরের উপলব্ধ ও পরীক্ষিত জ্ঞানকে—নিজে পুনরায় আয়ত্ত করিয়া কার্য্যকরী করা যাইতে পারে। শেষোক্ত বিষয়ের জন্যই বিশেষ ভাবে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হয়। আর যত সহজেই সে শিক্ষালাভ করা যায় তাহারই ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই না এক ভারতবর্ষ ছাড়া অপর সকল দেশেই মাতৃভাষাতেই সকল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বা সেইরূপ চেষ্টা হইতেছে।

এতদিন আমরা এই বিদেশী ভাষার মোহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রকৃত কোন চেষ্টা করি নাই। বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের ও অল্প কয়েকটী দেশের সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এই মাতৃভাষার মধুর রস হইতে নিজদিগকে কখনও বঞ্চিত করেন নাই। শক্তিমান সরল শিশু যেমন প্রাণান্ত হইবার ভয়ে অথবা কোন প্রকার লোভের বশবর্ত্তী হইয়াও তাহার মাতৃস্তন পরিত্যাগ করে না, ইঁহারাও সেইরূপ মাতৃভাষার শীতল ক্রোড় হইতে নিজেরা কখনও বিচ্যুত হয়েন নাই বা প্রাণদায়ী মাতৃক্ষীরধারা হইতে নিজদিগকে কখনও বঞ্চিত করেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা সে পথ পরিত্যাগ করেন নাই ও যে পথে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ, তাহা অতি দৃঢ়তার সহিত দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহার জন্য দেশ তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আর দেশের বালকগণকেও এই বিষবৃক্ষের ফল গ্রহণে বিরত হইতে হইবে।

অজৈব রসায়ন

[শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়]

দহন

একটি জলপাত্রে ছোট একটি মুচি ভাসাইয়া তাহার উপর একখণ্ড ফস্ফরস্ রাখা হইল। একটি তার উত্তপ্ত করিয়া ফস্ফরসটীকে স্পর্শ করাইলেই উহা জ্বলিয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ মুচিটী জলের উপরই একটি সিলিণ্ডার দিয়া আবৃত করা হইল। ফস্ফরস্ জ্বলিতে থাকে ও গাঢ় শ্বেতবর্ণ ধূম নির্গত হইয়া সিলিণ্ডারের গাত্রে প্রলিপ্ত হয়। নিবিয়া গেলে সিলিণ্ডারের ভিতর জল অল্পে অল্পে উঠিতে থাকে, অর্থাৎ সিলিণ্ডারটীর ভিতর আবদ্ধ বায়ু হইতে কিয়দংশ অপসৃত হইয়াছে বুঝা যায়। সিলিণ্ডারটীর আয়তন চিহ্নযুক্ত হইলে দেখা যাইবে যে, দহনের পর অবশিষ্ট গ্যাসের আয়তন, পূর্ব্বের আয়তনের $\frac{৪}{৫}$ অংশ (২৫নং চিত্র)।

সিলিণ্ডারটীর মুখ বন্ধ করিয়া উত্তোলন করা হইল। আবদ্ধ গ্যাসটীর ভিতর একটি দীপশিখা প্রবেশ করিলে সেটী নিবিয়া যায়। গ্যাসটীও জ্বলে না। সুতরাং বায়ু হইতে দহনসহায়ী কোনও গ্যাস অপসৃত হইয়াছে। এই অপসৃত গ্যাস আমাদের পরিচিত অম্লজান। সিলিণ্ডারের গ্যাসটী নাইট্রোজেন। বায়ু প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অম্লজান গ্যাসের মিশ্রণ। আয়তনে ৪ ভাগ : ১ ভাগ।

নাইট্রোজেন

মুচি

জল পাত্র
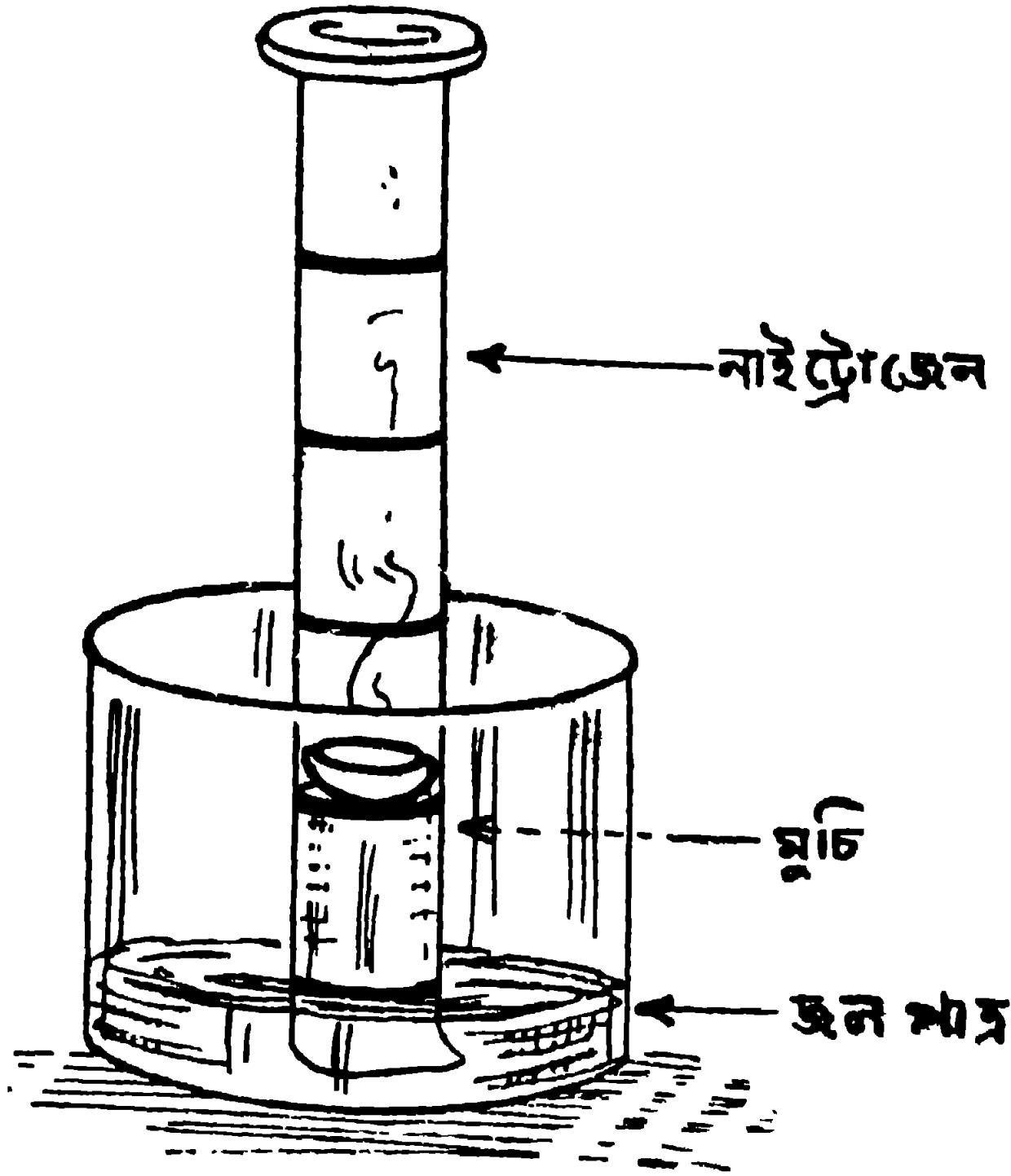
২৫নং চিত্র।

সাধারণ দহনক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে অম্লজানযোগ। ফস্ফরস্ দহনে ফস্ফরসের সহিত অম্লজান সংযুক্ত হইয়া ফস্ফরস্-পঞ্চাম্লজান উৎপন্ন করে। ইহাই শ্বেতবর্ণ প্রলেপের রূপে সিলিণ্ডারের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

উল্লিখিত উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠ বা বাতি দহন করিলে উৎপন্ন গ্যাসটী একটি বিশেষ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। গ্যাসটীর ভিতর কিছু চূণের জল দিয়া আলোড়ন করিলে জলটী "দুগ্ধবর্ণ" হইয়া থাকে। বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অসংখ্য ভাসমান শ্বেতবর্ণ কণিকা সৃষ্ট হওয়ায় এইরূপ বোধ হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠ ও বাতির উপাদানগত অঙ্গার বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান সৃষ্টি করিয়াছে। এই গ্যাসটী চূণের জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া 'ক্যালসিয়ম্ কার্ব্বনেট্' নামক শ্বেতবর্ণ দ্রব্য প্রক্ষেপ করে। $Ca\ (OH)_2 + CO_2$ $= Ca\ CO_3$ (ক্যালসিয়ম্ কার্ব্বনেট্) $+ H_2O$

কাষ্ঠ বা বাতি প্রভৃতির অন্য একটি উপাদান, উদ্জান। দহনে এইটী অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে। ২৬ নং চিত্রানুযায়ী যন্ত্র সজ্জিত করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য পরীক্ষায় জল বলিয়া প্রমাণ করা যায়।

একখণ্ড পটাসিয়ম্ ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে উহা সশব্দে উদ্জান বিচ্ছিন্ন করে। এই উদ্জান প্রজ্বলিত হয়। $K_2 + 2H_2O = 2KOH + H_2$ দহনে তাপ ও আলোক শক্তি নির্গত হয়। আমরা এই দুইটী শক্তি আমাদের প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত করি।
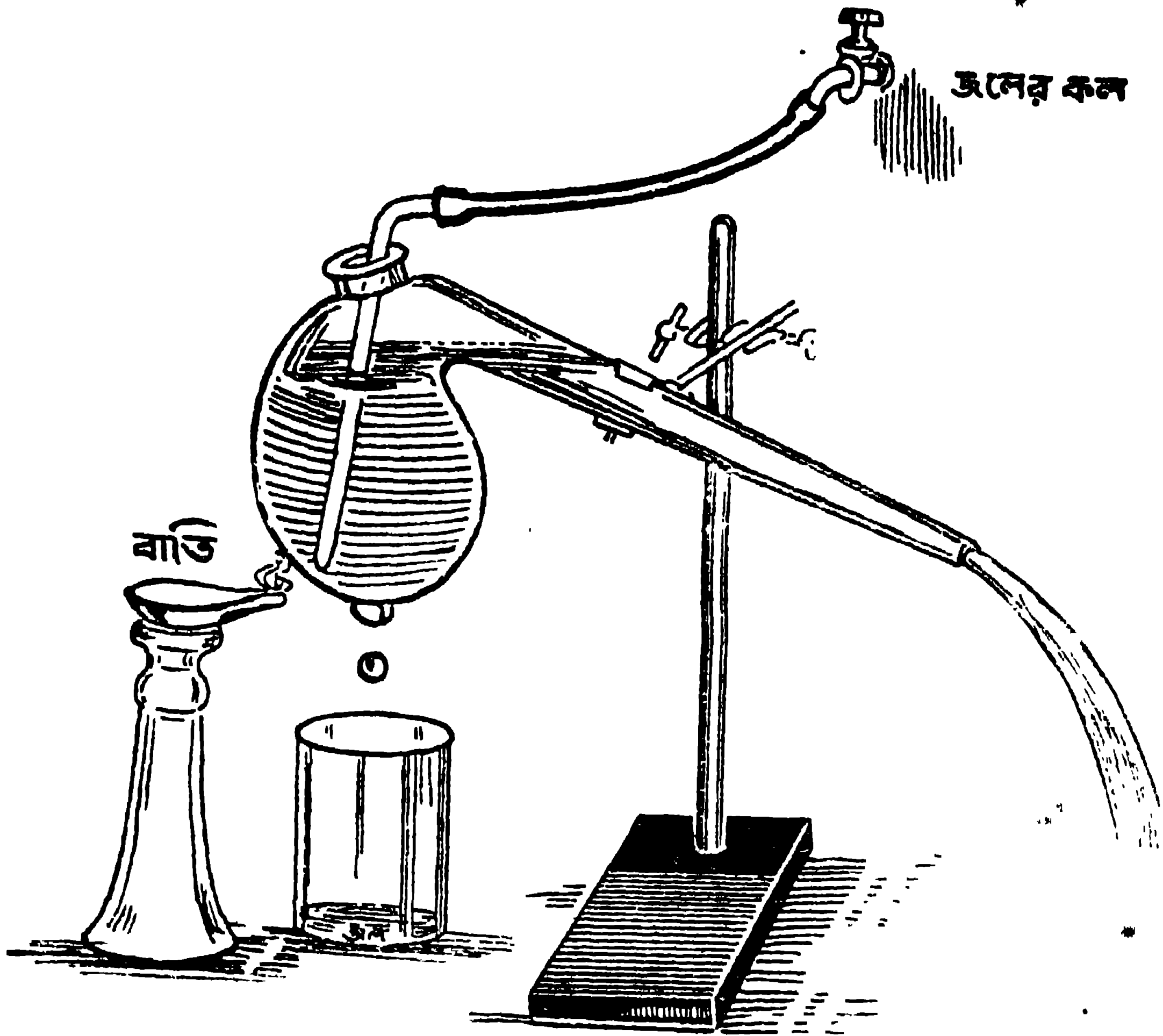
২৬ নং চিত্র।

আমাদের শারীরিক ক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হওয়াও প্রকৃতপক্ষে এই দহনেরই অনুরূপ। এক্ষেত্রেও অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান উৎপন্ন হয়। কিছু চুণের জলের ভিতর দিয়া নিঃশ্বাস চালনা করিলে চুণের জল দুগ্ধবর্ণ হয়। যেরূপে কয়লার দহনে উৎপন্ন তাপ সাহায্যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত হয়, সেইরূপে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইয়া আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন করে ও শারীরিক প্রক্রিয়াদি সাধিত হয়।

একখণ্ড ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ নামক ধাতু নির্ম্মিত তার তৌল করিয়া লওয়া হইল। তারটীতে অগ্নি সংযোগ করিলে উহা উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে থাকে। উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ দ্রব্যটী পুনরায় তৌল করিলে ম্যাগ্‌নেসিয়মের ভার অপেক্ষা অধিক হইবে। এই আধিক্যের পরিমাণই সংযুক্ত অম্লজানের পরিমাণ:—

$$2Mg + O_2 = 2MgO$$
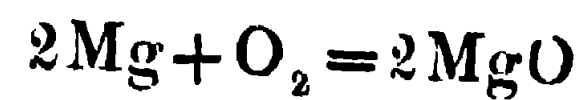
অম্লজানের অভাবেও এক শ্রেণীর দহন সম্পাদিত হইতে পারে। 'ক্লোরিণ' নামক গ্যাসের অভ্যন্তরে একটি বাতি জ্বালাইয়া দিলে বাতিটী জ্বলিতে থাকে; কিন্তু প্রচুর ধূম নির্গত হয়। ইহার কারণ বাতির

উদ্‌জান ক্লোরিণের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণাম্ল গ্যাস উৎপন্ন করে :—

$H_2 + Cl_2 = 2HCl$ (লবণাম্ল গ্যাস)।

কিন্তু অঙ্গারের উপর ক্লোরিণের কোনও প্রক্রিয়া না থাকায় অঙ্গারটী ধূমের রূপে বিচ্যুত হয়।

'ব্রোমিন' নামক তরল মৌলিক দ্রব্যেও জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিলে প্রবলবেগে দহন হয়। এক্ষেত্রে কাষ্ঠের উদ্‌জান ব্রোমিনের সহিত সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোব্রোমিক অম্লগ্যাস উৎপন্ন করে :—

$H_2 + Br_2 = 2HBr$
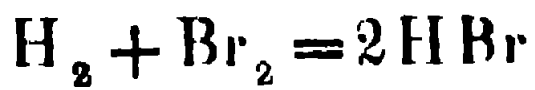
অঙ্গার পূর্ব্বের ন্যায় বিচ্যুত হয়।

ক্লোরিণ গ্যাস বা ব্রোমিনের ভিতর একখণ্ড সূক্ষ্ম তাম্রপত্র নিক্ষিপ্ত হইলে উহা প্রজ্বলিত হয় :—

$Cu + Cl_2 = CuCl_2$

$Cu + Br_2 = CuBr_2$
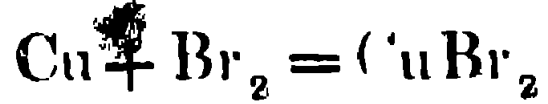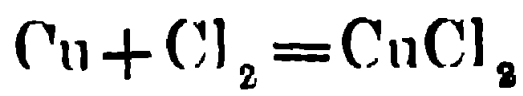
ফলতঃ কোনও সতেজ প্রক্রিয়াফলে আলোক ও তাপ শক্তি এককালে নির্গত হইলেই আমরা তাহাকে ব্যাপকভাবে "দহন" বলিয়া থাকি।

একখণ্ড ফস্ফরস্ অন্ধকারে বায়ু সংস্পর্শে রক্ষিত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা হইতে মৃদু আলোক নির্গত হইতেছে। লক্ষ্য করিলে শ্বেতবর্ণের ধূমও ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মন্থর-গতিতে দহনকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। অনেক সময় কয়লাস্তূপ বা পাটের স্তূপ এইরূপ মন্থর দহনের ফলে হঠাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

জল

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জল উদ্‌জান ও অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগফল। উদ্‌জান বায়ু বা অম্লজানের সংস্পর্শে দহন করিলে, এবং বাতি প্রভৃতি সাধারণ দাহ্য দ্রব্যেরও দহনে জল উৎপন্ন হয়। জলের ভিতর দিয়া তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালন করিলে জল বিচ্ছিন্ন হইয়া উদ্‌জান ও অম্লজান উদ্ভূত হয় (২৭নং চিত্র)
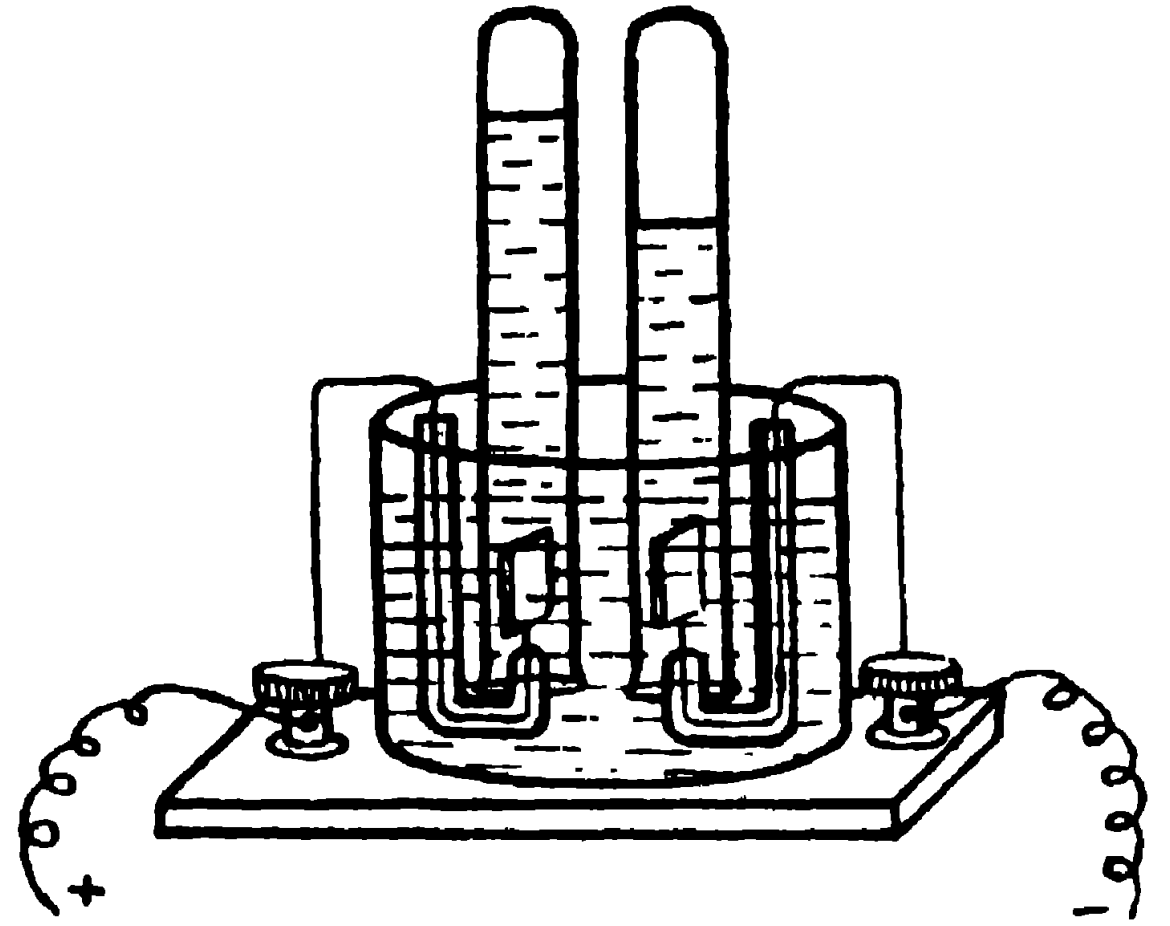
২৭নং চিত্র।

এই পরীক্ষার জন্য একটি জলপূর্ণ বীকারে দুইটী প্ল্যাটীনম্‌নির্ম্মিত পাত রাখা হইল। এই পাত দুইটীর সহিত প্ল্যাটীনম্‌নির্ম্মিত তার সংযুক্ত হইয়া বীকারের বাহিরে নীত হইল। বীকারের জলে কয়েক ফোঁটা অম্ল মিশ্রিত হইল। দুইটী টেষ্ট-টিউব এই অম্ল মিশ্রিত জলে পূর্ণ করিয়া পাত দুইটীর উপর নিম্নমুখে ক্ল্যাম্প সাহায্যে রক্ষিত হইল। এক্ষণে বীকারের বহির্দ্দেশে তার দুইটীর সহিত একটি 'ব্যাটারী'র প্রান্তদ্বয় তারযোগে সংযুক্ত হইলেই জল হইতে বুদ্‌বুদের আকারে গ্যাস নির্গত হয়। উদ্ভূত গ্যাস টেষ্টটিউব দুইটীতে সংগৃহীত হইতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা যায় যে, একটিতে অপরটী অপেক্ষা আয়তনে দ্বিগুণ গ্যাস রহিয়াছে। ইহা নিম্নলিখিত সাম্য অনুযায়ী :—

$$2H_2O = 2H_2 + O_2$$
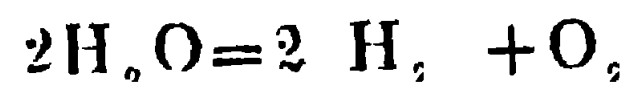
২ ভাগ ১ ভাগ

সমধিক আয়তনবিশিষ্ট গ্যাসটী যে উদ্‌জান তাহা গ্যাসের মুখে একটি অগ্নিশিখা আনয়ন করিলেই বুঝা যায়। গ্যাসটী জ্বলিতে থাকে। অপরটীকেও পরীক্ষা দ্বারা অম্লজান বলিয়া প্রমাণ করা যায়।

একটি জলপূর্ণ পাত্র উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে জল আপনিই শুকাইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণী, জলাশয় প্রভৃতির জল হ্রাস হয়। আমাদের স্নানের পর সিক্ত বস্ত্রাদি আপনিই শুষ্ক হয়—ইত্যাদি নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, জল হইতে সকল অবস্থায়ই বাষ্প নির্গত হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে জলের উপর জলবাষ্পের অবস্থিতির জন্য একটি চাপের সৃষ্টি হয়, ইহাকে "বাষ্পচাপ" বলে। বাষ্পচাপ উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পায়। একটি বদ্ধ পাত্রে কিছু জল রাখিলে, অবিলম্বে পাত্রে বর্ত্তমান উত্তাপানুযায়ী চাপের সৃষ্টি হয়। এই পরিমাণ চাপ উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জল হইতে বাষ্প নির্গত হইবে। চাপের পরিমাণ উক্তরূপ হইলে আর জল বাষ্পে পরিণত হইবে না। এই অবস্থায় বাষ্পচাপকে সম্পূর্ণ বাষ্পচাপ বলে।

প্রত্যেক তাপমাত্রায় একটি বিশেষ পরিমাণ সম্পূর্ণ বাষ্পচাপ সৃষ্ট হয়। ভূপৃষ্ঠে বাষ্পচাপ উত্তাপানুযায়ী সম্পূর্ণ পরিমাণ প্রাপ্ত হয় না বলিয়া জল হইতে অবিরত বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। বায়ুর "আর্দ্রতা" শব্দে এই সম্পূর্ণ চাপের সহিত স্থানীয় বায়ুর বর্ত্তমান বাষ্পচাপের অনুপাত বুঝায়। আমাদের বাঙ্গালা দেশের আর্দ্রতা সাধারণতঃ ৮৫%। বৃষ্টির সময় আর্দ্রতা ১০০% হইয়া নামে। পশ্চিম প্রদেশে ৫০% বায়ুর অত্যধিক আর্দ্রতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে।

একটি বীকারে কিছু জল লইয়া তাহাতে তাপ প্রয়োগ করিলে জলের উত্তাপ বৃদ্ধি জনিত বাষ্পচাপের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিবার জন্য বাষ্পসৃষ্টির বেগও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে বাষ্পচাপ স্থানীয় বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান হইলেই বাষ্প বুদ্বুদের আকারে জল হইতে নির্গত হইতে থাকে। এই ঘটনাকে "স্ফুটন" বলে। ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জলের স্ফুটনোত্তাপ ১০০° সেঃ।

একটি বদ্ধ পাত্রে কিছু জল লইয়া পাম্প সাহায্যে তাহার উপরিস্থ চাপ হ্রাস করিলে বাষ্পচাপও হ্রাস হয়। বর্ত্তমান তাপমাত্রায় যে পরিমাণ বাষ্প-চাপ হওয়া উচিত সে পরিমাণ পুনরায় পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে জল হইতে বাষ্প সৃষ্টির বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পাম্প চালনার সহিত এই বেগ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে বাষ্পচাপ উপরিস্থ বায়ুচাপের সমান হয়। তখন জল ফুটিতে থাকে (২৮ নং চিত্র)। এক্ষণে যে তাপমাত্রা বর্ত্তমান, তাহা স্ফুটন তাপ নহে। বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপে যে তাপমাত্রায় জল ফুটিতে আরম্ভ করে, তাহাই জলের "স্ফুটনোত্তাপ"। যে স্থানে ৭৬ সেমিঃ পরিমাণ বায়ুর চাপ, সে স্থানে জলের স্ফুটনোত্তাপ ১০০ সেঃ।

পর্ব্বতাদির শিখরে বায়ুর চাপ সমতল প্রদেশ অপেক্ষা নিম্নতর বলিয়া সেরূপ স্থানে স্ফুটনোত্তাপও নিম্নতর। যতই উচ্চে যাওয়া যায়, বায়ুর চাপ ততই নিম্নমাত্রা এবং স্ফুটনোত্তাপও তদনুযায়ী নিম্নমাত্রা হইয়া থাকে। এইরূপ গভীর খনির তলদেশে বায়ুর চাপ অধিক বলিয়া জলের স্ফুটনোত্তাপ ১০০° সেঃ অপেক্ষা উচ্চতর। ভূপৃষ্ঠের ৫০০০ ফুট নিম্নে জলের স্ফুটনোত্তাপ প্রায় ১০৫° সেঃ ও ভূপৃষ্ঠ হইতে ১১০০০ ফুট উর্দ্ধে ৯০° সেঃ মাত্র। ফলতঃ স্ফুটনোত্তাপের ১° সেঃ তারতম্য হইলে উভয় স্থানে উচ্চতার তারতম্য প্রায় ১০৮০ ফুট হয়। কোনও কোনও সময়ে জলের স্ফুটনোত্তাপ নিরূপণ করিয়া তাহা হইতে স্থানটীর উচ্চতা নির্ণীত হইয়া থাকে।

তাপ প্রয়োগ করিলে জলের উত্তাপ ক্রমে স্ফুটনোত্তাপ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া জল ফুটিতে আরম্ভ করে। তাহার পর আর জলের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় না। প্রযুক্ত তাপশক্তি জল হইতে বাষ্প বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে। এক গ্র্যাম জলকে সম্পূর্ণরূপে বাষ্পে পরিণত করিতে ৫৩৬ ক্যালোরী পরিমাণ তাপশক্তি ব্যয় হয়।
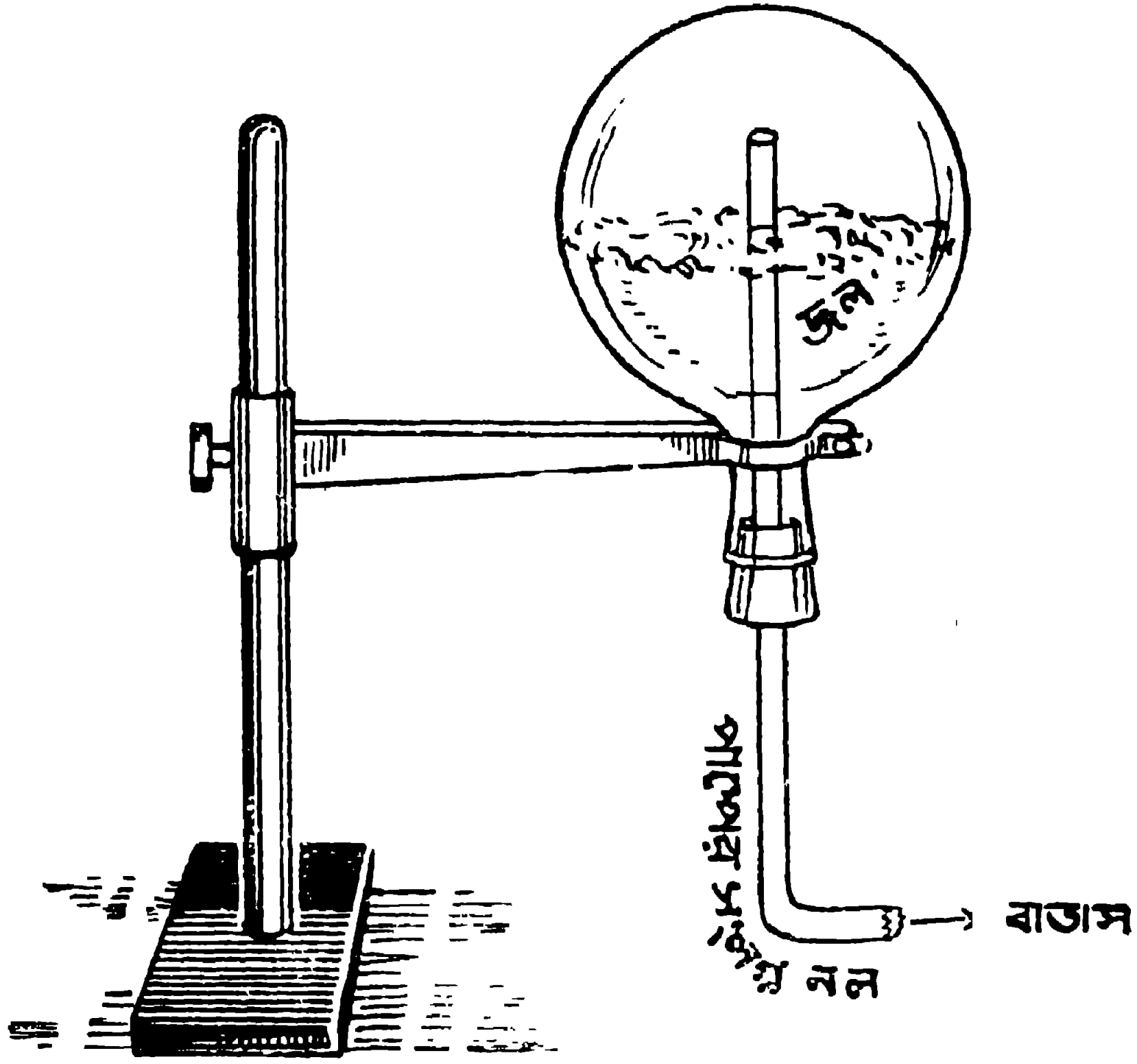
২৮নং চিত্র।

এক গ্র্যাম জলবাষ্পকে তরল করিলেও এই পরিমাণ তাপ নির্গত হয়। এই তাপকে জলবাষ্পের "প্রচ্ছন্ন তাপ" বলে।

জল হইতে ক্রমাগত তাপ হরণ করিলে উত্তাপ নামিতে নামিতে ক্রমে বরফ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। এই উত্তাপকে "শিলাজায়ী উত্তাপ" বলে। চাপের সহিত এ উত্তাপেরও পরিবর্ত্তন হয়। দুই খণ্ড বরফ একত্র করিয়া চাপ দিলে একত্রে জুড়িয়া যায়। বস্তুতঃ সংলগ্ন অংশ চাপ বৃদ্ধির ফলে তরল হয় ও তাহার পর চাপ অপসরণ করিলেই পুনরায় কঠিন হইয়া পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হয়। বরফ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে আর উত্তাপের পরিবর্ত্তন হয় না। বরফেরও "প্রচ্ছন্ন তাপ" আছে। এই তাপই হৃত হইতে থাকে। ১ গ্র্যাম জলকে বরফে পরিণত করিলে ৮০ ক্যালোরী পরিমাণ তাপ নির্গত হয়। ইহাই বরফের "প্রচ্ছন্ন তাপ"।

বরফ চূর্ণ করিয়া লবণ প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিলে মিশ্রণের তাপমাত্রা অত্যন্ত নামিয়া যায়। এইরূপ মিশ্রণকে "শিলাজায়ী মিশ্রণ" বলে। বরফচূর্ণ ও লবণ (পরিমাণ ৩ : ১) মিশ্রিত করিয়া $-$৩০° সেঃ পর্য্যন্ত উত্তাপ পাওয়া যায়। নিশাদল* ও বরফচূর্ণ সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে O° ফাঃ পাওয়া যায়, অর্থাৎ $-$১৭·৮° সেঃ।

শিলাজায়ী মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে দুগ্ধাদি পানীয়কে কঠিন অবস্থায় পরিণত করা যায়। এই সকল দ্রব্য "কুল্‌পী বরফ" নামে আমাদের সুপরিচিত।

জল বিশ্বব্যাপী। ভূমণ্ডলের ৮০ %, জল ও ২০ %

স্থল। স্থলেও মৃত্তিকাদির সহিত গড়ে প্রায় ১০°/, জল বর্ত্তমান। জলের সাহায্যেই আমাদের দেহে খাদ্য-দ্রব্য জীর্ণ ও উৎপন্ন বিষাক্ত দ্রব্যাদি বিদূরিত হয়।

সাধারণতঃ জলাশয়াদিতে যে জল পাওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ নহে। নানা দ্রব্য দ্রবীভূত অবস্থায় উহাতে বর্ত্তমান। প্রধানতঃ লবণ ও ম্যাগ্নেসিয়ম্ ক্লোরাইড্,—এই দুইটী সমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান বলিয়া সমুদ্রজলের স্বাদ লবণাক্ত। অন্যান্য জলে ক্যাল্সিয়ম্ বাইকার্ব্বনেট্, ক্যাল্সিয়ম্ সাল্ফেট্, ক্যাল্সিয়ম্ ক্লোরাইড্, লবণ বা সোডিয়ম্ ক্লোরাইড্, ম্যাগনেসিয়ম্ সাল্ফেট্ ও কার্ব্বনেট্ পাওয়া যায়। কদাচিৎ নাইট্রেট্ জাতীয় দ্রব্য ও কদাচিৎ অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান বা গন্ধকোদজান গ্যাসও পাওয়া যায়।

সাধারণ জল অশুদ্ধ অল্প জল কোনও একটি পাত্রে তাপযোগে শুকাইয়া দিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। পাত্রে শ্বেতবর্ণ দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে। ইহাই উল্লিখিত দ্রব দ্রব্যগুলির মিশ্রণ। পানীয় জলে এই প্রকার দ্রব্যের অল্পপরিমাণে অবস্থান বাঞ্ছনীয় বিশুদ্ধ জল বিস্বাদ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। পানীয় জলের স্বাদ প্রকৃতপক্ষে দ্রব অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান গ্যাস ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য।

বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ। কিন্তু সময়ে সময়ে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন-চতুঃ-অম্লজান (N_2O_4) প্রভৃতি গ্যাস দ্রব অবস্থায় ইহাতেও থাকে।

সাবান ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ জলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জলে দ্রবীভূত দ্রব্যের পরিমাণ যত অধিক হইবে, ফেনা উৎপন্ন করিতে ততই অধিক সাবান ক্ষয় হইবে। যে জলে এইরূপে অত্যন্ত অধিক সাবান ক্ষয় হয় তাহাকে "কর্কশ জল" বলে। "কোমল জলে" অধিক সাবান ক্ষয় হয় না।

কর্কশ জল দুই শ্রেণীর। প্রথমতঃ যদি দ্রব অবস্থায় ক্যাল্সিয়ম্ ক্লোরাইড্ প্রভৃতি অনপসরণীয় দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে জলটী "স্থায়ী কর্কশ"। দ্বিতীয়তঃ যদি ক্যাল্সিয়ম্ বাইকার্ব্বনেট্ দ্রবীভূত থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণ চুণ সহযোগে বা ফুটাইয়া জলটীকে কোমল করা যায়:—

$$CaO + Ca(HCO_3)_2 = 2CaCO_3 + H_2O$$

$$Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + CO_2 + H_2O$$
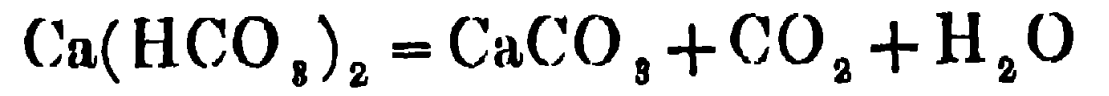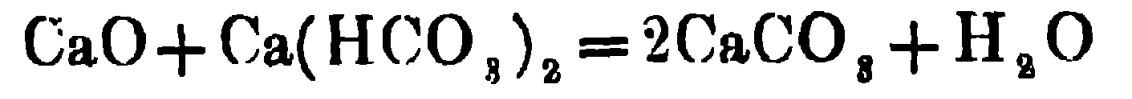
ক্যাল্সিয়ম্ কার্ব্বনেট্ অদ্রবণীয় বলিয়া প্রক্ষিপ্ত হয়। এই জল ছাঁকিয়া লইলেই নরম জল হইবে। বয়লারে এই উপায়ে জল শোধন করিয়া ব্যবহার করা হয়। নতুবা বয়লারের অভ্যন্তরের নল ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ জল "অস্থায়ী কর্কশ"।

উপসরণের সময় জল (অথবা অন্য যে কোনও তরল দ্রব্য) হইতে তাপশক্তি হৃত হইতে থাকে। সুতরাং কিছু জল একটি বদ্ধ স্থানে লইয়া উহার উপরিস্থ বায়ু নিষ্কাশন করিতে থাকিলে প্রথমতঃ বায়ুচাপ হ্রাস হেতু জলটী ফুটিতে আরম্ভ করিবে। স্ফুটনের সহিত জলটীর উত্তাপও নিম্নতর হইতে থাকে। যন্ত্রে জলশোষক কোনও দ্রব্য রক্ষিত হইলে (যথা নির্জ্জল গন্ধকাম্ল) উদ্গত বাষ্প ইহাতে বিলীন হইতে থাকে। ক্রমে জলের উত্তাপ 0° সেঃ পর্য্যন্ত অবতরণ করিলে উহা বরফে পরিণত হইতে থাকে। উপসরণে তাপহরণ হয় বলিয়া গ্রীষ্মকালে স্নানাদির পর আমাদের শরীর শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে জলের উপসরণ দ্রুত হয় না; কারণ আর্দ্রতা অঙ্ক সম্পূর্ণতার কাছাকাছি হইয়া থাকে। এইজন্য এ সময় অবগাহনেও তৃপ্তি হয় না। আমাদের দেশে সকলেরই ইহার অভিজ্ঞতা আছে।

তাপের সহিত জলের গুরুত্ব পরিবর্ত্তনের একটু বিশেষত্ব আছে। জলের গুরুত্ব ৪° সেঃ উত্তাপে সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে। এই উত্তাপেই জলের গুরুত্ব =১ ধার্য্য হইয়াছে। তাপমাত্রা ৪° সেঃ অপেক্ষা

উচ্চ বা নিম্ন যাহাই হউক, জলের গুরুত্ব ১ অপেক্ষা অল্পতর হইবে। বরফে পরিণত হইলে জল আয়তনে ১/১৮ অংশ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ গুরুত্বও ১/১৮ অংশ পরিমাণ অল্পতর হয়।

প্রকৃতিরাজ্যে এই নিয়মটী বিশেষ কার্য্যকরী। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় জল তাপহরণের অনুক্রমে গুরুতর হইতে থাকিলে সমুদ্র, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ে (শীত-প্রধান দেশে) সর্ব্বাপেক্ষা শীতল জলই সর্ব্বনিম্নে গমন করিত। 0° সেঃ উত্তাপে বরফ সর্ব্ব-নিম্নে জমিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমস্ত জলাশয়ই কঠিন হইত। বলা বাহুল্য যে এই অবস্থায় সকল জলচর জীবেরই নাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই সর্ব্ব নিম্নস্তর 4° সেঃ উত্তাপে থাকে। স্থানীয় উত্তাপ 0° সেঃ হইলে পর সে স্তর উপরে থাকিয়া কঠিন হয়। অতএব, নিম্নে 4° সেঃ উত্তাপে জল সর্ব্বদা তরলরূপে অবস্থান করিয়া জলচরের প্রাণ রক্ষা করে।

জগতে মোট জলের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত থাকে। জলাশয় ও মৃত্তিকা হইতে জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘের সঞ্চার করে শীতল বায়ু প্রভাবে এই বাষ্প ভূত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং বৃষ্টি বা শিলারূপে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করে।

শীতপ্রধান দেশে তুষারপাত হয়। বৃষ্টি, শিলা ও তুষারপাত মূলতঃ একই ঘটনা, উত্তাপের তারতম্যে এইরূপ আকারভেদ হইয়া থাকে। তুষারপাত দেখিতে অতি মনোরম। নরম কার্পাস উত্তমরূপে ধুনিয়া উচ্চ হইতে ছাড়িয়া দিলে যেরূপে পড়িবে বলিয়া কল্পনা করা যায়, তুষারপাত তাহারই অনুরূপ। শীতপ্রধান দেশে এই নরম তুষার কঠিন হইয়া কখনও কখনও ২.৩ ফুট পরিমাণ পথে জমিয়া থাকে। এই সমস্ত জলের নল ফাটিয়া যায়। তাহার কারণ নলের অভ্যন্তরে জল জমিয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হয়।

জল তড়িৎ পরিচালক নহে। কিন্তু অল্পমাত্র অম্ল, ক্ষার বা লবণ জাতীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইবামাত্র পরিচালক হয়। উক্ত দ্রব্যগুলি জলের দ্রবণে বিশেষরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। এই সকল বিষয় সবিশেষে আকৃতিক রসায়নে আলোচ্য। সংক্ষেপে প্রসঙ্গান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। জলের বা যে কোনও তরল দ্রব্যের স্ফুটনোত্তাপ কোনও দ্রবণীয় দ্রব্যের বর্ত্তমানে উচ্চতর হইয়া থাকে ও দ্রবণের শিলাজায়ী উত্তাপ দ্রাবকের শিলাজায়ী উত্তাপ অপেক্ষা নিম্নতর হয়।

নানাপ্রকার রোগের বীজাণু জলের সাহায্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। এইজন্য পানীয় জল সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য মারীভয় প্রবল তাহার প্রধান কারণ পানীয় জলের অভাব ও এসম্বন্ধে অমনোযোগীতা। পানীয় জল প্রথমে ফুটাইয়া, পরে পরিষ্কৃত বালুকা ও কাষ্ঠ কয়লার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চালিত হইলে নির্দ্দোষ হয়। গভীর কূপের জলই উৎকৃষ্ট পানীয়। বর্ত্তমানকালে লৌহনির্ম্মি নল মৃত্তিকার মধ্যে বহুদূর চালনা করিয়া পাম্প সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে নির্দ্দোষ জল পাওয়া যায়। ইহা উত্তম পানীয় ও ইহার ব্যবহারে সংক্রমণ বিস্তারের ভয় নাই। আমাদিগের গ্রামে গ্রামে এইরূপ নলকূপ বা 'টিউব ওয়েল' (২৯ নং চিত্র) প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তাহা হইলে মারীভয় অর্দ্ধেক হ্রাস হইবে।

(১৬)

হাইড্রোজেন পারক্সাইড

সঙ্কেত H_2O_2। সংযোগভার ৩৪।

নলকূপ
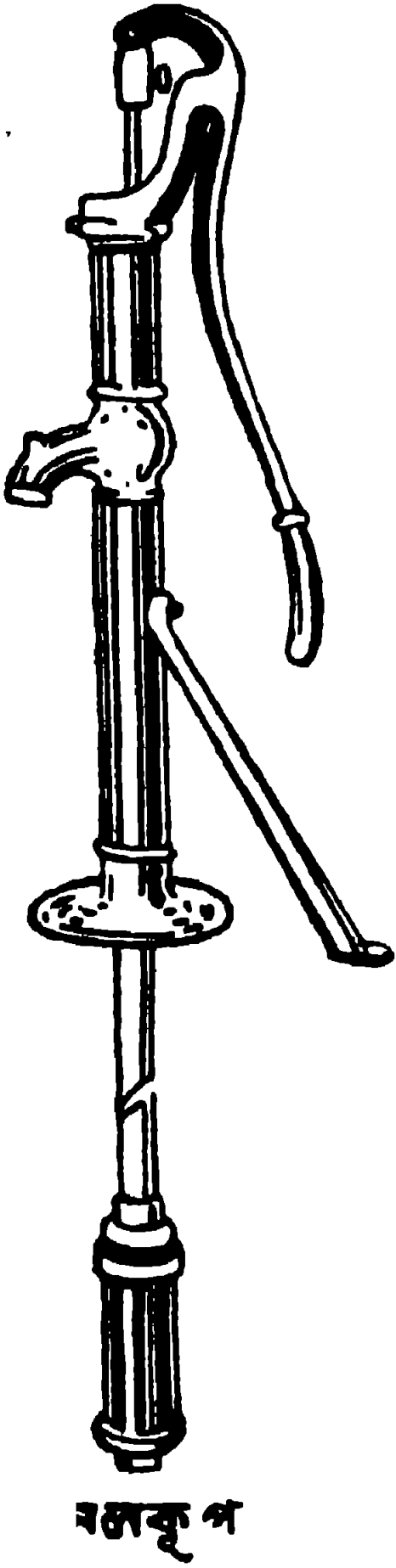
২৯নং চিত্র।

কিছু জলের ভিতর অঙ্গারাম্ল গ্যাস সঞ্চালিত হইতে দিয়া উহাতে অল্প অল্প পরিমাণে বেরীয়ম্-দ্বি-অক্সাইড্ নামক দ্রব্যের চূর্ণ যোগ করিতে থাকিলে হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ উৎপন্ন হয় এবং বেরীয়ম্ কার্ব্বনেট্ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে :—

$$BaO_2 + CO_2 + H_2O = H_2O_2 + BaCO_3$$
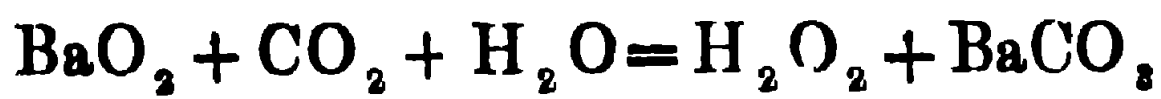
উৎপন্ন মিশ্রণটী হইতে পরিস্রবণ প্রক্রিয়া অবলম্বনে উক্ত প্রক্ষিপ্ত কার্ব্বনেট্ বিমুক্ত হয়। পরিস্রুত তরল দ্রব্যটী হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ ও জলের মিশ্রণ। পারক্সাইড্‌টীকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক্ করিতে হইলে উক্ত মিশ্রণটীকে বায়ুশূন্য স্থানে তির্য্যকপাতন করা আবশ্যক। জল হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ অপেক্ষা দ্রুততর উপসরনীয় বলিয়া পূর্ব্ববর্ণিত "আংশিক তির্য্যকপাতন" প্রক্রিয়া অবলম্বনে উপরোক্ত মিশ্রণ ক্রমশঃ পৃথক্ করা যাইতে পারে।

ঈথর (Ether) নামক জৈব শ্রেণীর অন্তর্গত তরল দ্রব্যবিশেষে হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ মিশ্রণ-শীল। কিন্তু জল ও ঈথর পরস্পর মিশ্রণশীল নহে। সুতরাং হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ ও জলের মিশ্রণ কিছু ঈথর সহযোগে আলোড়িত হইবার পর ক্রমে দুইটী স্তর পৃথক্ হইয়া পড়ে। উপরের স্তরটী শুদ্ধজল (কারণ ঈথর জল অপেক্ষা গুরু-তর) এবং নিম্নের স্তরটী ঈথর ও পারক্সাইড্‌টীর মিশ্রণ। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকালে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পর জলের সহিত মিশ্রিতাবস্থায় কিছু পার-ক্সাইড্ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। বার বার ঈথর-যোগে আলোড়নের পর ঈথর স্তর পৃথক্ করিলে অবশেষে হাইড্রোজেন পারক্সাইড্‌টী সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া থাকে।

শেষোক্ত মিশ্রণটী অল্পায়াসেই পাত্রান্তরিত হইতে পারে। ইহা হইতে সাবধানে তাপযোগে ঈথরটী উপস্থত হইলে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ অবশিষ্ট থাকে। এই সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য ; কারণ ঈথর অতি সহজ দাহ্য দ্রব্য এবং ঈথরবাষ্প ও বায়ুর মিশ্রণ অগ্নি সংস্পর্শে সতেজে বিস্ফুরিত হইয়া থাকে।

বেরীয়ম্-দ্বি-অক্সাইড্ (বা বেরীয়ম্ পারক্সাইড্) ও সোডিয়ম্ পারক্সাইড্ (Na_2O_2) হইতে গন্ধকাম্ল সহযোগে হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ উৎপন্ন হয় :—

$$BaO_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + H_2O_2$$

$$Na_2O_2 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + H_2O_2$$
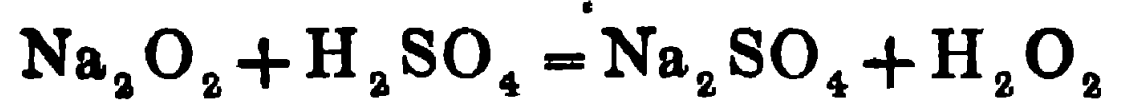
বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ গাঢ় তরল দ্রব্য ও অম্লধর্ম্মী। উহার বর্ণ প্রকৃতপক্ষে ঈষৎ নীলাভ।

কিন্তু সচরাচর ব্যবহারের সময় দ্রব্যটী বর্ণহীন বোধ হয়। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের শিলাজায়ী উত্তাপ -2° সেঃ।

দ্রব্যটী সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া জল ও অম্লজান উৎপন্ন করে :—

$$2\,H_2O_2 = 2\,H_2O + O_2$$
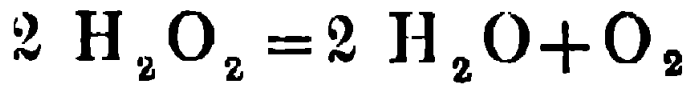
কোন একটি চূর্ণ সহযোগে সবেগে আলোড়িত হইলে অথবা তাপ প্রয়োগ করিলে উহা উপরোক্ত-রূপে বিচ্ছিন্ন হয়। রৌদ্র সংস্পর্শেও উক্ত প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ গাঢ় লোহিতবর্ণের বোতলে রক্ষিত হয়।

দ্রব্যটী হইতে সহজেই অম্লজান বিচ্যুত হয় বলিয়া উহা একটি প্রধান "অম্লজানযোগী" দ্রব্য। রসায়নে "অম্লজানযোগ" ও "অম্লজানহরণ" এক একটি প্রধান ও নিত্য অবলম্বনীয় প্রক্রিয়া। যে সকল দ্রব্য হইতে বা দ্রব্যের মিশ্রণ হইতে সহজে অম্লজান বিচ্যুত হইয়া থাকে, যাহাতে এই বিচ্যুত অম্লজান অন্য দ্রব্যের সংযুক্ত হইতে পারে, এইরূপ দ্রব্য বা দ্রব্যের মিশ্রণকে "অম্লজানযোগী" বা "অম্লজান-যোজক" বলা হইবে।

সুতরাং কোনও একটি দ্রব্যে অম্লজানযোগ এবং অপর একটি দ্রব্যের অম্লজানত্যাগ প্রক্রিয়াদ্বয় পরস্পরের সহগামী। প্রথমোক্ত শ্রেণীর দ্রব্য "অম্লজানহারক" ও শেষোক্ত দ্রব্য অম্লজানযোজক, সাল্‌ফিউরাস্ এসিড্ অম্লজানযোগ প্রক্রিয়াফলে সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (অর্থাৎ গন্ধকাম্ল) উৎপন্ন করে :—

$$2\,H_2SO_3 + O_2 = 2\,H_2SO_4$$

এই প্রক্রিয়ার জন্য উক্ত এসিড্ ও হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ একযোগে ফুটান হয়। পটাসিয়ম্ পার্ম্মাঙ্গানেট্ ও পটাসিয়ম্ ডাইক্রোমেট্ গন্ধকাম্লের সহিত মিশ্রণে অম্লজানযোজক :—

$$2\,KMnO_4 + 4H_2SO_4 = K_2SO_4 + Mn_2(SO_4)_3 + 4\,H_2O + 2O_2$$

$$K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 = K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 4\,H_2O + 3O$$

সজল ক্লোরিণও এইরূপে অম্লজানযোগী :—

$$2\,Cl_2 + 2\,H_2O = 4\,HCl + O_2$$
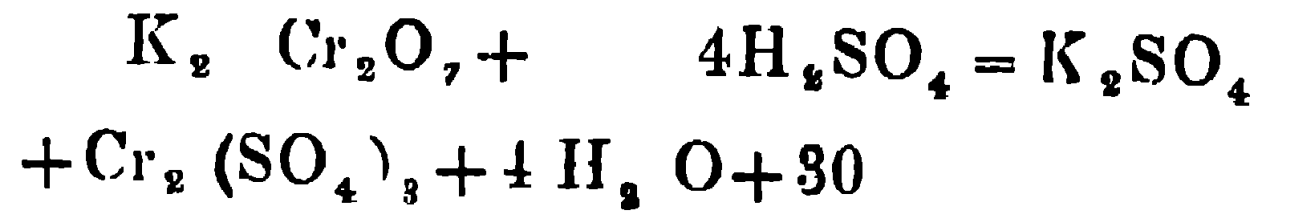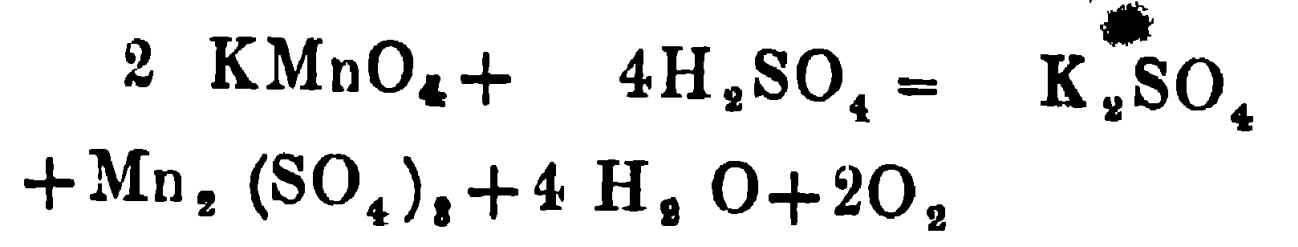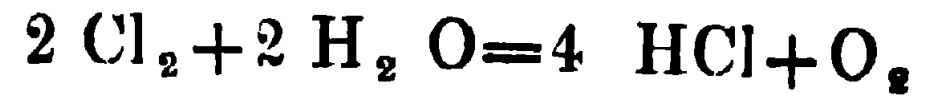
যোজন সংখ্যা

বা "যোজনীয়তা" (Valency) :—

উদ্‌জানের সহিত বিভিন্ন মৌলিক দ্রব্যের সংযোগ আলোচনা করিলে দেখা যায় :—

HF, HCl, HBr, HI

H_2O, H_2S

H_3N, H_3P

H_4C
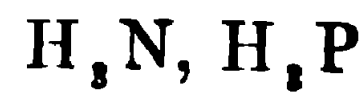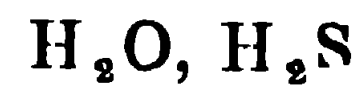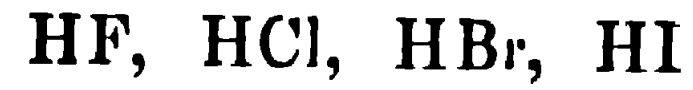
কতকগুলি দ্রব্যে, একটি উদ্‌জানের পরমাণু অপর দ্রব্যের একটি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ফ্লোরিণ, ক্লোরিন, ব্রোমিণ ও আয়োডিন্ এই শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে, কোনও কোনও মৌলিক দ্রব্যের একটি পরমাণুর সহিত উদ্‌জানের দুইটী (যথা H_2O, H_2S) বা ততোধিক পরমাণু সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই উদ্‌জান পরমাণুর সংখ্যা অন্য মৌলিক দ্রব্যটীর "যোজনসংখ্যা" বা "যোজনীয়তা" বলিয়া অভিহিত হইবে।

ফ্লোরিণ, ক্লোরিণ প্রভৃতি একযোগী; অম্লজান ও গন্ধক দ্বিযোগী; নাইট্রোজেন ও ফস্ফরস্ ত্রিযোগী; অঙ্গার চতুর্যোগী ইত্যাদি।

চতুর্যোগী দ্রব্যের একটি পরমাণুর সহিত যে কোনও একযোগী দ্রব্যের চারিটী পরমাণু ও যে কোনও দ্বিযোগী দ্রব্যের দুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইতে পারে।

কোনও কোনও দ্রব্য বিভিন্ন যোজন-সংখ্যা অনুক্রমে সংযুক্ত হয়। নাইট্রোজেন হইতে N_2O, N_2O_2, N_2O_3, N_2O_4 ও N_2O_5—এই পাঁচটী অক্সাইড্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং নাইট্রোজেন প্রক্রিয়া বিশেষে একযোগী, দ্বিযোগী ত্রিযোগী, চতুর্যোগী বা পঞ্চযোগী হইতে পারে। তাম্র হইতে CuO ও Cu_2O এই দুইটী অক্সাইড্ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাম্র একযোগী ও দ্বিযোগী। এইরূপ দ্রব্যকে "ভিন্নযোগী" বলা হইবে।

প্রক্রিয়ার ফলে কোনও দ্রব্যের যোজনীয়তা উচ্চতর হইলে উহা অম্লজান যোগ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ও নিম্নতর হইলে অম্লজানচ্যুতি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ধার্য্য হইয়া থাকে:—

$CuCl_2 + Cu = Cu_2Cl_2$ (অম্লজানচ্যুতি)

$MnCl_2 + Cl_2 = MnCl_4$ (অম্লজান যোগ)
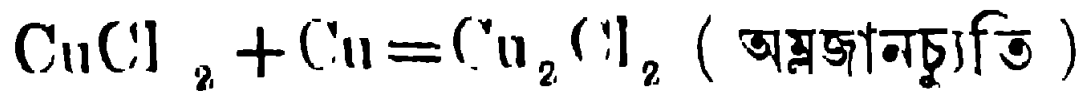
হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ একটি প্রধান অম্লজানযোগী দ্রব্য। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা অম্লজানহারক দ্রব্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা—রৌপ্যের অক্সাইড্, স্বর্ণের অক্সাইড্ বা প্ল্যাটিনমের অক্সাইড্, হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ সহযোগে অম্লজান বিচ্যুত হইয়া থাকে :—

$$Ag_2O + H_2O_2 = 2Ag + H_2O + O_2$$
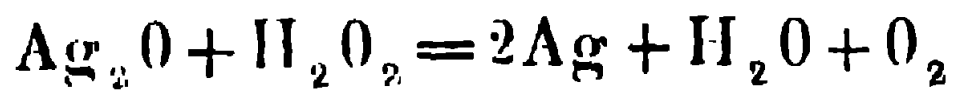
এইরূপ ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যই এককালে অম্লজান ত্যাগ করে। ওজোন ও হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ উভয়েই অম্লজানযোগী দ্রব্য; কিন্তু পরস্পর প্রক্রিয়ায় উভয়ে উভয় হইতে অম্লজান হরণ করিয়া থাকে :—

$$O_3 + 3H_2O_2 = 3H_2O + 3O_2$$

যে সকল দ্রব্যে অম্লজান দৃঢ় সংলগ্ন নহে, তাহাদের পরস্পর প্রক্রিয়াফলে এইরূপে অম্লজান পৃথক্ হয়।

হাইড্রোজেন পারক্সাইডের অম্লধর্ম্ম, পটাসিয়ম্ কার্ব্বনেট্ ও সোডিয়ম্ কার্ব্বনেটের সহিত প্রক্রিয়ায় পরিস্ফুট হয় :—

$$K_2CO_3 + H_2O_2 = K_2O_2 + H_2O + CO_2$$

$$Na_2CO_3 + H_2O_2 = Na_2O_2 + H_2O + CO_2$$
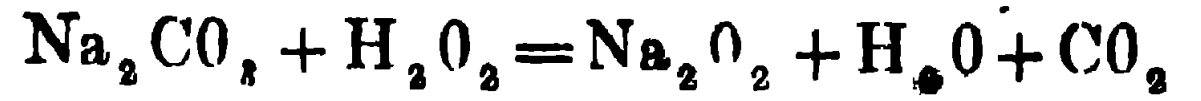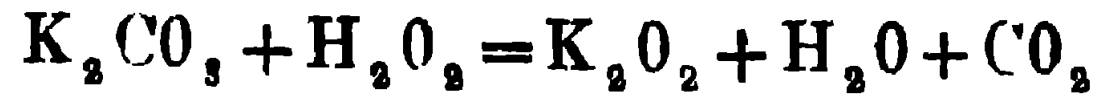
উপরোক্ত প্রক্রিয়ার সহিত প্রকৃত একটি অম্লের প্রক্রিয়ার তুলনা করিলেই ইহার বোধগম্য হইবে :—

$$K_2CO_3 + H_2SO_4 = K_2SO_4 + H_2O + CO_2$$
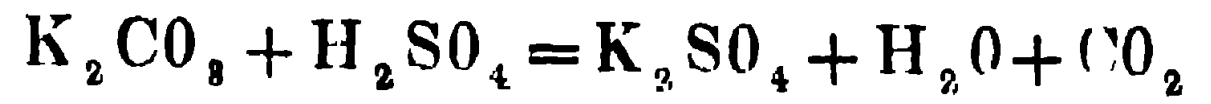
'টিটানিক্' অম্লের দ্রবণ (H_2TiO_3) হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ যোগে লোহিত বর্ণ গ্রহণ করে। পটাসিয়ম্ ক্রোমেট্ (K_2CrO_4) ও একটি অম্লের মিশ্রণে হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ যোগ করিলে মিশ্রণটী নীলবর্ণ ধারণ করে। ইহা কিছু ঈথর সহযোগে আলোড়িত হইলে ঈথরের স্তরে নীলবর্ণ দ্রব্যটী সঙ্গত হইয়া পৃথক্ থাকে।

পটাসিয়ম্ আয়োডাইড্, লৌহের প্রথম সালফেট্ ও শ্বেতসারের দ্রবণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহাতে অত্যল্প হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ যোগ করিলেই মিশ্রণটী নীলবর্ণ গ্রহণ করে। পটাসিয়ম্ আয়োডাইড্ হইতে আয়োডিন বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্বেতসারের সহযোগে এই বর্ণ উৎপন্ন করে।

হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ সহযোগে নানাবিধ পদার্থের বর্ণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অম্লজান যোগই ইহার কারণ। উক্ত উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার সুপ্রচুর। খড় ও রেশম হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ সাহায্যে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ গ্রহণ করে। মস্তকের কেশ হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ প্রয়োগে ক্রমে স্বর্ণাভ হয়।

এই জন্য বিলাসী জগতে ইহার আদর যথেষ্ট। ত্বকের নানাবিধ কলঙ্ক দূর করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। জলমিশ্রিত হাইড্রোজেন পারক্সাইড সাহায্যে মুখ প্রক্ষালনে দন্ত নীরোগ, নির্ম্মল ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। দ্রব্যটীর জীবাণু-বিনাশ ক্ষমতা সতেজ। এই জন্য ক্ষতস্থানে দ্রব্যটী প্রযুক্ত হইলে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ হয়। এসকল ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন

পারক্সাইড্ ব্যবহারের আর একটি স্থবিধা এই যে, ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

জলের সহিত মিশ্রণে হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ বিক্রয় হয়। ইহার কারণ, এই অবস্থায় উহা অধিকতর কালস্থায়ী, এবং বিশুদ্ধ দ্রব্যটীর বিস্ফোরণ প্রবণতার জন্য উহা সচরাচর ব্যবহারের উপযোগী নহে।

কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথ

[শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীবনসংগ্রামের সূচনা

যে বৎসর রাজেন্দ্রনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় অসাফল্য লাভ করিলেন, সেই বৎসর মতিলাল ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেও তিনি একেবারে নিরুৎসাহ হয়েন নাই। তাঁহার নিকট আজ পর্য্যন্ত হতাশ বলিয়া কোন চিন্তা আগমন করে নাই। তিনি পুরুষসিংহ; সিংহের ন্যায় আগমন করিয়াছেন; সিংহের ন্যায় জীবনাতিবাহিত করিতেছেন।

রাজেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, তিনি পুনরায় আর এক বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার সকল আশায় অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়া তিনি এবং তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারবর্গ বিপদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন।

তৎকালে যোগেন্দ্রনাথ এই পরিবারের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। একমাত্র তাঁহারই উপার্জ্জনে এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে তিনি অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তদুপরি তিনি আত্মপর জ্ঞানরহিত। নিজ পরিবারবর্গের উপর তাঁহার যেরূপ আকর্ষণ অপরের উপরও তাঁহার সেইরূপ দয়ার আকর্ষণ ছিল।

তিনি যে সময় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, সেই সময় তিনি তাঁহার স্বদেশস্থ বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে মিউনিসিপ্যালিটীর চাকরিতে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, অনেকস্থলে তাহাদের অনেককে নিজ বাসায় আহারাদি প্রদান করিয়াও অবস্থান করিতে দিতেন।

এই মহৎ গুণ রাজেন্দ্রনাথেও সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার জন্মভূমি ভ্যাবলা গ্রামকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। আজ তিনি লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে অবস্থান করিতেছেন। পৃথিবীর ধনকুবেরদিগের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বগ্রামবাসিদিগকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মার্টিন

কোম্পানীর বৃহৎ আফিসে তাঁহার স্বগ্রামবাসী প্রায় সমস্ত লোককেই চাকরি প্রদান করিয়া প্রতিপালিত করিতেছেন। তাঁহার নিকট অগ্রে তাঁহার স্বগ্রামবাসীর আবেদন গ্রাহ্য।

এই যোগেন্দ্রনাথের অন্তর ব্রাহ্মণ্যতেজে পূর্ণ ছিল। তিনি হিন্দুধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসী এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন, এবং তাঁহার শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার কম ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন নাই, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল যে, যখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা এম, এ, পড়িতেন তখন তিনিই তাঁহাকে ইংরাজীর পাঠ পড়াইয়া দিতেন।

এই অসাধারণ প্রতিভাশালী যোগেন্দ্রনাথের নৈতিক চরিত্র অতি নির্ম্মল এবং দুর্দ্দমনীয় তেজের আকর ছিল। এই দুর্জ্জয় তেজশালী পুরুষ অপরের অন্যায় বাক্যের কখনও পৃষ্ঠপোষক হইতে পারিতেন না। তিনি আমরণ ন্যায়বাদী ছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কলেক্টর ছিলেন। গুণগ্রাহী স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহাকে উপযুক্ত লোক বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে কিছু দিবস অন্তে হগ সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে যিনি মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান হইলেন তাঁহার সহিত স্বাধীনচেতা যোগেন্দ্রনাথের মতদ্বৈধ সঙ্ঘটিত হইতে আরম্ভ করিল।

যখন এই মতদ্বৈধ বিরোধে পরিণত হইল তখন দুর্দ্দমনীয় তেজশালী স্বাধীনচেতা যোগেন্দ্রনাথ এক কথায় সেই সাত শত টাকা বেতনের চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কোনরূপ চিন্তা করিলেন না যে, তাঁহার এই চাকরি পরিত্যাগে তাঁহার প্রতিপাল্য এই বৃহৎ পরিবার পুনরায় অভাবের তাড়নায় ধাবিত হইবে।

যে সময় রাজেন্দ্রনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ফেল হইলেন, সেই সময় এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হইল। সেই সময় যোগেন্দ্রনাথ চাকরি পরিত্যাগ করিলেন। যোগেন্দ্রনাথের চাকরি পরিত্যাগে মুখোপাধ্যায় পরিবারের তৎকালে বাহিরের আয় রুদ্ধ হইল। দেশের যাহা বিষয়সম্পত্তি বর্ত্তমান তাহাতে দেশের খরচ সংকুলন হইবার উপায় আছে, কিন্তু কলিকাতার বাসার খরচ কিম্বা বালকগণের পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই।

জীবনসংগ্রামে চিন্তার ধারা

যোগেন্দ্রনাথের কর্ম্মত্যাগে যখন বাহিরের আয়ের পথ রুদ্ধ হইল, তখন রাজেন্দ্রনাথের পুনরায় পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করাও অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইল। রাজেন্দ্রনাথও বুঝিতে পারিলেন এ অবস্থায় তাঁহার আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ করা সম্ভব হইবে না।

এদিকে যোগেন্দ্রনাথ যখন দেখিলেন যে তাঁহার চাকরি পরিত্যাগে তিনি কলিকাতার বাসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অপারক হইতেছেন তখন তিনি চিন্তাকাতর হইয়া উঠিলেন, এবং যখন কোন দিকে কোন উপায় আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইলেন তখন অনন্যোপায় হইয়া উপস্থিত কিছু আয়ের জন্য রাজেন্দ্রনাথকে কোন চাকরি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইচ্ছা তাহাতে যদি কোনরূপ ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি কোনরূপ চাকরি গ্রহণ করিয়া দাসত্বের পদে শির নত করিতে রাজী নহেন। এই সময় তাঁহাকে বহুলোক, তাঁহার বহু আত্মীয়স্বজন, বহু বন্ধুবান্ধব চাকরি গ্রহণের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে উপরোধ, অনুরোধ, উপদেশ প্রভৃতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। এমন

কি, যে যোগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেও তাঁহাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন, সেই যোগেন্দ্রনাথের বারংবার অনুরোধ ও তাঁহার নিকট নিষ্ফল হইল। রাজেন্দ্রনাথের এক কথা আমি চাকরি করিব না, আমি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব না।

রাজেন্দ্রনাথের জীবনে যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা এই স্থানেই প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি যে স্বাধীনতার উপাসক, তিনি যে আলস্য জয়কারী, তিনি যে আত্মবিশ্বাসী, এবং কর্ম্ম সাধনায় আস্থা স্থাপনকারী তাহা এই স্থানেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সংসারের কঙ্কর কর্কশময় পথ, হেলায় পার হইয়া সাফল্যের দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায় না।

অনেকের চরিতকথা পাঠ করিবার সময় জ্ঞাত হওয়া যায় যে বাল্যে তাঁহারা অনেকেই মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকেই নিদারুণ দুঃখ কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া সেই সময় জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। অনেকে গ্যাসালোকে পাঠ করিয়াছেন, অনেকে অপরের ছিন্ন পুস্তকের পৃষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন। যে সময় সেই সকল লোকের হৃদয়স্থ এই সব দৃঢ়তার কথা, একাগ্রতার বিষয়, আগ্রহের বিষয় প্রভৃতি পাঠ করা যায় তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কিন্তু পরে যখন এই সকল লোক শিক্ষা সমাপনান্তে সংসারসমুদ্র পার হইবার জন্য তাহার তীরে উপনীত হন, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সেই একাগ্রতা, সেই দৃঢ়তা, সেই প্রবল আত্মোন্নতেচ্ছা কেবলমাত্র পরানুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। সকলেই তখন স্বাধীনতার দ্বার হইতে দূরে পলায়ন করিয়া দাসত্বের নিকট অবনত শিরে দণ্ডায়মান।

চিরকাল শ্রবণ করা যাইতেছে, এই বাঙ্গালীজাতি অতি মেধাশীল জাতি। জগতের মধ্যে যে সকল জাতি প্রতিভাসম্পন্ন ও মেধাশালী বলিয়া কথিত বাঙ্গালীজাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু যদি বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলিত হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহাদের সেই মেধা ও প্রতিভার পরিস্ফুটনের নিমিত্ত অপরের কুলিশ কঠোর হস্তের পরিচালন আবশ্যক। নচেৎ তাহার স্ফুরণ হইবে না।

বর্ত্তমানে সাধারণ বাঙ্গালী আত্মোন্নতিতে যে বিশেষ মেধাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরের নিকট হইতে যেটুকুমাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহারই উপর টীকা টিপ্পনী প্রয়োগ করিতে সিদ্ধহস্ত ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

অনেক মেধাশালী বাঙ্গালীর কথা শ্রবণ করা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সেই মেধা পরের প্রদত্ত আইনব্যবসা কিম্বা কোন উচ্চ রাজসরকারের চাকরিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহাদের দ্বারা কোন কার্য্যকরী কার্য্যের কর্ম্মপন্থা, কিম্বা দেশের ধন সম্পত্তি দেশে অবস্থানের বিধান, কিম্বা দেশের কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য দেশে উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন প্রভৃতি কোন স্বাধীন চিন্তার কিম্বা কোনরূপ স্বাধীন জীবিকার নির্দ্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই।

এইরূপ উপায় আবিষ্কৃত হইলে আজ বাঙ্গলার ব্যবসাক্ষেত্র ইউরোপবাসী ছাড়াও সুদূর মারবাড় প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ দ্বারাও অধ্যুষিত হইতে পারিত না। বাঙ্গালার ব্যবসাক্ষেত্রে বর্ত্তমানে একজনও বাঙ্গালী দণ্ডায়মান নাই। নগ্ন মস্তকের পরিবর্ত্তে নানারূপ পাগড়ী ও টুপি পরিহিত মস্তক সকল পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই বর্ত্তমানে [illegible] মায়ের রূপ

আজ এই কলিকাতা সহরের যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই আর বাঙ্গালী ব্যবসাদার দৃষ্ট হয় না। মুদী, হালুইকর প্রভৃতি সকলেই অবাঙ্গালী। যদিও ছোট দোকানদারদিগের মধ্যে দুই একটী ছোট বাঙ্গাঁলীর দোকান দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাঙ্গলার কেন ভারতের ব্যবসাকেন্দ্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না এই কলিকাতার ব্যবসার স্থান বড়বাজারে গমন করিলে আর তথায় একজন মাত্রও বাঙ্গালী দৃষ্টিগোচর হইবে না, তথায় সকলেই অবাঙ্গালী।

বাঙ্গলার এই মেধাশীলতার পরিচয়, এই স্বাধীন-চিন্তার পরিচয়, এই কর্ম্মশক্তির পরিচয়,শুধু কলিকাতার মধ্যে নিবদ্ধ নহে। বাঙ্গলার সুদূর পল্লীতেও ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের যে কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসা-কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর পরিত্যক্ত গদি গুদাম লইয়া অবাঙ্গালী তথায় অপ্রতিহত প্রভাবে ব্যবসা চালাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। আর সেই স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা মেধাশালী যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, কিম্বা এম, এ, পাশ করিয়া সেই অবাঙ্গালীর নিকট বেতনস্বরূপ সামান্য অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছে, ইহাই কি বাঙ্গালীর মেধার পরিচয় ?

পাট বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি, সেই পাট হইতে কত অবাঙ্গালী কোটী কোটী মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া লইতেছে, কিন্তু তাহাতে বর্ত্তমানে একজন বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহই নাই। সকলেই অবাঙ্গালীকে নিজের মুখের অন্ন তুলিয়া দিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইয়া বুভুক্ষিত চিত্তে তাহাদের আহার দেখিতেছে।

গঙ্গানদীর দুই তীরে অসংখ্য পাটকল বর্ত্তমান কিন্তু তাহার একটীতেও বাঙ্গালীর স্বামীত্ব নাই। এমন কি মারবাড়বাসীগণও পাটকল স্থাপন করিয়া ইউরোপবাসীগণের সহিত প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। বাঙ্গালী ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। মেধাশালী বাঙ্গালী স্বেচ্ছায় নিজের অন্নমুষ্টি অপরকে প্রদান করিয়া আইনের কূটতর্কে কিম্বা ডাক্তারের বৈদেশিক ঔষধের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে।

আজ চতুর্দ্দিক হইতে বেকারসমস্যার হুজুগ উঠিয়াছে। আপনাকে আপনি যে বেকারে পরিণত করিয়াছে তাহার সমস্যা দূরীভূত হইবার উপায় কোথায় ? সকলেই রাজদ্বারে যুক্তকরে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য দণ্ডায়মান, কিন্তু মারবাড়বাসী-গণ সে চিন্তার নিকটও গমন করেন না। বাঙ্গালী যতই বেকার বেকার বলিয়া চিৎকার করিয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, অবাঙ্গালী সেই অবকাশে বাঙ্গালার বক্ষে বসিয়া "সকার" হইতেছে।

বাঙ্গলার টাকার বাজার কলিকাতার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত স্থানে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তথায় বাঙ্গালীর স্থাপিত একটীও ব্যাঙ্ক নাই। সকলগুলিই অবাঙ্গালীর দ্বারা স্থাপিত। যদিও বাঙ্গালী পরিচালিত একটী মাত্র ব্যাঙ্ক মাতৃজঠর হইতে বহির্গত হইয়া সবেমাত্র ধীরে ধীরে "হামাগুড়ি" দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সেই শৈশবেই তাহার বাঙ্গালী পরিচালকগণের গুণবত্তায় শেষ পরিণতির বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সে সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ কর্ত্তব্য নহে।

এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির দোষ কোন স্থানে নিহিত, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মেধার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইলে কোথায় মেধাশক্তির স্ফুরণ হইয়া তাহা উৎকৃষ্টতরভাবে কার্য্যক্ষম করিবে, তাহা না হইয়া

বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইলে আরও জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

রাজেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই বাঙ্গালীজাতির এই আত্মঘাতী অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাঙ্গালী তাই তিনি নিজের আদর্শদ্বারা বাঙ্গালীকে দোষ ত্রুটীর বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন—রাজেন্দ্রনাথের চরিত্রদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে অগ্রে নিজের দোষ ত্রুটী দূর কর তাহা হইলে তোমার বাঞ্ছিত নিশ্চয় তোমার করতলগত হইবে। আজ তোমরা বৈদেশিকের পদলেহী, কিন্তু উপযুক্ত গুণে গুণান্বিত হইলেই বিদেশী তোমার নিকট অবনত শির হইবে।

জীবনসংগ্রাম

স্বাধীনচেতা রাজেন্দ্রনাথকে যখন কেহই কোনরূপে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চাকরিতে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন সকলেই নিরুপায় হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ঈপ্সিতলাভেচ্ছুককে তাহার ঈপ্সিত লাভের পথ হইতে কেহই কোনরূপে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। ইহা জগতের চিরন্তন নিয়ম।

এদিকে যোগেন্দ্রনাথ বাসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে একরূপ অপারক হইয়া উঠিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া বকুল বাগানের বাসা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাসা বন্ধ হওয়াতে রাজেন্দ্রনাথ নিরুপায় হইলেন। কোন অর্থের সম্বল নাই। একেবারে নিঃসম্বল, কিন্তু পুরুষসিংহ রাজেন্দ্রনাথ তাহাতে হতাশ হইলেন না। নিঃসম্বল অবস্থাতেই তিনি সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সম্বল মাত্র তীক্ষ্ণ প্রতিভা, গভীর আত্মবিশ্বাস এবং দুর্জ্জয় দূরাকাঙ্ক্ষা, ইহা লইয়াই আজ নিঃস্ব যুবক জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চলিলেন।

যখন বকুল বাগানের বাসা বন্ধ হইল, রাজেন্দ্রনাথ তখন নিরুপায় হইয়া আশ্রয় অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। তিনি অনুসন্ধানে অবগত হইতে পারিলেন যে তাঁহার সহপাঠী শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বাস যিনি তাঁহার সহিত পরীক্ষা প্রদান করিয়া শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে তৎকালে দুই বৎসর শিক্ষানবিশী থাকিবার জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ভাতা প্রাপ্ত হইতেছেন। তিনি সেই টাকার উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেনে একটী মেসে অবস্থান করিতেছেন।

তৎকালে গবর্ণমেণ্টের একটী নিয়ম ছিল যে যাঁহারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিবেন, তাঁহাদের চাকরি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট দায়ী থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদের দুই বৎসর শিক্ষানবিশী অবস্থায় থাকিতে হইবে। এই অবস্থায় তাঁহারা ভাতা স্বরূপ মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে কেবল সর্ব্ব প্রথম ছাত্রকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

রাজেন্দ্রনাথ তখন বন্ধু গগনচন্দ্রের অবস্থান স্থানের বিষয় অবগত হইয়া সেই মেসে তাঁহার নিকট একত্র অবস্থান করিতে আগমন করিলেন। এই গগনবাবু এখনও জীবিত আছেন। ইনি প্রথমে গভর্ণমেণ্টের অধীনে এবং জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার হইয়া পরে এই রাজেন্দ্রনাথের নিকট বহু দিবসাবধি চাকরি করেন। এক্ষণে ইনি বার্দ্ধক্যের বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন। ইঁহার দুইটী পুত্র, একটী বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার, অপরটি ইঞ্জিনিয়ার। ইনি অতি নিরহঙ্কার, সদাশয় এবং মহৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোক, এবং রাজেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ।

বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেনে মেসের বাসায় গগনচন্দ্রের নিকট রাজেন্দ্রনাথ আগমন করিলে তথায় তিনি আর

দুইটী বন্ধু প্রাপ্ত হয়েন। একজনের নাম দেবেন্দ্রনাথ সেন অপরের নাম অক্ষয়কুমার পাইন। দেবেন্দ্র নাথের বাটী পূর্ব্ববঙ্গের কোন জেলায় এবং তিনি সে সময় কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে ছিলেন (তংকালে এফ, এ বলিত), এবং অক্ষয় কুমার পাইন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন।

এই কয়জন মেসের বাসায় একঘরে অবস্থান করিতেন এবং সকলের সহিত সকলে গভীর সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ মেসের বাসায় আগমন করিয়া সামান্য যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহাদ্বারা কোনক্রমে একমাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু পরের মাসে অভাব হইল! পুরুষসিংহ রাজেন্দ্রনাথ তখন চিন্তিত হইলেন। চিন্তা—কি উপায়ে মেসের খরচ চালাইয়া নিজে কোন স্বাধীন জীবিকার অনুসন্ধান করিবেন।

রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাতে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন না, তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন আপাততঃ স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্য করিবার পূর্ব্বে এবং যত দিবস তাহার সুযোগ না প্রাপ্ত হওয়া যায় তত দিবস আত্মব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সামান্য কোনরূপ চাকরিতে নিযুক্ত হইতে হইবে। রাজেন্দ্রনাথ পরানুগ্রহকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন। তিনি সদ্ভাবে স্বোপার্জ্জিত অর্থদ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক। সর্ব্বোপরি তিনি সময়কে বৃথা অতিবাহিত করিয়া আলস্যে কালহরণ করিতে কখনই ইচ্ছুক নহেন।

রাজেন্দ্রনাথ এইরূপ চিন্তা করিয়া চাকরির অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। সামান্য অনুসন্ধানেই তিনি মিসনরীদিগের স্কুলে পনর টাকা বেতনে একটী শিক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই চাকরি প্রাপ্তে রাজেন্দ্রনাথের মেসে অবস্থানের ব্যয় নির্ব্বাহের চিন্তা অন্তর্হিত হইল।

তৎকালে বাজার এরূপ দুর্মূল্য হয় নাই। সর্ব্ব দ্রব্যই সুলভ ছিল। সেই কালে যে ব্যক্তি মাসে পনর টাকা উপার্জ্জন করিত তাহাতেই তাহার স্বচ্ছন্দে চলিত। রাজেন্দ্রনাথের মেসে অবস্থানকালীন তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট হইতে লেখক শ্রবণ করিয়াছেন যে, তখন মেসে তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকার খরচ মায় ঘর ভাড়া প্রভৃতি লইয়া মাসে সাত টাকার বেশী ব্যয় হইত না।

রাজেন্দ্রনাথ চিরকাল মুক্তহস্ত পুরুষ। কার্পণ্য তাঁহার হৃদয় বিরহিত। সে সম্বন্ধে বোধ হয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু একবার তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছিলেন যে "যখন তাঁহারা ইটালির ভেনিস সহরে গমন করিয়াছেন তথায় তাঁহার সহিত সপত্নীক রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়, তিনি সদা মুক্তহস্ত, কোনরূপ ব্যয়ে কার্পণ্য করিতেছেন না"। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মুক্তহস্ততা বর্ত্তমান, বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবগণকে, আত্মীয়স্বজনকে, তাঁহার স্বগ্রামবাসীগণকে ভোজনে আপ্যায়িত করাইতে।

দূর হইতে অনেকে তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বলিতে পারেন, তাঁহার বাটীতে তাঁহার কত আত্মীয়স্বজন নিত্য আহারাদি করেন, এবং কিরূপে যত্নের সহিত তাঁহারা তথায় সংকৃত হয়েন।

মেসের বাসায় অবস্থিতির সময় ও তাঁহার সেই প্রকৃতি বর্ত্তমান ছিল। পনর টাকা বেতন, তাহার মধ্যে সাত টাকা মেসের ব্যয় অবশিষ্ট টাকা মধ্যে বন্ধুবান্ধবগণকে সময়ে সময়ে ভোজনে তৃপ্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

তাঁহার সেই অল্প আয়ের সময়ও যদি কখনও তাঁহার বন্ধুগণ তাহার নিকট আমোদের ছলে কিছু আহার করিতে চাহিয়াছেন সদা মুক্তহস্ত রাজেন্দ্রনাথ কখনও তাহাতে অস্বীকৃত হয়েন নাই। তাঁহার এই যৌবনঘটনা সম্বন্ধে এখনও জীবিত তাঁহার সেই মেসে অবস্থান কালীন জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে লেখক শ্রবণ করিয়াছেন।

তাঁহার বন্ধু বলেন রাজেন্দ্রনাথ যাহা আনন্দের সহিত আমাদিগকে ভোজন করিতে প্রদান করিতেন, তাহা কখনই স্বল্প পরিমাণে প্রদান করিতেন না। যাহাতে সকলের প্রাচুর্য্য হয় সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত।

তাঁহার বন্ধু গল্প করেন, একদা অকস্মাৎ এক আতাফল বিক্রেতার উচ্চ শব্দ তাঁহাদের কর্ণে ধ্বনিত হইল। তখন তাঁহাদের মধ্যে জনৈক লোক রহস্যের ছলে রাজেন্দ্রনাথের নিকট আতাফল ভক্ষণের মানস জ্ঞাপন করিলেন। বন্ধু আতাফল* ভক্ষণে ইচ্ছুক হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজেন্দ্রনাথ তৎ-ক্ষণাৎ সেই ফল বিক্রেতাকে আহ্বান করিয়া তাহার নিকটে অবস্থিত সমুদয় ফল ক্রয় করিয়া লইয়া সমবেত বন্ধুদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রদান করিলেন।

কিন্তু তখন রাজেন্দ্রনাথ জানিতেন তাঁহার নিকট যে অর্থ বর্ত্তমান তাহা হইতে আতাফলের মূল্য বাবদ ফল বিক্রেতাকে প্রদান করিলে তাঁহার নিকট এক্ষণে অবশিষ্ট আর কিছুই বর্ত্তমান থাকিবে না, এবং তাঁহাদের বিদ্যালয়ের বেতনের অর্থ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহে কষ্ট হইবে। এমন কি, তাঁহার নিত্য জলযোগের ব্যয় সঙ্কুলন হইবে না, এবং সেই মাস তাঁহার সেইরূপ অনটনের মধ্যে যাপিত হইল। তথাপি তিনি বন্ধুগণকে আনন্দ উপভোগের পথ হইতে বঞ্চিত করিলেন না।

রাজেন্দ্রনাথ নিজে আবাল্য অল্পাহারী, অতি ভোজন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি যে অদ্য অল্পায়ু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সুস্থ শরীর এবং দীর্ঘ জীবন উপভোক্তা তাহাতে বোধ হয় এই মিতাহারই তাহার প্রধানতম কারণ।

তিনি নিজে অল্প এবং মিতাহারী হইলেও তবু বান্ধবগণকে ভোজনে তৃপ্ত করিতে অমিতাচারী, তিনি মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের সেই অমৃতময় উপদেশের জীবন্ত প্রতীকস্বরূপ বর্ত্তমান।

"তুমি নিজে মিত এবং অল্পাহারে পরিতুষ্ট হইবে কিন্তু অতিথি এবং বন্ধুগণকে ভোজন প্রাচুর্য্যে পরিতৃপ্ত করিবে।"

রাজেন্দ্রনাথের অল্পার্জ্জনের সময় এইরূপ ঘটনা বহুবার সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, বহুবার তিনি বন্ধুবান্ধব-গণের ভোজনেচ্ছায় পরিপোষক হইয়া পরে তিনি অর্থকৃচ্ছ্রতার ক্রোড়ে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ সে সময় কদাপি চিন্তাক্লিষ্ট, অনুতপ্ত কিম্বা বিষাদিত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রবণ করা যায় নাই।

রাজেন্দ্রনাথের চরিত্রের অপর দিকের বৈশিষ্ট্য যে তিনি নিজে বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজনে আপ্যায়িত করাইতেন, কিন্তু কখনই উপযাচক হইয়া কিম্বা ভোজন করাইয়াছি তাহার পরিবর্ত্তে বন্ধুবান্ধব-গণের নিকট রহস্যের ছলেও প্রীতিভোজনের জন্য যাচ্ঞা করেন নাই, পরন্তু অনেক সময় বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে ভোজনে আপ্যায়িত করাইবেন শ্রবণ করিলে তিনি তাহাতে বাধা প্রদান করিতেন। স্বাধীনচেতা রাজেন্দ্রনাথ কখনও কাহারও অনুগ্রহপ্রার্থী হয়েন নাই। তিনি স্বাবলম্বনকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

কয়লা এবং শোষকরূপে উহার ব্যবহার

[শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী]

যুদ্ধকালে প্রাণান্তকর দূষিত বায়বীয় দ্রব্য হইতে সৈনিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কয়লা শোষকরূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানেরা বিষাক্ত বায়ু অস্ত্ররূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছিল। সেই সময় অবধি এই বায়ু হইতে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য রসায়নবিদ্‌গণ যথেষ্ট গবেষণা করিয়া আসিতেছেন।

কয়লার দূষিত বায়ু শোষণ করিবার অসাধারণ শক্তি। সৈনিকেরা বিপদের সময় পোষাকের সঙ্গে তাহাদের নাসিকার অগ্রে কয়লা ব্যবহার করে। কয়লার আরও উপকারিতা আছে। ইহা নানা প্রকারের রঙ্ চমৎকারভাবে শুষিয়া লয়। সাদা চিনি বা মিছরি তৈয়ার করিবার সময় রসের মধ্যে অনেক রঙ্ থাকে এবং পরিমিতভাবে কয়লার সহিত মিশ্রিত করিলে খুব পরিষ্কার সাদা চিনি পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে পুষ্করিণীর দূষিত জলে অনেক প্রকার রোগের বীজাণু থাকায় ইহা সম্পূর্ণরূপে পানের অযোগ্য। আমরা জানি যে, এই দূষিত জল কয়লার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলে উহা পানের উপযোগী হয়। উহার কারণ এই যে, কয়লা জলের মধ্য হইতে দূষিত দ্রব্যগুলি শোষণ করিয়া লয়।

যে প্রকারের কয়লা শোষকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা জ্বালানী কয়লা হইতে অনেকে বিভিন্ন। শোষণকারী কয়লা অনেক উপায়ে পাওয়া যায়—যেমন প্রাণী, প্রাণীর রক্ত, কাঠ, নারিকেল অথবা চিনি হইতে। উক্ত দ্রব্যগুলি বেশ করিয়া পোড়াইয়া লইলে কয়লা পাওয়া যায়। এই সকল শোষণকারী কয়লার মধ্যে কাঠের কয়লা সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয়সাপেক্ষ। এই জন্য এই কয়লা সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ কয়লা তৈয়ারী করিতে হইলে চিনি হইতে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

কাঠকয়লা প্রস্তুত করিবার প্রণালী মোটামুটি এইরূপ :—কাঠকে একটী চুল্লীর মধ্যে অল্প পরিমাণ বায়ুর সংস্পর্শে উত্তপ্ত করা হয়। উহাতে কাঠ হইতে বায়বীয় দ্রব্য এবং উদ্বায়ী তরল দ্রব্য নির্গত হয়। চুল্লীর মধ্যে এক প্রকার পোড়া কঠিন দ্রব্য থাকে—তাহাই আমাদের কাঠকয়লা। এই কাঠকয়লাকে চূর্ণ করিয়া অন্যান্য প্রণালীদ্বারা উহার শোষণশক্তি বর্দ্ধিত করা যায়।

কয়লার শোষণশক্তি কি প্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা যায় সে সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কয়লার শোষণশক্তি দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে—একটী তাহার নিজের বিশিষ্ট শোষণশক্তি এবং অপরটী তাহার বিশিষ্ট উপবিভাগ। শেষোক্ত বিষয়টীকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে কয়লাকে বিশেষভাবে চূর্ণ করা আবশ্যক। বিশিষ্ট শোষণশক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হয় :—

হৃত কয়লাকে তাপসহ মৃত্তিকানির্ম্মিত নলের মধ্যে ঢুকাইয়া ৬০০° ডিগ্রী হইতে ১০০০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয়। ইহাতে কয়লার শোষণশক্তি অনেকগুণ বাড়িয়া যায়। কয়লাকে এইরূপ ভাবে উত্তপ্ত করিবার পক্ষে বৈদ্যুতিক-চুল্লী বেশী উপযোগী।

বায়ুর মধ্যস্থিত অম্লজানের সংস্পর্শে এইরূপ উত্তপ্ত করিলে কয়লা পুড়িয়া অঙ্গার-দ্বি-অম্লজানে পরিণত হয়। কাজেই উত্তপ্ত করিবার সময় কয়লাকে বেশী বায়ুর সংস্পর্শে না আসিতে দেওয়া উচিত। এই জন্য পাম্প দিয়া বায়ুকে বাহির করিয়া লওয়া হয়। অনেক সময় নাইট্রোজেন অথবা উদ্‌জান তাপসহ মৃত্তিকানির্ম্মিত নলের মধ্যে ঢুকাইয়া কয়লাকে উত্তপ্ত করা হয়। তাহাতে অনেক সময় কয়লার শোষণশক্তি বর্দ্ধিত হয়। তাপের পরিমাণের উপর কয়লার শোষণশক্তি যথেষ্ট নির্ভর করে।

পদার্থ (Matter)

[শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী]

পার না চ'লিতে আপনার পায়
থাক' বুঝি তাই ব'সিয়া ?
আছে ত' তোমার যা কিছু থাকার
চুপে কেন থাক রোষিয়া !
দৈর্ঘ ত' তোমার আছেই আকারে,
কার' নীচে নও প্রস্থেতে,
পুরুতে সদাই বিন্দু হ'তে বড়,
পার গো সিন্ধুরে ভেদিতে।

এত 'গুণ' পরে গুরুতাও পেয়ে
পার' না নড়িতে তখন,
প'ড়ে থাক' নানা আকার ধরিয়ে
বাস্প, তরল, সুঘন।

বেপে আছ' তুমি শূন্য জুড়িয়া
এখানে, ওখানে, সেখানে,
পার' নাক' শুধু ভাঙ্গিতে গ'ড়িতে
"শক্তি" থাকে না যেখানে।

তুমিই কি তবে সাংখ্যের "পুরুষ"
করম-বিহীন দর্শক !
ভেঙ্গে দাও মোহ, আবরণ ভেদি,
হউক সাধনা সার্থক।

আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান

[শ্রীযুক্ত নির্ম্মলাপদ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এস্-সি]

কৃষিকার্য্য বহুকাল হইতেই পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় সুজলা সুফলা দেশে কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা মানব সভ্যতার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হইয়াছিল। চীন, গ্রীস্, রোম্, মিশর ইত্যাদি অন্য প্রাচীন দেশেও কৃষি-বিদ্যার উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়াছিল। কোন্ জমিতে, কিরূপ আবহাওয়ায়, কিরূপ স্থানে, কিরূপ সারে ও কিরূপ তত্ত্বাবধানে কোন্ ফসল ভাল উৎপন্ন হয় তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছিল। বালিযুক্ত মাটীতেই বা কোন ফসল জন্মে আর কর্দ্দমাক্ত মাটীতেই বা কি ফসল জন্মে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কি ফসল জন্মে আর গরম আবহাওয়ায় কি ফসল জন্মে ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ফসল বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বাহির করা হইয়াছিল। এখনও ভারতবর্ষে, চীনে ও মিশরে সনাতনী প্রথার চাষ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই সকল স্থানের চাষের রীতিনীতি হইতেই বুঝা যায় কি পদ্ধতিতে প্রাচীন কালের কৃষিবিদ্যা আলোচিত হইয়াছিল।

দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীনকালের অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় কৃষি-বিজ্ঞানেও সর্ব্বত্র, প্রকৃতির কার্য্য-কলাপকে শুধু অনুসরণ করিয়া যাওয়া হইয়াছিল মাত্র। ভূয়োদর্শনে তাঁহারা অমানুষিক অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ওকৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। জমিতে সার দিলে ফসলের বৃদ্ধি হয় এইটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু ঐ সারে ফসলের বৃদ্ধি হয় কেন ও কি উপায়ে হয় তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। এইখানেই প্রাচীন বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অভিযানের আরম্ভ। আধুনিক বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য, জমি ও তাহাতে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে আসল সম্বন্ধটী আবিষ্কার করা।

প্রাচীনকালের এই প্রকার অসম্পূর্ণ কৃষি-বিজ্ঞান সম্বল করিয়া ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দেশ এখনও কৃষিকার্য্য চালাইতেছে তাহাদের জমিতে ফসলের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। ইহা সত্য যে, দেশও কাল নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কালের পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালোচিত ব্যবস্থাদিরও পরিবর্ত্তন দরকার। কিন্তু কি যে এই পরিবর্ত্তন, স্থানও কালের সঙ্গে তদুপযোগী ব্যবস্থাদির কি যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তাহার কিছু না জানার দরুণ প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কুফল ফলিতেছে। আধুনিক কালের ও আধুনিক স্থানের সঙ্গে সে প্রাচীন পদ্ধতি খাপ খাইতেছে না। আমাদের দেশে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেও যে স্থানে যেরূপ পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইত সেস্থানে এখন আর তাহা হয় না, যে নদীতে যে পরিমাণ জল বহিয়া যাইত তাহা এখন আর সেরূপ বহে না; মানুষের রোগ,

ভোগ, দুঃখ দুর্দ্দশা তখন যেমন ছিল এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; যে সকল ফসল সেকালে আবাদ হইত না সেরূপ অনেক ফসল এখন দেশে আমদানী হইয়াছে। এক কথায় আবহাওয়া প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে দেশকালোচিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনা আশু প্রয়োজন।

আধুনিক সকল প্রকার বিজ্ঞানের জন্ম ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং ইহাদের বয়স দুইশত বৎসরের অধিক নহে। তাহার পূর্ব্বে অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকগণ অন্ধকারে হস্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন মাত্র। ষোড়শ শতাব্দীতে ভন হেলমণ্ট্ নামক এক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেন যে, গাছের উপাদান জল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে ; অর্থাৎ গাছের শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল জলের নানাবিধ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনজাত পদার্থ মাত্র। অধ্যাপক বয়েল ঐ সময়েই স্থির করেন, গাছের ভিতর যে লবণাক্ত পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও জলের রূপান্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এইরূপ আজগুবি মতবাদই প্রচলিত ছিল। এই সময়ে ল্যাভোঁসিয়ে, প্রিষ্ট্‌লি, ক্যাভেন্‌ডিস্, লিবিগ্, হ্বোলার প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ আবির্ভূত হইয়া বিজ্ঞানের ধারা ফিরাইয়া দেন। ল্যাভোঁসিয়ে প্রমাণ করেন যে আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে বায়ু বাহির করিয়া দিয়া থাকি উহা অঙ্গারযুক্ত এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ, যাহা উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। প্রিষ্ট্‌লি এই সময়েই অম্লজান আবিষ্কার করেন এবং দেখিতে পান যে, অঙ্গারযুক্ত নাসানির্গত বায়ু আহরণ করিয়া উদ্ভিদ্ অম্লজান পরিত্যাগ করে। মানুষ এই অম্লজান প্রশ্বাসের সহিত টানিয়া লয় ; অর্থাৎ মানুষ যাহা পরিত্যাগ করে তাহা উদ্ভিদের প্রয়োজন এবং উদ্ভিদ্ যাহা পরিত্যাগ করে তাহা মানুষের প্রয়োজন। এইরূপে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল যোগসূত্রের আবিষ্কার হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ হইয়া যায় যে, উদ্ভিদের উপাদানে অঙ্গার থাকে এবং উক্ত অঙ্গার বায়ু হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার পর রাদার ফোর্ড 'নাইট্রোজেন' আবিষ্কার করেন এবং ডেভি সোডিয়ম্ ও পটাসিয়ম্ ধাতুদ্বয় আবিষ্কার করেন। হ্বোলার কিছুদিন পরে প্রমাণ করিয়া দেন যে, জৈব পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী হইতে পারে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, অঙ্গারযুক্ত কোন জৈব দ্রব্য জীবনীশক্তি ব্যতিরেকে তৈয়ারী হইতে পারে না। এইরূপে নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত নানাবিধ তথ্যের মূলীভূত কারণও বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, লিবিগ্ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরস্, পটাস্, চূণ ইত্যাদি দ্রব্য উদ্ভিদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং অঙ্গারের ন্যায় নাইট্রোজেনও উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক বায়ু হইতে আহৃত হয়। লিবিগের এই সিদ্ধান্তের পর কৃষি-বিজ্ঞান নূতন পথ অবলম্বন করে। সারের ভিতর কোন্ জাতীয় পদার্থ বর্ত্তমান থাকায় উহা উদ্ভিদের আবশ্যকীয় খাদ্যে পরিণত হয় তাহা আয়ত্ত হওয়ায় সারের ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হইতে থাকে এবং সার বিক্রয় একটী লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়।

কিন্তু, উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করে,—লিবিগের এই সিদ্ধান্ত শীঘ্রই ভ্রমজনক বলিয়া ধরা পড়ে। বুঝা যায় যে, নাইট্রোজেন প্রথমতঃ মাটীর ভিতরে গিয়া সঞ্চিত হয়। সেখানে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা নাইট্রোজেন উদ্ভিদের খাদ্যরূপে পরিণত হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত এই খাদ্য শিকড়ের ভিতর দিয়া উদ্ভিদের সর্ব্বত্র চালিত হয়। বায়ু হইতে অঙ্গার সংগ্রহ করিয়াই উদ্ভিদ্ ক্ষান্ত। অন্যান্য যাবতীয় খাদ্য মাটীর ভিতর দিয়া সংগৃ

হয়। মাটীর ভিতর এমন কোন প্রক্রিয়া চলে যাহার উপর উদ্ভিদের খাদ্যাখাদ্য, জীবন মরণ, পুষ্টি ক্ষয় সমস্তই নির্ভর করে। এইবার বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পড়ে মাটীর উপর। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, মাটীর তত্ত্ব ও তথাকার নানাবিধ প্রক্রিয়াদি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না হইলে উদ্ভিদের তত্ত্ব আলোচনা নিষ্ফল।

জগদ্বিখ্যাত রদামষ্টেডের কৃষিবিজ্ঞান অনুষ্ঠান এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সার্ জন্ লজ্ প্রথমে একজন কৃত্রিম সার ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দেখিতে পান যে, কৃত্রিম সার সময়ে সময়ে আশানুরূপ ফলদান করে না। ইহা দেখিয়া তিনি স্থির করেন যে, শুধু সার দিলেই যে ফসল ভাল হইবে তাহা নহে। যে জমিতে সার দিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করা পূর্ব্বেই দরকার। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ও অন্যান্য আরও কয়েক স্থানে মাটী সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হইয়া গেল। তাহার পর গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কৃষি-বিজ্ঞান দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমেরিকায় পূর্ব্বে যে জমিতে মাত্র ১২ বুশেল ফসল হইত সেখানে এখন প্রায় ৩০ বুশেল ফসল হইতেছে।

যাহা হউক, মাটী বিশ্লেষণ করিয়া মোটামুটি তিন প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। (১) কঠিন দ্রব্য, যথা,—প্রস্তর, বালুকা, শুষ্ক কর্দ্দম ইত্যাদি। (২) 'কলয়েড' বা কণাদল শ্রেণীর দ্রব্য। এরূপ দ্রব্য জলে মিশাইলে চিনি কিম্বা লবণের ন্যায় সম্পূর্ণ মিশিয়া যায় না, আবার বালুকা এবং প্রস্তরের ন্যায়ও সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া থাকে না। ইহা জলের মধ্যে ভাসিতে থাকে। চিনি জলে দ্রবীভূত হইলে উহার অস্তিত্ব শ্রেষ্ঠ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দৃষ্টিগোচর করা যায় না; কিন্তু কণাদল দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ কণাদল দ্রবীভূত হয় না, ভাসমান থাকে। বালুকা যদিও জলে মিশেনা তথাপি বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা ইহাকে এত সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করিয়া ফেলা যাইতে পারে যে, ইহা তখন জলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ভাসিয়া বেড়াইবে, কখনই নীচে সমাবেশিত হইবে না। বালুকার এইরূপ অবস্থাকে 'কলয়েড' অবস্থা বলা যাইতে পারে। বর্ষার সময় নদীর ঘোলা জল সহজে পরিষ্কার হইতে চাহে না; কারণ জলের ভিতর মাটী 'কলয়েড' অবস্থায় থাকে। ফট্‌কিরি দিলে মাটীর ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং উহা নীচে পড়িয়া যায়। (৩) জলের সহিত মিশিতে পারে এরূপ দ্রব্য যেমন—'নাইট্রেট্ অব্ সোডা', লবণ, ফস্‌ফরিক অম্ল, 'সুপার ফস্‌ফেট্ অব্ লাইম' ইত্যাদি। ইহারা জলে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। কণাদলের ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায় না। ইহাদিগকে দ্রবনীয় পদার্থ বলা হয়।

এই বিভিন্ন ধর্ম্মী দ্রব্যগুলি এরূপভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যে, প্রাণীদেহের ন্যায় উহারাও মাটীকে একটী সজীব প্রাণীবিশেষ করিয়া তুলিয়াছে। প্রাণী দেহকে তিনভাগ করিলে আমরা পাই হাড়, মাংস ও জলীয় দ্রব্য; হাড় বর্ত্তমান থাকায় প্রাণীদেহ গঠন-বৈশিষ্ট্য লাভ করে, মাংস বর্ত্তমান থাকায় হাড়ের সহিত অন্যান্য দেহাংশের, যথা পেশী, শিরা, নাড়ী ইত্যাদির সংযোগ সাধিত হয়, এবং জলীয় পদার্থ অর্থাৎ রক্ত ইত্যাদি থাকার দরুণ দেহের সর্ব্বত্র আহার প্রেরণ, পুষ্টিসাধন ও বিষ নাশন চলিতে থাকে। মাটীর সম্বন্ধেও ঐ রূপ বলা যাইতে পারে। মাটীতে যে পরিমাণ প্রস্তর, বালুকা, কর্দ্দম ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে তাহার উপরে সেই মাটীর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে অর্থাৎ মাটীর জাতি নির্ণয় ঐ সকল হইতে করা যায়। মাটীর ভিতর কণাদল জাতীয় দ্রব্য বর্ত্তমান থাকায় মাটী শুষ্ক হইয়া গেলে বালুকার ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায় না, শক্ত ঢিলে পরিণত হয়; আবার মাটী ভিজা

থাকিলে বালুকার ন্যায় ধুইয়া যায় না আঠার ন্যায় এক সঙ্গে লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ মাটীর ভিতর যাবতীয় বিভিন্ন পদার্থকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কণাদলের প্রয়োজন হয়। জলীয় দ্রব্য এই কণাদলের জন্য মাটী হইতে চুয়াইয়া অন্যত্র যাইতে পারে না। কাজেই যে জলীয় দ্রব্যে মাটীর পুষ্টি, সে জলীয় দ্রব্য মাটীর ভিতর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিতে পারে, ধুইয়া যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রমরাজ্যে
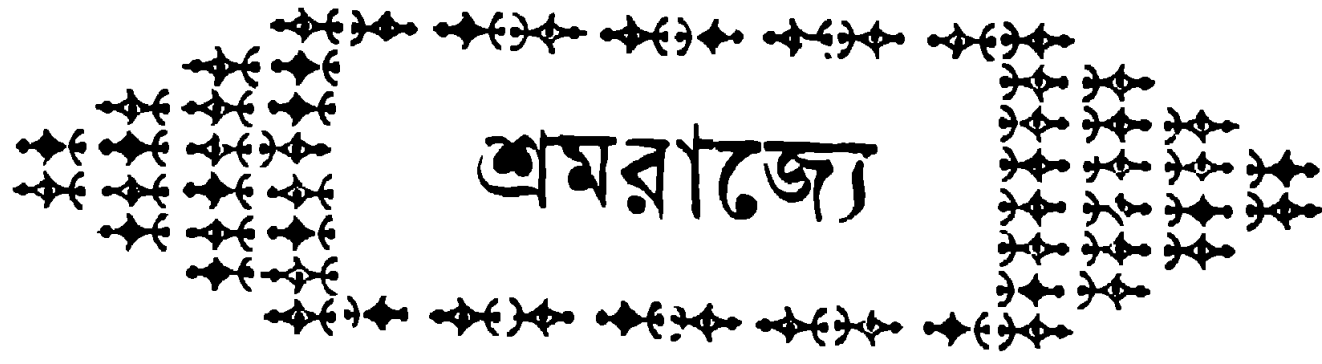
[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্জন]

(১)

জীবনকে শক্তিরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাইবে, সকল জীবেরই এই চেষ্টা। এই চেষ্টাটিই জীবের জীবন।

এ ইচ্ছা পূর্ণ হইতে, বহু লক্ষ বৎসর গিয়াছে। আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই। তবুও যুগের পর যুগ ইচ্ছার সংগ্রাম চলিতেছে। কিন্তু জীবের বিজয়-সিংহাসন বহুদূরে এখনও।

কারণটুকু বড়ই সুন্দর। যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, তিনি জীবসৃষ্টির মূলেই, ঐ ইচ্ছাটিকে তাঁহার আপন ইচ্ছার পরম রহস্যে উজ্জ্বল করিয়া, উহাকে নিজের দুটি পাশে ভাগ করিয়া রাখিয়াছেন। একটি প্রবল সুন্দর পুরুষশক্তি, আর একটি অমল সুন্দর স্ত্রীশক্তি। স্রষ্টা ঐ দুটিকে একই স্থানে ভিন্ন করিয়া রাখিয়া, জগতের বিচিত্র বিজ্ঞান এবং বিচিত্র কাব্য গঙ্গাযমুনার ন্যায় এদুটি ধারাকে অনন্ত কালসমুদ্রের উদ্দেশে চির প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন।

দুজনের হাত ধরিয়া দুজনেই ছুটিয়াছে। কিন্তু দুজনের পায়ের নৃত্য ছুটিয়াছে দুটি তালে। একজন ছুটিয়াছে অশেষ স্রোতের বেগে গিরিশিলা লঙ্ঘন করিয়া, আর একজন অপূর্ব্ব তরঙ্গের কল-গান সমীরণে ছড়াইয়া দিয়া।

কর্ম্মের বীররস বাঁটিয়াছেন একজন। স্নেহ-মায়ামমতার আনন্দরস বাঁটিয়াছেন আর একজন।

জগতে জীবন সঞ্চারের কথা মনে হয়। অতি আদিতে, সুদূর নক্ষত্রের আলোর ভিতর হইতে, এই ধরণীতেই আসিবার জন্য জীবন যখন সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখনই সেই আলোর কণায় কণায় কি এই বৈচিত্র্য ছিল? তাহারই কিছুকাল পরে, জীবন যখন জীবকোষের ভেলাতে করিয়া, জলময় ধরণীর এপার ওপার পাড়ি দিতেছিল, তখন সে ভেলার নাবিকটি ছিল কে?

যিনি ছিলেন, তিনি কি একা ছিলেন? অথবা ছিলেন দুজনেই?

জলের শৈবালে কি তাঁহারা আনন্দে ঘর বাঁধিয়া-

ছিলেন ? একাত্মক কীটরূপে প্রথম যিনি জগতে জয়যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন, তিনিই কি জীবজগতের আদি অর্দ্ধনারীশ্বর ?

কিন্তু সে কথা এ জগৎ প্রথমেই জানিতে পারে নাই। একদিন প্রভাতে জাগিয়া সেই দিনের জগৎ দেখিল, সকলেরই মন কোথায় চলিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছে। নূতন সূর্য্য কি যে কর্ম্মের বারতা লইয়া আসিয়াছে, স্পষ্ট যদিও তাহা বোঝা গেল না, কিন্তু এটুকু বোধ হইল যে, আলস্যের রাত্রির অবসান হইয়াছে। আর নিদ্রায় সুখ নাই, নির্জ্জনতাতে সুখ নাই, নীরব নিশ্চল হইয়া থাকিতে প্রাণ চাহে না, কোন একটা কিছু কাজের জন্যই যেন মন উন্মুখ। সমস্তটা জগৎ জুড়িয়া সহসা যেন একটা শ্রমের প্রভাত আসিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখিলেই যেমন করিয়া শ্রমের ইচ্ছাটি তাহার হৃদয়ে আসিয়া যুক্ত হয়, ঠিক অকস্মাৎ এক স্বাধীন খেলার ইচ্ছারূপে, যেন তাহারই আদিরূপটি নীরব জগতে হঠাৎ জাগিয়াছে।

জীবজগতের প্রথম কর্ম্মশক্তি আসিয়া শ্রমের আনন্দ-উষার ভোরের দুয়ারে দাঁড়াইয়াছেন।

এই জীবজগৎ সেই দিন হইতে সত্য সত্য সজীব হইল। আহারে এবং আহার অন্বেষণে তাহাই সহজ ইচ্ছা হইল। আহারে, দৃষ্টিতে, শ্রবণে সে নিজেকে উপলব্ধি করিতে লাগিল এবং প্রতি স্পর্শে অন্যকে জানিয়া নব নব পুলকে পুলকিত হইতে লাগিল। বিপুল এই ধরণীর বুকে তাহার পর অজস্র নূতন রূপে, নানা নূতন ভাবে, দেহে এবং মনে আপনাকে যুগ যুগ ধরিয়া সে প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে।

সেই দিনগুলিতেই জগৎ প্রথম জানিতে পারিয়াছে যে, সে একা নহে। কোটি কোটি বৎসরের নিদ্রার পরে জাগিয়া, জাগরণের তোরণে পা দিয়াই সে জানিল, সে বিভক্ত, সে অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাহার পরিপূর্ণতারই জন্য অনাদিকাল হইতে তাহারই পাশে নিজ প্রাণরসে জীবনদীপের তৈল সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে আর একজন।

বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, কৌতূহলে, শ্রমমন্দিরের সোপানে প্রণত হইয়া, জীবের জগৎ অজ্ঞানারূপিনী সেই চিরসঙ্গীর হাতটি গ্রহণ করিল।

সেই শুভ মুহূর্ত্তটিকে ঘিরিয়া, পৃথিবীর জীব, জীবনের রথখানিকে গড়িয়া লইয়াছে। দুটি চাকার উপরে সজীব ভুবনের রথ চলিল, বিজয়-ভেরী বাজাইয়া, অনন্তের কোন পথে, অতুলন শ্রমে পর্ব্বতারণ্য ভেদ করিয়া, ঝড় ঝঞ্ঝা সমুদয় পায়ের তলে মথিত করিয়া, অকাতর অবাধ গতিতে, আপনাকে ধরিত্রীর কোলে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য।

এজন্য জীবের অগণিত শ্রেণী জীবন উৎসর্গ করিতে বেদনা বোধ করে নাই। এক জীব জীবন অঞ্জলি দিয়াছে, তাহার উপরে আর এক জীবের উদ্ভব হইয়াছে। জীবনে মৃত্যুতে, মৃত্যুতে জীবনে এই যাত্রা পথের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। নূতন নূতন কতই শ্রমের পথ দেখা দিয়াছে, জল হইতে জীব স্থলে আসিয়াছে, শামুকের খোলস হইতে আসিয়া হয়তো বৃক্ষশাখায় বাসা লইয়াছে, হয়তো মাটির বুকে গর্ত্ত খনন করিয়া গৃহ বাঁধিয়াছে, পর্ব্বতের গহ্বরে, বৃক্ষের কোটরে আবাস স্থান করিয়া লইয়াছে—এবং অবশেষে কুটীর বাঁধিয়াছে। কিন্তু সব স্থানেই, শ্রমের আনন্দ-উষার সেই দুইজন, তেমনি হাতে হাতে ধরিয়া ছুটিয়াছে।

(২)

ছুটিয়াছে দুই জনেই কিন্তু পথের বহু বাধা দুই জনকেই কম আহত করে নাই। তবু সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব বিধান তাহাদিগকে চালাইয়া লইয়া গিয়াছে।

কুটীর হইতে তাহাদের গতি প্রাসাদ পর্য্যন্ত,

এবং এখন আকাশ পর্য্যন্তও। জগতের শ্রমরাজ্য চারিদিকে বিপুল হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের প্রতিভা নানামুখে নানাভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে তাহারা নিজেকে হারাইয়া যায় নাই।

তাহার কারণ, বিধাতার ইচ্ছার রহস্যে ঢাকা বিজ্ঞান ও কাব্যের পতাকা তাহারা দুইজনে পাশা-পাশি বহিয়া লইয়া চলিয়াছে বলিয়া। সেইজন্যে লক্ষ্যপথও তাহারা কখনও হারায় নাই। কত দুঃখ, ভুল, ভ্রান্তি, হয়তো কত যুগে যুগে ঘটিয়াছে, কিন্তু আবার যুগে যুগেই সেগুলিকে দূর করিবার জন্য নূতন বলের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে।

এই যে বনে পশুযূথের মধ্যে স্ত্রীদের রক্ষণের জন্য পুরুষদলের ব্যস্ততা দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে শ্রম নিবেদনের আগ্রহ কতখানি! স্ত্রীশক্তির কাছে পুরুষশক্তির আপন জীবনের পরিচয় এবং জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিজের অন্তরগত কামনা, এ উভয়ই উহার মধ্যে।

আবার যখন দেখিতে পাই, আদিম যুগের বর্ব্বর মানুষেরা এবং তাহারও পরযুগের আরও একটু উন্নত মানুষেরা, তুলনায় একটু উন্নত হইয়াও দাসত্ব প্রথায় বহু বিবাহে জীবন পথের মালাগাছিকে কণ্ঠে না ধরিয়া, তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে, তখন মনে হয় যে শ্রমের পথে চলিতে চলিতে, জ্ঞানের রাজ্যটুকু পার হইতে গিয়া, তাহার আলোকের বিচার বুদ্ধিতে তাহাদের ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছে।

সেইজন্য মানুষ যখন সমাজ গড়িল, মানবধর্ম্মেরও অতিরিক্ত করিয়া ধর্ম্মের শ্রেণী গড়িল, তখন মনে হইলে দোষ নাই যে, তাহারা কর্ত্তব্যের পথে ইতস্ততে পড়িয়া গিয়াছে! ইহাও আর এক প্রকারের পরীক্ষা। এখানে পুরুষশক্তি আপনার বলে জীবনের যুদ্ধে টিকিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে কি না এখনও তাহা সন্দেহের বিষয়। কখনও সমাজ হয়তো জীবন-গতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "রাখ, থাম।" ধর্ম্মশাস্ত্র একবার স্নেহে কোলে নিতেছেন, আবার আছাড়িয়া ফেলিতেছেন। শাস্ত্র একরূপে বলিতেছেন "যিনি সঙ্গিনী, তিনি শক্তিরূপিনী", অন্যরূপে বলিতেছেন "এ সঙ্গ অমঙ্গল।" হয়তো বা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পুরুষশক্তিকে বলিতেছেন, "সন্ন্যাস শ্রেয়।"

কিন্তু শ্রেয় কিম্বা প্রেয়, এদুটি মনগড়া পথের দিকে মন দিতে বিজ্ঞান স্বীকৃত হইল না। রথের রশ্মিগুলি পুরুষশক্তি ও স্ত্রীশক্তি উভয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া সে বলিল, "তোমরা চল। জ্ঞানরাজ্যটি তোমাদের স্বর্গ হইতে পারে, কিন্তু তোমরা যে মানুষ, শ্রমরাজ্যের অধিবাসী তোমরা। আপন পথেই তোমরা লক্ষ স্বর্গ গড়িতে পারিবে। তোমরা যেদিন তোমাদের পথ চলা ছাড়িয়া দিবে, সেদিন স্বর্গেরও কোন মূল্য নাই।"

তাহার পর দেখা গেল যে কতই ধরণের সভ্যতা শেষ কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যে উঠিল এবং পড়িল, কিন্তু জীবনের কর্ম্ম-গতি একই ধারাতে নিরুদ্বেগে কালের পথ বাহিয়া চলিয়াছে। সহস্র নীতি, সহস্র বিধি, সহস্র অনুশাসন এখন শুধু তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিয়া তাহাদের পথের ধূলি সরাইয়া দিতেছে।

ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক এই যে তড়িতের ভিতরে তড়িৎ-স্বভাবের দুইটি অংশ আছে, এই অংশ দুইটি যেমন পরস্পর স্বাধীন, তেমনই পরস্পর সহযোগী। জীবসৃষ্টির বহু পূর্ব্বে, এই জগদ্বিকাশের আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাদের হাতে কি কি অধিকার রাখিয়া দিয়াছিলেন, এত যুগ পরে, বৈজ্ঞানিকেরা আজ তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বিস্মিত হইতেছেন। তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন, ইহার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছুই নাই। এই ধরণীর মাটির মতই তাহা স্পষ্ট।

পদার্থেরা অবিশ্রাম কাজ করিয়া ছুটিয়াছে—পরস্পরের সেই সহযোগীতায়। প্রতিটি অণুর অস্তিত্বও অক্লান্ত শক্তিব্যয়ের সহযোগীতায়—সেই হাতে হাতে ধরিয়া চলার। জীবলোকের আজিকার দিনে সে শ্রেষ্ঠ জীব মানবের—মর্ম্মদেবতা তাহার অন্তহীন শ্রম-রাজ্যের যে যুগযুগান্তের খাতাখানি খুলিয়াছেন, তাহার অক্ষরও কোন আস্তরণের উপর লিখিত নয়, সে অক্ষরগুলির মুখ পরিষ্কার ভূপিঠে। উহার ভিতরে হয় তো অশ্রুর ধারা মিলিবে না, রক্তের লালিমা পাওয়া যাইবে না, কিন্তু প্রস্তরে, ধাতুতে, জীবনের পরিপূর্ণ ব্যথা জমাট হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়া রহিয়াছে। সেখানে পুরুষশক্তির ক্ষমতার দম্ভ, স্ত্রীশক্তির স্নেহ-মমতার আতিশয্য, সমস্ত ঝরিয়া খসিয়া গিয়া, নিঃশব্দ, প্রাণহীন পদার্থে পূর্ণ প্রাণের মূর্ত্ত সাক্ষ্য জাগিয়া আছে। এগুলির কোনটিকে ক্রম বিকাশের প্রতীক, কোনটিকে জ্ঞানের প্রতীক অথবা কোনটিকে অন্য কিছুর প্রতীক বলিতে পারি, কিন্তু—সকলের উপরে এগুলি যে শ্রমের প্রতীক, শক্তির প্রতীক এ বিষয়ে ভুল কি? চিন্তার দিক দিয়া মানুষ যদি কখনও বিধাতার নিকটে তাহার শ্রেষ্ঠ উপহারটা লইয়া গিয়া দাঁড়ায়, তবে সেই সঙ্গে এই অক্ষরগুলির উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে সমস্ত জীবন-পরিচয়ের হিসাবটি নিয়া পৌছাইতে হইবে সৃষ্টিকর্ত্তার পদ্মাসন তলে। কেন না, সেখানে সকল রত্ন, সকল মাণিক্যের অপেক্ষাও সত্যের প্রভাবটি বেশী। যে রহস্যের বিন্দুটি তিনি সৃষ্টির মূলে রাখিয়া দিয়াছেন, সেটি এই সত্য। এই সত্যের মূর্ত্তিটি বিশেষ জ্ঞানের ভিতর দিয়া, সকল অবস্থাতেই দেখা যায় এবং জীবনকাব্যের ভিতর দিয়া ইহার অমৃত সব সময়েই আস্বাদন করা যায়। এটি পরিপূর্ণতার মূর্ত্তি। সচলতার জীবন্ত গতি। সৃষ্টিকর্ত্তা অন্য কোন উপহার কামনা করেন কি না জানা যায় নাই, কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর কাছেই যে তিনি এ জিনিষটি চাহিয়াছেন, তাহারা নিখুঁত-ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে ইহা উপহার দিক,—এটিও সত্য।

(৩)

এইজন্য, জগতে যখনই যাহা কিছুরই বিকাশ হইয়াছে, তিনি পুরুষশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি উভয়কেই তাহা বাঁটিয়া দিয়াছেন, তাহারা পরিপূর্ণ হউক। তাহাদের উভয়েরই প্রাণও চিরদিন সেই লক্ষ্যেই ছুটিয়াছে। সেই জন্য সভ্যতার আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত যেমন স্ত্রীপুরুষের অধিকার লইয়া বিবাদও বাঁধিয়া আছে, তেমনই দুজনেই তাহারা পৃথিবীর হাল ধরিয়া চলিয়াছেন। গৃহকর্ম্মে, সঙ্গীতে, শিল্পে, সমাজে, রাষ্ট্রে, মন্দিরে, তাঁহাদের বিবাদ এবং প্রীতি সমস্রোতে চলিয়াছে। উভয়ে অংশী বলিয়াই, এবং অংশী বলিয়াই আজও যে মানব জগৎশক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসন 'শান্তি'কে পায় নাই সে শুধু দুই অংশী দুইজনকে এখনও সম্যক্ জানিয়া উঠিতে পারে নাই। এই হেতুটুকুতে।

জ্ঞানের রাজ্যে উভয়ের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। সমাজে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। রাষ্ট্রে এবং অন্য বহুপ্রকারে। কিন্তু দুইটী শক্তিরই, পরস্পরের বন্ধু হইয়া হাত মিলাইবার একটী মাত্র অনাদি হইতে অনন্তকালব্যাপী চিরন্তন স্থান—শ্রমরাজ্যে।

এইখানেই দুইজনের পরিপূর্ণ মূর্ত্তিখানির আভাস পাওয়া যায়। লৌকিক ধর্ম্ম আসিয়া যখন গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, এটি ইঁহার নিষেধ, ওটি উঁহার নিষেধ। তখন শ্রম বলিলেন, সত্য ধর্ম্ম তো ইহা নয়। মানবধর্ম্ম জগৎ যাত্রার জীবনপথে উভয়ের মিলিত শ্রমে। শ্রম জয়ী হইলেন। পুরুষ মন্দির গড়িল, তাহাতে শিল্প আঁকিল। স্ত্রী অঙ্গন পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতে আলিম্পন আঁকিলেন। কলা জন্মলাভ করিল। কিন্তু সে শ্রমের গর্ভে।

কলা জন্মলাভ করিয়া নিষেধ বাধা উড়াইয়া দিল। এইরূপ করিয়া সকল কর্ম্মেই অবশেষ যে তিলকটি অক্ষয় হইয়া আছে, সেটি শ্রমের।

যেদিন শ্রমকে জগৎ-মানব স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সমান ভাবে, অসন্দিগ্ধরূপে দেখিতে চাহিবে, সেই দিন মানুষের সকল ভাণ্ডারের সকল দ্বার খুলিয়া যাইবে এবং শক্তিরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসনের বেদিটি দেখা যাইবে। কর্ত্তব্যের সজাগ বুদ্ধিতে, সজাগ সমতায়, মনোভাবের নির্ভীকতায়, শান্তির মঙ্গলে একটি আনন্দময় জগৎ সুন্দরতর লোকে তাহার লিপিখানি পাঠাইবে।—"এতদিন বৃথা চলি নাই; আমি আসিতেছি।"

আসিতেছে। জগৎময় শ্রমেরই সাড়া পড়িতেছে। শ্রমই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, মানুষের স্বাধীনচিত্ত জগতের সর্ব্বশক্তি, পথচলা পথিকের বিজয়গীতি। মৃত্যু উচ্চেও, মৃত্যু নিম্নেও; ধনী সুখী নহে, দরিদ্রও নয়। কিন্তু যে শ্রমী সে অমর। সেখানে অতি ক্ষুদ্রও অনন্ত বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। সারাদিন স্বামীস্ত্রীতে রৌদ্রতাম্র আকাশের নীচে শ্রমে অক্লান্ত থাকিয়া, দিনান্তে ঘাম মুছিতে মুছিতে যখন বিশ্রামের মুখে কুটীরে তাহারা ফিরে, শিশুদল দুইদিক হইতে আসিয়া দুইজনকে ঘিরিয়া ধরে, গাছের নীচে আগুনের ধুনী জ্বালাইয়া সন্ধ্যায় শান্তিতে যখন স্বেচ্ছায় সঙ্গীত তাহার কণ্ঠ হইতে উচ্ছ্বিত হয়, আর গৃহিনীর সবল হস্তের দীপ কুটীর মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন সে দৃশ্যে রাজার তৃপ্তি হয়, গৃহীর তৃপ্তি হয়, দীন দুঃখীর তৃপ্তি হয়, সন্ন্যাসী মুক্ত হন। কেননা ধরণী ইহাদেরই রাজত্ব, মান, অভিমান, দর্প, কপটতা, ক্ষমতা সকলের উপর দিয়া ইহাদের মুকুটের চূড়া। স্বাধীন গৃহ ইহাদেরই। আশা ও কর্ম্ম ইহারাই জীবন্ত। ইহারাই জগতে নির্ব্বিলাস, নির্ব্বিরোধ। ধরণী কোল পাতিয়া ইহাদিগকে ধরিয়াছে, আকাশ হৃদয়ের আলিঙ্গন দিয়া আছে, কর্ম্ম একটী শিশুর মত ইহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে। অবিরাম গতিতে পথ কাটিয়া চলিয়াছে ইহারা যুগযুগান্ত নদীর ধারায় মত, সিদ্ধি সমুদ্রের আহ্বানে! ইহারাই জগতের শোণিত।

এই শোণিতস্রোত মানবের শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভাগে বিভাগে নির্ব্বিচারে সমস্ত ধমনী ভরিয়া যখন বহিবে, তখন জীবজগৎ সার্থক হইবার, তাহার সত্য আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হইবার বিলম্ব থাকিবে না।

তখন মানুষ জীবনলোকে আনন্দে বলিয়া উঠিতে পারিবে সেই আমি,

যে,
মহা রথযাত্রায় চলিয়াছি।
আমি সেই,
"পূর্ণের পদপরশ যাহার 'পরে।"

সুন্দরবনে শিকার

[শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের নৌকার আর একটি লোক একখানি দা হাতে করিয়া পূর্ব্বোক্ত শিকারী মাঝির সহগামী হইল, কারণ জঙ্গলের ভিতর যখন লোকে প্রবেশ করে, তখন তাহারা হস্তে একটি দা কিম্বা কুড়াল লইয়া জঙ্গলে যায়। কদাচ নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়া উচিত নহে। ভদ্রলোকের পক্ষে যখন শিকার করিতে জঙ্গলে উঠা হয়, তখন একখানি ছোরা কাছে রাখা আবশ্যক; কারণ সুন্দরবন জঙ্গল অত্যন্ত বিষধর সর্প-সঙ্কুলস্থান। হাতে একখানি অস্ত্র রাখা বিশেষ আবশ্যক, কারণ অনেক সময় সর্পের সম্মুখে পড়িলে বন্দুকের দ্বারা বিশেষ কার্য্য হয় না। হয় সেই সময় দা কিম্বা কুড়াল দ্বারা তাহাকে মারা হয়, নচেৎ তাড়াতাড়ি একটি সরু গাছ কাটিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ লাঠি রূপে ব্যবহার করা যায়। ইহা ছাড়া যদি কোন ঝোপ বা জঙ্গলের সম্মুখে পড়া যায়, তখন তাহাদ্বারা পথ করিয়া লওয়া যায়। এইরূপে দা কিম্বা কুড়াল জঙ্গলের ভিতর বিশেষ উপকার দেয়, ভদ্রলোক দা কিম্বা কুড়াল না লইয়া ছোরা লয়। ইহারা সেইজন্য একখানি দা লইয়া চলিল।

আমরা নৌকায় তখন আহারাদির জন্য ব্যস্ত হইলাম। আমাদের সেই সহযাত্রীটী তখন ভাত চড়াইয়া দিয়াছিল, আমরা সকলে হাতাহাতি তাহার সাহায্য করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বরাত্রের মৎস্য ভাজা ছিল তাহার ঝোল হইল। তাহার দ্বারা নৌকার ভিতর বসিয়া আহারাদি ক্রিয়া সকলে সম্পাদন করিলাম এবং এদিকেও সেই ছোট হরিণটী রাত্রের আহারের জন্য ছাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

আমরা সকলে আমাদের সেই নৌকার মাঝির প্রতীক্ষায় সর্ব্বদাই জঙ্গলের দিকে নজর রাখিয়াছি সে কখন ফিরিয়া আসিবে এবং সেই সহিত উৎসুক হইয়াও রহিয়াছি যে সে কোন মৃগ শিকার করিল কিনা? আমরা সকলেই এরূপ আলোচনা করিতেছি এবং যতই বেলা যাইতেছে ততই আমরা নৌকার ভিতরে সকলে অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছি যে, সেই লোক কখন ফিরিয়া আসিবে, আমরা আবার জঙ্গলের ভিতর শিকার করিতে প্রবেশ করিব, কিন্তু আমাদের সেই মাঝির কোনরূপ সন্ধান নাই। নৌকার ভিতর বসিয়া আমরা ক্রমেই উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই সঙ্গে তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছি এবং নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যতদূর সম্ভব হা হুতাশ করিতেছি। তখন আমরা বলাবলি আরম্ভ করিলাম যে তাহার নিকট বন্দুক দেওয়া যতদূর সম্ভব ভুল হইবার হইয়াছে। জঙ্গলের ভিতর যদি তাহার কোন বিপদ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত; কারণ এ জঙ্গলের অবস্থা আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। ইহার ভিতর আর কোন

নদী আছে কিনা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না কিম্বা এ জঙ্গলের ভিতর কিরূপ অবস্থা খুব "হদো" গাছের ঝোপ রহিয়াছে কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ যে জঙ্গলের ভিতর হদো গাছের ঝোপ থাকে তাহা অত্যন্ত খারাপ, তাহার মধ্যে একে ত পথ ঠিক করা যায় না তাহার উপর হদো বনের ভিতর ব্যাঘ্র থাকিলে তাহাও দেখা যায় না। হদো গাছের ঝোপের ভিতর অনেক সময় বিষধর সর্প সকল কুণ্ডলী হইয়া থাকে। মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। অনেক সময় মানুষ যে মুহূর্ত্তে সেই জঙ্গলের নিকট পা দেয়, সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে সর্পে দংশন করে। এই সব বিষয় আলোচনা করিতেছি এরূপ সময় তখন বেলা বোধ হয় সাড়ে চারিটা আন্দাজ হইবে দূরে একটী বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল। কিন্তু জঙ্গলের ভিতর বন্দুকের শব্দের দ্বারা স্থানের দূরত্ব অনুভব করা যায় না। কতদূরে যে এরূপ শব্দ হইল তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাহা যে অত্যন্ত দূরে হইয়াছে তাহা একরূপ আন্দাজ করিলাম। তখন আমরাও বন্দুক বাহির করিয়া আওয়াজের দ্বারা সঙ্কেত করিব এইরূপ মনস্থ করিতেছি, কিন্তু আর আওয়াজ করা হইল না। আমাদের পূর্ব্বে কথা ছিল যে পর পর যদি দুইটী শব্দ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা। এখান হইতে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু দেখা গেল তাহার কোনরূপ নহে, কারণ পর পর দুইটী শব্দ হইল না। আমরা তখন অনুভব করিলাম যে হয়ত কোন হরিণের পদচিহ্ন ধরিয়া যাইয়া দূরে পড়িয়াছে সেখানে সেই হরিণের সন্ধান পাইয়া তাহার উপর গুলি করিয়াছে। কিন্তু যখন বুঝিলাম যে তাহার শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই, তখন আমরা সে বেলা জঙ্গলে উঠিবার আশা একরূপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহারই জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম।

আমাদের পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে যে সুন্দরবন জঙ্গলের নিকটস্থ প্রদেশে যে সমস্ত লোক বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের শিকার করিবার সখ আছে তাহারা যদি কখনও একটী ভাল বন্দুক পায় তাহা হইলে তাহাদের শিকারে নিবৃত্ত করা দুষ্কর ব্যাপার হয়, তখন তাহাদের বাটীতে যত কার্য্যই থাকুক বন্দুক পাইলে তাহারা সে সব কার্য্য ফেলিয়া শিকার করিতে জঙ্গলের ভিতর চলিয়া যাইবে। এমন কি, চাষের সময় যখন হয়ত একদিন চাষ বন্ধ রাখিলে ক্ষতি হইবে কিম্বা হয়ত তখন একটী মজরের দাম পাঁচসিকা, দেড়টাকা সেই সময়ও এইরূপ অবস্থা। যদি তাহাদের বলা যায় যে আচ্ছা বন্দুক দিতেছি সকালে জঙ্গলে যাও দুই তিন ঘণ্টা সময়ের বেশী বিলম্ব করিও না, আমরা অন্যত্র চলিয়া যাইব। তাহারা তখনই স্বীকার করিবে 'হাঁ বাবু তাহাই হইবে এই আমরা ফিরিয়া আসিলাম বলিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।' কিন্তু একবার চলিয়া যাইতে পারিলে তাহারা দুই ঘণ্টার স্থানে আট নয় ঘণ্টা লাগাইবে। যদি জঙ্গলে উঠিবামাত্রই একটী হরিণ পায় তাহা হইলে সেই হরিণকে ফেলিয়া রাখিয়া অথবা তাহাকে অন্য কোন হিংস্র প্রাণীতে না খাইয়া ফেলে কিম্বা অন্য কেহ চুরি করিয়া না লইয়া যায় সেই জন্য গাছের উপর বাঁধিয়া রাখিয়া আবার হরিণ পাওয়া যায় কিনা তাহার চেষ্টা করিবে। তাহাতেই হয়ত সন্ধ্যা হইয়া যাইবে এবং হয়ত আর হরিণ পাইল না কিন্তু তাহাতেও তাহাদের কিছু আসে যায় না। এইরূপ অবস্থা অনেকবার হইয়াছে। ঐ সব লোকের হাতে বন্দুক দিয়া তাহার পর একদিন বিলম্ব হইয়াছে এবং তাহাতে কত কার্য্যের ক্ষতি হইয়াছে ;

কিছুতেই তাহাদিগকে পারা যায় না। ইহা আমাদের জানা আছে।

তখন সেখানে বসিয়া আমরা তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলাম যে আজকার শিকার ত আমাদের বিফল হইল। আজ বৈকালে যদি জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত আরও দুই একটী হরিণ পাইতাম এবং রাত্রের জোয়ারে আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিতাম। এইটী সদাসর্ব্বদা জানা আবশ্যক—কলিকাতার দিক হইতে সুন্দরবন জঙ্গলে আসিতে হইলে নদীতে যখন ভাঁটা হইবে তখন আসিতে হইবে এবং সুন্দরবন হইতে ফিরিয়া কলিকাতার দিকে যাইতে হইলে নদীতে যখন জোয়ার হইবে তখনই যাওয়া যাইবে। ইহা অবশ্য নৌকার সম্বন্ধে, ষ্টীমারের সম্বন্ধে আলাদা কথা। কারণ ষ্টীমার কিম্বা মোটর বোটের জোয়ার ভাঁটার আবশ্যক হয় না। নদীতে জোয়ার ভাঁটা যাহাই থাকুক সে সমানভাবে চলিবে। সে যাহা হউক আমরা গিয়াছি নৌকায় ইহার চলিবার সময় জোয়ার ভাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নচেৎ ইহা চলিবে না। যাহা হউক তখন আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। প্রথমে আলোচনা করিতে লাগিলাম যে আমাদের ফিরিয়া যাওয়া হইল না। তাহার পর আলোচনার বিষয় হইল যে অদ্য বৈকালে শিকারের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু সর্ব্বশেষে তাহাদের বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম

এদিকে শীতকালের বেলা শীঘ্র অবসান হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের সেই একবার বন্দুকের শব্দ ছাড়া আর কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তখন বেলা যতই অবসান হইতে লাগিল আমরা ততই চিন্তিত হইতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে মনোভাব এরূপ হইতে আরম্ভ করিল যে, নৌকা হইতে উঠিয়া জঙ্গলের ভিতর তাহাদের সন্ধান করি, কিন্তু তাহা অসম্ভব কারণ তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। চারিদিক প্রায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে—এরূপ অবস্থায় কোথায় তাহাদের অনুসন্ধানে যাইব। সেই জঙ্গলের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই ধারণা নাই, তাহার উপর নদীতে জোয়ার আসিয়াছে তাহাতে জঙ্গলের মধ্যস্থিত ছোট বড় নদী সকল যাহা ভাঁটার সময় একেবারে শুষ্ক হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছে এবং জঙ্গলের নিম্নপ্রদেশসকল জলে ভরিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের জন্য যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি সমাগম হইল তথাপিও তাহাদের কোনরূপ সন্ধান নাই। এরূপ অবস্থায় রাত্র যখন আটটা হইয়াছে তখন আমরা এরূপ মানস করিলাম যে নৌকা হইতে বন্দুক ছোড়া হউক তাহার শব্দ পাইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে। মধ্যে মধ্যে আমরা নৌকা হইতে খুব জোরে জোরে "সাই" অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে কাহাকেও ডাকিবার সঙ্কেতধ্বনি পূর্ব্বে তাহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছি যে জঙ্গলের ভিতর কাহারও নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকা উচিত নহে এবং সে আওয়াজও বহুদূরে যায় না। তাহার মধ্যে "কুই" বলিয়া উচ্চে চীৎকার করিলে তাহার শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত যায়। সেইরূপ ধ্বনি করা হইতেছে কিন্তু কোনরূপ তাহাদের সাড়া নাই। তাহার উপর নৌকার মধ্যে বিপদ। যে লোক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার এক ভ্রাতা নৌকায় ছিল সে আরও অস্থির হইয়া উঠিয়াছে এবং একরূপ ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে। তাহাকে স্থির করান আমাদের আরও দুর্ঘট ব্যাপার হইয়া উঠিল। সেই সময় নৌকার ভিতর সকলেই একরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

যে সময়ে আমরা নৌকার ভিতর বন্দুকের শব্দ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছি অর্থাৎ টোটা বাহির করিয়া বন্দুকে ভরিব বলিয়া ঠিক হইতেছি,

সেই মুহূর্ত্তে আমাদের অদূরে অর্থাৎ খালের মুখে যে স্থানে আমাদের নৌকাটী বাঁধা রহিয়াছে সেখান হইতে তিন চারি শত হস্ত দূরে একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র ডাকিয়া উঠিল। বৃহৎ বুঝিতে পারিলাম তৎপর দিবস তাহার পায়ের দাগ দেখিয়া, কারণ ব্যাঘ্র ছোট কি বড় তাহা তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া অনুভব করা যায়। আমরাও যে দিবসের কথা বলা হইতেছে তাহার পর দিবস সেই স্থানে দেখিতে উঠিয়াছিলাম যে কিরূপ ব্যাঘ্র এই স্থানে কল্য রাত্রে ছিল। সে যাহা হউক যেমনি সেই ব্যাঘ্র আমাদের সন্নিকটে ডাকিয়া উঠিয়াছে তখনি আমাদের সেই পূর্ব্বোক্ত সাহসী সঙ্গীটী ভয়ে নৌকার ভিতর চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে এবং এরূপ চীৎকার আরম্ভ করিল যেন তাহাকে নৌকার ভিতর আসিয়া ব্যাঘ্রে ধরিয়াছে। যতই তাহাকে স্থির হইয়া থাকিতে বলা হইতেছে, সে ব্যক্তি ততই ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিতেছে এবং এক এক সময় এরূপ করিতেছে যে যেন সে নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং সে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল যে এখান হইতে নৌকা খুলিয়া দিয়া অন্যদিকে চলিয়া যাই। কিন্তু আমরা বলিলাম যে কিরূপে ইহা হইতে পারে। আমাদের দুইজন সঙ্গী জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া রহিল আর আমরা তাহাদের এখানে ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে খালের এধার হইতে অন্যধারে এখন নৌকা বাঁধিয়া রাখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই খালও ক্ষুদ্র তথাপি ইহাতে কিছু নিরাপদ হইতে পারা যায়। যখন এইরূপ পরামর্শ হইতেছে তখন ব্যাঘ্রটীও চীৎকার করিতে করিতে আমাদিগের নৌকার দিকে অগ্রসর হইতছে। তাহার চীৎকার যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আমাদিগের নৌকাস্থিত সহযাত্রীটী একান্ত ভয়ে অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং তাহার ভিতর কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। যখন কিছুতেই তাহাকে স্থির করা যাইতেছে না তখন আমাদিগের ভিতর হইতে একব্যক্তি তাহাকে বলিয়া উঠিল যেখানে তোমার এত ভয় তখন শিকার করিতে আসিয়াছিলে কেন? আমরা ত জোর করিয়া তোমাকে ডাকিয়া আনি নাই। তোমাকে ত অনেক বারণ করা হইয়াছিল তুমি ত কোনরূপ আমাদের নিষেধ বাক্য শ্রবণ কর নাই। এখন ক্রন্দন করিলে কি হইবে। তোমার কোনরূপ ভয় নাই নৌকার ছইয়ের ভিতর বসিযা থাক ব্যাঘ্র আর ছইয়ের ভিতর হইতে মানুষ লইয়া যাইবে না। আর যদি বিশেষ ভয় হয় ইহার উপরের পাতা কাঠ উত্তোলন করিয়া নৌকার খোলের মধ্যে প্রবেশ কর তাহা হইলে আর কোন-রূপ ভয় থাকিবে না। এদিকে তাহাকে লইয়া এইরূপ ব্যস্ত ওদিকে যখন বলা হইল নৌকাটী খুলিয়া খালের অপর পারে যাইবার জন্য তখন আমাদের নৌকাস্থিত দুইজন মাঝি একেবারে সে কার্য্য অস্বীকার করিয়া বসিল। বলিল বাবু আমরা কোন মতেই এসময়ে নৌকার ছইয়ের বাহিরে যাইয়া নৌকা খুলিতে পারিব না কিম্বা বাহিরে বসিয়া হাল ধরিতে পারিব না। তৎকালে তাহাও এক বিপদ হইল। আমরা নিজেরাও হাল ধরিতে জানি না যে হাল ধরিয়া নৌকাটী খালের পর পারে লাগাইব। তাড়াতাড়ি তখন কিরূপ করা যাইবে তাহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তৎপরে আমরা পরামর্শ করিয়া লইলাম যে ব্যাঘ্রের ডাকের দিক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোড়া যাউক। গুলি লাগে ব্যাঘ্রটী মরিয়া যাইবে, না লাগে ব্যাঘ্রটী পলায়ন করিবে; কিন্তু তখন আমাদের সহিত দুইটি বন্দুক ছিল। মোট আমাদিগের সহিত তিনটী বন্দুক ছিল। তাহার একটী লইয়া চলিয়া গিয়াছে নৌকার মধ্যে দুইটী রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহাই স্থির করিয়া লইয়া সেই ব্যাঘ্রের শব্দের দিক

অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া একসঙ্গে গুলি ছুড়িলাম এবং অপর দুইটী ব্যক্তি দুইটী হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া নৌকার বাহিরে ধরিয়া দণ্ডায়মান হইল। আমরা পর পর চারিটী গুলি ছুড়িলাম। আমাদের বোধ হয় তাহার ভিতর একটী গুলি তাহার গাত্রে বিদ্ধ হইতে পারে, কারণ তৎপর দিবস সেইস্থানে রক্ত দেখা গিয়াছিল এবং এই গুলি ছুড়িবার কালীন ব্যাঘ্রটী অত্যন্ত চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল তাহা আমরা বেশ অনুভব করিলাম। তৎপরে আরও দুইবার আমরা সেখানে গুলি ছুড়িলাম এবং ব্যাঘ্রটী যে পলায়ন করিয়াছে তাহার চীৎকারে বুঝিতে পারিলাম। কারণ তাহার শব্দ ক্রমে ক্রমে দূরে যাইতে লাগিল। তখন বেশ অনুভব করিলাম যে সেইস্থান নিরাপদ হইয়াছে, কোন ব্যাঘ্র এখানে নাই। তখন সেই মাঝিদের বলিলাম এইবার তোমরা নৌকা হইতে বাহির হইয়া নৌকাটী বাহিয়া খালের অপর পারে লইয়া যাও আমরা বন্দুক লইয়া নৌকার সম্মুখের দিকে এবং পশ্চাতের দিকে বসিয়া রহিলাম তোমাদের কোন ভয় নাই। তাহাদের বুঝাইলাম যে আমরা বলিতে পারিতেছি না যে যদি ব্যাঘ্রটী আহত হইয়া থাকে তাহা হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে। তখন যদি পুনরায় ফিরিয়া আসে তাহা হইলে উপায় কি হইবে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে ব্যাঘ্র আহত হইলেই পলায়ন করে। তাহাদের ভয় দেখাইয়া অপর পারে লইয়া যাইবার জন্যই তাহাদিগকে বলিলাম। তখন তাহারা সকলে আমাদের কথায় আশ্বাসিত হইয়া নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া নৌকাটী বাহিয়া লইয়া অপর পারে উপস্থিত হইল।

(ক্রমশঃ)

তাপ-গতি-বিজ্ঞান

[ডক্টর যতীন্দ্রনাথ বসু
ও
শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

যদি কোনও গ্যাস এরূপভাবে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় যে সঙ্কোচন ও প্রসারণ কালীন ইহার উত্তাপ সমান থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণকে সম উত্তাপে* সঙ্কোচন ও প্রসারণ বলা হয়।

সম উত্তাপে গ্যাসের প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন জনিত কৃতকর্ম্ম—

মনে কর, ১নং চিত্রে কখগ বক্ররেখা সম উত্তাপে প্রসারণ বা সঙ্কোচন নির্দ্দেশ করিতেছে এবং এই বক্র রেখার সমীকরণ চ × অ = স্থ। মনে কর, ক বিন্দু এবং গ বিন্দুতে চাপের পরিমাণ বর্ণনানুক্রমে $চ_১$ ও $চ_২$ এবং আয়তন $অ_১$ ও $অ_২$।
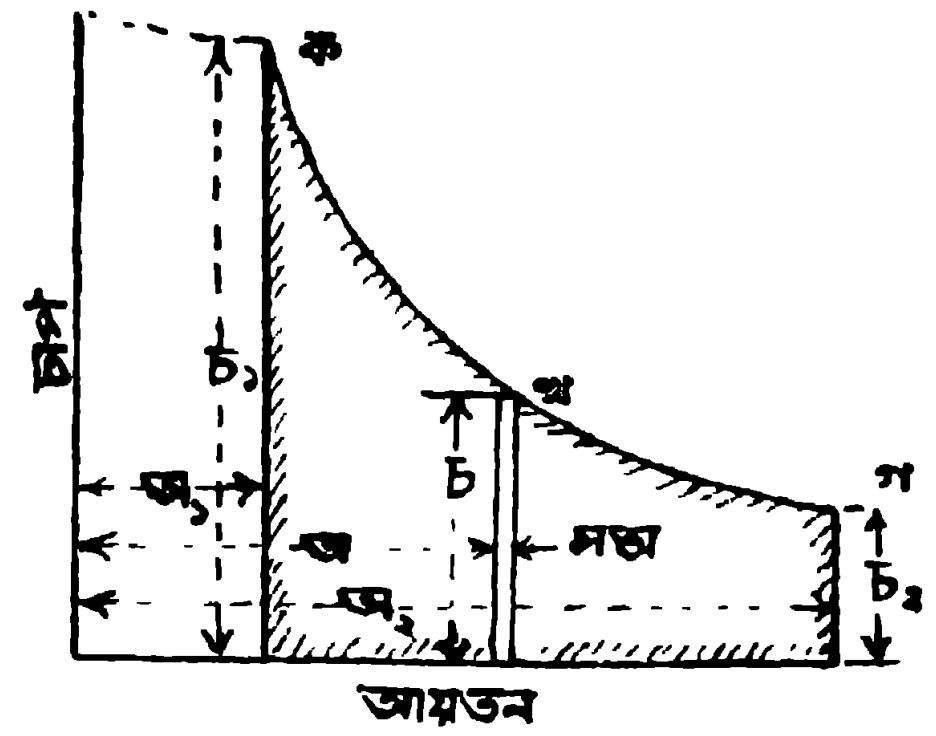
১নং চিত্র।

আয়তন $অ_১$ হইতে $অ_২$ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এই পরিবর্ত্তনকে অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং সূক্ষ্ম অংশের উপর গড়ে 'চ' চাপ পড়িতেছে বলিয়া ধারণা করা হইল। এক্ষণে মনে কর, খ বিন্দুতে সঅ আয়তনের একটি সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন।

সুতরাং এই পরিবর্ত্তনজনিত আংশিক কৃতকর্ম্মের পরিমাণ

---

* Isothermal

$= চ \times সঅ$

তাহা হইলে কৃতকর্ম্মের সমষ্টি

$$= \int_{অ_1}^{অ_2} চ \times সঅ$$

$$= \int_{অ_1}^{অ_2} স্থ \times \frac{সঅ}{অ}$$

$$= স্থ \log_e \frac{অ_2}{অ_1}.$$

$$= চ_1 \times অ_1 \times \log_e \frac{অ_2}{অ_1}.$$

$$= ২{\cdot}৩০৩ \times চ_1 \times অ_1 \times \log \frac{অ_2}{অ_1}$$

যদি চাপ প্রতি বর্গফুট এবং আয়তন প্রতি ঘনফুটে লওয়া হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম ফুট-পাউণ্ড এককে উল্লিখিত হইবে।

$$প্রদত্ত\ তাপ = ই + \frac{কৃতকর্ম্মের\ সমষ্টি}{য},$$

(এখানে 'ই'—অন্তর্শক্তি এবং 'য'—তাপ-কর্ম্ম অনুপাত)

$$= ব_অ\ (উ_2 - উ_1) + \frac{২{\cdot}৩০৩ \times চ_1 \times অ_1 \times \log \frac{অ_2}{অ_1}}{য}$$

এক্ষেত্রে উত্তাপ সমভাবেই আছে অর্থাৎ $উ_2 = উ_1$।

সুতরাং

$$প্রদত্ত\ তাপ = \frac{২{\cdot}৩০৩ \times চ_1 \times অ_1 \times \log \frac{অ_2}{অ_1}}{য}\ তাপএকক$$

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সম উত্তাপের প্রসারণে যে পরিমাণ কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে ঠিক সেই পরিমাণ তাপ প্রদান করিতে হইবে, তাহা না করিলে উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, এবং সম উত্তাপের সঙ্কোচনে সম্পাদিত কর্ম্মের পরিমাণ তাপ গ্যাস হইতে গ্রহণ করিতে হইবে নচেৎ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইবে।

গ্যাস যদি এমন কোনও স্থানে আবদ্ধ হয় যে, তাপ তাহার নিকট হইতে স্থানান্তরিত না হইতে পারে অথবা অন্য স্থান হইতে কোনও তাপ গ্যাসের ভিতর না আসিতে পারে এবং সেই অবস্থায় যদি গ্যাসের কোনও প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন হয়, তাহা হইলে সেইরূপ প্রসারণ ও সঙ্কোচনকে সমতাপে * প্রসারণ ও সঙ্কোচন বলিয়া থাকে।

সমতাপে প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন জনিত কৃতকর্ম্ম

সমতাপে গ্যাস $চ \times অ^ন = স্থ$ ধারানুযায়ী প্রসারণ অথবা সঙ্কোচন কার্য্য সম্পাদন করে।

পূর্ব্বের ন্যায় কখগ বক্ররেখা ইহা নির্দ্দেশ করিতেছে।

মনে কর,	$চ_1$	প্রাথমিক	চাপ
	$অ_1$	„	আয়তন
	$উ_1$	„	উত্তাপ
এবং	$চ_2$	পরিবর্ত্তিত	চাপ
	$অ_2$	„	আয়তন
	$উ_2$	„	উত্তাপ।

* Adiabatic.

পূর্ব্বের ন্যায় আংশিক কৃতকর্ম্মের পরিমাণ

$$= চ \times সঅ,$$

কিন্তু $চ \times অ^{ন} = স্থ$

অথবা $চ = \dfrac{স্থ}{অ^{ন}}$;

সুতরাং কৃতকর্ম্মের সমষ্টি—

$$= স্থ \times \int_{অ_১}^{অ_২} \frac{সঅ}{অ^{ন}}$$

$$= \frac{স্থ}{১-ন}\left(অ_২^{১-ন} - অ_১^{১-ন}\right),$$

$$= \frac{চ_১ \times অ_১^{ন}}{১-ন}\left(অ_২^{১-ন} - অ_১^{১-ন}\right);$$

কিন্তু $চ_১ \times অ_১^{ন} = চ_২ \times অ_২^{ন}$

সুতরাং কর্ম্মের সমষ্টি $= \dfrac{চ_১ \times অ_১ - চ_২ \times অ_২}{ন-১}$ ....(১)

$$= \frac{গ \times (উ_১ - উ_২)}{ন-১} \quad ......(২)।$$

প্রদত্ত তাপ = অন্তর্শক্তির বৃদ্ধি + $\dfrac{কর্ম্ম}{য}$

$$= ই \times \frac{কর্ম্ম}{য}।$$

তাপ সমভাবেই ছিল, সুতরাং প্রদত্ত তাপ = 0;

তাহা হইলে $ই = -\dfrac{চ_১ \times অ_১ - চ_২ \times অ_২}{য \times (ন-১)}$ তাপ একক।

সুতরাং সমতাপের প্রসারণে যে পরিমাণ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, গ্যাস হইতে সেই পরিমাণ তাপ অন্তর্হিত হয়। সেই জন্য দেখা যায়, কোনও প্রসারণের পর গ্যাসের উত্তাপ অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সমতাপ সঙ্কোচনে গ্যাসের উপর যে পরিমাণ কর্ম্ম করা হয় সেই পরিমাণ তাপ উহাতে প্রযুক্ত হয় এবং তাহাদ্বারা উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, গ্যাসকে সঙ্কোচন করিলে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়।

সমতাপ প্রসারণে চাপ, আয়তন এবং উত্তাপের পরস্পর সম্বন্ধ

আমরা জানি—$চ_১ \times অ_১^{ন} = চ_২ \times অ_২^{ন}$

অথবা $\dfrac{চ_২}{চ_১} = \left(\dfrac{অ_১}{অ_২}\right)^{ন}$;

সুতরাং $\left(\dfrac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{১}{ন}} = \dfrac{অ_১}{অ_২}$;

কিন্তু $চ_১ \times অ_১ = গ \times উ_১,$

$চ_২ \times অ_২ = গ \times উ_২,$

সুতরাং $\dfrac{উ_২}{উ_১} = \dfrac{চ_২}{চ_১} \times \dfrac{অ_২}{অ_১} = \left(\dfrac{অ_১}{অ_২}\right)^{ন} \times \dfrac{অ_২}{অ_১},$

অর্থাৎ $\dfrac{উ_২}{উ_১} = \left(\dfrac{অ_১}{অ_২}\right)^{ন-১}$।

ঐরূপে $\dfrac{উ_২}{উ_১} = \left(\dfrac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}$।

সুতরাং কর্ম্মের পূর্ব্ব সমীকরণে আমরা আয়তন অথবা চাপ ব্যবহার করিতে পারি।

বহুতাপমিশ্র প্রসারণ

বহুতাপমিশ্র * প্রসারণের ধারা পূর্ব্বের ন্যায়—

$$চ \times অ^{ন} = স্থ,$$

এবং

(ক) প্রদত্ত তাপের পরিমাণ $= ব_{চ} (উ_২ - উ_১)$,

(খ) অন্তর্শক্তির পরিবর্ত্তন $= ব_{অ} (উ_২ - উ_১)$,

(গ) কৃতকর্ম্মের পরিমাণ $= \frac{চ_১ \times অ_১ - চ_২ \times অ_২}{ন - ১}$

সুতরাং

$$(উ_২ - উ_১) = ব_{অ} (উ_২ - উ_১) + \frac{চ_১ \times অ_১ - চ_২ \times অ_২}{(ন - ১) য}$$

বহুতাপমিশ্র প্রসারণে চাপ, উত্তাপ এবং আয়তনের সম্বন্ধ সমতাপ প্রসারণের ন্যায়, কেবলমাত্র সমতাপ প্রসারণে "ন" $=$ ১.৪ এবং বহুতাপমিশ্র প্রসারণে 'ন'র পরিমাণ ১ হইতে অধিক এবং ১.৪ হইতে ন্যূন।

* Polytropical.

বায়ুসঙ্কোচক যন্ত্র

সঙ্কোচনের ধারা $-$ চ $\times$ অ^{ন} $=$ স্থ

যখন,

ন $=$ ১ সম উত্তাপে সঙ্কোচন

ন $=$ ১.৪ সমতাপে "

ন $=$ ১.৩ } বহুতাপমিশ্র "
ন $=$ ১.২ }

যখন সম উত্তাপে বায়ু সঙ্কুচিত করা হয়, তখন ইহার উত্তাপের বৃদ্ধি পায়, ফলে সঙ্কুচিত করিতে অধিক পরিমাণ কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সঙ্কোচনের সময় যাহাতে উত্তাপের বৃদ্ধি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যকমত 'সিলিণ্ডার'টী জলদ্বারা শীতল করিতে হয়।

(২নং চিত্র)

(২নং চিত্র) মনে কর,

প্রতি বর্গফুটে চ১ পাউণ্ড বায়ুর প্রবেশের চাপ,

" চ২ " সঙ্কুচিত বায়ুর নিষ্ক্রমণ চাপ,

অ১ ঘনফুট গৃহীত বায়ুর আয়তন

এবং অ২ " সঙ্কুচিত " "

সুতরাং

$$কর্ম্ম = \frac{চ_২ \times অ_২ - চ_১ \times অ_১}{ন - ১} + চ_২ \times অ_২$$

$-চ_১ \times অ_১$ ফুঃ পাঃ ;

$$= \frac{ন}{ন-১}\left(চ_২ \times অ_২ - চ_১ \times অ_১\right) \text{ ফুঃ পাঃ}$$

কিন্তু $\frac{চ_১ \times অ_১}{উ_১} = \frac{চ_২ \times অ_২}{উ_২}$;

অর্থাৎ $চ_২ \times অ_২ = চ_১ \times অ_১ \times \frac{উ_২}{উ_১}$;

অর্থাৎ $চ_২ \times অ_২ = চ_১ \times অ_১ \times \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}$ ।

সুতরাং

$$কর্ম্ম = \frac{ন}{ন-১}\left\{চ_১ \times অ_১ \times \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}} - চ_১ \times অ_১\right\}$$

ফুঃ পাঃ

$$= \frac{ন}{ন-১} \times চ_১ \times অ_১ \left\{\left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}} - ১\right\} \text{ ফুঃ পাঃ (১)}$$

সঙ্কোচন যদি সম উত্তাপে হয়,
তাহা হইলে

$কর্ম্ম = ২.৩০৩ \times চ_১ \times অ_১ \times \log \frac{চ_২}{চ_১} + চ_২ \times অ_২$ $-চ_১ \times অ_১$ ফুঃ পাঃ ; কিন্তু সম উত্তাপে গ্যাস বয়েলের সূত্রানুসরণ করে।

সুতরাং $চ_১ \times অ_১ = চ_২ \times অ_২$

সুতরাং

$$কর্ম্ম = ২.৩০৩ \times চ_১ \times অ_১ \times \log \frac{চ_২}{চ_১} \text{ ফুঃ পাঃ .. (২)}$$

$$= ২.৩০৩ \times গ \times উ_১ \log \frac{চ_২}{চ_১}$$

সুতরাং

কর্ম্ম ক্ষমতা * $= \frac{(২)}{(১)}$ ।

সম উত্তাপের সঙ্কোচনে কোনও তাপ বায়ুকে উত্তপ্ত করিবার জন্য অকারণে নষ্ট হয় না, সুতরাং ইহাই দক্ষ সঙ্কোচন।

বহুস্তর সঙ্কোচন

বায়ুকে সঙ্কুচিত করিলে উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং সেইজন্য কতক পরিমাণ অধিক কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বায়ুকে একটি সিলিণ্ডারে আংশিক সঙ্কুচিত করিয়া ঐ সঙ্কুচিত বায়ুকে একটি শীতল আধারের ভিতর দিয়া চালিত করা হয়, তখন ইহার উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তৎপর ঐ অবস্থায় ইহাকে পৃথক্ সিলিণ্ডারে পুনরায় সঙ্কুচিত করা হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ইহাকে পুনরায় শীতল করিয়া সঙ্কোচন করা চলে। এইরূপ ভাবে সঙ্কোচন করাকে বহুস্তর সঙ্কোচন বলে।

(৩নং চিত্র)

* Efficiency.
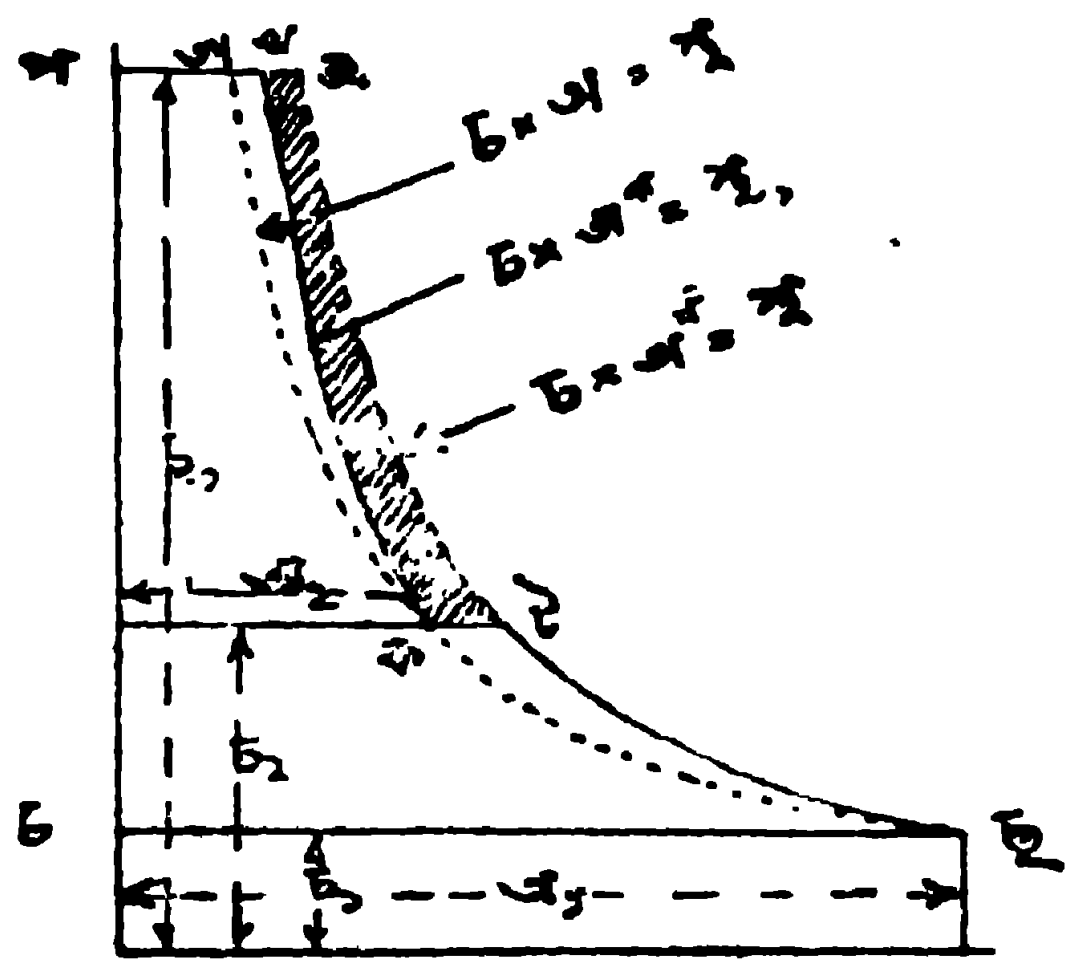
(৩নং চিত্র) মনে কর, বায়ুকে $চ_{১}$ চাপ হইতে $চ_{০}$ চাপে সঙ্কুচিত করিতে হইবে। এক্ষণে ইহাকে যদি একটি সিলিণ্ডারে $চ_{০}$ চাপ পর্য্যন্ত সম উত্তাপ রেখা ছগ অনুযায়ী সঙ্কুচিত করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের পরিমাণ চছগপ ক্ষেত্র হইতে এবং সমতাপ রেখা ছজ অনুযায়ী হইলে কর্ম্মের পরিমাণ চছজপ ক্ষেত্র হইতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সম উত্তাপে সঙ্কোচন সম্ভব নয় বলিয়া সমতাপে করিতে হইলে অধিক কর্ম্মের প্রয়োজন হয়।
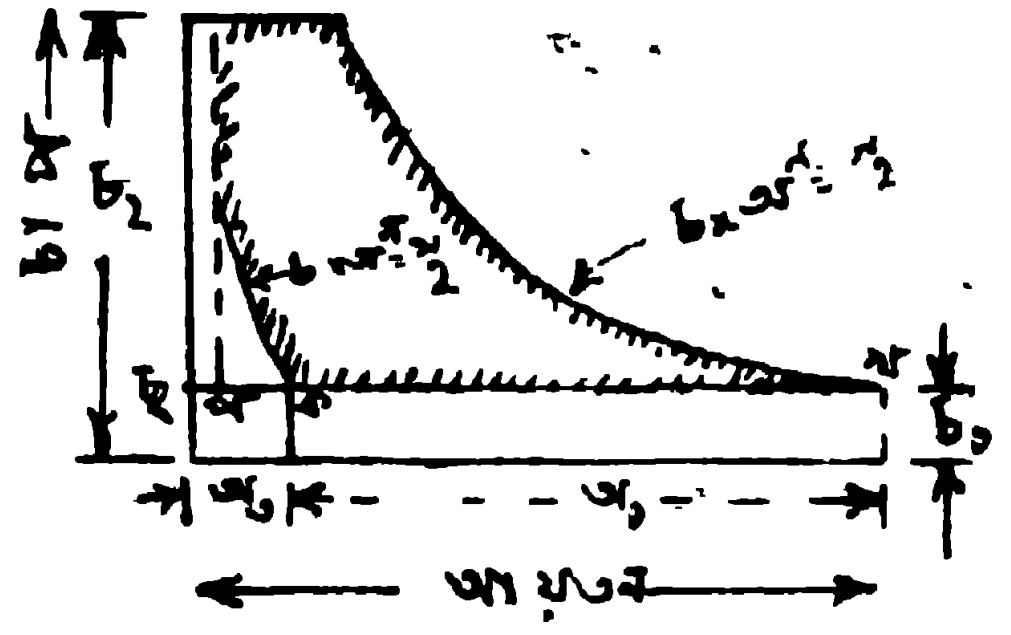
সেইজন্য প্রথমতঃ $চ_{১}$ চাপ হইতে $চ_{২}$ চাপ পর্য্যন্ত সমতাপ রেখানুযায়ী আংশিক সঙ্কুচিত করা হয়। মনে কর, এইরূপে ছ হইতে ট বিন্দু পর্য্যন্ত আসিয়া বায়ুকে শীতল করা হইল এবং সম উত্তাপ রেখার ক বিন্দু হইতে পুনরায় কথ রেখানুযায়ী $চ_{০}$ চাপ পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত করা হইল, তাহা হইলে সঙ্কুচিত কর্ম্মের পরিমাণ চছটকখপচ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমতাপ রেখানুযায়ী সঙ্কোচন করিলে যে পরিমাণ কর্ম্মের আবশ্যক হয় তাহার পরিমাণ বহুস্তর সঙ্কুচিত কর্ম্ম অপেক্ষা অধিক। এস্থলে কথজট ক্ষেত্র অধিক কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছে।

অব্যাপ্ত আয়তনের ফল নির্দ্দেশ

৪নং চিত্রের ছপ অব্যাপ্ত স্থানের† বায়ু প্রসারিত হইয়া $চ_{১}$ না হওয়া পর্য্যন্ত বায়ুর প্রবেশ পথের কপাট* বন্ধ থাকিবে।

এক্ষণে

কর্ম্ম = ছখগজ ক্ষেত্র — ছকঘজ ক্ষেত্র,

* Clearance space. † Admission valve.

(৪নং চিত্র)

$$=\frac{ন}{ন-১}\times চ_{১}\times(অ_{১}+অ_{০})\left\{\left(\frac{চ_{২}}{চ_{১}}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}-১\right\}$$

$$-\frac{ন}{ন-১}চ_{১}\times অ_{০}\left\{\left(\frac{চ_{২}}{চ_{১}}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}-১\right.$$

$$=\frac{ন}{ন-১}চ_{১}\times অ_{১}\times\left\{\left(\frac{চ_{২}}{চ_{১}}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}-১\right.$$

এই সমীকরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে সঙ্কোচন জনিত কর্ম্ম অব্যাপ্ত স্থানের উপর নির্ভর করে না।

আয়তনীয় ক্ষমতা $=\frac{কখ}{পখ}$।

বায়ুচালিত যন্ত্র

সঙ্কোচক যন্ত্র হইতে বায়ুকে মোটর যন্ত্রে লইয়া তথায় ইহাদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করান হয়। মোটর যন্ত্রে ব্যবহারের পূর্ব্বে বায়ুকে পূর্ব্বোত্তাপিত কোনও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া চালিত করা হয়, তাহাতে বায়ুর উত্তাপ বৃদ্ধি পায়।

মনে কর,—

$চ_১$ — সিলিণ্ডারে প্রবেশ করিবার সময় বায়ুর চাপ,

$অ_১$ — পিষ্টনের সম্মুখস্থ সিলিণ্ডারে প্রবিষ্ট বায়ুর আয়তন ($চ_১$ চাপে)

$চ_২$ — বায়ুর নিষ্ক্রমণের চাপ,

$অ_২$ — ভ্রমণপথের * শেষ প্রান্তে পিষ্টনের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ বায়ুর আয়তন,

দ — পিষ্টনের ভ্রমণপথ বা উহার প্রতিবার কর্ম্ম করিবার আয়তন পরিমাণ।
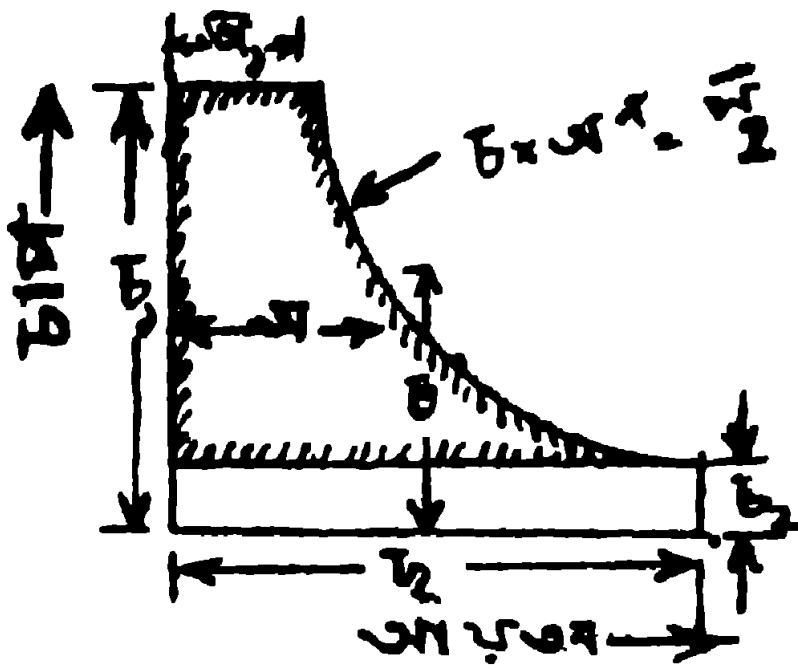
(৫নং চিত্র)

(১) মনে কর, অব্যাপ্ত স্থানশূন্য সিলিণ্ডারে বায়ু ভ্রমণের শেষে $চ_২$ চাপ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছে।

এক্ষেত্রে—

$$অ_২ = দ \quad (\text{৫ নং চিত্র})$$

$$কর্ম্ম = \frac{চ_১ \times অ_১ - চ_২ \times অ_২}{ন - ১} + চ_১ \times অ_১ - চ_২ \times অ_২$$

$$\frac{ন}{ন-১}\left(চ_১ \times অ_১ - চ_২ \times অ_২ \right)$$

$$কিন্তু \quad চ_২ \times অ_২ = চ_১ \times অ_১ \times \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}$$

* Stroke.

সুতরাং—

$$কর্ম্ম = \frac{ন}{ন-১} \times চ_১ \times অ_১ \left\{ ১ - \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}} \right\}$$
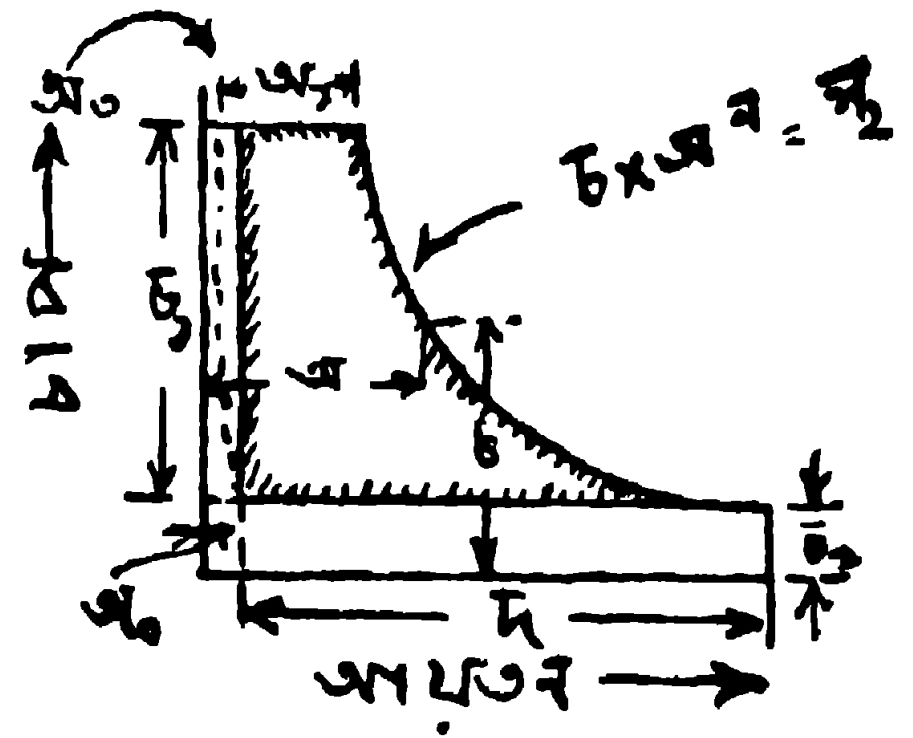
(৬নং চিত্র)

(২) এক্ষেত্রে ৬নং চিত্র হইতে দেখা যাইতেছে, অব্যাপ্ত স্থানের আয়তন "$অ_০$" এবং ভ্রমণের শেষে বায়ু $চ_২$ চাপ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছে।

পিষ্টনের পুনরাগমনের শেষে শূন্যস্থানে $চ_২$ চাপে $অ_০$ আয়তনের বায়ু থাকিবে। এক্ষণে পিষ্টন যখন পুনরায় তাহার ভ্রমণ কার্য্য আরম্ভ করিবে, তখন $চ_১$ চাপের সিলিণ্ডার-প্রবিষ্ট বায়ু ঐ "$অ_০$" আয়তনের বায়ুকে $চ_২$ চাপ হইতে $চ_১$ চাপে পরিবর্ত্তন করিবে। এই প্রবিষ্ট বায়ুর পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে বাহির করা যায়।

মনে কর—

অব্যাপ্ত স্থানের বায়ু $চ_২$ চাপ হইতে $চ_১$ চাপে $চ \times অ^ন = স্থ$ ধারানুযায়ী সঙ্কুচিত হইয়াছে, এবং তখন ইহার আয়তন $অ_০$ হইতে $অ_৩$ হইয়াছে।

সুতরাং—

$$চ_১ \times অ_৩^{ন} = চ_২ \times অ_২^{ন}$$

ইহা হইতে—

$$অ_৩ = অ_০ \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{১}{ন}}$$

এবং

$$চ_১ \times অ_৩ = চ_২ \times অ_০ \left(\frac{চ_১}{চ_২}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}$$

এবং অব্যাপ্ত স্থান পূর্ণ করিবার নিমিত্ত $চ_১$ চাপে অধিক বায়ুর পরিমাণ $= অ_০ - অ_১$।

সুতরাং কর্ম্মের সমষ্টি—

$$= \frac{ন}{ন-১} \times চ_১ \times (অ_১ + অ_৩) \times$$

$$\left\{ ১ - \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}} \right\} - (চ_১ - চ_২) \times অ$$

$$= \frac{ন}{ন-১} \times চ_১ \times অ_১ \left\{ ১ - \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}} \right\}$$

$$\frac{ন}{ন-১} \times চ_১ \times অ_৩ \left\{ ১ - \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}} \right\}$$

$$-(চ_১ - চ_২) অ_৩$$

কিন্তু $চ_১ \times অ_৩ = চ_২ \times অ_০ \times \left(\frac{চ_১}{চ_২}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}$

সুতরাং

$$কর্ম্ম = \frac{ন}{ন-১} \times চ_১ \times অ_১ \left\{ ১ - \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}} \right\}$$

$$+ \frac{ন}{ন-১} চ_২ \times অ_০ \left\{ \left(\frac{চ_১}{চ_২}\right)^{\frac{ন-১}{ন}} - ১ \right\}$$

$$-(চ_১ - চ_২) \times অ_১$$

প্রথম অবস্থায় (১)

$$চ_২ \times দ^{ন} = চ_১ \times অ_১^{ন}$$

সুতরাং $দ = অ_১ \left(\frac{চ_১}{চ_২}\right)^{\frac{১}{ন}}$

দ্বিতীয় অবস্থায় (২)

$$চ_২ \times (দ + অ_০)^{ন} = চ_১ \times (অ_১ \times অ_৩)^{ন}$$

সুতরাং

$$দ = অ_১ \left(\frac{চ_১}{চ_২}\right)^{\frac{১}{ন}} + অ_৩ \left(\frac{চ_১}{চ_২}\right)^{\frac{১}{ন}} - অ_০$$

কিন্তু $অ_৩ = অ_০ \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{১}{ন}}$

সুতরাং $দ = অ_১ \left(\frac{চ_১}{চ_২}\right)^{\frac{১}{ন}}$

দেখা যাইতেছে, প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় অবস্থাতেই $চ_১$ চাপে $অ_১$ আয়তন বায়ুর জন্য "দ" সমান।

(৩)

(৭ নং চিত্র) মনে কর, $অ_০$ আয়তনের অব্যাপ্ত
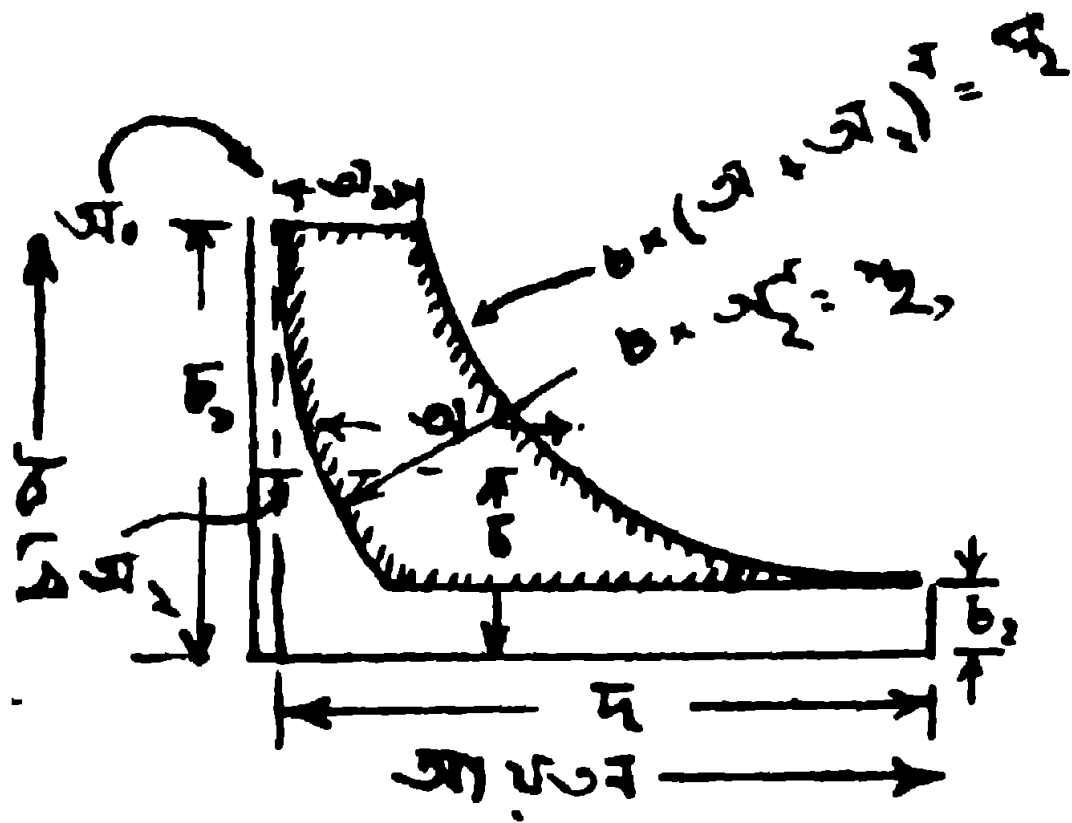
(৭নং চিত্র)

স্থানের বায়ু সিলিণ্ডার পরিত্যাগের চাপ $চ_২$ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছে এবং নিষ্ক্রমণ পথের * কপাট পিষ্টনের পুনরাগমনের পূর্ব্বেই এরূপ অবস্থায় বন্ধ হইতেছে যে, অব্যাপ্ত স্থানের $চ_১$ চাপের বায়ু পিষ্টনের পুনরাগমন শেষ হওয়ার সময় $চ_১$ চাপে সঙ্কুচিত হইতেছে।

$$কর্ম্ম = \frac{ন}{ন-১} চ_১ \times (অ_১ + অ_০) \times \left\{১ - \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}\right\}$$

$$- \frac{ন}{ন-১} চ_১ \times অ_০ \left\{১ - \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}\right\}$$

$$= \frac{ন}{ন-১} \times চ_১ \times অ_১ \left\{১ - \left(\frac{চ_২}{চ_১}\right)^{\frac{ন-১}{ন}}\right\}$$

= প্রথম অবস্থার কর্ম্ম।

সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যদি পিষ্টনের পুনরাগমনের সময় অব্যাপ্ত স্থানের বায়ু প্রবেশকালীন চাপে সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে অব্যাপ্ত স্থানের কর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু যে আয়তন পর্য্যন্ত কাজ করে তাহা বর্দ্ধিত করিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

* Exhaust.

পথ
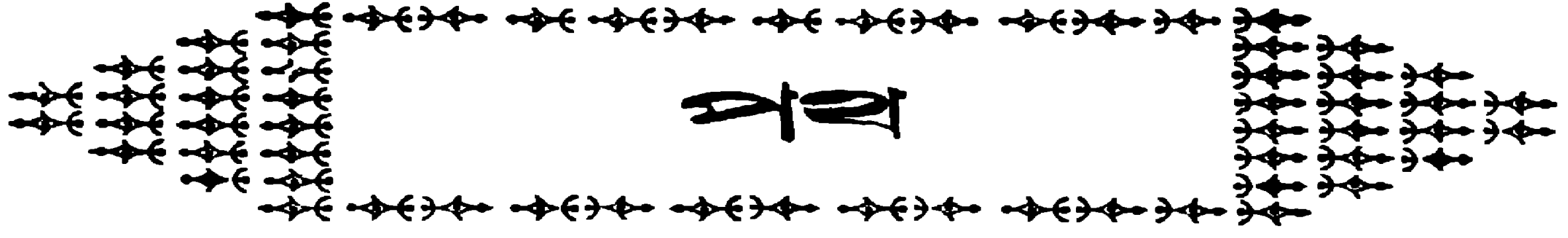
[শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত]

তোমাতে প্রাণ ছুটেছে আজ,
নূতন ভোরের চলার পথ !
বলার যাহা বল্‌বো তোমায় ;
পূর্‌বে কবে মনোরথ ?
ঊষার আলো নিয়ে তুমি
জাগো আমার আঁধার প্রাণে !
হ'লে আমি লক্ষ্য হারা
বুকে নিও স্নেহের টানে !
ফুলের মত ছড়িয়ে আছে
বিশ্বেরি ঐ বিপুল কাজ,
চল্‌তে পথে চয়ন করে'
মোহন মালা গাঁথবো আজ !
তুমিই আমার সকল আশা,
নবীন জয়ের অতুল পথ !
অপার অসীম তোমার হিয়া,
—জ্যোতি ভরা গগনবৎ !

গৃহ-স্বাস্থ্য
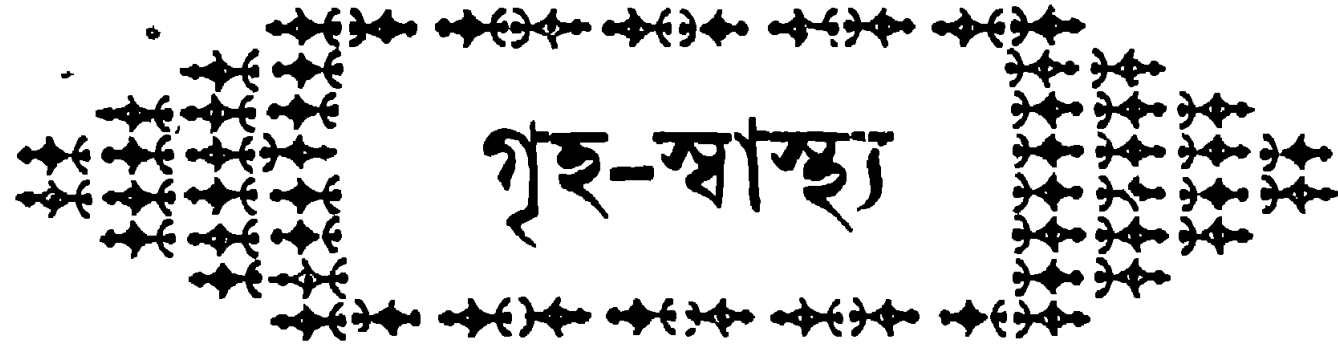
[শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল]

পূর্ব্বাভাস

আমরা সাধারণতঃ যে সকল অভাব অনুভব করি, তন্মধ্যে অশন, বসন ও ভবন, এই তিনটী সর্ব্বপ্রধান। শরীর ধারণ জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, শরীর আচ্ছাদন জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছদ এবং আশ্রয়স্থানের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ আবশ্যক।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনে শরীর নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তন্নিবারণার্থ এবং দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা আহার করি। শীত ও লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য পরিচ্ছদের এবং রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীতের প্রকোপ হইতে শরীর রক্ষার জন্য গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য-বিধিসম্মত গৃহনির্ম্মাণই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহাদির স্থান নির্ব্বাচন

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। সুস্থদেহে থাকিতে হইলে, স্বাস্থ্যবিধিসম্মত স্থানে গৃহনির্ম্মাণ করা উচিত। স্বাস্থ্যের জন্য রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহের আবশ্যক। ইংরাজীতে একটী কথা প্রচলিত আছে তাহার মর্ম্ম এই, 'যথায় সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না, সেরূপ স্থানেই চিকিৎসকগণ যাতায়াত করেন।' বস্তুতঃ, সূর্য্যালোকিত স্থান সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর হয়। গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিলে, তথায় অনেক রোগের জীবাণু জীবিত থাকিতে পারে না এবং সে কারণে, সেই সকল রোগের সম্ভাবনাও থাকে না। অতএব, গৃহমধ্যে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

দূষিত বায়ু স্বাস্থ্যহানিকর। বিশেষজ্ঞগণের মতে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিলে অনেক রোগের সম্ভাবনা থাকে না—এমন কি, অনেক জাতরোগ হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সেই জন্য, গৃহমধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের জন্য বাসগৃহের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক খোলা রাখা উচিত।

"পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।
উত্তর বেড়ে, ঘর করগে দক্ষিণ ছেড়ে॥"

অর্থাৎ, পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী, পশ্চিমদিকে বাগান ও দক্ষিণদিক খোলা রাখিবে এবং উত্তরদিক ঘেঁসিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিবে।

অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং শুষ্ক স্থানে গৃহনির্ম্মাণ করা উচিত। ভিজা জমির উপর বাস করিলে প্রায়ই নানাবিধ রোগভোগ করিতে হয়। সীমানার দিকে জমি ঢালু করিয়া দিলে, সেই জমির উপর জল দাঁড়ায় না এবং তাহা শুষ্কাবস্থায় থাকে। বাসগৃহের নিকটে নাবাল জমি বা জলাভূমি থাকা নিরাপদ নহে। নাবাল জমির উপর জল জমে—সেই জল যাহাতে বাহির হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা

করিবে। সম্ভবপর হইলে, সেই নাবাল জমি মৃত্তিকার দ্বারা ভরাট করান উচিত।

জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত থাকিলে ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার এত সর্ব্বনাশ হইত না। বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরে যত লোক মরে, তত আর কোনও রোগে মারা যায় না। এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এনোফিলিস্ জাতীয় স্ত্রীমশক ম্যালেরিয়া বিষ বহন করিয়া তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে, যাহাতে মশক জন্মিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বল্প জল বিশিষ্ট খানা ডোবাতে, এঁদো পুকুরে কিম্বা ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসীতে জল জমিলে তাহাতে মশক ডিম পাড়ে। নালা কাটিয়া বদ্ধ জল বাহির করিয়া দিলে, খানা ডোবাগুলি ভরাট করিলে এবং ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী বাটীর নিকট না ফেলিলে মশক জন্মিবে না। জলনিকাশ বা ভরাট করা সম্ভবপর না হইলে, বদ্ধ জলে কেরোসিন তৈল বা চূণ ছড়াইয়া দিবে। তাহা হইলে মশার উপদ্রব কম হইবে।

বাটীর নিকটে গাছপালা থাকিলে তাহা কাটিয়া পরিষ্কার করা উচিত, কারণ রৌদ্র ও জলনিকাশের অভাবে সেই জমি আর্দ্র অবস্থায় থাকে। জঙ্গলাদি পূর্ণ স্থান মশকাদির আবাসস্থল। বাটীর নিকটে গাছপালা জন্মিতে দিবে না। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে তাহাদের উচ্ছেদসাধন একান্ত কর্ত্তব্য।

বাসগৃহের নিকট মলমূত্রাদি আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত থাকিলে স্বাস্থ্য অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। আবর্জ্জনায় বায়ু দূষিত হয় এবং তাহাতে মাছির উপদ্রবও হইয়া থাকে। পচা ময়লা, আবর্জ্জনা, প্রভৃতির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া এবং তাহাই খাইয়া মাছিরা বড় হইয়া উঠে। এই মাছির দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড্, উদরাময় প্রভৃতি রোগের বীজ প্রসারিত হয়। মলমূত্রাদি আবর্জ্জনা বাটীর নিকট জমা হইতে না দিলে যমের দূত মাছি জন্মিবে না। সে কারণে বাসগৃহের আবর্জ্জনা যত শীঘ্র সম্ভব স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

গৃহনির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে সেই জমিতে কখনও পুষ্করিণী বা অপর কোনরূপ গহ্বর ছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ভরাট জমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত নয়। ভিজা ও ভরাট জমি, ময়লাপূর্ণ ডোবা, আবর্জ্জনা স্তূপ ও অপরিষ্কৃত পানীয় জল স্বাস্থ্যহানিকর। আবর্জ্জনাদ্বারা ভরাট জমি হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয় তাহা দূষিত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর।

দূষিত জলপান স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ—সংক্রামক রোগের অধিকাংশই জলসাহায্যে প্রসারিত হয়। অতএব যথায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব সেরূপ স্থানে গৃহনির্ম্মাণ কদাচ করিবে না।

যথায় বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য সহজে পাওয়া যায় না সেরূপ স্থান বাসগৃহের পক্ষে অনুপযুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাটীর রেখাচিত্র বা নক্সা

১। পূর্ব্বাভাস

স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে, বাটীর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সাধন এবং শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা বিধায়ক ব্যবস্থা করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কলাকৌশলপূর্ণ দৃঢ় গৃহ পরিকল্পনা করিবে এবং তদনুযায়ী বাটীর রেখাচিত্র বা নক্সা অঙ্কিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে, রেখাচিত্র কল্পিত বাটীর প্রতিবিম্বস্বরূপ—ইহাতে বাটীর বিভিন্ন অংশগুলি কাগজের উপর ক্ষুদ্রাকারে অঙ্কিত হয়। নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বাটীর চিত্রাঙ্কন বিশেষ আবশ্যক।

রেখাচিত্র বা নক্সা বলিলে প্রধানতঃ বাটীর তলচিত্র বা প্ল্যান (২ ক চিত্র), বাহ্যচিত্র এবং ছেদচিত্র (৩ ক চিত্র) বুঝায়।
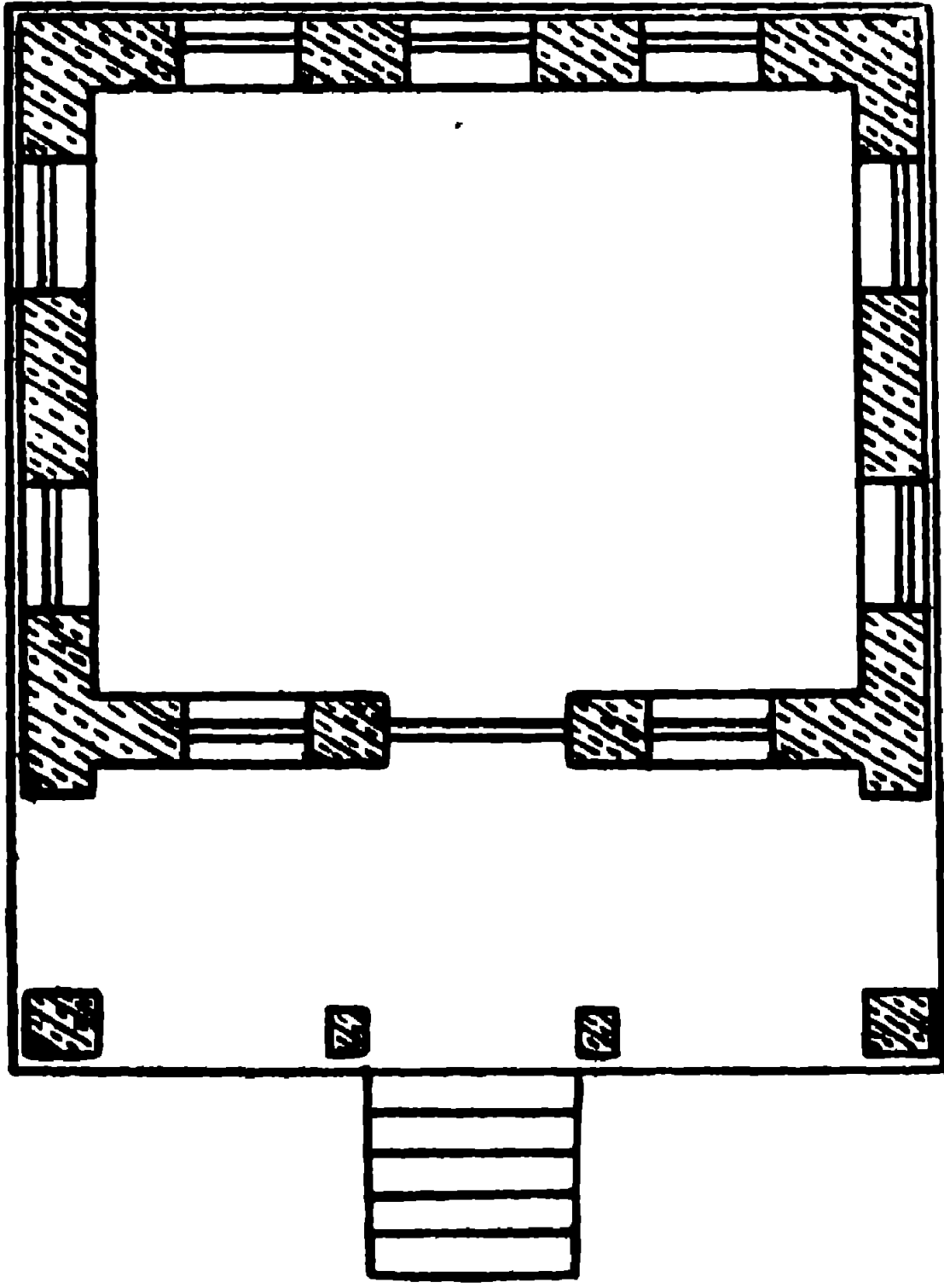
(২ক চিত্র)

বাটীর তলচিত্র

বাটীর তলভাগ মেঝে হইতে ৩।৪ ফুট উচ্চে সমান্তরালভাবে ছেদ করিলে, সেই ছেদরেখান্তর্গত চিত্রকে (২নং চিত্র) তলচিত্র বলা হয়। বাটীর দেওয়াল-গুলি মেঝে হইতে ৩।৪ ফুট গাঁথা হইলে তাহার উপর হইতে নীচের দিকে তাকাইয়া যে দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃতপক্ষে তলচিত্রে অঙ্কিত করা হয়। তলচিত্রে ঘরের আয়তন, দেওয়ালের এবং দরজা জানালার অবস্থান ও বিস্তার দেখান হইয়া থাকে। ভিত্তি খনন করিবার জন্য ভিত্তিচিত্র অঙ্কিত করা সুবিধাজনক—তাহাতে দেওয়াল-ভিত্তির অবস্থান ও বিস্তার দৃষ্ট হইবে।

বাহ্যচিত্রে বাটীর বহির্দ্দৃশ্য অঙ্কিত হয়। যে দিকের চিত্র অঙ্কিত হইল, সেই দিক অনুসারে সম্মুখ দৃশ্য, পশ্চাৎ দৃশ্য ও পার্শ্ব দৃশ্য আখ্যা দেওয়া হয়।

আমরা চর্ম্মচক্ষে যেরূপ দৃশ্য দেখি তাহা প্রকৃত-পক্ষে বাহ্যচিত্রে দেখান হয় না—সেরূপ চিত্রকে ফটোগ্রাফ চিত্র বলা যায়। তাদৃশ চিত্রে দূরত্বানুসারে আনুপাতিক পরিমাণের ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া তাহা গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ উপকারে আইসে না। তদ্দ্বারা কেবল বাটীর বাহ্য সৌন্দর্য্য অনুমিত হইতে পারে। দূরত্বানুসারে পরিমাণের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া কৃত্রিম ফটোগ্রাফ চিত্র (১নং চিত্র) অঙ্কন করা যায়।

বনিয়াদ ও আভ্যন্তরিক দৃশ্যের জন্য কল্পিত বাটীকে তাহার উপরিভাগ হইতে তলভাগ পর্য্যন্ত লম্বভাবে ছেদ করিয়া সেই ছেদরেখান্তর্গত দৃশ্যের অনুরূপ ছেদচিত্র (৩নং চিত্র) অঙ্কিত হয়। যেরেখা দ্বারা ছেদ করা হইল সেই ছেদক রেখা দৈর্ঘ্যের সমান্তরাল হইলে সেই ছেদ দৃশ্যকে দীর্ঘছেদ দৃশ্য এবং ছেদরেখাটী প্রস্থের সমান্তরাল করিয়া ছেদকরিলে সেই ছেদ দৃশ্যকে আড়দিকের ছেদদৃশ্য বলে। ছেদরেখা বিন্দুরেখা দ্বারা তলচিত্রে দেখান হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ, রেখাচিত্র '৮ ফুট=১ ইঞ্চি' স্কেলে অঙ্কিত হয়, অর্থাৎ কল্পিত বাটীর যে অংশের পরি-মাণ ৮ ফুট, সেই অংশটী রেখাচিত্রে এক ইঞ্চি দীর্ঘ রেখা দ্বারা সূচিত হইবে। কাগজের উপর বাটীর সমান মাপের চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর হয় না, সেইজন্য প্রকৃত বস্তুর অনুরূপ চিত্র ক্ষুদ্রাকারে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে অঙ্কিত হয়। স্কেল ৮ফুট =১ ইঞ্চি হইলে প্রকৃত বস্তু ও অঙ্কিত চিত্রের অনুপাত=$\frac{১}{৯৬}$ হইবে। কল্পিত বাটীর নক্সা কোনও নির্দ্দিষ্ট স্কেলে আঁকিয়া প্রত্যেক অংশের পরিমাণ যতদূর সম্ভব লিখিয়া দিতে হয়। কোনও
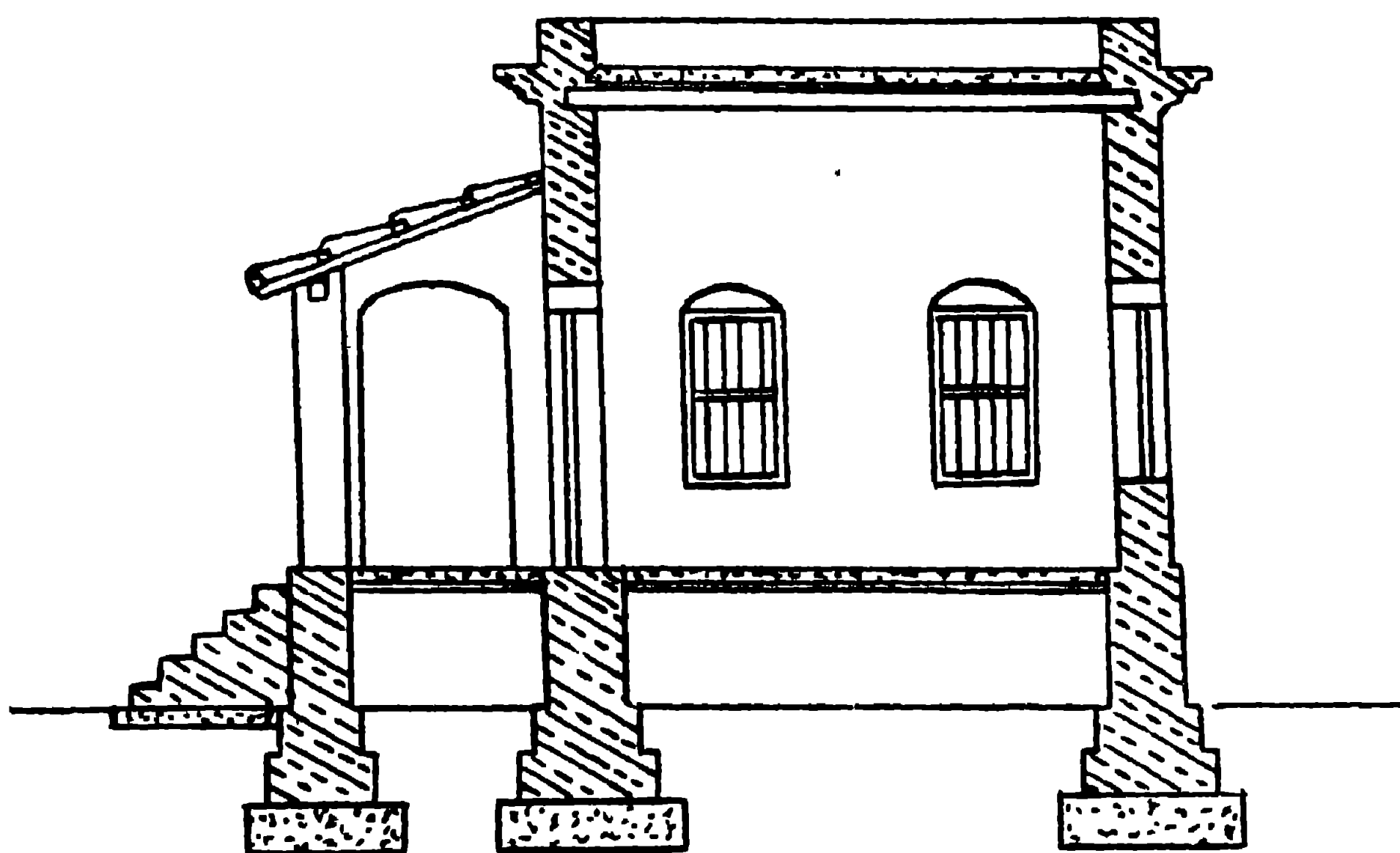
(৩ক চিত্র)

বাটীর ছেদ চিত্র
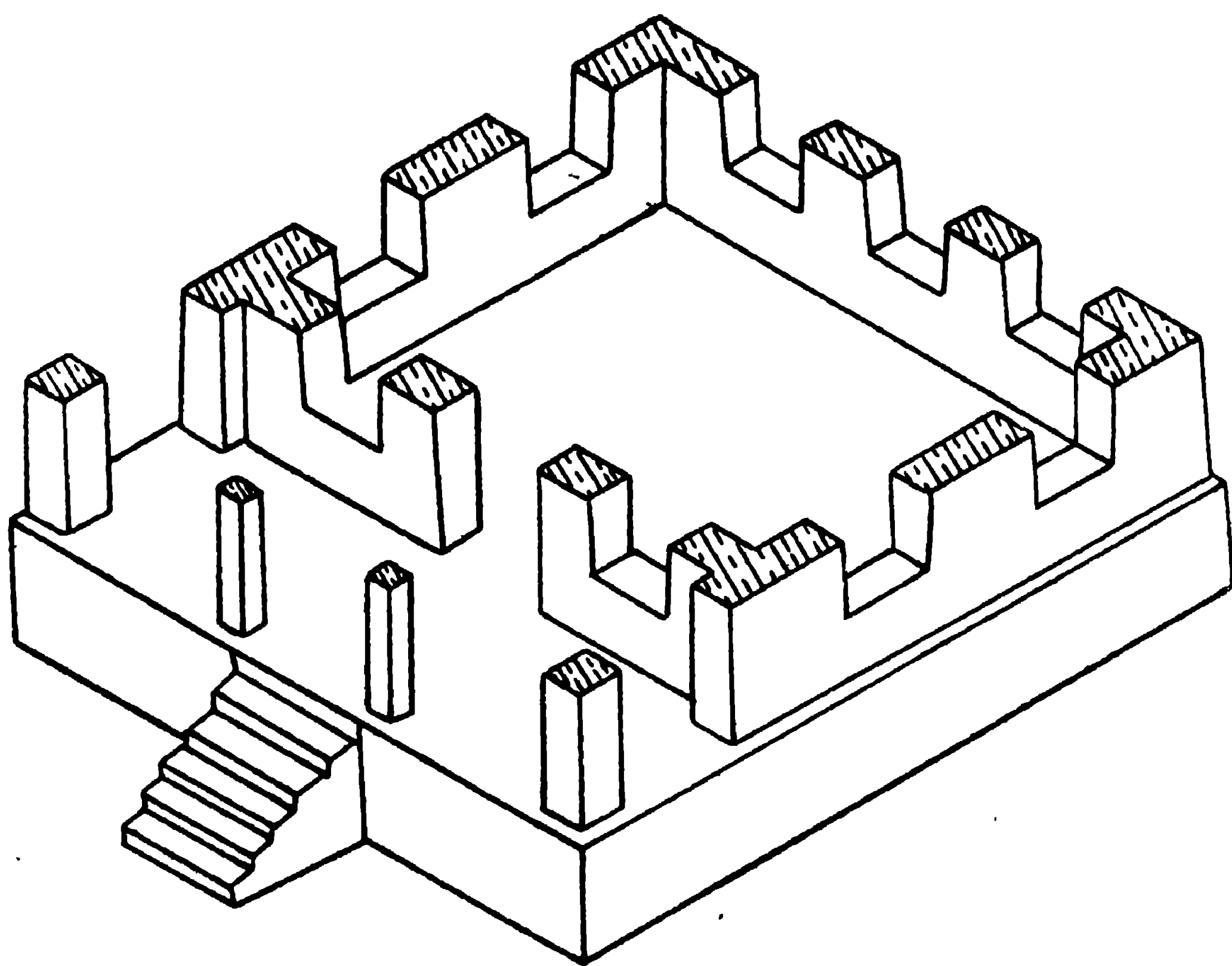
(২নং চিত্র)

বাটীর সমান্তরালভাবে ছেদকরন
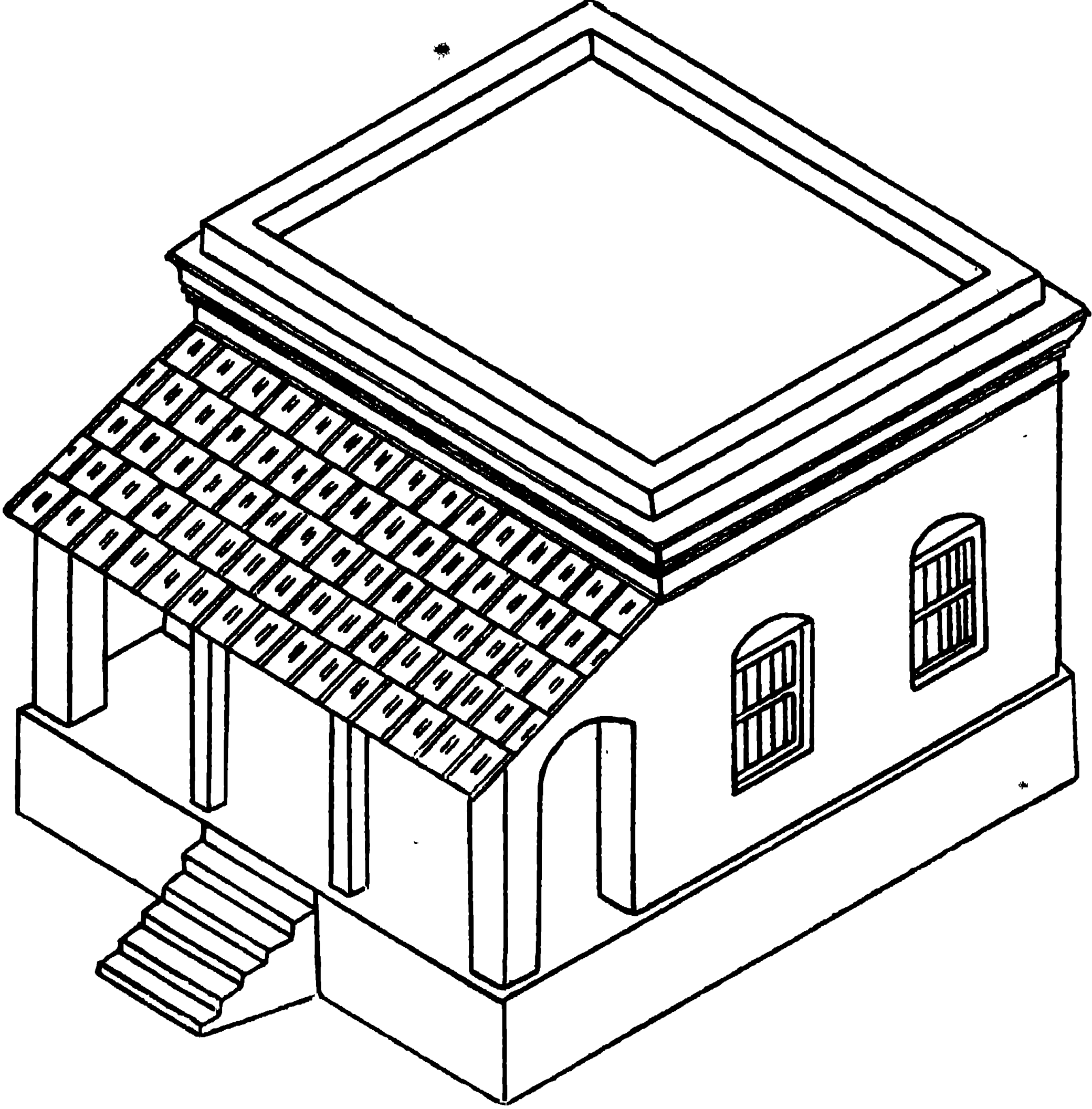
(১নং চিত্র)

বাটীর কৃত্রিম ফটোগ্রাফ চিত্র

অংশের পরিমাণ লেখা না থাকিলে, স্কেল সাহায্যে তাহা স্থির করা যায়।

২। বাটীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

কল্পিত বাটী যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, সেই অনুযায়ী নক্সা প্রস্তুত করা উচিত। বসতবাটী হইলে গৃহকর্ত্তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিবে। বসতবাটীর প্রত্যেক ঘরে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। দ্বিতল বাটীর একতলায় বৈঠকখানা বা বসিবার ঘর এবং দ্বিতলে শুইবার ঘরের বন্দোবস্ত করিলেই ভাল হয়। দিবাভাগে বসিবার ঘর শীতল রাখিবার এবং রাত্রি-কালে শয়নগৃহ নৈশ বায়ুদ্বারা শীতল রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। কল্পিত বাটীর আকার বৃহৎ হইলে তাহাতে একটী প্রবেশ হল এবং সেই হলের
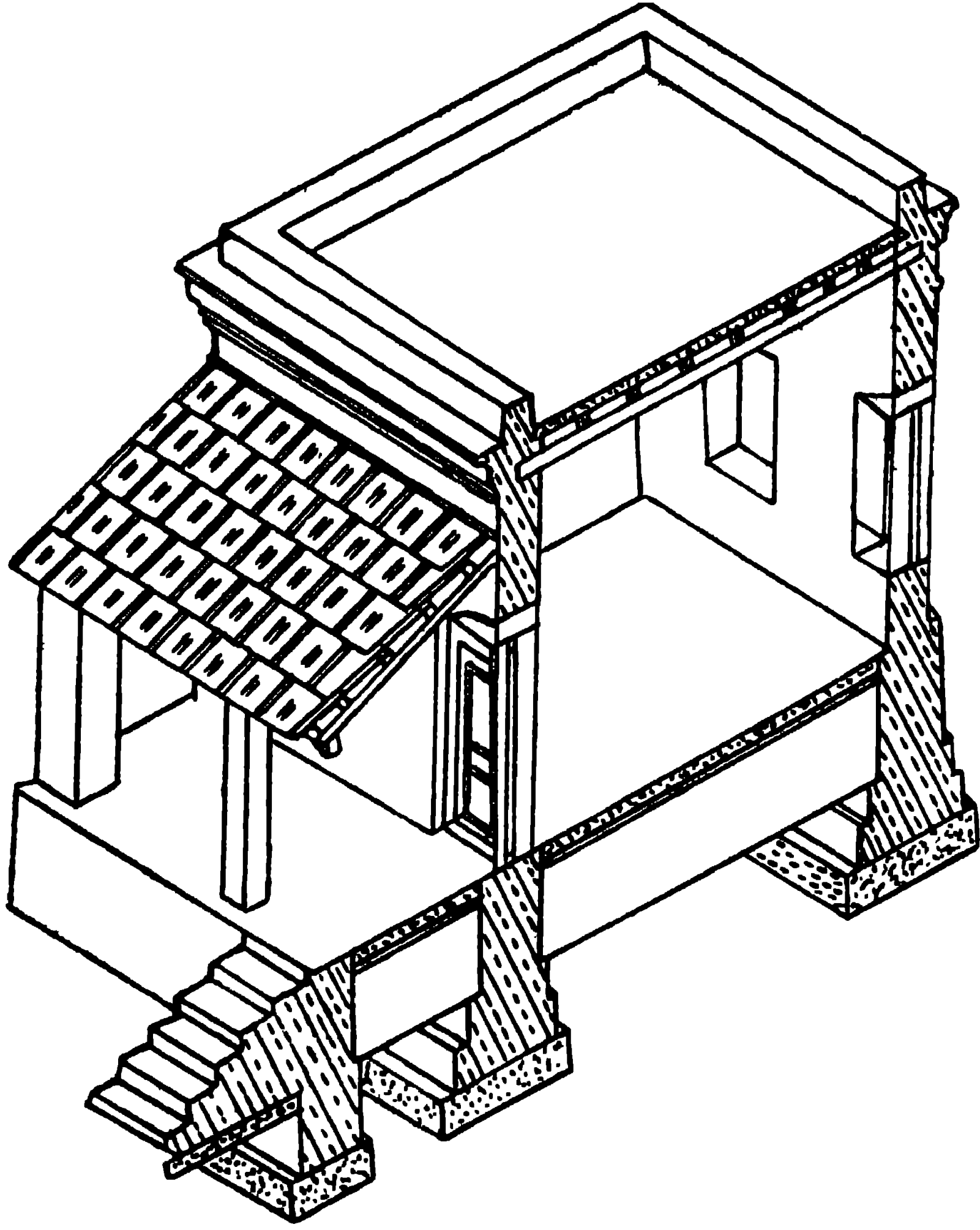
(৩নং চিত্র)

বাটীর লম্বভাবে ছেদকরন

একপার্শ্বে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি রাখা আধুনিক রুচিসঙ্গত। প্রবেশ হল, যাতায়াতের পথ ও সিঁড়ি উত্তমরূপে আলোকিত থাকিবে। যাতায়াতের পথ যথাসম্ভব সরলভাবে রাখাই উচিত, তাহাতে বাঁক না থাকিলেই ভাল হয়।

বড় রাস্তার উপরে বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী বাটী সমূহের বাহ্য দৃশ্যানুযায়ী নির্ম্মাণ করা উচিত। রাস্তার ধারে বৈঠকখানা ও ভিতর দিকে অন্দরমহল থাকিবে। সাধারণতঃ ঘরের দৈর্ঘ্য বিস্তারের সমান বা তাহার দেড়গুণ পর্য্যন্ত রাখিলেই ভাল দেখায়। রান্নাঘর ও ভোজনঘরের দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ বা তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক হইলেও ক্ষতি হয় না। ছাদের কড়ি মেঝে হইতে অন্ততঃ ৭ হাত উচ্চে বসান উচিত—তাহা ৮ হাত উচ্চে বসাইলেই ভাল দেখায়। শয়নগৃহের দরজা মধ্যস্থলে না রাখিয়া ঘরের একপার্শ্বে রাখিলেই খাট রাখিবার সুবিধা হয় এবং তাহাতে ঘরের আবরুও রক্ষিত হয়। দরজা জানালা যথাসম্ভব ঋজু ঋজু বসাইবে,

তাহাতে গৃহমধ্যে বায়ুপ্রবাহের সুবিধা হয়। জানালাগুলি প্রশস্ত ও সংখ্যায় অধিক হওয়া উচিত। দরজা জানালার সংখ্যা ও তাহাদের পরিমাণ নির্ণয় করিবার সঙ্কেত গ্রন্থকার প্রণীত সরল গঠনতত্ত্বের ১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বারাণ্ডার উপকারিতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাটীর যেপার্শ্বে রৌদ্র লাগে সেই দিকে বারাণ্ডা থাকিলে তৎপার্শ্ববর্ত্তী ঘর সেরূপ গরম হইয়া উঠে না। তদুদ্দেশ্যে বারাণ্ডার বিস্তার ৫।৬ হাত হইলেই ভাল হয়—অপরাপর পার্শ্বে বিস্তার অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও ক্ষতি হয় না। বারাণ্ডার জন্য তৎসংলগ্ন গৃহ যাহাতে অন্ধকার হইয়া না পড়ে এবং তন্মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহের ব্যাঘাত না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বারাণ্ডার জল যাহাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ না করে সে বিষয়েও সাবধান হওয়া উচিত।

ছাদের উপর উঠিলে যাহাতে কেহ পড়িয়া না যায় তদুদ্দেশ্যে ছাদের চতুর্দ্দিকে অন্ততঃ দুই হাত উচ্চ আল্‌সে নির্ম্মাণ করা উচিত। আল্‌সের দেয়াল হাল্‌কা রাখিবার জন্য তাহার মাঝে মাঝে ফুকর রাখা হয়। ছাদে যাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে এবং সহজে বাহির হইয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে আল্‌সের নীচে নর্দ্দমা রাখা উচিত। প্রত্যেক নর্দ্দমার জল এক একটী গা-নল দিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

যথায় কোনরূপ দুর্গন্ধ আসা সম্ভব সে রূপ স্থানে শয়নগৃহ বা রন্ধনগৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। রন্ধনগৃহ শয়নগৃহ হইতে অল্প দূরে নির্ম্মাণ করা উচিত। রন্ধনগৃহের ধূম যাহাতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে এবং সহজে বাহির হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবিধা হইলে, ধূমবিহীন চুলা নির্ম্মাণ করা উচিত।

সকল গৃহেই আলোক ও বাতাসের সুব্যবস্থা থাকিবে। যে গৃহ আলোকিত রাখিবার অন্য কোন উপায় নাই তাহার ছাদের উপর আওয়াজি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

খাটা পায়খানা বাসগৃহ হইতে অন্ততঃ ৩।৪ হাত দূরে এবং পৃথক্‌ভাবে নির্ম্মাণ করা উচিত। ড্রেন-পায়খানা গৃহসংলগ্ন থাকিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু সেরূপ পায়খানা কেবলমাত্র কলিকাতার ন্যায় সহরেই সম্ভব। বাটীর যেদিকে রান্নাঘর তাহার বিপরীত দিকে পায়খানা থাকিলে ভাল হয়। যে পথ দিয়া মেথর পায়খানার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ময়লা বাহির করিয়া লয় সেই প্রবেশ পথ প্রশস্ত করা এবং তথায় একটী দরজা বসান উচিত। পায়খানায় বায়ু সঞ্চালনের সুব্যবস্থা থাকিবে। গোশালা ও পায়খানা পশ্চিমদিকে থাকিলেই ভাল হয়।

রাস্তার জল যাহাতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে একতলার মেঝে বা পোতা-তল রাস্তার উপরিভাগ হইতে অন্ততঃ দেড় হাত উচ্চে রাখা উচিত। পোতাতলের উচ্চতা অধিকতর হইলে একতলায় ঘরগুলি স্বাস্থ্যকর হয়।

সাধারণতঃ মাটীদ্বারা পোতা ভরাট করিয়া তাহার উপর একতলার মেঝে তৈয়ারী করা হয়। মাটীর দ্বারা ভরাট না করিয়া যদি খিলানের উপর বা কড়ির উপর মেঝে তৈয়ারী করা হয় তাহা হইলে সে মেঝে স্যাঁৎসেঁতে হয় না। কিন্তু সেরূপ মেঝে নির্ম্মাণ করা ব্যয়সাধ্য। মাটীর পরিবর্ত্তে বালি বা ঘোস দ্বারা পোতা ভরাট করিলেও মেঝে শুষ্কাবস্থায় থাকে। মেঝে ভিজা থাকিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়।

যে ঘরের দেওয়াল ভিজা থাকে তথায় বাস করিলে নানাবিধ রোগভোগ করিতে হয়। দেওয়ালে যাহাতে স্যাতানি উঠিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে

পোতাতলের নিম্নে দেওয়ালের উপর একটী জলাভেদ্য স্তর দেওয়া উচিত।

৩। ব্যয় সংক্ষেপ

যথায় জমির মূল্য অল্প, সেরূপ স্থানে একতলা বাটী নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যথায় জমির মূল্য অধিক বা যথায় জমির দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, তথায় দ্বিতল বা ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করাই উচিত। তাহা করিলে অল্প জমির উপর অধিক সংখ্যক ঘর পাওয়া যায় এবং উপর তলার ঘরগুলি অধিকতর স্বাস্থ্যকর হয়।

একতলা বাটী নির্ম্মাণ করিতে আপাততঃ বাধ্য হইলেও যাঁহারা ভবিষ্যতে বাটী দ্বিতল বা ত্রিতল করিবার বাসনা রাখেন, তাঁহাদের দ্বিতল বা ত্রিতল বাটীর উপযোগী ভিত্তির উপর বাটী নির্ম্মাণ করা এবং উপর তলায় উঠিবার অন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা উচিত।

আপাততঃ বৃহৎ বাটীর প্রয়োজন বা তাহা নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম না হইলেও, ভবিষ্যতে আয় ও পরিবার বৃদ্ধি হইতে পারে ইহা বিবেচনা করিয়া, ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির উপায় রাখিয়া বাটীর পরিকল্পনা বা বাটী নির্ম্মাণ করা উচিত।

৪। বাটীর সৌন্দর্য্য

কতকগুলি সুন্দর সুন্দর থাম, কার্নিস প্রভৃতি অলঙ্কারযুক্ত হইলেই বাটীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় না বা তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। যে বাটীতে প্রবেশ করিলেই প্রত্যেক গৃহের স্ব স্ব উদ্দেশ্য, অপরের সাহায্য না লইয়াই, বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ যে বাটীর রেখাচিত্র দেখিলেই মনে হয় যে গৃহগুলি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই সুন্দর বলা যায়। বাটীর বাহ্যদৃশ্য হইতেই যাহাতে বাটীর উদ্দেশ্য, ঘরগুলির সন্নিবেশ প্রণালী, কোনও বিশিষ্ট অংশের গুরুত্ব প্রভৃতি তথ্য বুঝিতে পারা যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যে বাটী ভাবব্যঞ্জক নহে তাহাকে সুন্দর বলা যায় না।

বাটীর সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ব্যবহারোপযোগী বাটী পরিকল্পনা করা এবং বাটীর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সুদৃঢ় ও স্থায়ীভাবে নির্ম্মাণ করা উচিত।

সাধারণতঃ মেঝে ও ছাদতলে কোনরূপ গড়ন দেওয়া হয়। দুই বা ততোধিক তলবিশিষ্ট বসতবাটীতে, সাধারণতঃ, দুই বা ততোধিক কার্নিস থাকে। পোতাতলেও একটী সাদা গড়ন দেওয়া হয় তাহাকে পোতাতলের গড়ন বলা যায়।

কার্নিস দেখিলেই প্রত্যেক তলের শেষসীমা বিভিন্ন তলের উচ্চতা এবং তাহাদের সমান্তরতা বুঝিতে পারা যায়। পোতাতলের গড়নদ্বারা মূল বা তলদেশের স্থূলতা ও দৃঢ়তা সূচিত হয়। স্থপতিবিজ্ঞানমতে বাটীর উচ্চতা কার্নিসদ্বারা সমানাংশে বিভক্ত হইবে না। কার্নিস যে কেবল মেঝে বা ছাদতলেই থাকিবে তাহার কোন কথা নাই প্রয়োজন হইলে উহা অন্যত্রও গঠিত হইতে পারে।

দ্বিতল বাটী হইলে, উপর তলের বিশেষত্ব জ্ঞাপনার্থ সেই তলের উপরে শোভাবর্দ্ধক কার্নিস এবং নিম্নতলের জন্য অপেক্ষাকৃত সাদা কার্নিস দেওয়া উচিত। কোথাও নিম্নতলে ২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পরিমাণে ইট বাহির করিয়া সাদা গড়ন দেওয়া হয় ইংরাজীতে সেরূপ গড়নকে 'ষ্ট্রিং মোল্ডিং' বলে। এইরূপ কার্নিস ব্যবহারে দ্বিতলের জানালা ও খিলানগুলিও দেখিতে অধিকতর সুন্দর হইবে।

৫ বায়ু সঞ্চালন

বায়ু আমাদের জীবনস্বরূপ। বায়ুর অভাবে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না। সুস্থ দেহে থাকিতে হইলে বায়ু বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে শরীর পুষ্ট হয় এবং অনেক রোগের হাত হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দূষিত বায়ু স্বাস্থ্য-হানিকর।

বিশুদ্ধ বায়ুর কোন গন্ধ নাই। যে গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দুর্গন্ধ অনুভূত হয় সেই গৃহের বায়ু দূষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গৃহমধ্যে বায়ু দূষিত হইলে তাহা শোধনের প্রধান উপায় বায়ু সঞ্চালন। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গৃহমধ্যে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা-করিতে হইবে। বায়ু সঞ্চালনের পথে পায়খানা বা আবর্জ্জনারাশি থাকা উচিত নয়। বাটীর নিকট গাছপালা থাকিলে বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়।

বদ্ধ গৃহে বায়ু অতি শীঘ্র দূষিত হয়। বিধাতার বিধানে বায়ু কখনও স্থির থাকিতে পারে না। প্রবেশপথ পাইলেই বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়। গৃহমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের জন্য উপযুক্ত দরজা জানালার আবশ্যক। দূষিত বায়ু উষ্ণ ও লঘু সেই জন্য তাহা ছাদের দিকে উঠিতে থাকে এবং ছিদ্র পাইলেই সেই পথে বাহির হইয়া যায়। যাহা বাহির হইয়া যায় তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য বাহিরের শীতল বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। সেই শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ু যাহাতে জানালা বা অপর কোন রন্ধ্রপথ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে তজ্জন্য জানালাগুলি মেঝে হইতে অধিক উচ্চে বসান উচিত নহে। বায়ু নিষ্কাশনের জন্য জানালাগুলি ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা করা সকল সময়ে সুবিধাজনক হয় না। সাধারণতঃ ছাদের নিম্নে দেওয়াল গাত্রে বড় বড় ছিদ্র রাখিয়া তাহার মুখে লৌহ নির্ম্মিত জাল বা ঝাঁজরি বসাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে জানালা দিয়া বিশুদ্ধ বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং ছাদসংলগ্ন রন্ধ্রপথ দিয়া উষ্ণ ও দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। জানালাগুলি ঋজু ঋজু বসান উচিত—তাহাতে গৃহমধ্যে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা হয়।

তাপ
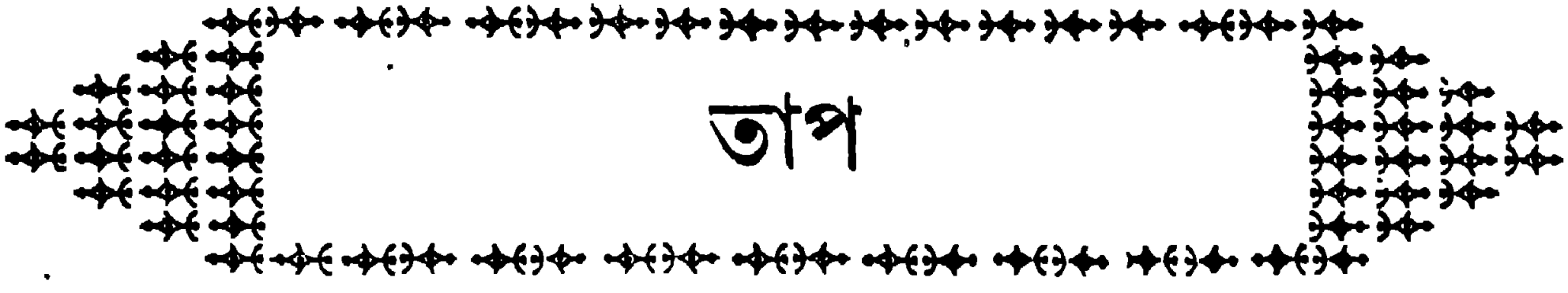
[শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়]

তাপের বিকীরণ

কোন অবলম্বন ব্যতীতও তাপশক্তি উত্তপ্ত বস্তু হইতে শীতল বস্তুতে সঞ্চালিত হইতে পারে। ইহাকে তাপশক্তির "বিকীরণ" বলা হইবে। একটি তাপমান কাচপাত্রে সম্পূর্ণ আবদ্ধ হইবার পর পাত্রটী হইতে পাম্পসাহায্যে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া বহির্ভাগে কোন উত্তপ্ত বস্তু আনীত হইলেই তাপমানটী উত্তাপ বৃদ্ধি নির্দ্দেশ করিতে থাকে। এক্ষেত্রে কোন অবলম্বন ব্যতীতও তাপমানটীতে তাপ সঞ্চারিত হইতেছে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে তাপসঞ্চারও এই প্রথানুগত।

সকল বস্তু হইতেই সর্ব্বদা তাপশক্তি বিকীর্ণ হইতেছে; অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু হইতে যেমন তাপশক্তি নির্গত হইতেছে, তেমনই চতুঃপার্শ্বস্থ অন্যান্য বস্তু হইতে উহাতে তাপশক্তি সন্নিবিষ্টও হইতেছে। এইরূপে ক্রমে বস্তুটীর লব্ধ ও বিচ্যুত তাপশক্তির সমতা সংঘটিত হইলে উহার উত্তাপ স্থির থাকে। অন্যথা উত্তাপের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে।

তাপশক্তি সংক্রমণের সময়, উত্তপ্ত বস্তুর বা কণিকার সংলগ্ন শীতল বস্তু বা কণিকা উত্তপ্ত হয় এবং উহা তৎসংলগ্ন শীতলতর বস্তুতে (বা কণিকায়) তাপ প্রদান করে। এইরূপে ক্রমে তাপ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই কারণে তাপের সংক্রমণ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু বিকীরণ অতি দ্রুতবেগে সংঘটিত হয়। ফলতঃ তাপশক্তি বিকীরণে, আলোকশক্তির সহিত তুলনার যোগ্য। একটি বস্তু আলোক হইতে আবৃত হইবামাত্র উহা অন্ধকারময় হয় ও আবরণটী অপসৃত হইবামাত্র পুনরায় আলোকিত হইয়া থাকে। এইরূপে একটি বস্তু উপযুক্তভাবে আবৃত হইলে যে বিকীর্ণ তাপশক্তি উহা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নিবারিত হওয়ার ফলে বস্তুটীর উত্তাপ নিম্নতর হইতে থাকে। আবরণটী অপসৃত হওয়ামাত্র বিকীর্ণশক্তি প্রাপ্তে উত্তাপ পুনরায় উচ্চতর হইতে আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে তাপশক্তি প্রথমতঃ শক্তির অন্য আকারে বিকীর্ণ হইয়া থাকে এবং কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া তাপশক্তির রূপে প্রকট হয়। নানাবিধ বিচারের ফলে এক্ষণে বিজ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, বিকীর্ণশক্তি কম্পনের আকারে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বস্তুতে সঙ্গত হইবামাত্র উহা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বস্তুতঃ বস্তুর তাপ, উহার অভ্যন্তরীণ অণুর কম্পনের বিশেষত্ব হইতে উৎপন্ন।

বিকীর্ণ তাপশক্তি সরলরেখাক্রমে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহা ৩৬ নং চিত্রানুযায়ী পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। "ক" একটি উত্তপ্ত ধাতব গোলক, "খ" একটি ধাতুনির্ম্মিত মসৃণ পাত, উহাতে "ঘ" চিহ্নিত একটি ছিদ্র আছে এবং "গ" একটি তাপমান যন্ত্র। "ক", "ঘ" ও তাপমানের আধারটী
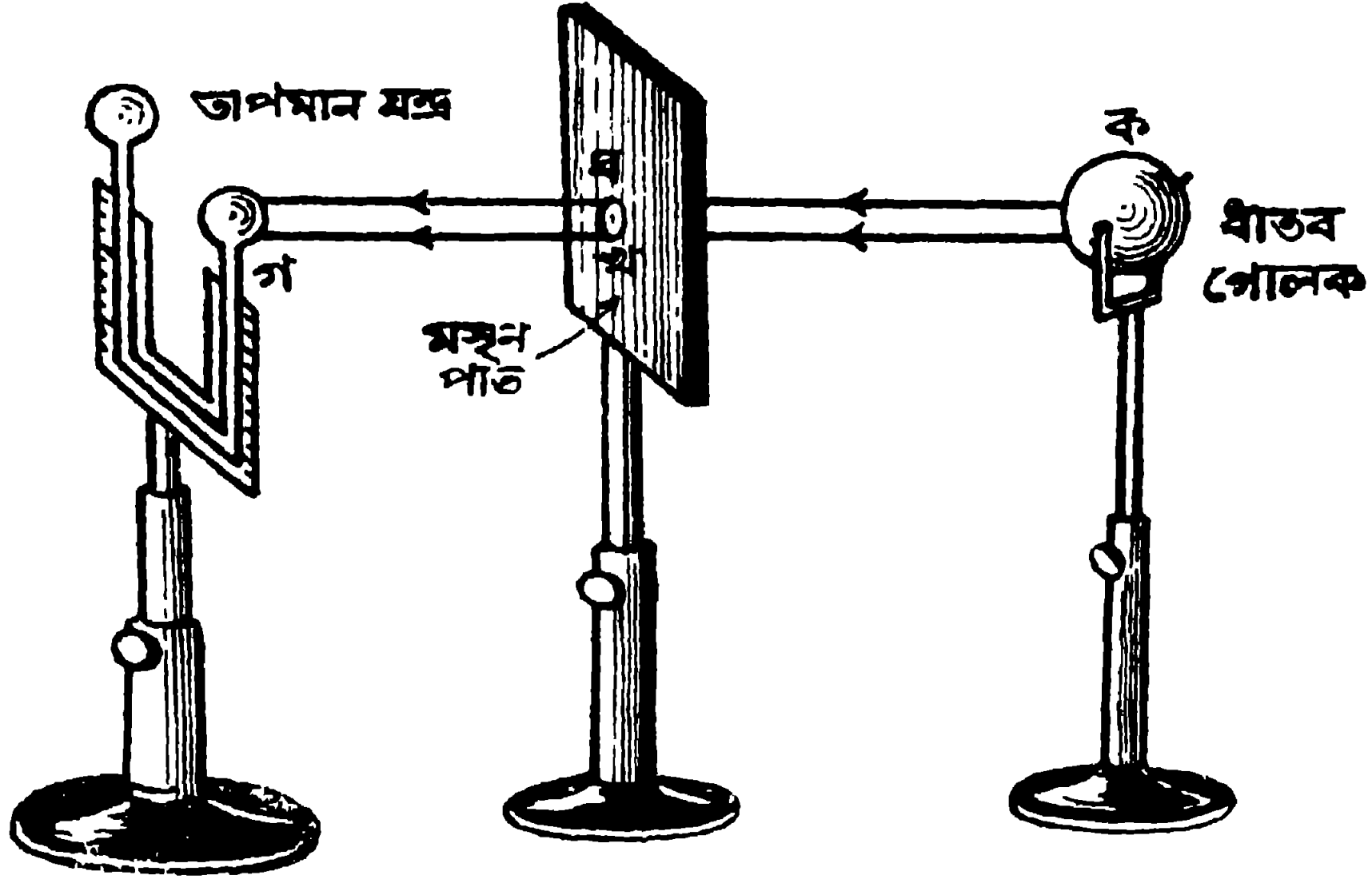
(৩৬ নং চিত্র)

একত্রে সমরেখাবর্ত্তী হইলে তাপমানে উত্তাপ বৃদ্ধি সূচিত হইবে। অন্যথা উত্তাপের কোন তারতম্য লক্ষিত হইবে না। বিকীরণ সরলরেখাক্রমে না হইলে উপরোক্ত ঘটনা সম্ভবপর নহে। এইরূপে "ক" ও "গ" এর মধ্যে ২।৩টী পাত সজ্জিত হইলেও ছিদ্র-গুলি একত্রে কগ রেখাবর্ত্তী হইবামাত্র তাপমানে উত্তাপ বৃদ্ধি প্রদর্শিত হইবে।

একটি বস্তুর উপর বিকীর্ণশক্তি পতিত হইলে উহা শক্তি শোষণ করিবে, অথবা উহা হইতে শক্তি "প্রতিফলিত" হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অংশতঃ উভয় প্রকারেই শক্তি ফলিত হইয়া থাকে।

শক্তি শোষণের ফলে বস্তুটী উত্তপ্ত হইয়া থাকে। প্রতিফলনে শক্তি অন্য মুখে চালিত হয় মাত্র; সুতরাং প্রতিফলনকারী বস্তুর উপর উহা সন্নিবিষ্ট না হওয়ায় কোনও রূপে প্রকাশিত হয় না।

বিকীর্ণশক্তি বিচারকালে শক্তি "রশ্মির" আকারে চালিত হইতেছে,—এইরূপ কল্পনা করা হয়। উত্তপ্ত বস্তু হইতে সরলরেখাদ্বারা রশ্মি ব্যক্ত হইয়া থাকে।

(৩৭নং চিত্র) চিত্রে "ব" একটি উত্তপ্ত গোলক, "দ" একটি দর্পণ ও "ত" একটি তাপমান। "প" চিহ্নিত একটি ধাতুনির্ম্মিত পাতে "গ" চিহ্নিত ছিদ্র-পথে শক্তিরশ্মি সঞ্চালিত হইতেছে। "দ" দর্পণে রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া "ত" তাপমানে উত্তাপ বৃদ্ধি নির্দ্দেশ করিতেছে।

দর্পণের পরিবর্ত্তে একটি মসৃণ ও উজ্জ্বল ধাতব পাতও ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোলকটী হইতে একটি রশ্মি দর্পণের "ট" বিন্দুতে প্রতিফলিত হইতেছে কল্পিত হইল। "ট ন" সরলরেখা দর্পণতলের লম্ব অনুক্রমে অঙ্কিত হইয়াছে। তাপমানটী যেস্থানে রক্ষিত হইলে উত্তাপ বৃদ্ধি নির্দ্দেশ করিতে থাকে, তাহা "ত" চিহ্নিত হইলে দেখা যাইবে যে $\angle$ ব ট ন ও $\angle$ ন ট ত সমান।

বিকীর্ণশক্তি শোষণের ক্ষমতা "ভুসা" (অর্থাৎ তৈলাদি দহনোৎপন্ন অঙ্গার) নামে সুপরিচিত দ্রব্যেরই সর্ব্বোচ্চ। শোষণক্ষমতা পরিমাণে ভুসাই তুলনামূলক। কৃষ্ণবর্ণের অমসৃণ বস্তু শক্তি শোষণ-
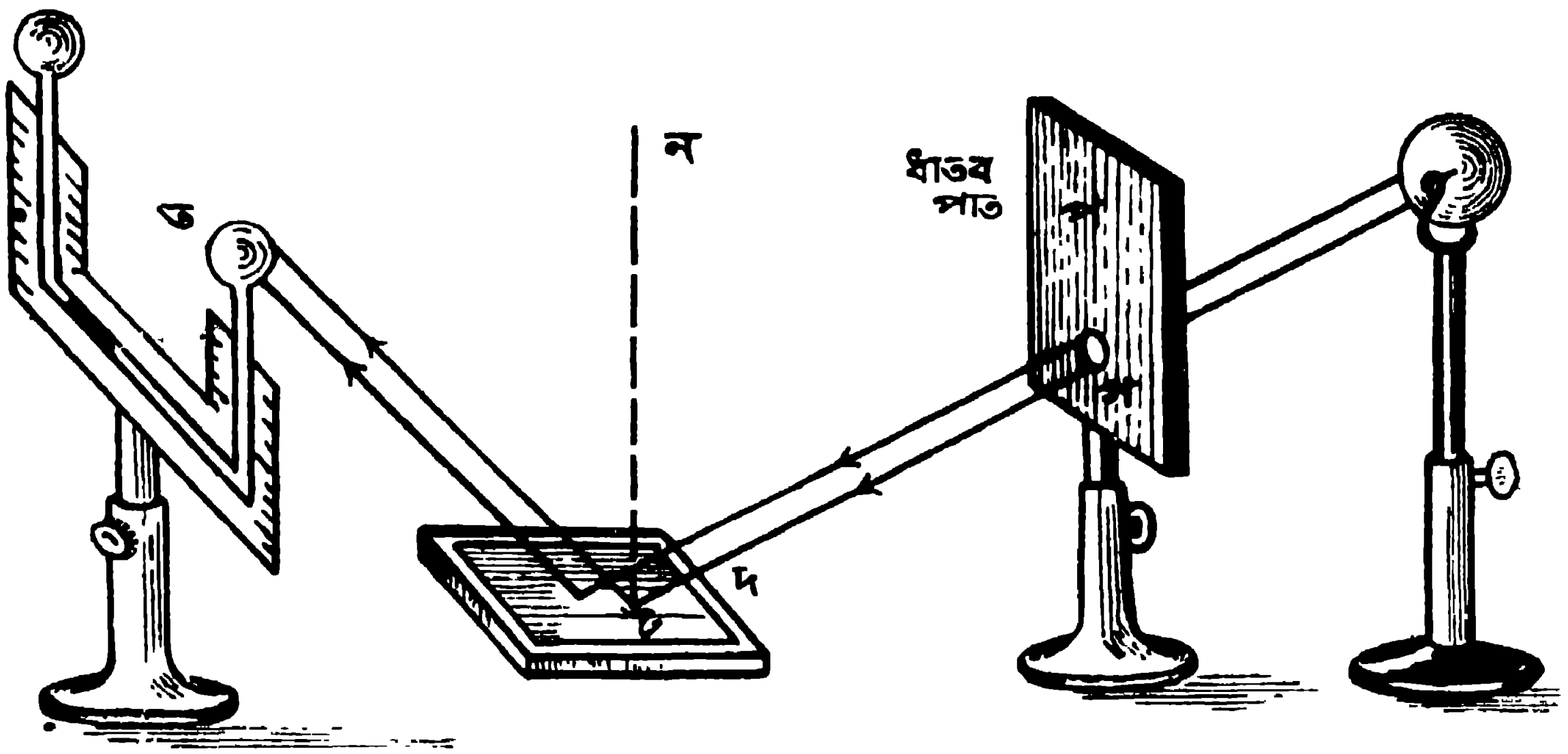
(৩৭নং চিত্র)

ক্ষম ও শ্বেতবর্ণের মসৃণ উজ্জ্বল বস্তু বিকীর্ণশক্তি প্রতিফলনক্ষম। অগ্নির সন্নিকটে, একটি তাপমান উজ্জ্বল ধাতব পাতে (অর্থাৎ "রাঙ্গতা" দ্বারা) আবৃত ও অপরটী ভুসালিপ্ত অবস্থায় একত্রে সজ্জিত হইলে, শেষোক্ত তাপমান উচ্চতর উত্তাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

উপরোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বনে, খাদ্য পানীয়াদি বহুক্ষণ ইচ্ছামত উত্তপ্ত রাখিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। (৩৮নং চিত্র) চিত্রে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সুপরিচিত একটি পাত্রের গঠনপ্রণালী প্রদর্শিত হইল। "ক" একটি কাচনির্ম্মিত বোতল। ইহাকে বেষ্টন করিয়া অপর একটি ঈষৎ বৃহত্তর বোতল, মুখের কাচ গলনে সংলগ্ন হইয়াছে। বোতল দুইটার মধ্যে "ক" চিহ্নিতটার বহির্দ্দেশে ও বৃহত্তরটার অভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাহায্যে রৌপ্য প্রলেপে উজ্জ্বল দর্পণের সৃষ্টি হইয়াছে। (আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দর্পণও এই উপায়ে সমতল কাচখণ্ডের উপর রৌপ্যের প্রলেপে উৎপন্ন)। উভয় বোতলের অবকাশস্থ বায়ু পাম্পসাহায্যে "প" চিহ্নিত পথে নিষ্কাশিত হইবার পর তাপযোগে কাচের গলনে উক্ত পথ বদ্ধ হইয়া থাকে। সমগ্র বোতলটী অপর একটি সুদৃশ্য ধাতব আধারে রক্ষিত হয়।
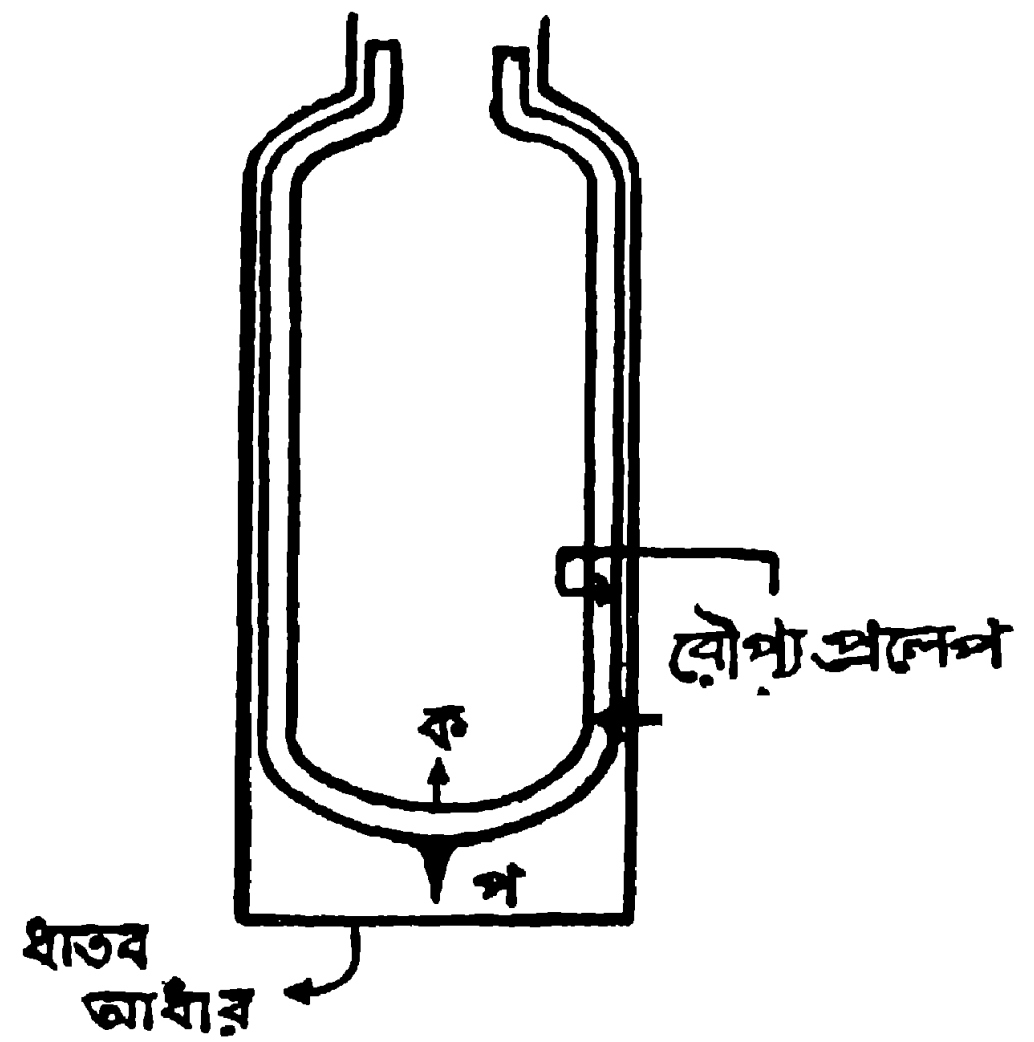
(৩৮নং চিত্র)

বায়ুর সংস্পর্শে কোনও উত্তপ্ত বস্তু রক্ষিত হইলে সংলগ্ন বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয়, সুতরাং লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধমুখে অপসৃত হইতে থাকে। এইরূপে বস্তুটী হইতে ক্রমান্বয়ে তাপশক্তি ক্ষয় হইতে থাকে। ইহাকে তাপশক্তির "সঞ্চারণ" বলা হইবে।

বায়ুর অভাবে উপরোক্ত পাত্রে রক্ষিত কোনও বস্তু হইতে সঞ্চারণক্রমে তাপ অপসৃত হইতে পারে না। সংলগ্ন কোন পরিচালক দ্রব্যের অভাবে পরিচালনক্রমেও তাপের ব্যয় হয় না, এবং তাপ-শক্তির বিকীরণও দর্পণটীতে নিবারিত হয়। এই জন্য বোতলে রক্ষিত বস্তু হইতে তাপ ক্ষয় হইতে পারে না, পক্ষান্তরে ইহাতে তাপশক্তি বহির্দ্দেশ হইতেও নিবিষ্ট হইতে পারে না।

উপরে বর্ণিত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে সংঘটন করা অসাধ্য। কিন্তু তথাপি সযত্নে যন্ত্রটী নির্ম্মিত হইলে ইহা বহুক্ষণ উত্তাপ রক্ষা করিয়া থাকে, আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য "থার্ম্মস্" (৩৮ ক চিত্র) এই প্রথায়
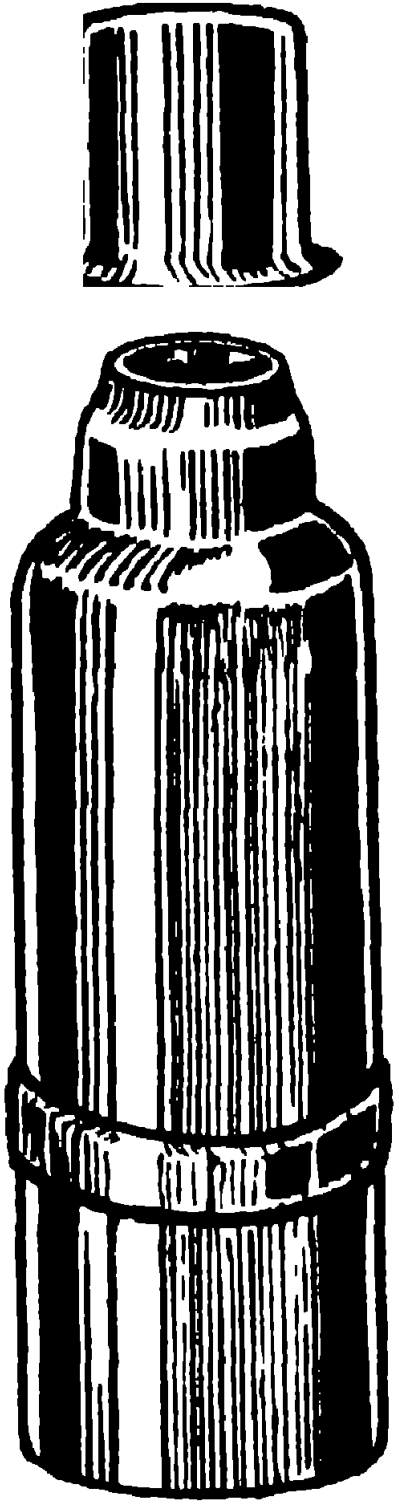
থার্ম্মো ফ্লাস্ক

(৩৮ ক চিত্র)

গঠিত। অল্প মূল্যের "থার্ম্মসে"ও খাদ্য প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টাকাল উত্তপ্ত থাকে ও তিনদিন যাবৎ শীতল থাকে। লেখক এইরূপ একটি "থার্ম্মসে" শিলাবৃষ্টির শিলা রাখিয়াছিলেন। ঐগুলি ৪ দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল।

বস্তুর তাপবিকীরণ ক্ষমতা

(৩৯ নং চিত্র) চিত্রানুযায়ী এক সমপ্রান্ত পাত্র
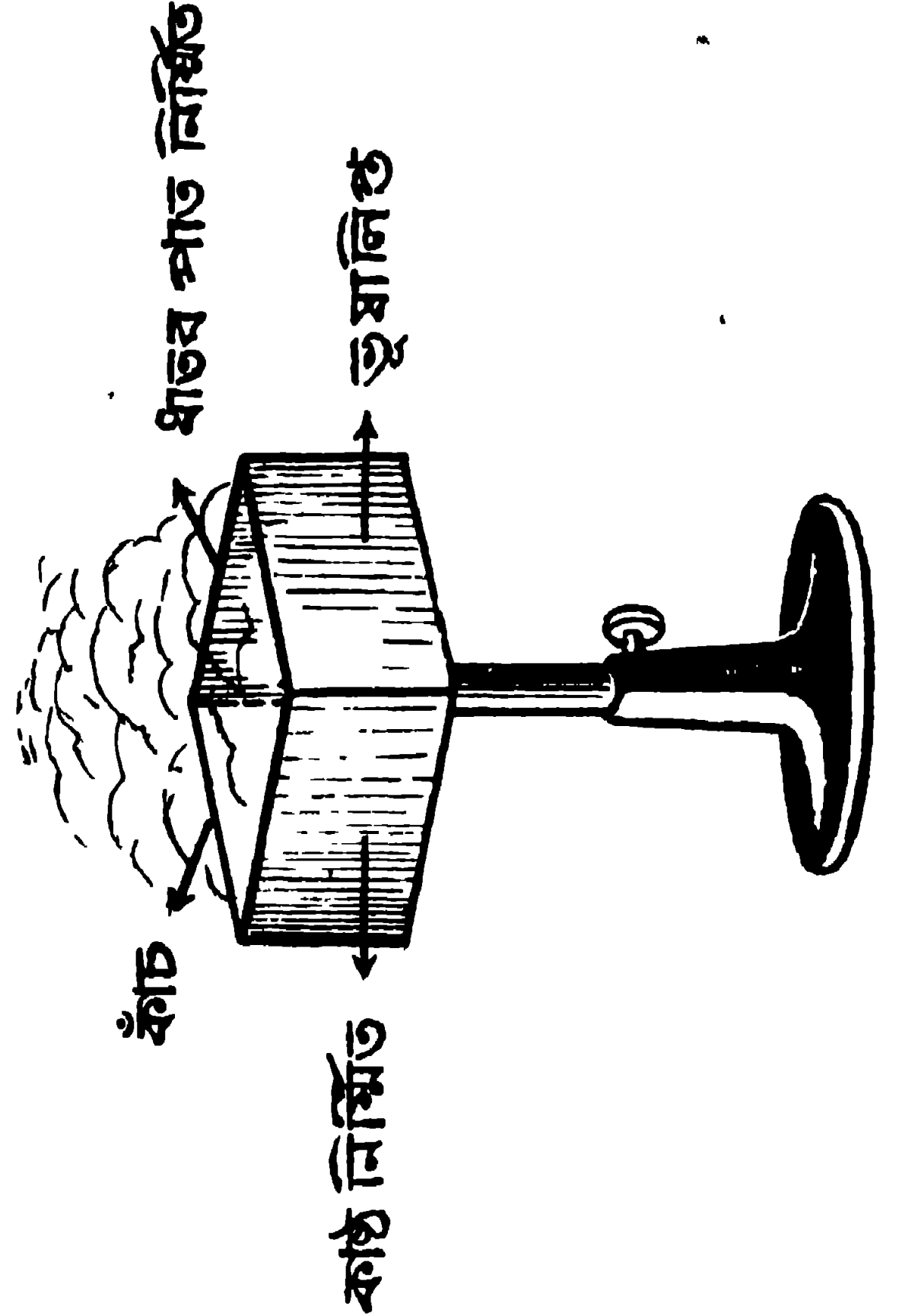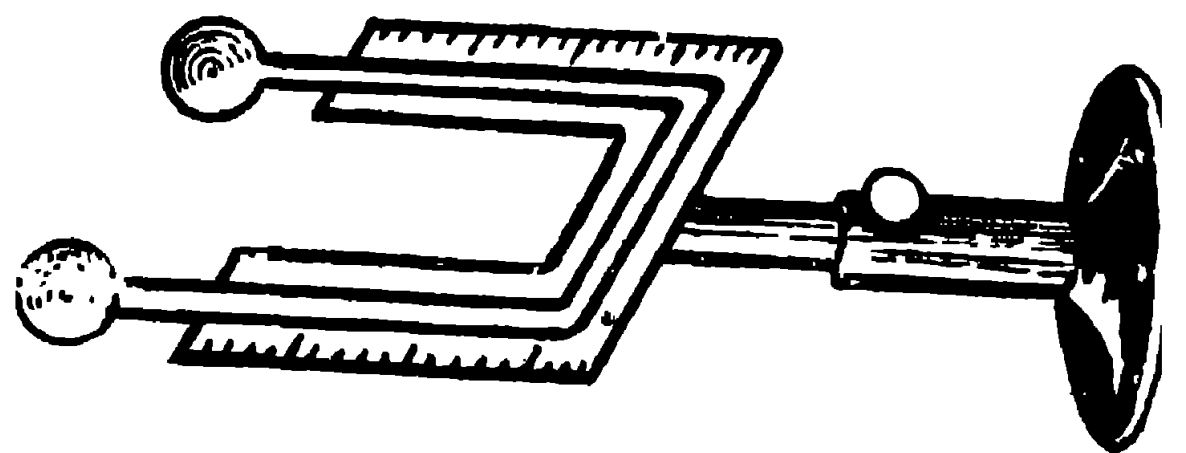
(৩৯নং চিত্র)

নির্ম্মিত হইল। উহার একটি প্রান্ত উজ্জ্বল ধাতব পাতে নির্ম্মিত, দ্বিতীয়টী ভুসালিপ্ত, তৃতীয়টী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও চতুর্থ প্রান্তে একখণ্ড কাচ সংলগ্ন আছে। পাত্রটী হইতে কিছু দূরে একটি তাপমান রক্ষিত হইল। পাত্রটী ফুটন্ত জলপূর্ণ হইলে পর উহা হইতে বিকীর্ণ তাপ, তাপমানে নির্দ্দিষ্ট হইবে। তাপমানটীর অভিমুখে ক্রমান্বয়ে পাত্রটীর চারি প্রান্ত রক্ষিত হইলে দেখা যায় যে, ভুসালিপ্ত প্রান্ত হইতে সর্ব্বোচ্চ ও উজ্জ্বল ধাতুময় প্রান্ত হইতে সর্ব্বনিম্ন বিকীর্ণ তাপ সূচিত হয়।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে বিকীর্ণ তাপশক্তি শোষণের ক্ষমতা ভুসারই সর্ব্বোচ্চ ও উজ্জ্বল ধাতব পাতেরই সর্ব্বনিম্ন। এইরূপে সকল বস্তুর তাপশোষণ ক্ষমতা ও তাপবিকীরণ ক্ষমতা সমান।

বিকীর্ণ তাপশক্তি পরিমাণের জন্য একটি সূক্ষ্ম তাপমান যন্ত্রের আধারে ভুসার প্রলেপ দেওয়া হয়। এইরূপে সামান্য বিকীর্ণশক্তি প্রাপ্তিমাত্রই উহার শোষণে উত্তাপতারতম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দুইটী বিভিন্ন ধাতুখণ্ডের স্পর্শস্থানে বিকীর্ণ তাপশক্তি সঙ্গত হইলে পর তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাহবেগ শক্তির পরিমাপক। ইহা "তড়িৎ-বিজ্ঞানের" আলোচ্য। এই ধর্ম্ম অবলম্বনেও বিকীর্ণ শক্তি পরিমিত হইয়া থাকে।

তাপস্বচ্ছতা:—কাচের ভিতর দিয়া যেমন আলোক অবাধে সঞ্চালিত হয়, আবার একখণ্ড ধাতুনির্ম্মিত পাতে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়, তেমনই বিকীর্ণ তাপও কোন কোন দ্রব্যের ভিতর দিয়া অবাধে গমনাগমন করিয়া থাকে ও কোন কোন দ্রব্যে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া থাকে। খনিজ লবণের ভিতর দিয়া তাপশক্তি অবাধে সঞ্চালিত হয়। একটি কাচপাত্রে 'কার্ব্বন-বাই-সালফাইড্' নামক তরল দ্রব্যে 'আয়োডিন' নামক কঠিন দ্রব্য দ্রবীভূত হইলে উৎপন্ন ঘোর নীলবর্ণের দ্রবণে আলোক সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়; কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া তাপশক্তি অবাধে সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

আলোকসম্পর্কে কাচ "স্বচ্ছ" ও কাষ্ঠ "অস্বচ্ছ"। সেইরূপ খনিজ লবণ ও আয়োডিন দ্রবণ "তাপস্বচ্ছ"। কাচ তাপ-অস্বচ্ছ।

তাপের প্রতিফলন

কতকগুলি বিভিন্ন উত্তপ্ত বস্তু হইতে বিকীর্ণ তাপ প্রতিফলিত হইয়া এককালে অপর একটি বস্তুর উপর নীত হইতে পারে। এক্ষেত্রে বস্তুটীর উপর বিকীর্ণ তাপসমষ্টি ফলিত হইয়া থাকে। এই উপায়ে দূরস্থ কোনও বস্তুর উপর প্রচণ্ড তাপ নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। গ্রীস্‌দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, আর্কিমেডিস্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক এই উপায়ে শত্রুপক্ষীয় জাহাজ দূর হইতে দগ্ধ করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহার জন্মভূমির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক পঞ্চাশখানি দর্পণ যদি এরূপ ভাবে সজ্জিত হয় যে, প্রত্যেকটী হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি একখণ্ড দূরস্থ কাষ্ঠে একত্রিত হইতে পারে, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে কাষ্ঠখণ্ডটি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

একটি শূন্যগর্ভ গোলকের একাংশ কর্ত্তিত হইলে যেরূপ আকার হয়, তদানুযায়ী দর্পণ নির্ম্মিত হইলে উহার ভিতরের অংশ উক্তরূপ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকে "কুব্জ দর্পণ" বলে। কার্য্যতঃ কুব্জদর্পণটী অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র দর্পণের সজ্জা বলিয়া ধার্য্য হইতে পারে। ৪০ নং চিত্রে ইহা সুবোধ্য হইবে। সরলরেখাক্রমে
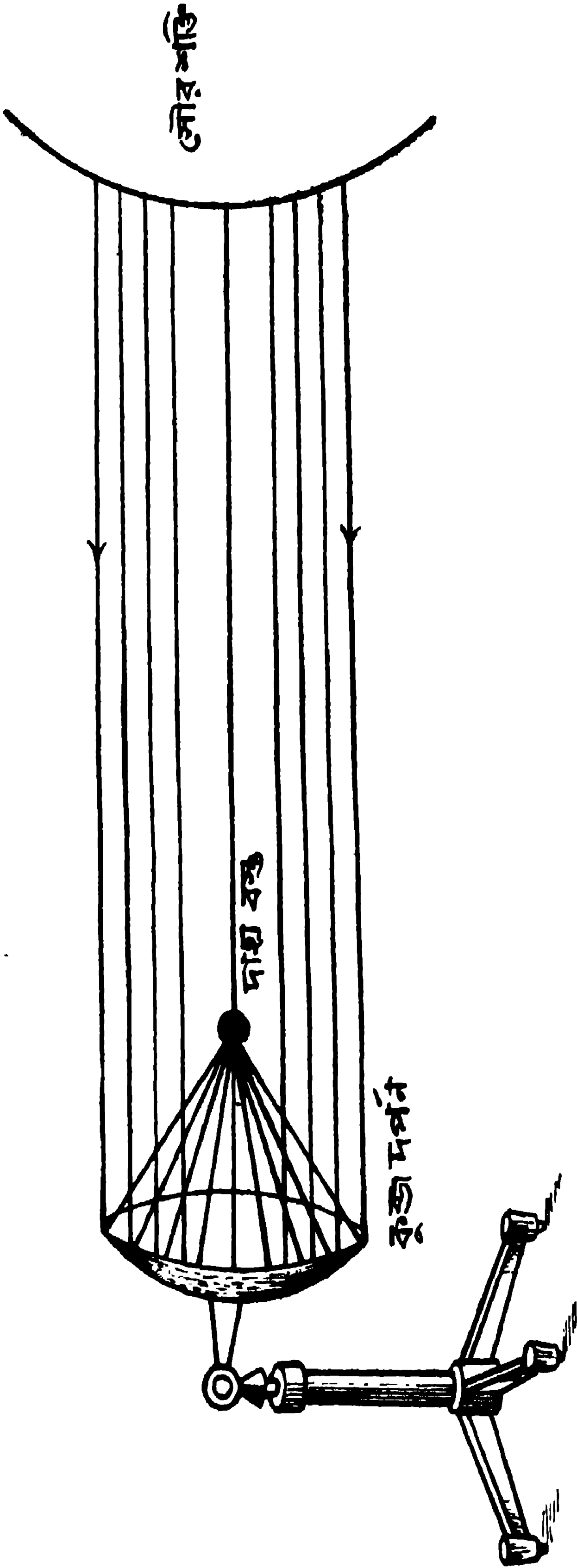
বিকীর্ণ সৌরশক্তির যে অংশ উক্ত দর্পণে পতিত হয়, তাহা একটি বিন্দুতে একত্রে প্রতিফলিত হইবে। এই বিন্দুতে কোনও দাহ্য বস্তু রক্ষিত হইলে উহা প্রজ্জলিত হইবে। অবশ্য দর্পণটী যত বৃহৎ হইবে, -উৎপন্ন তাপ ততই অধিক হইবে। "লেন্স" নামে পরিচিত কাচ (বা কোন স্বচ্ছ দ্রব্য) নির্ম্মিত স্থূলমধ্য পদার্থ বিশেষের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি সঞ্চালিত হইলেও উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী সকল রশ্মি রেখা একত্রে একটি বিন্দুতে মিলিত হইবে ও এই স্থানে কোনও দাহ্য দ্রব্য আনীত হইলে উহা প্রজ্জলিত হইবে।

এই সকল পদার্থের গঠনের সবিশেষ আলোচনা "আলোক-বিজ্ঞানের" অন্তর্গত।

শ্বেতবর্ণের বস্তু বিকীর্ণশক্তি প্রতিফলনক্ষম বলিয়া, গ্রীষ্মকালে শ্বেতবর্ণের পরিচ্ছদ উৎকৃষ্ট, পক্ষান্তরে শীতকালে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শীতপ্রধান দেশে, দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফল যাহাতে অধিকমাত্রায় সৌরশক্তি প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র সুপক্ক হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে উহাদের নিকটে কৃষ্ণবর্ণের প্রাচীর গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত পাত্রের বহির্দ্দেশ কৃষ্ণবর্ণ ও অন্তর্দ্দেশ শ্বেতবর্ণ হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্প তাপযোগেই রন্ধনাদি সুসম্পন্ন হইবে।

বস্তুতঃ শব্দশক্তি, তাপশক্তি, নিরালম্ব তড়িৎশক্তি ও আলোকশক্তি একই উপায়ে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শক্তি কম্পনের রূপে বিকীর্ণ হয় ও কম্পনের বিশেষত্ব অনুসারে উক্ত প্রকার বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

[আগামীবারে সমাপ্য]

(৪০নং চিত্র)

ভারতবর্ষের ইতিহাস

[শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ]

(৩য় প্রস্থ)

এইরূপে বেদজ্ঞানবলে ভারতবর্ষে মানবগণের মধ্যে সত্যযুগের আবির্ভাব হইল। এ সময় পৃথিবীর অন্যস্থলে মানবজাতির বসতি হয় নাই, অন্য কথায় ভারতবর্ষ হইতে মানবজাতি তখনও অন্য দেশে বিস্তার লাভ করে নাই। সুতরাং ভারতবাসী ও মানবজাতি এখন একই বস্তু। এই সময় লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দেবতা ও ঋষিগণের মানবরূপ ধারণের ফলে, আর সেই সকল দেবঋষিগণের সংস্পর্শে এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের মহিমায় এই মানব-জাতি এখন নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠে বলিয়া এই সময়কে সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এই ধর্ম্মপরায়ণতার ফলে কালক্রমে লোক সংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল. কারণ, ধর্ম্মই বৃদ্ধির কারণ। তখন এই ভারতবর্ষে আর তাহাদের সঙ্কুলান হইল না। অগত্যা লোক সকল ভারতের বাহিরে বাসস্থান অন্বেষণপূর্ব্বক তথায় বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কিছুকালের মধ্যে পৃথিবীর সমুদয় মহাদেশ মানবজাতির বাসস্থান হইয়া উঠিল।

এইভাবে বহুদিন অতিবাহিত হইলে কালধর্ম্মে পৃথিবীর মধ্যে ঝটিকা ও ভূমিকম্পাদি অতি ভীষণ প্রাকৃতিক ঘটনাবশে দেশসমূহ মধ্যে গমনাগমনের বাধা ঘটিয়া উঠিল। কারণ, এক ভূমিকম্পের ফলে জলপ্লাবন, নদ নদী ও হ্রদাদির উৎপত্তি হয়, শৈল-শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, পর্ব্বতমালা সমতল ভূমিতে পরিণত হয়, সমুদ্র মরুভূমি হয়, লোকালয় অরণ্য বা সমুদ্রে পরিণত হয় আর এইরূপেই প্রাকৃত ঘটনাবশে মধ্যে মধ্যে এক দেশ অন্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—কখনও বা বিভিন্ন দেশ এক দেশে পরিণত হয়। এস্থলেও তাহাই ঘটিল। এইরূপে মানবসভ্যতার মূল প্রস্রবণ ভারতবর্ষ হইতে অন্য দেশগুলি যত সম্বন্ধশূন্য হইতে লাগিল, ততই সেই সকল দেশবাসী মানবজাতির আকৃতি, প্রকৃতি, ধর্ম্মবুদ্ধি এবং মনোভাব প্রভৃতি সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। যে বেদের ভাষা শিখিয়া তাহারা বর্ণাত্মক ভাষা কথনে সমর্থ হইয়াছিল, আকৃতিভেদবশতঃ উচ্চারণভেদ ঘটায় সেই ভাষারও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। অধিক কি ক্রমে সেই বেদই লোকে বিস্মৃতও হইতে লাগিল, আর তাহার ফলে বেদের বিকৃতিও ঘটিয়া উঠিল। বিকৃত বেদমন্ত্রবশতঃ ধর্ম্মকর্ম্ম যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান আর ফলপ্রদ হইল না। সুতরাং যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও রহিত হইয়া গেল। দেশভেদে যে মানবের ভাষা ভাব, বর্ণ এবং আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী গরমদেশে বর্ণ কৃষ্ণ হয়, কিন্তু বিষুব-রেখা হইতে দূরবর্ত্তী শীতপ্রধান দেশে বর্ণ শুভ্র

বা উজ্জ্বল হয়। তির্ব্বতাদি দেশে মানবের নাসা অনুন্নত এবং হনু প্রশস্ত হয়, কিন্তু ভারতে তাহার বিপরীতই হয়—ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। জলবায়ু ও দেশের সংস্থানভেদে যে মানবের সকলই পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক দেশের লোক অন্য দেশে বাস করিলে কয়েক পুরুষ বাদে তাহাদের বংশধরগণের আকৃতিগত যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। দেশের জলবায়ু ভেদে তাহাদের আবার ব্যবহারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়। এ সকল ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে। চিন্তাশীল চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাহা হউক এই সময় মানবজাতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাহারা ক্রমে বিভিন্ন জাতিতেই পরিণত হইয়া পড়িল।

এই ব্যাপারেরই ফলে আজ চীন, হূণ, তাতার, পারস্য, তুর্ক ও রুশজাতি এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকাবাসী মানবগণ বিভিন্ন মনুষ্যজাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও ধর্ম্মমত—সবই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা সকলেই এই ভারতবাসী মানবসন্তান, সকলেই ভারতবাসীর ভ্রাতৃবৃন্দ। বেদহীন হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণগণের অভাবে যে এই সব জাতি বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে, আর ইহা শাস্ত্র মধ্যেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো প্রদেশে নিবিড় অরণ্য মধ্যে হিন্দুদিগের সূর্য্যমন্দির ভগ্নাবস্থায় অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সংবাদপত্র পাঠকারী মাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু তথাপি আজ পাশ্চাত্যগণের প্রভাবে আমরা শিখিতেছি—পূর্ব্বে আর্য্য ও অনার্য্য নামে দুই জাতীয় মানব ছিল। তাহাদেরই সন্তান কোথাও মিশ্রিত হইয়া, আর কোথাও বা অমিশ্রিত থাকিয়া, আজ পৃথিবীর মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে অমিশ্র আর্য্যজাতি অধিকাংশ ইউরোপবাসী পাশ্চাত্যগণ আর মিশ্রিত আর্য্যজাতি এই ভারতবাসীগণ। আর্য্যজাতীয় মানব সুন্দর, সুঠাম, সভ্য, বুদ্ধিবলে বলীয়ান্ এবং শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি, আর অনার্য্যজাতীয় মানব কুশ্রী, কৃষ্ণকায়, অসভ্য ও নীচ পশুপ্রকৃতি। মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যজাতি হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া ভারতে আসিয়া ভারতের অনার্য্যগণকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে দাসে পরিণত করিয়া ভারতে বসবাস করিয়াছেন, আর অল্প বিস্তর তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। যেমন ভারতের শূদ্রজাতি প্রায়শঃ এই অনার্য্যজাতি। কিন্তু ইউরোপের অধিকাংশ জাতির মধ্যে এই মিশ্রণ ঘটে নাই, তাহাদের সুন্দর বর্ণ সুন্দর আকৃতিই তাহার প্রমাণ।

আচ্ছা, এই শিক্ষার ফল কি? ইহার ফলে কি আমরা চিরতরে পাশ্চাত্য আর্য্যগণের অধীনতা বরণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইব না? আমরা পরাজিত অনার্য্যজাতি সম্ভূত বলিয়া কি তাহাদের অনন্ত দাসত্ব করিতে অভিলাষী হইব না? আমরা এক মানবজাতির মধ্যে পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য ভুলিয়া কি দ্বেষ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া অনার্য্যজাতিকে ঘৃণা করিতে শিখিব না? আমরা কি ভাবিব না—আমরা দাসের জাতি, আর্য্যগণের দাসত্ব করাই আমাদের স্বভাব, সুতরাং স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখাও অন্যায়? আর পাছে আমরা মানবজাতির এই এই আর্য্যানার্য্য বিভাগকে অপ্রমাণ বলি, সেই জন্য কি আমাদেরই বেদ হইতেই উক্ত আর্য্য এবং অনার্য্যজাতির কথা প্রদর্শন করা হয় নাই? জানি না এই জন্যই কি তাঁহারা বলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ যে বেদ, আমাদের সেই বেদ মধ্যে এই

আর্য্য ও অনার্য্যের কথা আছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সংগ্রামাদির বৃত্তান্ত আছে ইত্যাদি। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, যে মোক্ষমূলারকে ভট্ট মোক্ষমূলার নাম দিয়া কলিকাতা হইতে এক সময় এক শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের ঘড়াদি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাঁহার 'চিপ্‌স্ ফ্রম্ দি জার্ম্মান ওয়ার্কসপ্', নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের বেদের প্রচার করিবার উদ্দেশ্য খ্রীষ্টান মিশনারিগণের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সুবিধা দান করা।

যাহা হউক আমরা কিন্তু এই কথাটী সম্পূর্ণ ভুল মনে করি। আর্য্য অনার্য্য দুইটী মানবজাতি নহে। ইহারা মানবের দ্বিবিধ প্রকৃতি। সত্যনিষ্ঠ সরল স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে আর্য্য বলা হয়, এবং কুটিল অসত্যনিষ্ঠ পশুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে অনার্য্য বলা হয়। স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, এই সত্যটী আজ আচ্ছাদিত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, ভারতবাসী আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন একটী মিশ্রজাতি। শরীরের গঠন, মস্তকের অস্থি ও বর্ণের ভেদ প্রদর্শনদ্বারাও পাশ্চাত্যগণ আর্য্যানার্য্য বিভাগ সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে ব্যর্থ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাউক, এসব অবান্তর কথা, পৃথিবীর মানবজাতি যে এই ভারতবাসীর সন্তান এবং আমাদেরই ভ্রাতৃবৃন্দ, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এক্ষণে আমরা এই সত্যযুগ হইতে ভারতের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

সত্যযুগের বিবরণ

সত্যযুগের পরিমাণ (১৭২৮০০০) সতের লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর। বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া রবিবার হইতে এই যুগের আরম্ভ হয়। এই সময় মানব-সমাজে ষোল আনা পুণ্য ছিল। মানবগণ চারিশত বৎসর জীবিত থাকিত। মানবদেহ একুশহাত পরিমাণ হইত। প্রাণ, হাড়ের ভিতর যে মজ্জা থাকে, সেই মজ্জাগত ছিল; অর্থাৎ যতক্ষণ এই মজ্জা না শুকাইয়া যাইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানবের প্রাণবিয়োগ হইত না। কেবল তাহাই নহে, ইচ্ছা না করিলে মৃত্যুই হইত না। রোগ শোক ছিল না। সকলে সুবর্ণপাত্র ব্যবহার করিত। কেহ কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিত না। কেহ কাহারও কিছু অপহরণ করিত না।

এই যুগে ভগবান চারিবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সকল অবতারের নাম মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। এই সময় প্রথম রাজা হন মনু। অপর যে সকল রাজা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইক্ষ্বাকু, পৃথু, বলি, বেন, মান্ধাতা, পুরুরবা, ধুন্ধুমার, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ইত্যাদি।

বেদের মধ্যে সামবেদ প্রধান অবলম্বন ছিল। প্রধান তীর্থ ছিল পুষ্কর। মনুস্মৃতি প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র আর তপস্যাই প্রকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন।

উক্ত মনু মহারাজের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু এবং কন্যার নাম ছিল ইলা। ইলার সহিত চন্দ্রতনয় বুধের বিবাহ হয়। এই ইক্ষ্বাকু বংশই সূর্য্যবংশ এবং ইলার বংশই চন্দ্রবংশ। এই দুই বংশে পরে বহু পরমধার্ম্মিক মহাবীর্য্যবান্ রাজা জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাদের বিবরণ জানিতে হইলে আমাদের ইতিহাস ও পুরাণের স্মরণ গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। এটী প্রবন্ধ বলিয়া ইহাতে আর সে সব কথার উল্লেখ করা গেল না।

এই সত্যযুগে ধর্ম্ম চারিপাদ বিদ্যমান থাকিলেও বেদোক্ত কর্ম্ম ও উপাসনাকাণ্ডের অনুষ্ঠান ফলে আসুর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অর্থাৎ সকাম ভোগ

সুখপরায়ণ ব্যক্তিগণ মহাক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ক্রমে তাঁহারা শিবাদি দেবতাগণের বর লাভ করিয়া কেহ কেহ ভূ, ভুবঃ ও স্বর্ নামক ত্রিলোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। আর তাঁহাদের আচরণ যখন যখন অপর উপাসকগণের মুক্তির পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠে, অপর দেবারাধনার প্রতিকূল হইয়া উঠে, এক কথায় ধর্ম্মমতের স্বাধীনতার অবরোধ হইতে থাকে, তখন সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ বা তাঁহাদের শক্তিগণ মানবাদির রূপধারণ করিয়া তাঁহাদের নিধন বা চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। যেমন শিবভক্ত শম্ভু ও নিশম্ভুর অত্যাচার হইতে এবং মহিষাসুরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিবশক্তি ভগবতী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং শৈব হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান নারায়ণ নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। ফলতঃ এ সময়ের দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস সকলেই বেদসেবী থাকিয়াই বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াই অত্যাচারী হইত, বেদবিরোধী হইয়া আজকালের ন্যায় হইত না। আজকাল যেমন একের ধর্ম্মে অপরকে আনিবার জন্য প্রয়াস করা হয়, ছল বল, কৌশলাদি প্রয়োগ করা হয়, সে সময় সে সব ভাব ছিল না। যদি কেহ তপোবলে বলীয়ান্ হইয়া সেরূপ করিবার চেষ্টা করিতেন, তখনই ভগবান তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এই সময় জীবের চেষ্টা বা পুরুষকার তপস্যার দ্বারা ভগবানের ভিতর দিয়া কার্য্য করিত। আর তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদি হইলে ভগবানই সাক্ষাৎ ভাবে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। বেদবিরোধী কোন ভাব তখন উদিত হইত না। ভালমন্দ যাহা হইত তাহা বেদ অবলম্বনেই হইত। বেদবিরোধী হইয়া কিছুই হইত না। এজন্য শুম্ভ, নিশুম্ভ, মহিষাসুর, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি এসময় জন্মগ্রহণ করিলেও ধর্ম্মের পূর্ণরূপই বিদ্যমান ছিল বলা হয়।

কেহ হয়ত বলিবেন, এই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যে বহু আজগুবী কথা আছে। মনুষ্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব, সুতরাং মিথ্যা, উহা গালগল্প বিশেষ, উহার কোন কথাই ঠিক নহে। উহাতে ইতিহাস অংশ কিছুই নাই। কিন্তু একথা ঠিক নহে। ঐতিহাসিক অংশ উহাতে নিশ্চিতই আছে। যাহা হউক ইহার উত্তর এই—উহাদের অসম্ভব অংশবাদে সম্ভবপর অংশ গ্রহণ করাই পুরাণকর্ত্তাদিগের তাৎপর্য্য। আর কালেভদ্রে যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অতিমানব জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না ইহা মনে করাও সঙ্গত নহে। ভগবল্লীলার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই, আর তপবলেরও অসাধ্য কিছুই নাই। আর কোনটী অসম্ভব অংশ, তাহা লোকে নিজ নিজ সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিয়া থাকে। কথামালার জীবজন্তুর গল্পে যে অসম্ভব অংশ আছে, তাহা কোনও বালককেই বুঝাইতে হয় না, তাহা পরে বালকগণ আপনা আপনিই বুঝিয়া থাকে, অথচ বালক অবস্থায় তাহা হইতে যাহা শিক্ষণীয়, তাহাও তাহারা শিখিয়া থাকে। জ্যামিতির বিন্দু ও রেখাদির অঙ্কনের অসম্ভাবনা বুঝিয়াই লোকে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের ইতিহাস পুরাণের মধ্যেও উক্ত আখ্যায়িকাদি হইতে এইরূপ করিয়াই ঐতিহাসিক অংশ বুঝিয়া লইতে হয়। অতএব তাদৃশ অসম্ভব বর্ণনার মধ্যে ঐতিহাসিক অংশ নাই ইহা বলিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

যাহা হউক এই সত্যযুগে মানব একই ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। একই বেদের উপদিষ্ট ধর্ম্মই ধর্ম্ম ছিল। বেদবিরোধী আজকালকার ধর্ম্মের মত কোন ধর্ম্ম ছিল না। সকলেই বেদ মান্য করিত। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য,

নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুসারে, লোকে বেদ হইতেই নির্ণয় করিত। বেদবিরোধী কেহই ছিল না, বেদ-বিরোধী কোন ধর্ম্মও ছিল না। দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস সকলই বেদানুগামী ছিল। এইরূপে ধর্ম্ম বলিতে বেদোক্ত কর্ত্তব্যকেই বুঝায় বলিয়া এবং বেদ বহির্ভূত কর্ত্তব্যকর্ম্ম ধর্ম্মপদবাচ্য হইত না বলিয়া এই সত্যযুগে ধর্ম্মের পূর্ণরূপই বিদ্যমান ছিল। চতুষ্পাদ ধর্ম্মের অর্থাৎ ষোল আনা ধর্ম্মের সমস্তই বর্ত্তমান ছিল বলা হয়।

কেহ হয়ত বলিবেন—কেন? বেদবহির্ভূত ধর্ম্ম ধর্ম্মপদবাচ্য হইবে না কেন? বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, পারসিক ধর্ম্ম, চীনের ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম কি ধর্ম্মপদবাচ্য হইবে না? তাহাদের কি, তাহাদের ধর্ম্মাচরণের ফলে মুক্তি হইবে না? "হইবে না" বলা বাস্তবিকই আত্মম্ভরিতা, স্বার্থান্ধতা এবং নিতান্ত সংকীর্ণতার ফল। সকল ধর্ম্মেই অকার্য্য অকার্য্যই বলা হইয়াছে, মিথ্যা, চৌর্য্য, হিংসা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ, কামান্ধতা, মদ মাৎসর্য্য ভগবদ্ বৈমুখ্য প্রভৃতি কার্য্যগুলিকে নিন্দাই করা হইয়া থাকে, আর তদ্বিপরীত কার্য্যগুলিকে ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে,—প্রশংসা করা হইয়া থাকে। সকল ধর্ম্মেই প্রাণীমাত্রের একান্ত অভিলষণীয় যে সুখ, সেই সুখসাধনই উপদিষ্ট হইয়াছে। পুণ্য সুখসাধন, আর পাপ দুঃখসাধন—ইহাই বলা হইয়া থাকে। অতএব বেদোক্ত ধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং বেদ অমান্যকারীর ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলা নিতান্ত অসঙ্গত—ইহা নিতান্ত সংকীর্ণচেতার পরিচয়, ইত্যাদি।

কিন্তু এরূপ আশঙ্কা সমীচীন নহে। এরূপ আক্রমণ বা আশঙ্কা ধর্ম্মতত্ত্ব না জানার ফল। যাঁহারা বেদোক্ত ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলেন, এবং তদতিরিক্তকে অধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা ঈর্ষাবশতঃ বলেন না, বা সংকীর্ণতাপ্রযুক্তও বলেন না। তাঁহারা সুক্ষ্ম দৃষ্টির ফলেই এরূপ বলেন। অবশ্য যাঁহারা না বুঝিয়া ওরূপ বলেন, তাঁহারা গতানুগতিকভাবেই বলেন। আর তবে যে, একেবারেই কেহ ঈর্ষা বা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বলেন না, তাহাও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলা চলে না। যাহা হউক, ইহার উত্তর এই—ধর্ম্ম দ্বিবিধ, যথা—সামান্য ধর্ম্ম এবং বিশেষ ধর্ম্ম। সামান্য ধর্ম্ম যেমন—সত্য কথা, দান, পরোপকার, দয়া, সংযম প্রভৃতি এবং বিশেষ ধর্ম্ম যথা—বর্ণাশ্রমাচার অনুসারে যাগযজ্ঞাদি, জপ, তপ, পূজাপাঠ ইত্যাদি। সামান্য ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মেই প্রায় সমান, বিশেষ ধর্ম্মেই কেবল ভেদ। বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্গত বিশেষ ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মে নাই। এই বিশেষ ধর্ম্মের ফলে নির্ব্বিশেষ বা নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত হয়। বৈদিক ধর্ম্মের মুক্তি ও অন্য ধর্ম্মের মুক্তি অভিন্ন বস্তু নহে। এজন্য বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্গত বিশেষ ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মে নাই, আর এই জন্য অপর ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ ধর্ম্মপদ-বাচ্য হয় না। সামান্য ধর্ম্মকে বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্ম না বলিলেও চলে, উহাকে নীতি বলিলেও দোষ হয় না। আর এই বিশেষ ধর্ম্মজনিত যে পাপ-পুণ্য, তাঁহা বুদ্ধি বা বিদ্যাবলে নির্ণয় করিতে পারা যায় না। উহা সর্ব্বজ্ঞই কেবল নির্ণয় করিতে পারেন। এজন্য সর্ব্বজ্ঞানাকর বা সর্ব্বজ্ঞ বেদই এই বিশেষ ধর্ম্মের উপদেষ্টা হইবার যোগ্য। অন্য মানব কল্পিত বা মানব উদ্ভাবিত ধর্ম্ম কখনও বৈদিক বিশেষ ধর্ম্মের সমান হইতে পারে না। বৌদ্ধাদি অপর যাবতীয় ধর্ম্ম, প্রয়োজনানুসারে মানবের কল্যাণ চিন্তায় উদ্ভাবিত। উহা সনাতন নহে। পশুবধে পাপ আছে কিন্তু যজ্ঞার্থ পশুবধে পাপ নাই, ইহা সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন কেহ বলিতে পারেন না। মানব বুদ্ধিতে ইহা কখনই পুণ্যকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই জন্য বেদোক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম, অপর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-পদবাচ্য হয় না। উহা 'Religion' প্রভৃতি হইতে

পারে। কৃত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া নিষিদ্ধ ও কাম্যবর্জ্জন পুরঃসর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত এবং উপাসনাদ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া বেদান্ত বাক্যের শ্রবণাদি করিলেই নির্ব্বাণমুক্তি হইতে পারে, অন্য উপায়ে তাহা হইতে পারে না। আর নির্ব্বাণ মুক্তি যে সম্ভব, তাহা বেদ ভিন্ন কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়াই নির্ব্বাণ মুক্তির কথা বলিয়াছেন, অনেকে বলেন। তাহার মধ্যে কিন্তু বহু রহস্য আছে এস্থলে সে সব কথা আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধগণও বেদ হইতেই এই নির্ব্বাণের সন্ধান পাইয়াছেন। আর যে সব বৌদ্ধ শূন্যকে সং বলেন তাঁহাদের সঙ্গে তাদৃশ বিরোধ না থাকিলেও যাঁহারা শূন্য সং বলেন না তাঁহাদের নির্ব্বাণ কিন্তু বেদান্তের নির্ব্বাণের সহিত ঐক্য হয় না। ফলকথা বেদের কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ না করিলে নির্ব্বাণের কল্পনা বৌদ্ধগণ করিতে পারিতেন না।

তাহার পর বেদ হইতেই মানব বর্ণাত্মক ভাষা শিখিয়াছে বলিয়া আর বেদ হইতেই মনুষ্যোচিত ব্যবহার শিখিয়াছে বলিয়া বেদবিরোধী ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের বিকৃতি, আর তজ্জন্যও তাহা ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। এইজন্যই মীমাংসাশাস্ত্রে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন বেদোক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই ধর্ম্ম, ইত্যাদি। আর এইজন্যই এই সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া এই সময় মানবগণ মধ্যে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল বলা হয়।

যদি কেহ এই সময়ের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি হইতে এই সময়ের রাজবর্গের বংশাবলী নির্ণয় করিয়া প্রত্যেকের রাজ্যের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইতে পারিবে মনে হয়। এই প্রবন্ধ মধ্যে সে কার্য্য করা যুক্তও নহে সম্ভবও নহে গ্রন্থ মধ্যেই সে সব কথার স্থান হওয়া উচিত।

গোত্রেষ্টি যাগাদির দ্বারা সমাজবন্ধন

এই সত্যযুগের শেষভাগে মানব ঋষিগণ সমাজের কল্যাণ কামনায় এক দিকে সমাজকে গোত্র ও প্রবর বদ্ধ করিলেন এবং অন্য দিকে বেদবিদ্যার আলোচনার সুবিধার জন্য দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। সমাজকে গোত্র ও প্রবর বদ্ধ না করিলে কুলগত সদাচার রক্ষিত হয় না। কারণ, মানবজাতি বিভিন্ন প্রকৃতির হইলেও এবং সেই বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিগণের উন্নতির উপায়নিচয় বিভিন্ন প্রকার হইলেও, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে। এইরূপ বিভিন্ন অথচ একরূপ প্রকৃতি অনুকূলতা সহকারে উন্নতির চেষ্টা করিবার জন্য স্বভাববশেই একরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ একটী একটী দলে মিলিত হয়। ঋষিগণও এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বনে মানবগণকে এক একটী দলে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে গোত্রেষ্টি যাগাদির অনুষ্ঠান করিলেন এবং তাঁহাদের অনুকূল বেদের অনুমোদিত বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই গোত্রেষ্টি যাগের ফলে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়, সাংসারিক উন্নতি হয় এবং পরিণামে জ্ঞান ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়া মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত সহজে সম্পাদিত হয়। এই গোত্রেষ্টি যাগের যিনি প্রধান পুরোহিত হইলেন, তাঁহারই নামে সেই সকল ব্যক্তিগণের গোত্র নাম হইল। আর যে সকল ঋষি ঐ সকল যাগে সহকারী পুরোহিতের কার্য্য করিলেন তাঁহারা সেই সকল ব্যক্তির প্রবর নামে অভিহিত হইলেন। প্রত্যেক গোত্রের ব্যক্তিগণ

তাঁহাদের সামাজিক ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানকালে তাঁহাদের এই গোত্র ও প্রবরের নাম করিয়া সেই সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। অদ্যাবধি বিবাহ ও শ্রাদ্ধকালে এই গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ হইতে দেখা যায়। এই সব ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রিত মানবগণের জন্য যাবচ্চন্দ্রদিবাকর কল্যাণ করিবার জন্য ব্যাকুল। আমাদের কর্ত্তব্য কেবল, তাঁহাদের এই অনুকম্পার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা। ইঁহারা নিজ নিজ সন্তানের জন্য বিশেষতঃ এতই দয়ালু যে তাঁহাদিগকে স্মরণ না করিলেও তাঁহাদের সন্তান তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে কেহই বঞ্চিত হয় না। তথাপি অগ্নির উত্তাপ দান স্বভাব হইলেও অগ্নির নিকট যাহারা গমন করে, তাহারাই যেমন অগ্নির উত্তাপ অধিক পায়, এস্থলেও যাঁহারা নিজ নিজ গোত্র ও প্রবর ঋষিগণের চরিত্র কথা স্মরণ করেন, তাঁহারাই তাঁহাদের অনুকম্পা অধিকমাত্রায় লাভ করেন। এই গোত্রগত আচার যখন আরও বিশেষ আকার ধারণ করে, তখনই তাহা কুলাচার নামে অভিহিত হয়। কত সহস্র বৎসর অতীত হইল, আজ পর্য্যন্ত যে এক এক গোত্রের মানবগণ এখনও জীবিত রহিয়াছে এখনও সেই সেই গোত্র মধ্যে, মধ্যে মধ্যে চিরস্মরণীয় চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হইতেছে, ইহা সেই পরম কারুণিক ঋষিগণের উক্ত গোত্রেষ্টি যাগানুষ্ঠানের ফল। পৃথিবীর অপর সকল অংশেই অতি প্রাচীন মানববংশ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। সহস্র বৎসরের বংশ বিদ্যমান এমন জাতি এই ভূমণ্ডলে অতি অল্প। কিন্তু ভারতে কত কত সহস্র বৎসরের বংশ যে বিদ্যমান, তাহা গণনা করা যায় না। আজ কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবে আমরা আমাদের গোত্রানুসারে সদাচার পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছি। জানি না আমাদের এই দুর্ম্মতি কবে দূর হইবে। কোন্ বংশের কি গোত্র ও কি প্রবর, বিস্তারভয়ে এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। এজন্য শব্দকল্পদ্রুম অভিধান দেখিলে সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

*

দর্শনশাস্ত্র দ্বারা মানবের উন্নতিসাধন

কর্ম্মদ্বারা মানবসমাজকে যেমন উন্নতির পথে তুলিয়া দিবার জন্য ঋষিগণ মানবসমাজকে গোত্র বদ্ধ করিলেন, জ্ঞানের দ্বারা মানবসমাজকে উন্নতির পথে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্রের রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় মহর্ষি কপিল—সাংখ্যদর্শন, মহর্ষি গৌতম—ন্যায়দর্শন, মহর্ষি কণাদ—বৈশেষিকদর্শন, মহর্ষি পতঞ্জলি—যোগদর্শন, মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্ব পুরুষগণ—কর্ম্ম-মীমাংসাদর্শন এবং কাশকৃষ্ণ, কার্ষ্ণাজিনি, ঔডুলোমি প্রভৃতি বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষিগণ—মীমাংসাদর্শন শাস্ত্র রচনা করেন। এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণের জ্ঞানপিপাসা, যেন ছয়টী স্রোত-স্বতী তীর প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইবার পথ পাইল। জগতের মূল কি বা কে, কিরূপে ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়,—ইত্যাদি বিষয়ে যতই কেন মতভেদ থাকুক না, যত লোকেই নিজ নিজ বিশেষত্ব লইয়া যতই কেন পৃথক্ পন্থা নির্দ্দেশ করুক না, সেই সকল মতকে মূল ছয়টী মতে বিভক্ত করা যায়। এক কথায় মানবের মূল চিন্তাধারা বা তত্ত্ব চিন্তাধারা প্রধানতঃ ছয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আর সেই ছয়টী চিন্তাধারাই এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র। আজকাল পাশ্চাত্যগণ "যীশুখৃষ্টই জগতে আলোক আনিয়াছেন" এই ধর্ম্মবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া এই দর্শনশাস্ত্রগুলি, বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া, অর্থাৎ সকল দর্শনই দুই হাজার বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন বলিয়া,

আমাদিগকে শিখাইতেছেন, আর আমাদের দেশের কতিপয় মহামহোপাধ্যায় ঐতিহাসিকগণও তাহারই ঢাক বাজাইয়া সকলের কর্ণ বধির করিয়া দিতেছেন, কিন্তু আর্য্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মতে এই দর্শনগুলি এই সত্যযুগের মধ্যেই আবির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যাহা হউক গোত্রবন্ধনের ন্যায় ষড়দর্শনের দ্বারাও মহর্ষিগণ মানবসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

অবশ্য ভারতে এই ছয়খানি দর্শন ভিন্ন যে আর অন্য দর্শন নাই তাহা নহে। সত্যযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতে যে কত দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শকীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সময় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৭২টী ধর্ম্মমতের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত ধর্ম্মমত বা দার্শনিক মত উক্ত ছয়খানি দর্শনেরই অন্তর্গত হইয়া থাকে।

কিন্তু তাহা হইলেও এই ছয়খানি দর্শনকে অবার নানারূপে বিভক্ত করা যায়, যথা,—সংকার্য্যবাদ, সংকারণবাদ এবং অসংকার্য্যবাদ নামক তিনটী মতবাদে ইহাদিগকে বিভক্ত করা যায়—অথবা বেদের প্রামাণ্যের মুখ্যতা এবং অমুখ্যতা অনুসারে ইহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। আর এতদনুসারে কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা নামক দর্শন দুইখানি বেদের প্রামাণ্যের মুখ্যতাবাদী বা প্রাধান্যবাদী এবং অপর দার্শনিকগণ বেদের প্রামাণ্যের মুখ্যতা বা প্রাধান্য স্বীকার করেন না। আর এই মীমাংসা, দর্শন দুই খানির উদ্দেশ্য পুষ্টির জন্য বহু সূত্রগ্রন্থ, যথা—কল্প-সূত্র, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি—পরে জন্মলাভ করিয়াছে। এই সব দর্শন গ্রন্থগুলি এতই বিশাল যে ইহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াই অনেক জীবন ক্ষয় হইতে পারে। ফলতঃ, এই উভয়বিধ দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়া এই সত্যযুগেই ঋষিগণ মানবসমাজকে চিন্তারাজ্যের আধিপত্য অর্জ্জনে সুপ্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিলেন। এই সব দার্শনিক চিন্তাধারা সম্প্রদায়-ক্রমে রক্ষিত হইয়া অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে, ইহার মহিমা যাঁহারা অনুশীলন করেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই সত্যযুগ আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, চরিত্র সকল বিষয়ের আদর্শ। ইহার বহু কথা গল্পরূপে মহাতপা ভীষ্মদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব মধ্যে উপদেশ দিয়াছেন এবং পুরাণ মধ্যেও ইহার কিছু কিছু বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্যগণের শিক্ষার প্রভাবে আমরা শিখিতেছি, আমরা পূর্ব্বে বানর বা বনমানুষের জাতি ছিলাম। ক্রমে ক্রমোন্নতির নিয়মে আমরা সভ্যতা লাভ করিতেছি। এখন মানবজাতির যে অবস্থা তাহা পূর্ব্বের অবস্থা হইতে অনেক ভাল অনেক উন্নত, এবং উত্তরোত্তর আর উন্নত হইবে। আর এই উন্নতির কোন সীমাও নাই। দেশ ও কাল যেমন অনন্ত এই উন্নতিও তদ্রূপ অনন্ত ইত্যাদি। পরন্তু এর ক্রমোন্নতিবাদ যে কতদূর ভ্রান্তবাদ, কতদূর অদার্শনিকবাদ, তাহা দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। ইতিহাসের কঙ্কাল অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সে সব কথা আলোচনা করা আর সঙ্গত হয় না। তবে এই ক্রমোন্নতিবাদের ফলে আমরা দেখিতেছি যে মানবজাতির শান্তি কোথাও নাই, যতই অগ্রসর হইবে ততই আকাঙ্ক্ষা আবার ততই তাহার পরিপূর্ত্তির চেষ্টা,—পূর্ণ ও নিত্য-দশালাভ অসম্ভব কথা হইয়া যায়। পূর্ণ নিত্যবস্তুও কিছুই নাই—ইহাই স্বীকার্য্য হয়। আর যাহারা যে সব জাতির উপর প্রভুত্ব করিতেছে, তাহারাও ক্রমে উন্নত হইবে বলিয়া অধীন জাতির স্বাধীনতার কল্পনাও এক-রূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে, সুতরাং পাশ্চত্যগণের প্রাচ্য প্রভুত্ব অক্ষুন্নই থাকিতে পারিবে। কিন্তু বৈদিক

দার্শনিক চিন্তায় এ বিড়ম্বনা নাই। সকলেই আত্ম-স্বরূপ সকলই পূর্ণ, সুতরাং সকলই মূলে বা প্রকৃতপক্ষে একই অখণ্ড বস্তু, কারণ, পূর্ণ কখন দ্বৈতবস্তু হয় না। মূলেও পূর্ণ—শেষেও পূর্ণ মধ্যে যে অপূর্ণতা তাহা ভ্রমবিশেষ। ইহার নাশে শেষেও সেই পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। পাশ্চত্যগণ ইতিহাস দ্বারা আমাদিগকে যে পথে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাতে আমরা নিত্যবস্তুর সন্ধানই হারাইতে বসিতেছি, আমরা মরিয়া তাঁহাদের পুষ্টিসাধন করিবার পথে দাঁড়াইতেছি। পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অপরের দেশ অধিকার করিতেন, কিন্তু তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিতেন না, ইঁহারা কিন্তু ছলে, বলে, কৌশলে তাহাই করিয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহাদের দার্শনিক মতও তদনুকূল হইয়াছে। যাহা হউক মানবসমাজের আদর্শ এই সত্যযুগ; যে সব কারণে আমরা আজ কলির প্রভাবে কলুষিত, ঐকান্তিক যত্নদ্বারা সেই সব কারণ অপনীত করিতে হইবে, আর তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ যতদূর সুখ হইতে পারে তাহা লব্ধ হইবে, ইতিহাস পাঠের ফল পূর্ণ হইবে।

(ক্রমশঃ)

জলসেচন প্রণালী

[রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী]

প্রথম অধ্যায়

জলসেচনের প্রয়োজন

সাধারণতঃ ধান্য, গোধুম, যব প্রভৃতি ফসল উৎপাদনের জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কৃত্রিম জলসেচন ব্যতীত সমগ্র মাঠান জমির চাষ নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। কারণ কোন কোন স্থানে বৃষ্টিপাত সময়ে সময়ে এত অল্প পরিমাণ হইয়া থাকে যে, হয়ত ঠিক সময়ে ফসল বপন করা যায় না। তজ্জন্য ফসলের পরিমাণ কম হইয়া থাকে; অনেক সময়ে ফসল বপিত হইলেও পরিপক্ক হইবার সময়ে মোটেই বৃষ্টি না হওয়ায় ফসল মরিয়া যায় বা ফসলের পরিমাণ কম হইয়া থাকে। এই কারণে অতি প্রাচীনকাল হইতে (রাজা মান্ধাতার আমল হইতে) ভারতবর্ষে জমিতে জলসেচন করিবার জন্য বহুবিধ প্রণালী প্রচলিত আছে।

যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত অতি অল্প সে সকল স্থানে কূয়া বা স্থায়ী নদী হইতে যন্ত্রদ্বারা জল উত্তোলন করিয়া জমিতে জলসেচন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে এবং যে সকল জেলায় বৃষ্টিপতন প্রচুর কিন্তু সাময়িক নহে অর্থাৎ অসময়ে প্রচুর বারিপাত হয় অথচ প্রয়োজন সময়ে মোটেই বৃষ্টি হয় না সে সকল স্থানে পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে বৃষ্টির জল জমা করিয়া রাখা হইত এবং প্রয়োজন কালে যখন বৃষ্টি হইত না, তখন ঐ সকল

পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা হইতে জল ছাড়িয়া বা উত্তোলন করিয়া জমিতে জলসেচন করা হইত।

(২নং চিত্র)

কূপ বা নদী হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য বহুবিধ পুরাতন যন্ত্র প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে "পার্শিয়ান হুইল" অথবা "পারস্য চক্র" একটী প্রধান যন্ত্র। এই যন্ত্রে প্রায় ৩০ বা ৪০টী মাটির কলসী একখানি চাকার উপরিভাগে মজবুত দড়ি দিয়া এরূপভাবে গ্রথিত থাকে, যাহাতে চাকা ঘুরাইলে কলসী জলপূর্ণ হইয়া উপরে উঠিয়া জমির জলপ্রণালীতে ঠেকিবা-মাত্র প্রণালীতে সমস্ত জল পড়িয়া যাইবে এবং চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে পুনরায় ঐ সকল কলসী জলপূর্ণ হইয়া নদী বা কূয়া হইতে জল তুলিয়া লইবে। ঐরূপ চক্র ঘুরাইবার জন্য এক জোড়া বলদ গরু বা ঘোড়া প্রয়োজন হইত। নিম্নে ঐরূপ পারস্য চক্রের চিত্র দেওয়া হইল।

পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে এইরূপ পারস্য চক্রদ্বারা (১নং চিত্র) কূপমধ্যস্থ ৫০ বা ৬০ ফুট নিম্নস্থিত জল উত্তোলন করিয়া রবিশস্যে জলসেচন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রণালী,—যদ্দারা বেহার প্রভৃতি প্রদেশে

দ্বিতীয় প্রণালী

গভীর কূপ প্রভৃতি হইতে জল উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে জল সেচিত হইয়া থাকে, তাহার নাম "মোট"। পার্শ্বে মোটের একটী চিত্র (২নং চিত্র) দেওয়া হইল।

এই প্রণালীতে, এক জোড়া বলদ গরু কূপের উপরিস্থিত একটী 'পুলি বা 'কপিকলে' চালিত একটী দড়ির সাহায্যে এক প্রকার চর্ম্ম-নির্ম্মিত থলে দ্বারা (যাহাকে মোট বলে) কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া থাকে। এই প্রণালীতে সচরাচর দুইজন লোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। একজন লোক ঐ বলদ গরু দুটীকে চালাইয়া তাহাদের দৌড়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত লইয়া গেলে উক্ত চর্ম্মনির্ম্মিত মোটটী কূয়ার উপরিভাগে আসিয়া পড়ে, তখন আর একজন লোক ঐ মোটটীর মধ্য সংলগ্ন ছিদ্রটী খুলিয়া দেয় এবং তাহা হইলে ঐ মোটের মুখ হইতে জলপ্রণালীতে জল যাইয়া ক্ষেত্রে পতিত হয়।

৪ ফুট হইতে ১০ ফুট গভীর ছোট ছোট কূয়া হইতে জল তুলিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র যাহাকে

তৃতীয় প্রণালী

'লাট' বলে, পশ্চিম অঞ্চলে ও বঙ্গদেশেও ব্যবহার হইয়া থাকে। মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশে উহাকে 'পিকোটা' বলিয়া থাকে। নিম্নে তাহার একটী চিত্র দেওয়া গেল। (৩নং চিত্র) এই যন্ত্রে একটী বালতি (লোহার বা চামড়ার) একটী কাষ্ঠের ডাণ্ডায় ঝোলান থাকে এবং ঐ কাষ্ঠটী অপর একটী কাষ্ঠের খুঁটির উপর এরূপ-ভাবে সংলগ্ন থাকে যে, উহাকে টানিয়া সহজেই নীচু বা উঁচু করা যাইতে পারে এবং এই কাষ্ঠের ডাণ্ডার পশ্চাতে একখানি পাথর আঁটা থাকে, যাহাতে একজন কৃষক অনায়াসে উক্ত ডাণ্ডা টানিয়া বালতিটী জলে ডুবাইয়া দিতে পারে, এবং বালতিটী
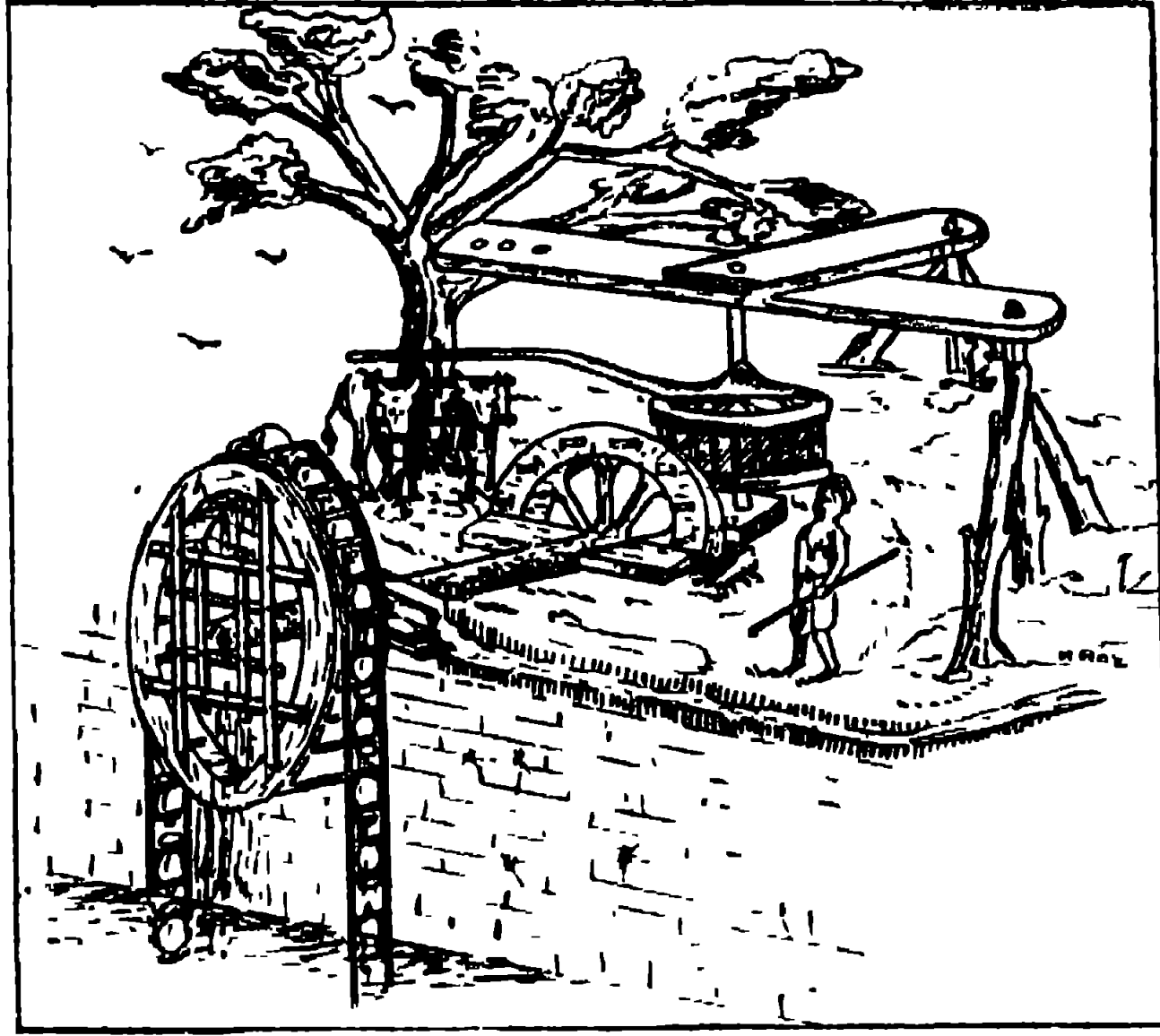
(১নং চিত্র)

জলপূর্ণ হইবামাত্র সামান্য ঊর্দ্ধদিকে টান দিলেই বালতি কূয়া হইতে উত্থিত হয় এবং জলপ্রণালীতে জল পড়িতে পারে।

চতুর্থ প্রণালী

চতুর্থ প্রণালী—যদ্দ্বারা ৩।৪ ফুট গভীর জলাশয় বা নালা হইতে জল উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে সেচন করা যায় তাহার নাম সেচনী বা ঝুড়ি যন্ত্র। নিম্নে ইহার একটী চিত্র দেওয়া হইল।

(৪নং চিত্র) এইরূপ সেচনী বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহাতে ঝুড়ির, যাহা ডোমেরা বাঁশের চেঁচাড়ী দ্বারা তৈয়ার করিয়া থাকে, দুই পার্শ্বে দুই গাছা দড়ি সংলগ্ন থাকে। একজন কৃষক এক পার্শ্বের দড়ি ধরিয়া থাকে ও অপর একজন তাহার বিপরীত পার্শ্বের দড়ি ধরিয়া নালা বা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে সেচন করে।

(৩নং চিত্র)

পঞ্চম প্রণালী

পঞ্চম প্রণালী—যাহা বঙ্গদেশে সচরাচর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় তাহার নাম "দ্রোণ"। ২ বা ৩ ফুট গভীর জলাশয় হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার ইহা একটী প্রধান যন্ত্র। ইহার
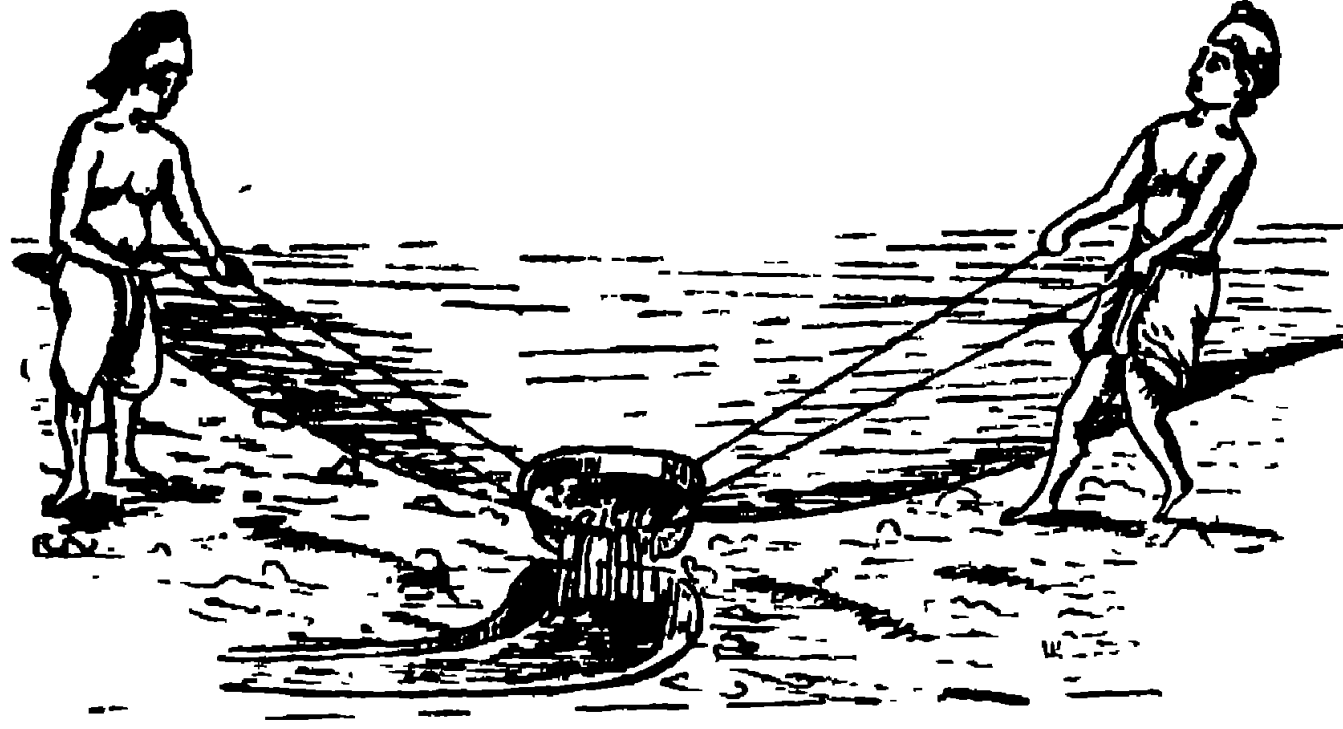
(৪নং চিত্র)

ব্যবহার প্রণালী প্রায় লাট চালাইবার প্রণালীর মত। ইহাতে একটী অর্দ্ধ তালবৃক্ষের মধ্যস্থিত শাঁস বাহির করা ডোঙ্গা একটী কাষ্ঠের ডাণ্ডায় দড়ি দিয়া ঝুলান থাকে নিম্নে চিত্র (৫নং চিত্র) প্রদত্ত হইল।

ঐ ডাণ্ডাটী অপর একটী কাষ্ঠের খুঁটির উপর এরূপভাবে সংলগ্ন থাকে যে উহাকে টানিয়া নীচু বা উঁচু করা যাইতে পারে এবং ঐ ডাণ্ডার অপর প্রান্তে একটী প্রস্তর বা কাদার ভার সংলগ্ন থাকায় উহা অনায়াসে কৃষক এক পদদ্বারা জলে ডুবাইয়া সামান্য টান দিলেই উঁচু হইয়া নালায় জল পড়িতে থাকে।

আজকাল দ্রোণের ব্যবহার বঙ্গদেশে বেশী পরিমাণে হওয়ায় লোহার পাত বা দস্তার পাত দিয়া কর্ম্মকারেরা দ্রোণ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ তালের দ্রোণ অপেক্ষা দস্তা বা লোহার দ্রোণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এরূপ একটী দ্রোণের মূল্য ৮৲ হইতে ১২৲ মাত্র।

শ্রীযুক্ত এলেন উইলসন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই সকল যন্ত্রদ্বারা কি পরিমাণে জল উত্তোলন করা যাইতে পারে এবং নিম্নে তাহার ফল প্রদর্শিত হইল। যথা—

	প্রণালী	দশঘণ্টায় কত ঘনফুট জল এক ফুট উচ্চে উঠাইতে পারে
১।	দুটী বলদদ্বারা টানিত মোট সাহায্যে একজন কৃষক	৭৯, ২০০ ঘনফুট
২।	লাটদ্বারা দুজন কৃষক	৫৭, ৬০০ „
৩।	ঐ একজন কৃষক	৩৩, ০০০ „
৪।	সেচনীদ্বারা দুজন কৃষক	২০, ১৭৮ „

শুদ্ধ তুলনা করিবার জন্য ১০ ঘণ্টা ও এক ফুট হিসাবে গণনা করা হইয়াছিল।
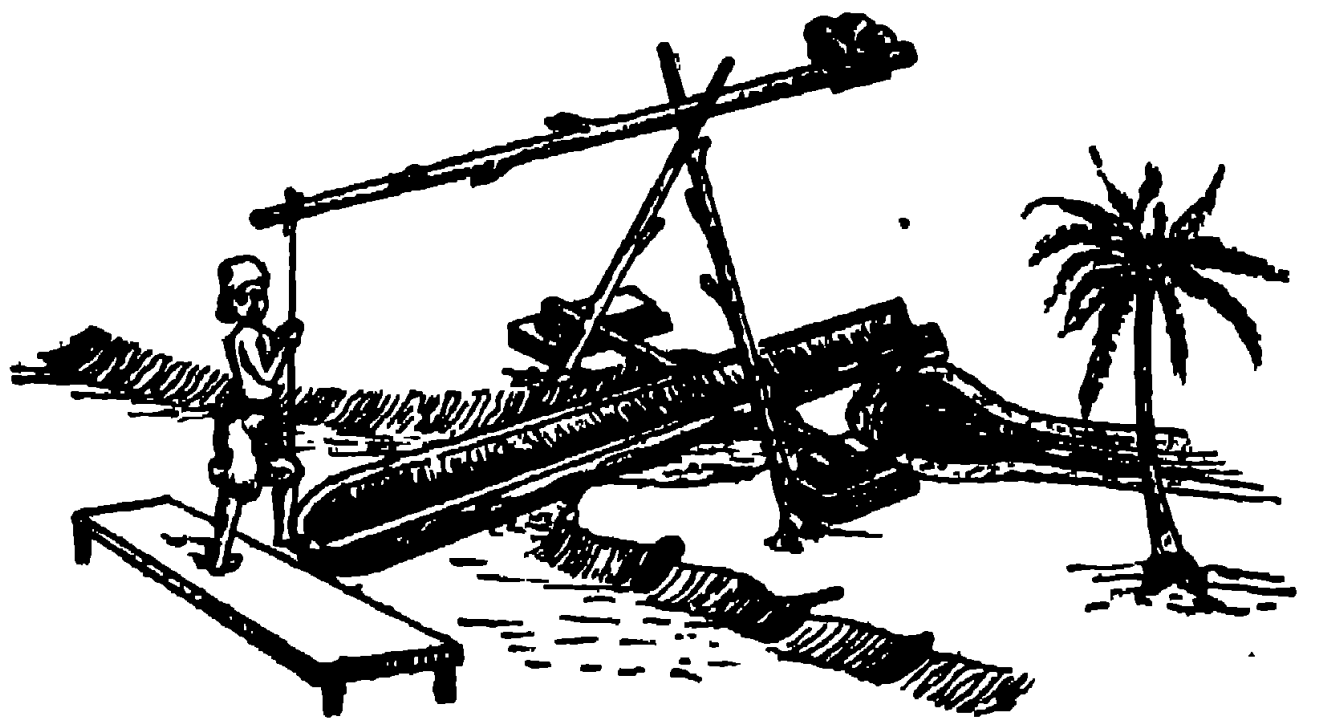
(৫নং চিত্র)

(ক্রমশঃ)

বাংলার প্রাকৃত সম্পদ—
পাট, খেজুরগাছ ও ইক্ষু।

(জনৈক পল্লীবাসী)

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ চেষ্টায় সংগৃহীত ও লিখিত।

পাট, খেজুরগাছ ও ইক্ষু

প্রকৃতিদেবী বাঙ্গালাদেশকে কতকগুলি নিজস্ব সম্পদসম্ভারে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর অপর কোনও স্থানে নাই; এবং মানুষের প্রয়োজন হিসাবে সেই গুলি প্রায় পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগেরই আবশ্যক হয়। এই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির একটীর স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত দ্রব্যের উৎপাদন প্রণালী পর্য্যন্ত এখনও অপর স্থানের মনিষীগণ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। সেই দ্রব্যের জন্য এখনও সমগ্র পৃথিবীর, একমাত্র বাঙ্গালার মুখাপেক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে হয়।

এই নিজস্ব সম্পত্তি অপর কিছুই নহে, তাহা পাট ও খেজুর গুড়। একমাত্র এই বঙ্গদেশ ছাড়া পৃথিবীর অপর সকল স্থান প্রকৃতিদেবীর এই স্নেহের দান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে খেজুর গুড় হইতে প্রস্তুত শর্করার স্থান ইক্ষুচিনি ও বিটচিনি দ্বারা অনেকাংশে অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দ্রব্য তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে সমর্থ হইল না।

দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার উপর প্রকৃতির এই অযাচিত স্নেহের দান এক্ষণে মৃত্যুপথের পথিক হইতে চলিয়াছে। সেদিকে এখনও কাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই; এবং ইহাদের এই মরণোন্মুখ হইবার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিযোগিতাই তাহার মুখ্য কারণ।

অনেকে ঠিক বাঙ্গালার ভিতরকার অবস্থার বিষয় অবগত নহেন। কেন যে এই দুইটী পরস্পর পরস্পরের মৃত্যুর কারণ সে সম্বন্ধে অগ্রে জ্ঞানলাভ করা বিধেয়। পরে সকলের চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়াছে যে, কি উপায় অবলম্বিত হইলে ইহারা পুনরায় মরণপথ হইতে সঞ্জীবিত হইয়া পৃথিবীর বাজারে বহির্গত এবং তথা হইতে ধন রত্ন আহরণ করিতে সমর্থ হয়।

এখনও পর্য্যন্ত প্রকৃতি প্রদত্ত এই স্নেহের দানের জন্য বঙ্গবাসী যতই দারিদ্রদশায় উপনীত হউক তথাপি অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয় নাই, বরং অপর দেশস্থ নিরন্ন ব্যক্তিগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া অন্ন প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাই বাঙ্গালার বিশেষত্ব।

পাট ও খেজুরগুড় শিল্পজাত নহে, কৃষিজাত দ্রব্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। পাট ও খেজুরগুড় বরাবরই বাঙ্গালায় ছিল এবং আছে, এবং এই দুইটী কৃষিজাত দ্রব্য এক হিসাবে সহোদর তুল্য। কারণ ইহাদের জঠরস্থান সমগুণবিশিষ্ট ভূমি, অর্থাৎ যে প্রকার জমিতে খেজুর বৃক্ষ হইবে ঠিক সেই ভূমিতেই পাট চাষ হইবে, তবে পাটগাছের পরমায়ু অল্প এবং তাহাকে সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই আবশ্যক। সেইজন্য তাহার উৎপাদিকা স্থানকে বিশেষরূপে পরিপাটি করিতে হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে তাহাতে কিঞ্চিৎ সার প্রদান করিতে হয়। কিন্তু খেজুর বৃক্ষের পরমায়ু বহুদিবস স্থায়ী সেই জন্য তাহার নিমিত্ত বিশেষ কোন কারকিতের আবশ্যক

হয় না কেবল রোপণ করিয়া তাহার শৈশব অবস্থায় তাহাকে বৃক্ষপত্রভোজী পশুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেই হইল।

বঙ্গদেশে অগ্রে পাট অপেক্ষা খেজুর গাছের আদর বেশী পরিমাণে ছিল। তখন লোকে পাট অপেক্ষা খেজুর গাছকে অত্যধিক যত্নসহকারে রোপণ করিত। কারণ একদিকে তখন বঙ্গদেশ হইতে পাট এরূপ অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইত না, কেবল দেশবাসীর গার্হস্থ্য আবশ্যকীয় হিসাবে যাহা এই দেশে প্রয়োজন হইত সেইরূপ উপযোগী হিসাবেই পাট উৎপন্ন হইত। আবার অন্যদিকে তখন বৈদেশিক শর্করার আমদানী ছিল না বলিয়া দেশজাত শর্করার জন্য খেজুর গাছের চাষ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল।

অনেকে তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, পাট-চাষের বহুল প্রবর্ত্তন দ্বারা এবং এই পাটের রপ্তানির জন্য বিদেশের বহু অর্থ এদেশে আগমন করিতেছে এবং করিয়াছে।

তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার আছে। যদিও পাট-চাষ বর্দ্ধিত হইয়া বঙ্গীয় কৃষকের হস্তে কিছু নগদ টাকা আগমন করে, কিন্তু সেই অনুপাতে খেজুর গাছের চাষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বৈদেশিক শর্করার আমদানীতে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ এদেশ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর যায়। সে হিসাবে তাঁহারা দৃষ্টি প্রদান করেন না।

এক্ষণে বাঙ্গালার কর্ত্তব্য হইতেছে দুই কূল রক্ষা করা। যাহাতে বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি পাটের দ্বারা বৈদেশিক অর্থ দেশস্থ হয়, এবং অপর দিকে বাঙ্গালার অন্য নিজস্ব সম্পত্তি খেজুরগুড়ের দ্বারা দেশের অর্থ বিদেশীর হস্তগত না হয় তাহারই উপায় বিধান করা।

বৈদেশিক বণিকের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, তাহার মধ্যে এখনও ভারতীয় বণিকের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। বৈদেশিক বণিক্ যখন কিছু প্রদান করে তখন জানে যে, পরে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ তাহারা গ্রহণ করিবে। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সেই উপায় স্থির করিয়া তবে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করে।

আমরাও এরূপ বুদ্ধিহীন যে আমরা যখন কোন অর্থ গ্রহণ করি, তখন আমরা চিন্তা করিয়া উপায় বিধান করিয়া রাখি না যে এই অর্থ গ্রহণের প্রতিদানে যাহাতে তাহাদের হস্তে আমাদের অর্থ না পতিত হয়। পাট ও খেজুরগুড়ের মরণোন্মুখ হইবার ইহাই কারণ।

বৈদেশিক বণিক্ যখন বাঙ্গালায় পাটের সন্ধান প্রাপ্ত হইল, এবং তাহা হইতে বহুবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত কৌশল আবিষ্কার করিল, তখন তাহাদিগের বাঙ্গালার পাটের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু পাট লইতে আগমন করিয়া দেখিল যে, পাট লইলে ইহাদিগকে পাটের পরিবর্ত্তে কেবল অর্থই প্রদান করিয়া যাইতে হয় সেই অর্থ পুনরায় কোনরূপে লইয়া যাওয়া যায় না। কিন্তু অর্থ তাহাদিগকে লইয়া যাইতেই হইবে তখন অর্থ লইয়া যাইবার উপায় আবিষ্কার করিতে চেষ্টিত হইয়া দেখিল যে অর্থ লইয়া যাইতে হইলে পাটের সহোদর ভ্রাতা খেজুর চাষের প্রাণ বিনাশ করা আবশ্যক।

এইরূপ সুচিন্তায় চিন্তিত হইয়া তাহারা পাট লইবার জাহাজে করিয়া বৈদেশিক চিনি আমদানী করিল। এদিকে বাঙ্গালার কৃষক পাটের দ্বারা এক থোকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আশায় বাঙ্গালার নিজস্ব দ্রব্য পাট তাহাদিগকে প্রদান করিয়া, অপর নিজস্ব দ্রব্য খেজুরগুড়ের প্রাণবধ করিয়া বৈদেশিক শর্করা লইতে আরম্ভ করিল। বঙ্গলক্ষ্মী এক সন্তানের প্রবলতায় অপর সন্তানের প্রাণবধ দেখিয়া অঞ্চলে মুখ আবৃত করিলেন।

বাঙ্গালী তখন বুঝিল না যে আমার নিজস্ব সম্পত্তি আমারই ইচ্ছামত দরে আমি অপরকে প্রদান করিতে পারি তাহাতে বিদেশীর কোন বাক্য উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। অতএব আমি আমার অন্য কৃষি নষ্ট করিব না। কিন্তু তখন তাহারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাই আজ এই দুর্দ্দশা।

বাঙ্গালার এই পাট ব্যবসা বহুদিবস হইতে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। বোধ হয়, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং যে সময় হইতে পাট রপ্তানি এদেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে প্রায় ঠিক সেই সময় হইতেই বৈদেশিক চিনিও এদেশে আমদানী হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বঙ্গদেশে পাটের দর পূর্ব্বে দুই টাকা কিম্বা নয় সিকা ছিল; কারণ তৎকালে পাট দেশ বহির্ভূত হইয়া গমন করিত না। কেবল দেশবাসীর আবশ্যকের জন্য সামান্য উৎপাদিত হইত, তাহাতে কৃষক তাহার কৃষিকার্য্যের ব্যয়ের উপর সামান্য কিছু লভ্যাংশ রাখিয়া বিক্রয় করিত।

এইরূপ অবস্থায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে অকস্মাৎ পাটের দর বর্দ্ধিত হইল, এবং কৃষক যত পাট উৎপাদন করিল তাহার সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। পূর্ব্বে এরূপ হইত না। উৎপাদিত পাটের কতক অংশ খরিদ্দার অভাবে হয়ত কৃষকের গৃহে সঞ্চিত থাকিত, হয়ত এক বৎসরের উৎপন্ন ফসল কৃষককে দুই বৎসরে বিক্রয় করিত হইত, কিন্তু বিদেশে রপ্তানিতে সুবিধা হইল যে, কৃষকের উৎপন্ন সমস্ত পাট বিক্রয় হইয়া গেল এবং তাহার মূল্যও কৃষক নগদ প্রাপ্ত হইল।

অকস্মাৎ বাঙ্গালী-কৃষক পাটের চাষের দ্বারা অসম্ভাবিত উপায়ে অর্থাগম দৃষ্টে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং সেই সঙ্গে অসম্ভবরূপে পাট চাষ বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে কৃষকের যে স্থানে যত জমি ছিল তাহার সমস্তই পাট বপনোপযোগী করিয়া ফেলিল। এমন কি, তাহার জীবনধারণের শস্য ধান্য তাহাও নিয়মিত করিল। সেই সময় এইরূপ হইয়াছিল অনেক কৃষক পাটের টাকায় আকৃষ্ট হইয়া ধান্য বপন একেবারে বন্ধ করিয়াছিল। তাহারা আহারের জন্য পাট বিক্রয়ের টাকা হইতে ধান্য খরিদ করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। তাহার ফলেই ধান্যের মূল্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া গেল। কৃষক কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি প্রদান করিল না।

ক্রমে পাট চাষ বর্দ্ধিত করিবার মানসে ভূমি প্রাপ্তির আশায় কৃষক ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং যখন ভূমি প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই দেখিল তখন অনন্যোপায় হইয়া খেজুর বাগানের খেজুর বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়া সেই সকল ভূমি পাট বপনের জন্য নিয়োজিত করিল

সেই কার্য্যের ফল হইল যে দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে খেজুরগুড় লোপ পাইবার উপক্রম হইল। বিশ বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগণা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় বহুসংখ্যক চিনির কারখানা বর্ত্তমান ছিল. কিন্তু খেজুর গুড় নিয়মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল, এবং সেই সঙ্গে দেশের বহুলোক নিরন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। তখন দেশের ঈষৎ রক্তিমবর্ণের দেশী শর্করার স্থানে শুভ্রবর্ণের বৈদেশিক শর্করা আগমন করিয়া আমাদের মিষ্টান্নের অভাব দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিল।

পাট চাষের দ্বারা কিছুদিন যে কৃষককুলের সচ্ছল অবস্থা আগমন করে নাই তাহা নহে। দুই চার বৎসর বঙ্গীয় কৃষকগণ পাট চাষের দ্বারা বেশ সচ্ছলতা অনুভব করিয়াছিল, এবং তাহাদের হস্তেও কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল; কিন্তু বিদেশী বণিক্ যে মুহূর্ত্তে বাঙ্গালার কৃষককুলকে সামান্য শ্রীমন্ত দেখিল

সেই মুহূর্ত্তে তাহারা তাহাদের শিল্প বিক্রয় করিবার উপযুক্ত বাজার আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বিদেশী বণিক্ অমনই বাঙ্গালার কৃষককুলের সম্মুখে সেই বাঙ্গালার পাট দ্বারা প্রস্তুত পাঁচশত টাকা মূল্যের কাশ্মীরীশালের অনুকরণে শাল প্রস্তুত করিয়া পাঁচ টাকা মূল্যে তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিল। নানারূপ সুদৃশ্য ধারণীযুক্ত ছত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদের সম্মুখে আনয়ন করিল। নানারূপ রঙে রঞ্জিত বৈদেশিক ছিটের কাপড় আনয়ন করিল। হারিকেন আলো আগমন করিল, কৃষকের সম্মুখে কৌটা বোঝাই সিগারেট আনয়ন করিল, কৃষক এখন আর ক্ষেত্রোৎপন্ন গৃহপ্রস্তুত তামাকে তৃপ্ত হইল না। আবার কৃষকপুত্র পদব্রজে গমন করিতে অসমর্থ হইল তাহার সম্মুখে মাত্র তিন মণ পাটের দরে এক-খানি সাইকেল গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘর ছাইবার জন্য করগেট টিন আসিল, আরও কত কি তাহাদের সম্মুখে বৈদেশিক বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক আনীত হইল তাহারাও হর্ষিত মনে তাহা খরিদ করিয়া পূর্ব্বাবস্থা হইতে আরও দারিদ্রদশায় উপনীত হইতে আরম্ভ করিল।

এদিকে ব্যাপকভাবে পাট চাষের অন্য ফলও ফলিতে আরম্ভ করিল। পাট চাষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল; কিন্তু যখন হইতে বহুল পরিমাণে পাট' চাষ আরম্ভ হইল, তখন হইতেই বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হইতে আরম্ভ করিল।

পাট গাছ হইতে পাট নিষ্কাশিত করিবার জন্য তাহাকে পনর ষোল দিবস জলে পচান আবশ্যক হয়। সেই জন্য কৃষকের এই পাট পচাইবার জন্য জলাশয় আবশ্যক হইল; কিন্তু দেশের মধ্যে এরূপ প্রচুর জলাশয় নাই যাহাতে কেবলমাত্র পৃথক্‌ভাবে পাট পচান কার্য্য চলিতে পারে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কৃষক পাটের টাকার লোভে আকৃষ্ট হইয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পানীয় জলের পুষ্করিণীতে পাট পচাইতে আরম্ভ করিল, কিম্বা এরূপ স্থলে পাট পচাইতে আরম্ভ করিল যাহার জল পানীয় জলের পুষ্করিণীতে আগমন করে। তখন সেই দূষিত জল পানে নানারূপ ব্যাধিতে বঙ্গদেশ-বাসী আক্রান্ত হইতে আরম্ভ করিল, এবং এই ব্যাধির আক্রমণে বঙ্গীয় কৃষককুল দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

পাট চাষের দ্বিতীয় ফল হইল বঙ্গদেশের মজুরীর মূল্য দ্বিগুণ হারে বর্দ্ধিত। পূর্ব্বে কৃষকের যে মজুরের আবশ্যক হইত তাহা একটা কোন নিরূপিত সময়ের মধ্যে প্রায় আবশ্যক হইত না, কেবল ধান্য রোপণের সময়ে কিছু নিরূপিত সময়ের মধ্যে আবশ্যক হইত। অবশিষ্ট কার্য্য কৃষক নিজের সুবিধামতভাবেই মজুর দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লইত। কিন্তু পাট চাষের কার্য্যে সেরূপ ভাবে সম্পন্ন হইবার উপায় নাই।

এই পাট চাষের কার্য্য সমস্তই একটা নিরূপিত সময়ের মধ্যেই আবশ্যক হয়। সেই জন্য সেই সময় একেবারে প্রত্যেক কৃষকেরই লোকের আবশ্যক, এই কারণে কৃষক বর্দ্ধিত হারে মজুরীর মূল্য প্রদান করিয়া মজুর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। পাটের উৎপন্ন দর ও তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বঙ্গীয় শ্রমজীবীসকল ম্যালেরিয়ার আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইল না। পূর্ব্বের একজনের স্থানে এক্ষণে তিন জনের আবশ্যক হয়। অথচ মজুরীর মূল্য অধিক হওয়ায় কৃষকের পাটের পড়তা অধিক হইতে আরম্ভ করিল।

আবার এদিকে কৃষকের একটা নিয়মিত সময়ের মধ্যে পাটের চাষের কার্য্য সমাপন করিবার জন্য অর্থের আবশ্যক হয়; কিন্তু কৃষক সেই সময়

অর্থাভাবে ঋণ করে, ইচ্ছা পরে পাট বিক্রয় করিয়া ঋণশোধ করিবে। কিন্তু যখন পাট বাজারে বহির্গত হয়, তখন কৃষক দেখিতে পাইতেছে বর্ত্তমানে তাহার উৎপাদনের খরচা অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য কম, এই কারণে বঙ্গীয় কৃষক দিন দিন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

এক্ষণে বাঙ্গালীকে পাট ও খেজুরগুড় দুই কৃষি রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বাঙ্গালী যদি অল্প পরিমাণ পাট বপন পূর্ব্বক পুনরায় খেজুর গাছ রোপণ করিয়া খেজুরগুড় উৎপাদনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গের এই দুই কৃষি পুনরায় রক্ষা প্রাপ্ত হয়।

পাট অল্প করিয়া বপন করিলে বৈদেশিক ব্যবসায়ী তাহাদের আবশ্যকের অনুপাতে ইহাকে উচ্চ মূল্যে খরিদ করিতে বাধ্য হইবে। কৃষকও তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লাভবান হইবে, এবং সেই সঙ্গে খেজুর বৃক্ষের পুনঃ পত্তন করিলে আর বৈদেশিক শর্করা-ব্যবসায়ী আমাদের নিকট হইতে কোনরূপে অর্থ লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না, বাঙ্গালার টাকা বাঙ্গালাতেই থাকিয়া যাইবে।

বহুল পরিমাণে পুনরায় খেজুর গাছের আবাদ করিলে এবং তাহা হইতে গুড় উৎপন্ন হইলে বোধ হয় বৈদেশিক শর্করা-ব্যবসায়ী আর ইহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তদুপরি ইক্ষুর চাষ বর্দ্ধিত করিলে আরও ভাল হইবে; কারণ বাঙ্গালার সব স্থানে খেজুরগুড় ভাল জন্মায় না। যে যে স্থানে খেজুর গুড় উৎপন্ন না হইবে সেই সেই স্থানে ইক্ষুর আবাদ করা আবশ্যক। যদি এখনও তাহা হয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও বর্দ্ধিতাকারে করা আবশ্যক।

এক্ষণে খেজুরগুড়, পাট এবং ইক্ষুর চাষের প্রণালী ও উৎপন্ন ব্যয় প্রদর্শিত হউক। প্রথমে পাট চাষ সম্বন্ধে দেখা যাউক। এক বিঘা ভূমিতে পাট বপন করিতে হইলে, অন্ততঃ চারিবার লাঙ্গল (১নং চিঃ) দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে হয়; তৎপরে

লাঙ্গল (১নং চিত্র)

"মই" দ্বারা সমতল এবং কঠিন মৃত্তিকাখণ্ডকে চূর্ণ করিয়া দিতে হয়, পরে বীজ বপন। এই কার্য্য চৈত্রের শেষে কিম্বা বৈশাখের প্রথমে যে বৃষ্টি হইবে সেই সময় করা আবশ্যক।

পরে চারা বহির্গত হইলে অন্ততঃ তিনবার বিঁদে দেওয়া আবশ্যক। (কাষ্ঠে লৌহশলাকা সংযুক্ত একপ্রকার কৃষিযন্ত্র) ইহা (২নং চিত্র) দ্বারা কিছু আগাছা ঘাস প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত হয় এবং ঘন সন্নিবেশিত পাট চারা কিছু পাতলা হইয়া

বিঁদে (২নং চিত্র)

যায়। পাট প্রথমে খুব ঘনভাবে বহির্গত হয় ; কিন্তু পরে তাহাকে পাতলা করিয়া দিবার আবশ্যক হয়, তৎপরে "নিড়ান" অর্থাৎ পাট বপনের পর ক্ষেত্রে পাটের অঙ্কুরের সহিত ঘাসও বহির্গত হয়, সেই সময় যদি সেই ঘাসকে উত্তোলন করিয়া না ফেলা যায় তাহা হইলে পাটের চারা সকল মরিয়া যাইবে। এই ঘাস একবার উত্তোলিত হইলেই শেষ হয় না, অন্ততঃপক্ষে তিনবার উত্তোলন করা আবশ্যক। সময় সময় চারিবারও উত্তোলিত করিতে হয়, অর্থাৎ যত দিন না পাটগাছ কিছু বৰ্দ্ধিত হইয়া তাহার পত্রের জল ঘাসের উপর পতিত হয়। এই অবস্থায় আর পাটক্ষেত্রে ঘাস জন্মাইতে সক্ষম হয় না। কৃষকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় এই ঘাসোত্তোলন কার্য্যে। চলিত কথায় ইহাকে "নিড়ান" বলে।

পরে শ্রাবণ মাসের শেষভাগে কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে পাটগাছকে কর্ত্তন করিতে হইবে। তৎপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কর্ত্তিত পাটগাছ সকলকে এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া গাছ হইতে পত্র সকল বিচ্যুত করিবার জন্য তিন চারি দিবস ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিতে হয়। পরে তাহাকে তথা হইতে লইয়া কোন জলাশয়ের মধ্যে পচাইবার জন্য ফেলিয়া দিতে হইবে। তথায় প্রায় পনর দিবস পচিবার পর সেই পাট গাছ হইতে পাটকে নিষ্কাশিত করিয়া লইতে হয়। পরে সেই পাট রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ

প্রেরিত হইবে। ইহাই হইতেছে পাট উৎপাদনের কৃষিকর্ম্ম-প্রণালী। এই সমস্ত কার্য্যই বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

এক বিঘা পরিমাণ ভূমিতে পাট চাষ করিবার খরচের হিসাব :—

লাঙ্গল খরচা ৪ বার ১৷৷০ হিঃ	৬৲
মই দেওয়া	১৷৷০
বীজের মূল্য ⁄২ সের ১৷০ হিঃ	২৷৷০
বিঁদে দেওয়া	১৲
নিড়ান ১ম বার ৮ জন ৷৷৵০ হিঃ	৫৲
„ ২য় „ ৬ জন ৷৷৵০ হিঃ	৩৸০
„ ৩য় „ ৪ জন ৷৷৵০ হিঃ	২৷৷০
কাটাই খরচা ৪ জন ৷৷০ হিঃ	২৲
পচাইবার জন্য জলে ফেলা খরচ ৪ জন ৷৷০ হিঃ	২৲
জলে ধৌত করা ১০০ হাতা ৷০ হিঃ	৩৲
শুষ্ক করিবার জন্য রৌদ্রে দেওয়া পরে বাঁধাই প্রভৃতি,	৸০
মোট	৩০৲

এই খরচের হিসাব জনৈক কৃষকের হিসাব হইতে লওয়া হইয়াছে, ইহার মধ্যে কল্পিত কিছুই নাই। সময় সময় ইহা অপেক্ষাও কিছু অধিক খরচা পড়ে।

যাহা হউক, এক বিঘা ভূমিতে সাধারণতঃ ৬ মণ পাট উৎপন্ন হয়। ভূমির উর্ব্বরতা হিসাবে কিছু কম বেশী হয়, সেই কারণ সাধারণ কৃষকগণ উক্ত ছয় মণ হিসাবেই ধরিয়া লয়। এক্ষণে ছয় মণ পাটের মূল্য ৩০৲ ত্রিশ টাকা, ৫৲ পাঁচ টাকা মণ প্রতি খরচা হয়। এই বৎসর বিক্রয় হইয়াছে ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা; কিন্তু অন্যান্য বৎসর বিক্রয় হয় ৮৲ আট হইতে ১০৲ দশ টাকার মধ্যে। আমরা ৯৲ নয় টাকা করিয়া ধরিয়া লইলাম। তাহা হইলে ৬ মণ পাটের মূল্য ৯৲ হিঃ ৫৪৲ টাকা। ব্যয় ৩০৲ ত্রিশ টাকা, তাহা হইলে লাভ হইবে ২৪৲ টাকা। পরে কোন কোন পাটের ভূমিতে রবিশস্য হয়, তাহাতে কৃষকের ২০৲ কুড়ি টাকা আন্দাজ লাভ হইতে পারে। তাহা হইলে এক বিঘা ভূমির আয় ২৪৲+২০৲=৪৪৲ টাকা। তাহা হইতে খাজনা ৩৲ তিন টাকা বাদ দিলে ৪১৲ একচল্লিশ টাকা কৃষকের থাকিতে পারে। ইহাই হইতেছে পাটের ভূমির লাভ।

এক্ষণে খেজুরগুড় সম্বন্ধে দেখা যাউক।

খেজুর গাছের চাষ

খেজুরগুড় প্রস্তুত করিতে হইলে খেজুররসের আবশ্যক, সেই রস খেজুর বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই খেজুর বৃক্ষ প্রতি বৎসর রোপণ করিবার আবশ্যক হয় না। একবার রোপণ করিলে তাহা হইতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত রস প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহার কারকিতের জন্য কোনরূপ ব্যয় কিম্বা পরিশ্রম আবশ্যক হয় না, একবার বসাইতে পারিলেই হইল। ব্যয়ের মধ্যে দুই এক বৎসর অন্তর খেজুর বাগানের মধ্যে একবার লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকে কর্ষণ করিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়।

খেজুর বৃক্ষ রোপণ করিবার উপযুক্ত ভূমি একটু উচ্চ দোআঁশ বালি মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক, এবং চারা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রতি চারি হাত অন্তর দুই একটী করিয়া পক্ক খেজুর কিম্বা তাহার বিচি ফেলিয়া গেলেই হইবে। তবে তাহা আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি হইবার পরই হইলে ভাল হয়।

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে চারা বহির্গত হইলেই কেবলমাত্র বৃক্ষপত্রভোজী পশুর গ্রাস হইতে তিন বৎসর আন্দাজ রক্ষা করিয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ যত দিবস না গাছ বড় হয় এবং তাহাতে কণ্টক সঞ্চারিত হয়। গাছ বড় হইলে এবং তাহাতে কণ্টক

সঞ্চারিত হইলে আর তাহার কোনরূপ বিনাশের ভয় নাই।

চারি বৎসর বয়স হইলেই বৃক্ষ হইতে রস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষককে ঐ ভূমি প্রথমে খেজুর চারা রোপণ হইতে চারি বৎসর মাত্র ফেলিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে ঐ গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া গুড় প্রস্তুত করিলেই হইল আর কোনরূপ বাধা বিপত্তি থাকিবে না।

খেজুর গাছ হইতে রস প্রাপ্তি এবং তাহা হইতে গুড় উৎপাদন

খেজুরগুড় উৎপাদনের সময় শীতঋতু, সেইজন্য শীতঋতু আগমনের পূর্ব্ব হইতেই খেজুরগুড়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। খেজুরগুড়ের জন্য খেজুর বৃক্ষ হইতে রস বহির্গত করাইবার নিমিত্ত প্রথমে আশ্বিন মাসে গাছকে "ঝুড়িতে" হয়, অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের পুরাতন শাখা সকল কর্ত্তিত করিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিতে হয়। এই "ঝোড়ার" আট দশ দিবস অন্তে তাঁহাকে "চাঁচ" দিতে হয়, অর্থাৎ খেজুর গাছের কাণ্ডদেশে যে স্থান হইতে রস নির্গত হইবে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া চাঁচিয়া রাখিতে হইবে, ইহাকেই চলিত কথায় "চাঁচ" দেওয়া বলে।

পরে তাহার আট দশ দিবস বাদে সেই চাঁচ দিবার স্থানে খুব তীক্ষ্ণধার কর্ত্তরিকা দ্বারা অল্প কাটিয়া তাহাতে একটী কঞ্চির "নলী" অর্থাৎ একটী আট দশ অঙ্গুলী পরিমাণ কঞ্চিকে দ্বিভাগে বিভাগ করিয়া তাহারই একখণ্ড সেই স্থানে বৃক্ষগাত্রে প্রোথিত করিয়া, এবং বৃক্ষের সহিত একটী কলসীকে বন্ধন করিবার জন্য বৃক্ষের কোন কঠিন শাখায় একটী রজ্জু বন্ধন করিয়া দিতে হয়। এদিকে মৃত্তিকার কলসীর গলদেশেও রজ্জু বন্ধন করিতে হয়। পূর্ব্বে এই সকল ঠিক করিয়া পরে সেই কর্ত্তিত কাণ্ডদেশে সেই মৃৎ-কলসীকে বন্ধন করিয়া দিতে হইবে।

যাহারা খেজুর গাছের কাণ্ডদেশ কাটিয়া রস বহির্গত করে, চলিত কথায় তাহাদিগকে "শিউলি" (৩নং চিত্র) নামে অভিহিত করা হয়। খেজুরগুড় উৎপাদনের সময় কৃষকের যদি কিছু কর্ম্মনৈপুণ্য প্রকাশের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই খেজুর গাছের কাণ্ডদেশ কাটিয়া রস বহির্গত করিয়া লইবার সময়। এই কাটা দ্বিখণ্ডিত করা নহে। খেজুর গাছের গলদেশ এরূপভাবে চাঁচিয়া যাইতে হইবে যে যাহাতে সেই সমস্ত বৎসরের কাটার মধ্যেও তাহার "মাজে" অর্থাৎ বৃক্ষ মজ্জায় কোনরূপ আঘাত না লাগে, তাহা হইলে ঐ বৃক্ষ জীবিত থাকিবে না। বৃক্ষকে বাঁচাইয়া রাখিয়া রস বহির্গত করিয়া লইতে হয়। সেইজন্য খেজুর গাছ কাটিবার কার্য্যে পারদর্শী লোকই নিযুক্ত করিতে হয়। এই পারদর্শী লোকের নামই "শিউলি"।

তৎপরে খেজুর গাছ হইতে রস বহির্গত করিয়া লইবার জন্য এক দিবস কাটিলে আট দিবস কাটা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তবে এক দিবস কাটিলে তাহা হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত রস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই রস প্রাপ্তির প্রথম দিবস রস বেশী পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সেই রস অতি সুস্বাদু এবং তাহা হইতে যে গুড় উৎপন্ন হইবে তাহাই উৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় দিবসের রস ঘোলা হইয়া যায়, এবং তাহাতে ঝাঁজ হয় তাহা নাসিকার নিকট আনয়ন করিলে নাসিকা এবং চক্ষে একটা সামান্য জ্বালা অনুভূত হয়। তাহা হইতে যে গুড় উৎপন্ন হয় তাহা তত ভাল নহে এবং তাহা হইতে শর্করা উৎপন্ন হয় না। তবে তাহা গুড়রূপে ভক্ষণ করা যায় এবং সাধারণে তাহা ভক্ষণও করে।

'শিউলি' খেজুর গাছ কাটিতেছে (৩নং চিত্র

কিন্তু তৃতীয় দিবসের রসের গুড় আর খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে না, তাহা তামাক মাখিবার এবং মদ্য প্রস্তুত কিম্বা পশু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই কারণে তাহার মূল্যও কম।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতেই অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের পুষ্প যাহা "মুচি" নামে অভিহিত হয় তাহা ফুটিয়া গেলেই রস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহা সুস্বাদু ও মিষ্টতার ভাগের আধিক্য পূর্ণ হয়। আর তাহা হইতে উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়।

তবে খেজুররস প্রাপ্তির জন্য যে মৃৎকলসীর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সেই কলসীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করিবার আবশ্যক হয়। নূতন কলসীতে প্রথম দিবস রস গ্রহণের পরে সেই কলসীকে উত্তমরূপে জলধৌত করিতে হইবে, তৎপরে তাহাকে রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া তাহার ভিতর দেশ অগ্নিদ্বারা ভালরূপে দগ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে তাহার মধ্যে কোনরূপ রসের গন্ধ না থাকে। এইরূপ না করিলে সেই কলসীতে প্রাপ্ত

রস দুর্গন্ধযুক্ত হইবে এবং সেই রস হইতে উৎপন্ন গুড় মনুষ্যের অখাদ্য হইবে। এইরূপ প্রতিবারই, কলসীতে রস গ্রহণ করিলেই তাহাকে উত্তমরূপে ধৌত এবং দগ্ধ করিতে হইবে।

খেজুর গাছ হইতে নির্য্যাস বহির্গত করিয়া লইবার জন্য দ্বিপ্রহরের পর হইতে সন্ধ্যার মধ্যেই গাছ কাটিয়া তাহাতে মৃৎকলসী বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে, এবং তৎপর দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সেই রসকে খেজুর বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া গুড় করিবার জন্য চুল্লীতে অগ্নিতাপে চড়ান কর্ত্তব্য, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়।

বৃক্ষ অত্যুচ্চ হইলে অনেকে রসপূর্ণ কলসীকে উপর হইতে নিম্নে আনয়নে অসমর্থ বিধায় নলী হইতে একটী সূত্র বৃক্ষের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়, এবং তথায় কলসীকে স্থাপিত করিয়া রাখে তাহাতে বৃক্ষের রস সূত্রবাহিত হইয়া বৃক্ষের তলদেশে অবস্থিত কলসীতে পতিত হয়।

গুড় প্রস্তুত প্রণালী

খেজুররস হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে একটী বৃহৎ চুল্লী প্রস্তুত করিতে হয়। চলিত কথায় সেই চুল্লীকে "বাইন" (৪নং চিত্র) নামে অভিহিত করা হয়।

চুল্লীতে রসের পরিমাণানুযায়ী যতগুলি জ্বাল দিবার পাত্রের আবশ্যক ততগুলি পাত্র বসাইবার মুখ করিতে হয়। ইহা এরূপভাবে প্রস্তুত হয় যে, এক স্থানে অগ্নিদ্বারা জ্বাল দিলে সমস্ত পাত্রস্থিত রস তাপ পাইবে। এই পাত্র বসাইবার স্থানকে 'চোখ' বলা হয়।

আবশ্যকমত এক চোখ বাইন, দুই চোখ বাইন, চারি চোখ বাইন, তাহার পরই সাত চোখ বাইন, তাহার পর নয় তাহার পর এগার চোখ বাইন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় তাহা রসের পরিমাণানুযায়ী; এবং রসকে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য বড় বড় মৃৎপাত্র বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাষায় তাহাদিগকে "জেলোহাঁড়ি" বলা হয়। এইরূপ এক একটী হাঁড়িতে পঞ্চাশ সের হইতে ষাট সের পর্য্যন্ত রস ধরিতে পারে এবং জ্বাল দিতে পারা যায়।

গুড় করিবার জন্য রসকে বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া আনিয়া সেই বাইনের নিকট রক্ষা করিয়া সেই সকল হাঁড়িকে ঐ চুল্লীতে স্থাপিত করিতে হইবে; এবং ীর ঐ মুখ সকল ঠিক হাঁড়ির মাপে প্রস্তুত করিতে হয়, যাহাতে হাঁড়ি বসিলে আর তাহার চতুর্দ্দিকে কোনরূপ ছিদ্র না থাকে। যদি কোনরূপ ছিদ্র থাকে তাহা ছাই, মাটি প্রভৃতি দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হয়। পরে কলসীস্থিত রসকে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া সেই হাঁড়িতে (৫নং চিত্র) দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাতে ঐ রসে পতিত সমস্ত আবর্জ্জনা আর গুড়ের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

রসের দ্বারা পাত্র সকল পূর্ণ হইলে তখন চুল্লীকে প্রজ্জলিত করিয়া দেওয়া হয়। আন্দাজ অর্দ্ধঘণ্টা পরিমিত সময় রস উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণের ফেনা উত্থিত হয়, চলিত কথায় তাহাকে "মলো" বলে। ইহাই হইতেছে রসের মধ্যে মিশ্রিত সমস্ত দূষিত দ্রব্য। এই মলোকে অতি সাবধানে উঠাইয়া ফেলিতে হয়, এবং সতর্ক থাকিতে হয় যাহাতে উহা গুড়ের সহিত মিশ্রিত না হয়।

মলো উঠিয়া গেলে রসকে ইচ্ছামত ফুটিতে দিতে হইবে। তবে সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে রস উতলাইয়া না বাহিরে পতিত হয়। এইরূপ উতলাইতে আরম্ভ করিলে একটী খেজুর ডালের অগ্রভাগ ভগ্ন করিয়া তাহাতে ফেলিয়া রাখিতে হয়।

বাইন (৪নং চিত্র)

চলিত কথায় তাহাকে "ঝাঁপ" বলে। কেহ কেহ প্রত্যহ খেজুর ডাল সংগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া একটী সাঁড়া বৃক্ষের শাখাকে ঐরূপ ঝাঁপ প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং তাহাই রসে ফেলিয়া দেয়, এইরূপ করিলে আর রস উতলাইয়া পাত্রের বহির্দ্দেশে পতিত হইতে পারে না।

রস ফুটিতে ফুটিতে প্রথমে সরিষাফুট হইবে অর্থাৎ সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে ফুটিতে আরম্ভ করে তৎপরে মটর-ফুট অর্থাৎ মটরের ন্যায় বড়, পরে পায়রা-ফুট অর্থাৎ পারাবতের ডাকার শব্দের ন্যায় "বক্ বক্" করিয়া শব্দ হয়। (জয়নগরের পয়ড়াগুড় বলিয়া যাহা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা এই পায়রাফুট গুড়)। পরিশেষে গুড়ে ফুট, অর্থাৎ সেই ফুট আরম্ভ হইলে বুঝিতে হইবে এইবার গুড় প্রস্তুত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে কৃষককে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, যাহাতে পাত্রমধ্যস্থিত ফুটন্ত রসের পার্শ্ব অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া না উঠে। সেইজন্য একটী ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডকে জলসিক্ত করিয়া নিকটে রক্ষা করা আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে সেই সিক্ত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা সেই রস-জাল দিবার পাত্রের ভিতরদেশ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

গুড় প্রস্তুত হইলে সেই হাঁড়িগুলিকে চুল্লী হইতে নামাইয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে হইবে। পরে একটী তাড়ু দ্বারা সেই গুড় হইতে

জেলোহাঁড়িতে রস ঢালিতেছে (৫নং চিত্র)

সামান্য পরিমাণ লইয়া সেই হাঁড়ির গাত্রে ঘসিয়া "বীজ" প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহা সমস্ত গুড়ে মিশ্রিত করিলে গুড় গাঢ় এবং দানাযুক্ত হয়। কেহ কেহ পূর্ব্ব হইতেই "বীজ" প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহারই সামান্য পরিমাণ উত্তপ্ত গুড়ে ফেলিয়া দিয়া গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিলে গুড় দানাযুক্ত হয়।

জ্বালানী

এক্ষণে গুড় জ্বাল দিবার জ্বালানী সম্বন্ধে বলা হউক। খেজুরগুড় প্রস্তুত করিবার যাহা কিছু খরচা যাহা কিছু চিন্তার ব্যাপার তাহা এই জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করা। কিন্তু দেখা যায় প্রথমে খেজুর গাছকে পরিষ্কার করিবার সময় অর্থাৎ ঝুড়িবার সময় যে শাখা পত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে দুই মাসের জ্বালানীর কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন হয় তাহার জন্য কোন চিন্তার আবশ্যক হয় না।

কিন্তু ইতিমধ্যে কৃষককে সম্মুখের তিন মাসের অর্থাৎ পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের জ্বালানীর ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গপল্লী দিন দিন যেরূপ জঙ্গলে আবৃত হইতেছে, তাহাতে যদি ঐ সময় সেই জঙ্গল সকল কাটিয়া লইয়া জ্বালানীতে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে একাধারে দুই কার্য্য সাধিত হইবে, গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া ম্যালেরিয়া দূর হয় এবং সেই সঙ্গে সামান্য কাটিবার খরচামাত্র ব্যয়ে কৃষকের রস জ্বাল দিবার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আজকাল অনেকে এরূপ উপায় অবলম্বনে জ্বালানী সংগ্রহ করিতেছে।

তাহা ছাড়াও এক্ষণে বঙ্গপল্লীর এরূপ স্থান নাই যেখানকার জলাশয় সকল কিম্বা বিল প্রভৃতি কচুরি-পানা দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া গিয়াছে। যদি পূর্ব্ব হইতে এই সকল কচুরিপানাকে জলাশয় হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহা দ্বারাও উত্তমরূপে রস জ্বাল দিবার কার্য্য সম্পন্ন হইবে, ইহা দ্বারাও একাধারে দুই উপকার সাধিত হইবে। রস জ্বাল দিবার কার্য্য হইবে, সেই সঙ্গে দেশের অনিষ্টকারী কচুরিপানাও ধ্বংস হইবে। এইরূপ উপায়েও এক্ষণে বহুস্থানে রস জ্বাল দিবার কার্য্য হইতেছে।

পরিশেষে যদি সামান্য জ্বালানীর অনটন ঘটে তখন পনর কুড়ি টাকার কাষ্ঠ খরিদ করিলে চলিয়া যাইবে। রসকে জ্বালে চড়াইয়া তাহা হইতে গুড় প্রস্তুত হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়।

আয়

এক্ষণে খেজুরগুড় প্রস্তুত করিবার আয়-ব্যয় সম্বন্ধে দেখা যাউক। প্রথমে দেখিতে হইবে এক বিঘা পরিমিত জমিতে কতগুলি খেজুর বৃক্ষ রোপিত হইতে পারে। তৎপরে সেই বৃক্ষ হইতে কত রস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎপরে সেই রস হইতে কত গুড় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

এক বিঘা জমিতে চারিশত হইতে অধিক বৃক্ষ জন্মাইতে পারে; কিন্তু আমরা কম পরিমাণেই তাহাকে ধরিয়া লইব। এক বিঘা জমিতে চারিশত বৃক্ষ ধরিয়া এই হিসাব প্রদান করিব।

তৎপরে রসের পরিমাণ সম্বন্ধে ধরিতে হইলে সব মাসে সম পরিমাণ রস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রসোৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধি শীতাধিক্যের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ যে সময় অত্যধিক শীত হয় রসও সেই সময় অত্যধিক পরিমাণে হয়, এবং অল্প শীতে রসও অল্প হয়। তবে কার্ত্তিক মাসের উৎপন্ন গুড় যেরূপ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, অন্য সময়ের খেজুর গুড় সেরূপ অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না। সেই সময়ের রস হইতে একটী অতি সুবাস নির্গত হয় এবং তাহাকে "নলেন" রস ও নলেন গুড় নামে অভিহিত করা হয়, এবং এই সময়ের গুড় বঙ্গবাসীগণের অতি প্রিয় দ্রব্য।

এক্ষণে রসের পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইলে রস গ্রহণের কলসীর হিসাবেই গ্রহণ করিতে হয়। যে কলসীতে রস গ্রহণ করা হয় তাহার মধ্যে রসের পরিমাণ দশ সের হিসাবেই হয়।

হিসাব

১ বিঘা জমিতে ৪০০ শত খেজুর বৃক্ষ—

১ম দিন কার্ত্তিক মাসে এই ৪০০ শত বৃক্ষ হইতে ১০০ শত কলসী রস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২য় দিন ... • ... ৫০

৩য় দিন ৩০

১০০ কলসী দশ সের হিসাবে ১০০০ হাজার সের, তাহা হইলে এই হাজার সের রসকে মণের পরিমাণে আনয়ন করিলে ২৫ মণ এবং যত রস হইবে তাহার দশমাংশের একাংশ গুড় হইবে। তাহা হইলে এই ২৫/ মণ রসের দশ ভাগের একভাগ ২½ আড়াই মণ গুড়।

কার্ত্তিক মাসের ১ম দিন ১০০ কলসী রস হইতে
২½ মণ ১২৲ হিঃ ৩০৲
২য় দিন ৫০ কলসী রস হইতে
১ মণ ৮৲ হিঃ ৮৲
৩য় দিন ৩০ কলসী রস হইতে
¾ মণ ৪৲ হিঃ ২৲

৪০৲

এই সময় গুড়ের মূল্য অত্যধিক থাকে, এখানে ১২৲ বার টাকা মূল্য ধরা হইল; কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যেও বিক্রয় হয়। তাহার পর দিবসের

গুড় কিঞ্চিৎ কম মূল্য, তাহা ৮৲ আট টাকা মণ হিসাবে ধরা হইল। তৎপর দিবসের গুড় আরও কম মূল্য, তাহা ৪৲ চারি টাকা হিসাবেই ধরা হইল।

তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসে একবার গাছ কাটিয়া যে গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা, তাহা হইলে এই মাসে চারিবার গাছ কাটিলে ৪০ × ৪ = ১৬০৲ টাকার গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাহার পর অগ্রহায়ণ মাসে গাছ ৫ পাঁচবার কাটিতে পারা যায়, তাহা অপেক্ষা বেশী কাটিয়া রস বহির্গত করিয়া লইলে খেজুর বৃক্ষ খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং এ সময় রসও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এ সময় দর ক্রমশঃ কম হইয়া আসে।

১ম দিন ১৫০ কলসী ১০ সের হিঃ
৩½ মণ ৮৲ হিঃ ২৮৲
২য় দিন ৮০ কলসী ১০ সের হিঃ
২ মণ ৫৲ হিঃ ১০৲
৩য় দিন ৪০ কলসী ১০ সের হিঃ
১ মণ ৩৲ হিঃ ৩৲

৪১৲

এক্ষণে এক দিবসের গাছ কাটায় ৪১৲ টাকা হইলে ৫ দিনের কাটায় ৪১ × ৫ = ২০৫৲ টাকা।

তৎপরে পৌষ এবং মাঘ এই দুই মাসে রস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সময় মাসে ৬ ছয় দিন হিসাবে গাছ কাটা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ তাহা অপেক্ষাও দুই এক দিবস বেশী পরিমাণে কাটে, তাহাতে গাছ খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে ৬ দিবসের হিসাব প্রদত্ত হইল।

১ম দিন ২০০ কলসী ১০ সের হিঃ
৫ মণ ৫৲ হিঃ ২৫৲
২য় দিন ১৫০ কলসী ১০ সের হিঃ
৩½ মণ ৪৲ হিঃ ১৪৲
৩য় দিন ৬০ কলসী ১০ সের হিঃ
১½ মণ ৩৲ হিঃ ৪॥০

৪৩॥৴০

তাহা হইলে এক দিবসের মূল্য ৪৩॥০ হইলে, দুই মাসের ১২ দিবসের হিসাব, ৪৩॥০ × ১২ = ৫২২৲

ফাল্গুন মাসের শীতাল্পতার সহিত রসের পরিমাণও কম হইয়া যায়, সেই কারণ তাহা কার্ত্তিক মাসের রস প্রাপ্তির সমান ধরা গেল তবে এ সময়ের গুড়ের মূল্য পৌষ মাঘ মাসের সমান।

ফাল্গুন মাসের ১ম দিন ২½ মণ ৫৲ হিঃ ১২॥০
২য় দিন ১ মণ ৪৲ হিঃ ৪৲
৩য় দিন ½ মণ ৩৲ হিঃ ১॥০

১৮৲

তাহা হইলে ১৮৲ × ৬ = ১০৮৲ টাকা। চৈত্র মাসে তিন পালা অবধি গাছ কাটা যায়, ১৮ × ৩ = ৫৪৲ টাকা।

এক্ষণে দেখা যাউক সমস্ত বৎসরে কত টাকার গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

কার্ত্তিক মাসে	১৬০৲
অগ্রহায়ণ	২০৫৲
পৌষ ও মাঘ	৫২২৲
ফাল্গুন	১০৮৲
চৈত্র	৫৪৲
	১০৪৯৲

ব্যয়

আয়ের হিসাব দেখা গেল এক্ষণে ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হউক। খেজুরগুড় উৎপাদন করাইতে হইলে অন্য কোনরূপ ব্যয়ের আবশ্যক নাই। কেবল

ব্যয়ের মধ্যে একজন শিউলির বেতন এবং তাহার সহায়তাকারী দুইজন মজুর হইলে, জ্বালানী সংগ্রহ হইতে খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইবে। আর যতগুলি খেজুর গাছ তাহার দেড়গুণ মৃৎকলসী এবং রস জ্বাল দিবার জন্য ১০।১২ দশ বার খানি জেলোহাঁড়ির আবশ্যক।

একজন শিউলির বেতন আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র মাস অবধি ২০৲ কুড়ি টাকা হিঃ ৬ মাসের বেতন ১২০৲ টাকা, ২জন মজুর ১৫৲ টাকা হিসাবে ৩০৲ টাকা, ৬ মাসের বেতন ১৮০৲।

তবে ইহার মধ্যে সময় সময় দুই এক পালা খেজুর গাছ কাটা বন্ধ হইতে পারে তাহা আকাশের অবস্থানুসারে; কারণ শীতকালে সময় সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় কিম্বা বৃষ্টিপাত হয়। সেইরূপ হইলে সেই সময় রস হয় না, তাহাতে কিছু লোকসান হইতে পারে সেই লোকসানির মূল্য ১০০৲ এক শত টাকা ধরা গেল এবং তাহা ব্যয়ের মধ্যে গণনীয় হইল। এক্ষণে সমস্ত ব্যয় এক স্থানে যোগ দিয়া দেখা যাউক।

শিউলি	১ জন	১২০৲
মজুর	২ জন	১৮০৲
কাষ্ঠ খরিদ		২০৲
কলসী, দড়ি প্রভৃতি		১৭৲
জমির খাজনা		৩৲
কার্য্য বন্ধের ক্ষতি		১০০৲
	ব্যয়	৪৪০৲

আয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে

আয়	১০৪৯৲
ব্যয়	৪৪০৲
লাভ	৬০৯৲ টাকা।

ইহা লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার ফল এই হিসাব নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি নাই।

তবে ইহা হইতে শর্করা দেশীয় প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে করিলে, কিঞ্চিৎ ব্যয় অধিক হয়। কিন্তু যদি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে একেবারে রস হইতে শর্করা বহির্গত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে খরচা কম পড়িতে পারে এবং তখন আর বৈদেশিক শর্করা প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালী সে কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই, হইতে চেষ্টাও করে নাই, বোধ হয় এখনও পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয় এ প্রণালী অবলম্বন করে নাই বলিয়া। কেবল স্বদেশীযুগের আমলে যশোর জেলায় তারপুর নামক স্থানে একটী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনির কারখানা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মূলধনের অল্পতার এবং পরিচালনার দোষেই তাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করুন পাট এবং খেজুর গুড়ের মধ্যে কোনটি লাভজনক। কিন্তু এই স্থলে একটু বক্তব্য আছে, খেজুরগুড়ের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে খেজুর গাছের চারা বড় হইয়া রস-প্রদানোপযুক্ত করিয়া লইবার জন্য ভূমিকে অন্ততঃ চারি বৎসর ফেলিয়া রাখিতে হয়। সাধারণ কৃষক কিন্তু এই ভূমিকে ফেলিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হয় না।

এক্ষণে বঙ্গদেশে উৎপন্ন ইক্ষু সম্বন্ধে বলা হউক। উহার লাভালাভও দেখা যাউক।

এক বিঘা ভূমিতে ইক্ষু চাষ করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে তাহাকে ৮ বার লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করা আবশ্যক।

৮ বার লাঙ্গল	১।০ হিঃ	১০৲
৬ কাহন বীজ	৩৲ হিঃ	১৮৲
বীজ রোপণ খরচা ৮ জন মজুর	॥০ হিঃ	৪৲

ক্ষেত্রে বেড়া দেওয়া খরচা বাঁশ, পাটকাটী, মজুর প্রভৃতি	১০৲
বৃষ্টি হইলে ভূমিকে পুনরায় কোপাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই কোপান অন্ততঃপক্ষে চারিবার হওয়া কর্ত্তব্য—ব্যয়	৬৲
আষাঢ় মাস হইলে গাছগুলিকে পরিষ্কার ও তাহার পত্র সকলকে জড়াইয়া দিতে হয়, তাহার ব্যয়	৯৲
সারের জন্য খইল বিঘা প্রতি ৬ মণ ৩৲ হিঃ	১৮৲
এবং ঐ খইল দিবার মজুরী ব্যয়	২৲
পুনরায় দুইবার জড়ান আবশ্যক, প্রত্যেকবার ৬টা লোক হিঃ ১২টা ॥০ হিঃ	৬৲
ক্ষেত্র জলসেচন ১২ টা লোক ॥০ „	৬৲
পরিশেষে ইক্ষু গাছকে মলিয়া রস বহির্গত করিয়া গুড় প্রস্তুত ব্যয় পাঁচ দিবস প্রত্যহ ১০৲ হিঃ	৫০৲
	১৩৯৲ খরচা

ইহাতে গুড় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে চল্লিশ ৪০৴মণ। ৫৲ মণ হিসাবে ধরিলে ২০০৲ টাকা।

আয় ২০০৲

ব্যয় ১৩৯৲

লাভ ৬১৲

বাঙ্গালার তিনটী ফসলের যথাযথ আয় ব্যয় প্রদান করা গেল। এক্ষণে ইহার বিচারভার সাধারণের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা ছাড়াও বাঙ্গালার আর একটী বৃক্ষ হইতে রস প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহা হইতে গুড় উৎপন্ন হয় তাহা তালের গুড় সে সম্বন্ধে পরে বলিব।

[জনৈক পল্লীবাসী]

অভাব দূরীকরণের উপায়

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত]

আজ যে সকল অভাবের তাড়নায় আমরা জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাদের জন্য আংশিক-ভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে আমরাই দায়ী। বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। সুশিক্ষা এবং শিল্পের প্রচলন দ্বারা আমাদের, এমন কি, এ ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বমানবের অভাব দূরীভূত হইতে পারে, পরন্তু বিশ্বব্যাপী বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, নগরে নগরে স্কুল, কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি ছাত্রগণ সুশিক্ষিত হইতেছে না। দেশের স্কুল কলেজগুলিতে নীতিশিক্ষা এবং শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাভাবই ইহার মূল কারণ। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বুদ্ধিবৃত্তির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থিগণ ভগবানে অনাস্থা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বৈগুণ্য লাভ করিয়া থাকে। চরিত্র মানবজীবনের অলঙ্কারস্বরূপ। ইহা গঠন করিবার পক্ষেও কোন সাহায্য পায় না। বহু ব্যয়সাধ্য এই শিক্ষা দ্বারা যুবকগণ এমন কি, নিজ নিজ পরিবারবর্গেরও গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারিতেছে না, এবং সকল সুখের আকর—স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বুঝিতেছে যে মরীচিকার মত ভ্রমোৎপাদক এই শিক্ষালাভের জন্য তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ ব্যয়িত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আধুনিক শিক্ষার পরিবর্ত্তে সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা প্রত্যেক দেশসেবকের অন্যতম কর্ত্তব্য।

শিল্পের দ্বারা অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জাপান ও জার্ম্মানী। আমরা পরাধীন। পরাধীন জাতির পক্ষে লুপ্তপ্রায় গৃহ-শিল্পের পুনরোদ্ধার দ্বারাই আর্থিক অভাব দূরীভূত হইবে এবং স্বাধীনভাব জাগিয়া উঠিবে; কারণ, অল্প মূলধন দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের অন্য উপায় নাই বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। নিম্নে বর্ণিত বাস্তব গল্পের আভাস হইতে এই মতের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

সুদূর পল্লীবাসী এক বৃদ্ধ অন্ধ ব্রাহ্মণ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া প্রতিবেশীগণের সহায়তা প্রার্থী হন। উপায়হীন এই অন্ধের মনোবাসনা পূরণার্থ লেখক তাঁহাকে "কাশ্যা" নামক ঘাসের আসন তৈয়ার করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, ফলে ন্যূনাধিক দশ টাকা মাত্র মূলধনে গত ৭ বৎসর যাবৎ উক্ত অন্ধ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে নিজের ভরণপোষণ করিতেছেন। চক্ষুষ্মান নরনারীগণের মোহান্ধকার কি ইহাতেও ঘুচিবে না?

পরবর্ত্তী সংখ্যায় এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ আলোচিত হইবে।

গ্রীক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ত্ব

[শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন]

প্রাচীন ফিনিসীয় এবং পারসীকদের সময় হইতেই ভারতবর্ষের সহিত ঐ সকল দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। সেই সূত্রে উহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়; কিন্তু ভৌগলিক হিসাবে তাহার বিশেষ মূল্য নাই। সুতরাং প্রাচীন জগতে বিদেশীয়দিগের নিকট ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত কতটা জানা ছিল সে বিষয়ে পরিচয় পাইতে হইলে প্রাচীন গ্রীসদেশে অনুসন্ধান করিতে হয়।

যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় প্রাচীনকালে সকল জাতির মধ্যেই এইরূপ ধারণা ছিল যে, পৃথিবী সাগর পরিবেষ্টিত এক গোলাকার ক্ষেত্র এবং সকলের মতেই নিজ নিজ দেশ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীকদেরও পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাচীনতম ধারণা এইরূপই ছিল। হোমারের সমসাময়িক যুগে তাঁহারা গ্রীসদেশ,—গ্রীসের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ, এসিয়া মাইনর, মিশর, সিসিলী এবং ইতালীর অংশবিশেষ ছাড়া বিশেষ কিছুই জানিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের কথা যে তাঁহারা একেবারেই জানিতেন না এমন বলা চলে না; কারণ তাঁহাদের মধ্যে যে ভারতবর্ষজাত চিনি এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত দ্রব্যসমূহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহার সাক্ষ্য হোমারের নিকটই পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যে অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রীকদের ভূবৃত্তান্তে জ্ঞানবৃদ্ধির সূচনা হয়, তাঁহাদের দেশে দেশে উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় এবং ইহার বিশেষ প্রসার লাভ হয় মানচিত্রের প্রচলনে *। এই সময় 'থেইল্‌স্' (খৃঃ পূঃ ৬০০) এবং তাঁহার এক শিষ্য 'এনেক্সিমেন্দার' কর্ত্তৃক দ্রাঘিমা নির্ণয় করিবার এক যন্ত্র আবিষ্কারে প্রভূত পরিমাণে ভূগোলবিদ্যার কল্যাণ সাধিত হয়।

'হেকাটায়স' (খৃঃ পূঃ ৫৪৯—৪৮৬) ছিলেন গ্রীকদের সর্ব্বপ্রধান ভৌগলিক। তিনি মাত্র দুইটি মহাদেশের কথা জানিতেন—ইউরোপ এবং এসিয়া; আফ্রিকা মহাদেশের কতকাংশ তাঁহার এই "এসিয়া" সংজ্ঞার অন্তর্গত ছিল। তাঁহার কৃত 'সার্ভে অব্ দি ওয়াল্ড্' নামক ভূবৃত্তান্তের এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে সিন্ধু নদীর উল্লেখ আছে এবং ভারতবর্ষে যে বালুকাময় মরুভূমি আছে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়; ভারতীয় কয়েকটি জাতি এবং কয়েকটি নগরের নামেরও উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু সেগুলি এখন বিশেষজ্ঞদের অনুধাবনযোগ্য।

* কীন সাহেবের গ্রন্থে জানা যায় যে গ্রীসের বহু পূর্ব্বে মিশর এবং ব্যবিলন দেশে মানচিত্র অঙ্কন প্রচলিত ছিল। The Evolution of Geography by J. Keane, London, 1899.

'হেরোডোটাস্' (৪৫০ খৃঃ পূঃ) প্রধানতঃ ইতিহাসের জনয়িতা বলিয়াই খ্যাত, কিন্তু তিনি একজন পর্য্যটকও ছিলেন। স্কিথিয়া হইতে এবিসিনিয়া এবং ভারতবর্ষ হইতে "পিলার্স অব্ হারকিউলিস্" (জিব্রাল্‌টার) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সম্বন্ধে তাঁহার কতকটা জ্ঞান ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল সামান্য এবং অস্পষ্ট। তিনি জানিতেন যে ভারতবর্ষ পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত দূরতম প্রদেশসমূহের মধ্যে একটি প্রদেশমাত্র, কিন্তু ইহার প্রকৃত অবস্থান বা আয়তন সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। হেরোডোটাসের বিবরণে স্কাইলেক্সের জলযাত্রায় ভারতবর্ষ পর্য্যটনের কাহিনী পাওয়া যায় বটে এবং হেকাটায়সের বিবরণের ন্যায় তাঁহার গ্রন্থেও সিন্ধু নদী, বালুকাময় মরুভূমি এবং কয়েকটা প্রাচীন জাতি ও স্থানের নাম ইত্যাদি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় তথ্য হেকাটায়সের অপেক্ষা বেশীও পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত বিষয়ে ইহাতে বিশেষ আলোকপাত করে না। পৃথিবী একটা সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত—এ পর্য্যন্ত সেইরূপ ধারণাই চলিয়া আসিতেছিল। হেরোডোটাস্ এই ধারণা অস্বীকার করিলেন, কিন্তু নিজে কোন প্রকার নূতন মত ব্যক্ত করিলেন না।

'টেসিয়াস্' (৪০১ খৃঃ পূঃ) পারস্যসম্রাটের চিকিৎসকরূপে কয়েক বৎসর পারস্যদেশে বাস করিয়াছিলেন। সেই অবসরে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীক ভাষায় তিনিই সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।—হেরোডোটাসের বিবরণে আছে যে, পারস্যসম্রাট ডেরিয়াস্ তাঁহার ভারত অভিযানের পূর্ব্বে স্কাইলেক্স্ নামক এক ব্যক্তিকে সিন্ধুনদ পর্য্যবেক্ষণ অভিযানে প্রেরণ করেন। স্কাইলেক্স্ সিন্ধুনদে অগ্রসর হইয়া মোহনা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া সেখান হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া লোহিত সাগর অভিমুখে ফিরিয়া যান—এই অভিযানে তাঁহার ৩০ মাস সময় লাগিয়াছিল। এই বিবরণ যখন হেরোডোটাসের গ্রন্থেও আছে তখন ইহা অবশ্যই টেসিয়াসের বিবরণ অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু ইউরোপ, এসিয়া এবং আফ্রিকার কতকগুলি দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত যে ক্ষুদ্র গ্রন্থ স্কাইলেক্সের নামে পরিচিত রহিয়া বর্ত্তমানেও প্রচলিত আছে তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে অনুমিত হইয়াছে যে এই গ্রন্থ সেকেন্দর সাহের পিতা ম্যাসিডনের রাজা ফীলিপের রাজত্বের পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিতে পারে না,—কিন্তু এই বিবরণ এত প্রকার অভিনব তথ্যে পূর্ণ যে ভূগোলবৃত্তান্ত হিসাবে ইহার উপর নির্ভর করা যায় না।

সেকেন্দর সাহের অভিযান

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় গ্রীকবীর স্বনামধন্য সেকেন্দর সাহের ভারত অভিযানে। সেকেন্দর সাহ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করাইলেন। তাঁহার সহিত যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানে কৃতী পুরুষ অভিযানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বিবরণই অমূল্য সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত; কিন্তু এখন সেগুলির আর অস্তিত্ব নাই, তবে এই সকল বিবরণ হইতে পরবর্ত্তী কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক অনেক তথ্য লাভ করিয়াছিলেন, যেমন—ডিডেরাস্ (খৃঃ পূঃ ১০০—১০০ খৃঃ), প্লুটার্ক, ষ্ট্র্যাবো (খৃঃ পূঃ ৬০—খৃষ্টাব্দ ১৯), কুর্টিয়াস্ (১০০ খৃষ্টাব্দ), এরিয়ান্ (২০০ খৃষ্টাব্দ) এবং জাষ্টিনিয়াস্ (৫০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী নন)। ইহাদের মধ্যে এরিয়ান্ সেকেন্দর সাহের ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। এই সকল লেখকদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কাহারও সামান্যমাত্রও প্রত্যক্ষ জ্ঞান না

থাকাতে ইঁহাদের বিবরণ ইতিহাস হিসাবে যতই অমূল্য সম্পদ্ হউক ভূবৃত্তান্ত হিসাবে ইহাদের মূল্য অনেকটা হ্রাস পাইতে বাধ্য।

মেগাস্থেনীস্

সেকেন্দর সাহের পরেই মেগাস্থেনীসের বিবরণ (৩০৫ খৃঃ পূঃ)। মেগাস্থেনীস্ অনেককাল ভারতবর্ষে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে বসবাস করিয়া (৩০৬—২৯৮ খৃঃ পূঃ) তাহার বিবরণ লিখিয়াছিলেন, এই হিসাবেও তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তার উপরে তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নিজ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা হইতে ভারতবর্ষের মৃত্তিকা, স্বাস্থ্য, উদ্ভিদ্, প্রাণী, মানবসমাজ, তাহাদের রাজ্যশাসন নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ই অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার এই বিবরণ শুধু গ্রীস দেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলন বিষয়েও এক অমূল্য রত্ন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মেগাস্থেনীসের মূল বিবরণের এখন আর অস্তিত্ব নাই। তবে তাঁহার বিবরণ বিবিধ প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় লেখকদের গ্রন্থে এত বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত এবং উল্লিখিত হইয়াছে যে, সেই সকল গ্রন্থ হইতেই মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ কতক পরিমাণে পুনঃ সংগৃহীত হইয়াছে। ডক্টর স্কোয়ানবেক্ এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণ সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, গ্রীক সাহিত্য এবং গ্রীক ও রোমীয় জ্ঞান জগতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীনদের জ্ঞানের পরিচয় যতটুকু পাওয়া যায় তাহার মধ্যে মেগাস্থেনীসের বিবরণই সর্ব্বোচ্চ সম্পদ্—

"Notwithstanding the work of Magasthenes in so far as it is a part of Greek literature and of Greek and Roman learning is, as it were, the culmination of the knowledge which the ancient ever acquired of India".

তবে মেগাস্থেনীসের বিবরণের মূল্য ইতিহাস হিসাবে যত অধিক, ভূগোল হিসাবে ততটা নয়—অন্ততঃ বর্ত্তমানে যতটা পাওয়া যায়, তাহাতেও ভূগোলতত্ত্ব বড় সামান্য নয়।

(ক্রমশঃ)

চিত্রে বাংলা দেশ

পল্লী

মাঠ

সহরবাসী অথবা প্রবাসী এমন কোন বাঙ্গালীই নাই যিনি বাংলার পল্লীতে গিয়া ইহার প্রাণমাতান মাধুর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন। বাংলার পল্লীশ্রী আজ ২৫.৩০ বৎসরের মধ্যেই যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের ন্যায় যুবকগণেরও মনে অনেক প্রকার হর্ষ সে পথের ছাপ আঁকিয়া দেয়। ইহার চিত্র সকল আমরা ধারাবাহিকভাবে 'পথে'র পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিব, যাহাতে সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও বাংলামায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির ও সুখ দুঃখের সকল বিষয়ই তাঁহারা অবগত হইতে পারেন।

বাংলার পল্লী আজ বাংলার চাষারাই রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট দেহে, জমিদার কর্ত্তৃক হতাদৃত (কারণ আজকাল জমিদারেরা থাকেন সহরে ও এই চাষাদের দত্ত টাকা আর দেশে খরচ না করিয়া জলের ন্যায় বিলাতী পণ্যে বিদেশে পাঠাইতেছেন) এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ (?) কর্ত্তৃক উপেক্ষিত সহস্র অসুবিধা ভোগ করিয়াও ইহারাই এক্ষণে জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত ইহাদের নাড়ীর যোগ পুনঃস্থাপিত হইলেই দেশের মঙ্গল।

আমবাগান

বাংলার আমবাগান বাংলা দেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চিত্র। আমের সময় বাংলার শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্তও ইহার রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করে। বাস্তবিকই এই আম খাওয়া লইয়াই অনেকে তাহাদের জীবনের বর্ষ গণনা করে। এসম্বন্ধে বাঙ্গালীকে আর বিশেষ করিয়া কিছুই জানাইতে হইবে না। আমরা আশা করি, প্রবাসী বাঙ্গালীগণ স্ব স্ব স্থানে প্রচুর পরিমাণে আম্র ভক্ষণ করিয়া স্বদেশের কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। তবে দুঃখের বিষয় এ বৎসর বাংলা দেশে সেরূপ প্রচুর আম জন্মায় নাই।

বিশ্রামরত পল্লীবাসীগণ

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন ত্রিপুরারাজ স্থাপত্যবিশারদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে

সেখানকার একটী স্মৃতি-মন্দির পরিকল্পনা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ত্রিপুরার আধুনিক প্রাসাদসমূহ বিলাতী ধরণে প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় স্থাপত্যসমুদ্রে যে নূতন ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছেন তাহার ঢেউ সর্ব্বস্থানের ন্যায় ত্রিপুরা-রাজের হৃদয় স্পর্শ করে। ত্রিপুরার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাগণের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে তাহা ত্রিপুরার স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিয়া শ্রীশবাবু ত্রিপুরার পুরাতন রাজধানী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের কীর্ত্তির কেন্দ্রস্থান উদয়পুর নামক স্থানটী দর্শন করিবার প্রস্তাব করেন ও স্থির হয় যে, তথাকার স্থাপত্য-শিল্পের ভাব লইয়া নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে এজন্য ত্রিপুরারাজ শ্রীশবাবুর সহিত হস্তী ও সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করিয়া ত্রিশ ক্রোশব্যাপী পর্ব্বত ও শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার গমনাগমনের ব্যবস্থা করেন। এই যাত্রাপথের বিবরণ শ্রীশবাবুর স্বহস্ত লিখিত বর্ণনা পাঠে "পথের" পাঠকপাঠিকা যেরূপ আনন্দ পাইবেন তাহা অন্যথা সম্ভব নয়। শ্রীশবাবুর ভাব যেরূপ গভীর, তাঁহার প্রকাশ করিবার ভাষাও সেইরূপ সুন্দর। তাঁহার এই রোমাঞ্চকর

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির---উদয়পুর

ও আনন্দদায়ক পর্য্যটন বিবরণ চিত্রসহ "পথের" পাঠকপাঠিকার জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশবাবুর পরিকল্পিত স্মৃতি-মন্দিরের চিত্র দেখান উদয়পুরে হইয়াছে।

উদয়পুরের জঙ্গলে জীর্ণমন্দির

যে সকল মন্দির, প্রাসাদ ও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহার চিত্রও প্রদত্ত হইল।

"ত্রিশ ক্রোশ পর্ব্বত ও অরণ্য অতিক্রম করিতে সর্ব্বশেষে তিন দিন আমাদের যাইতে লাগিয়াছিল। ক্রমির

রিয়াং পল্লী

যৌবন বনানীর শ্যামল শোভা যেরূপ মনোরম হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পর্য্যটনও তদ্রূপ ভয়াবহ। দিবাভাগে নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যাঘ্র সেই প্রদেশে বিচরণ করে। অরণ্যচারী হস্তীযূথের অত্যাচারে উপত্যকার অনেকগুলি ধান্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়াছে দেখিলাম, অথচ ক্ষেত্রগুলির পার্শ্বদেশে হস্তী বিতাড়িত করিবার সুউচ্চ বৃক্ষশিরে টং ঘর অবস্থিত। ব্যাঘ্র ধরিবার জন্য বহুসংখ্যক পিঞ্জরও পরিদৃষ্ট হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা গ্রামে আশ্রয় লইলাম।

উদয়পুরের শোভা

গোমতী নদীর তীরে বহুসংখ্যক জলাশয় শোভিত উদয়পুরের শোভা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। চিন্তাই রঘুপতির ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির, গোবিন্দ-মাণিক্যের প্রাসাদ ও জগন্নাথমন্দির, তদীয় গুণ-বতীর প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির, ছত্রমাণিক্য নক্ষত্র-রায়ের প্রাসাদ প্রভৃতি পরীক্ষা করিলাম। প্রাসাদ ও বিষ্ণুমন্দির জঙ্গলে আবৃত। চারিশত বৎসরের প্রাচীন গাঁথনি সংস্কারের অভাবে জীর্ণ, ভূমিকম্পই এহেন শোচনীয় পরিণামের প্রধানতম কারণ।
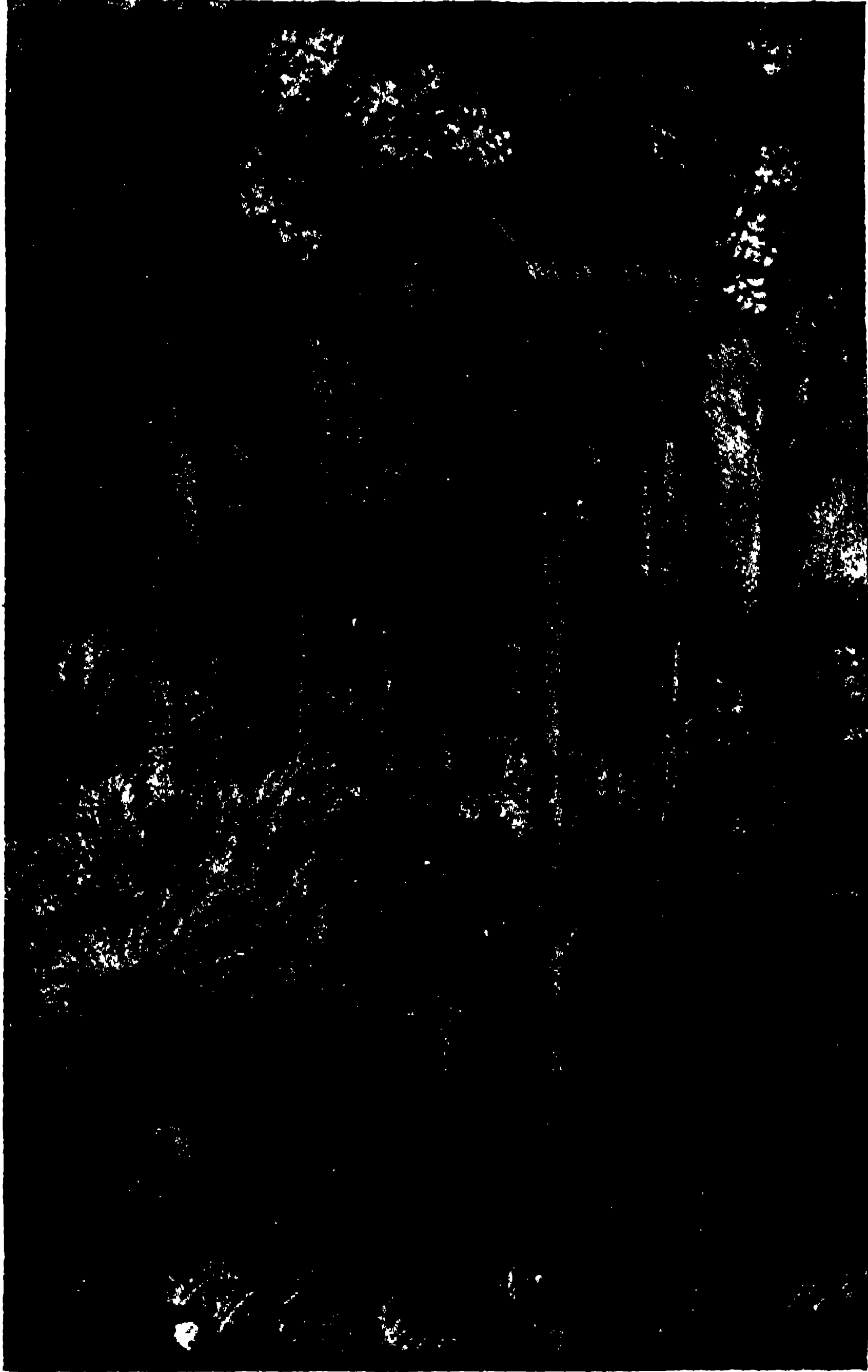
বৃক্ষশিরে টং ঘর

রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" ও "রাজর্ষি" গোবিন্দমাণিক্যের কীর্ত্তিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। নদীপথে ফিরিবার কালে কুমিল্লার "সতর রতন" মন্দির দেখিয়াছিলাম। ইহা বাংলা আদর্শে নির্ম্মিত জটিল স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, কিন্তু স্থান বিশেষে পড়িয়া গিয়াছে। ঐরূপ সুন্দর মন্দির বাংলা দেশে বিরল। দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনও স্থাপত্য-গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রিয়াং পল্লী

উদয়পুর হইতে পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত রিয়াং কন্যার শ্রাদ্ধের উৎসব ছিল। আরণ্য প্রকৃতির পল্লীতে গিয়াছিলাম। সেই দিন সেখানে এক উদ্দাম নৃত্যগীত আমার স্মৃতিপটে অহরহঃ দৃশ্যমান
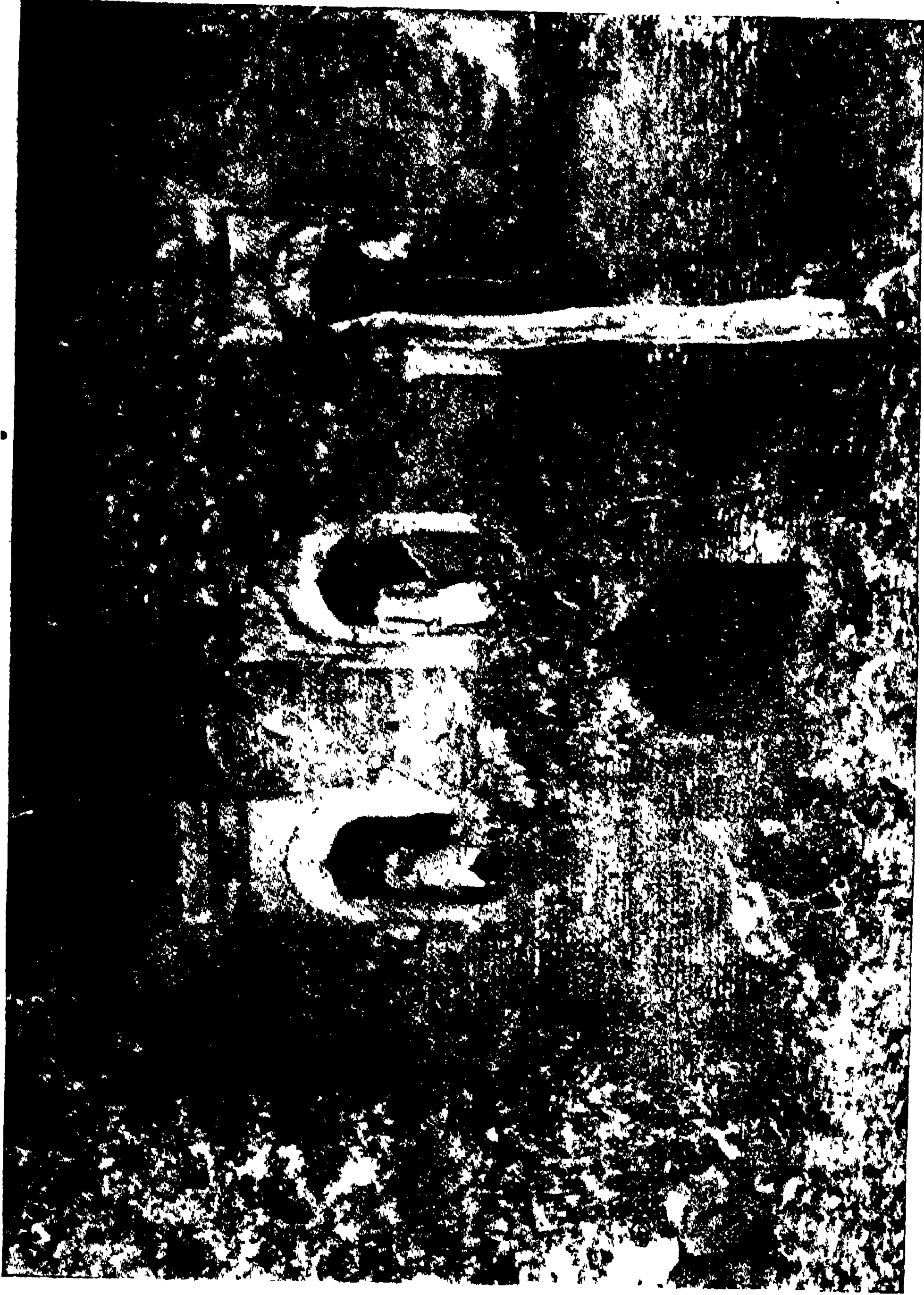
জীর্ণমদি উদয়পুর

রহিয়াছে—উত্তর হিমালয়ে কেদার বদরী যাত্রাপথে সুরধুনী, মন্দাকিনী ও অলকনন্দার অশ্রান্ত কল্লোল যেন আমার কর্ণকুহর অমৃতময় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই এক সুর! সেই গান, সেই হাসি, সেই নৃত্য থামিবার নহে। উত্তর ব্রহ্মে, শ্যামরাজ্যে, ব্রহ্ম-চীন সীমান্তে, চীন গণ্ডগ্রামে, দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্ব্বতে, আরাবল্লীর ভীল জনপদে সর্ব্বত্রই প্রকৃতির প্রিয় সন্তানদের সেই অনাবিল আনন্দের ধারা;

সর্ব্বত্র অরণ্যে ও কুটীরে, আলোকে ও ছায়াতে লুকোচুরি খেলা! কত আনন্দ, কত স্বাস্থ্য, কত সম্পদ্ সেই অসভ্য সন্তানদের।

একমাত্র শয়নকক্ষে সমগ্র পরিবারের শয়ন, রন্ধন ও ভোজন করিবার, ধান রাখিবার, তুলা পাকাইবার, চরকা চালাইবার ব্যবস্থা। নীচে থাকে

জগন্নাথের দোল

পল্লী কুটীর

সকলেরই বাসস্থানের, গ্রাসাচ্ছাদনের, ক্রিয়া-কর্ম্মের ও উৎসব অনুষ্ঠানের রীতিনীতি একরূপই। বনস্পতিছায়ে মঞ্চের আকৃতি কুটীর। কুটীরের

শূকর, ভেড়া। ত্রিতল মন্দিরের আকৃতি কাষ্ঠমঞ্চের খোপে খোপে হংস, মোরগ ও পারাবতের বাসা, সম্মুখের দাওয়ার দ্বারশীর্ষে লালুসা বা লক্ষ্মীদেবীর

ফুল গোঁজা ; বংশের ঝাড়ে টিয়া বসিয়া ; তাহার নিম্নে দোলায় শুইয়া ঘুমন্ত খোকা। বাসভবনের পার্শ্বেই ক্ষুদ্র উত্থান বেড়ায় ঘেরা,—ফুল ও ফল বৃক্ষ—হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল। মানব, পশুপক্ষী ও ফলফুলের সহিত আরণ্য প্রকৃতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রত্যুষে পাখীর গানের সঙ্গে সঙ্গে মানব জাগ্রত হয়—প্রদোষে

পাখীর কলরবের সঙ্গে সঙ্গে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করে—বাহিরের জগতের সন্ধান রাখে না, সভ্য মানবের ওজনকরা ও স্বার্থদুষ্ট কৃপার উপরে তাহারা নির্ভর করে না। গ্রাসাচ্ছাদনের সকল ব্যবস্থাই তাহারা নিজেরা করে। রিয়াংদের কৃত লতা, পুষ্প ও পশুপক্ষী বিচিত্রিত রঞ্জিত বস্ত্র দেখিলে বিস্মিত না

MANIKYA MEMORIAL
AGARTALA.
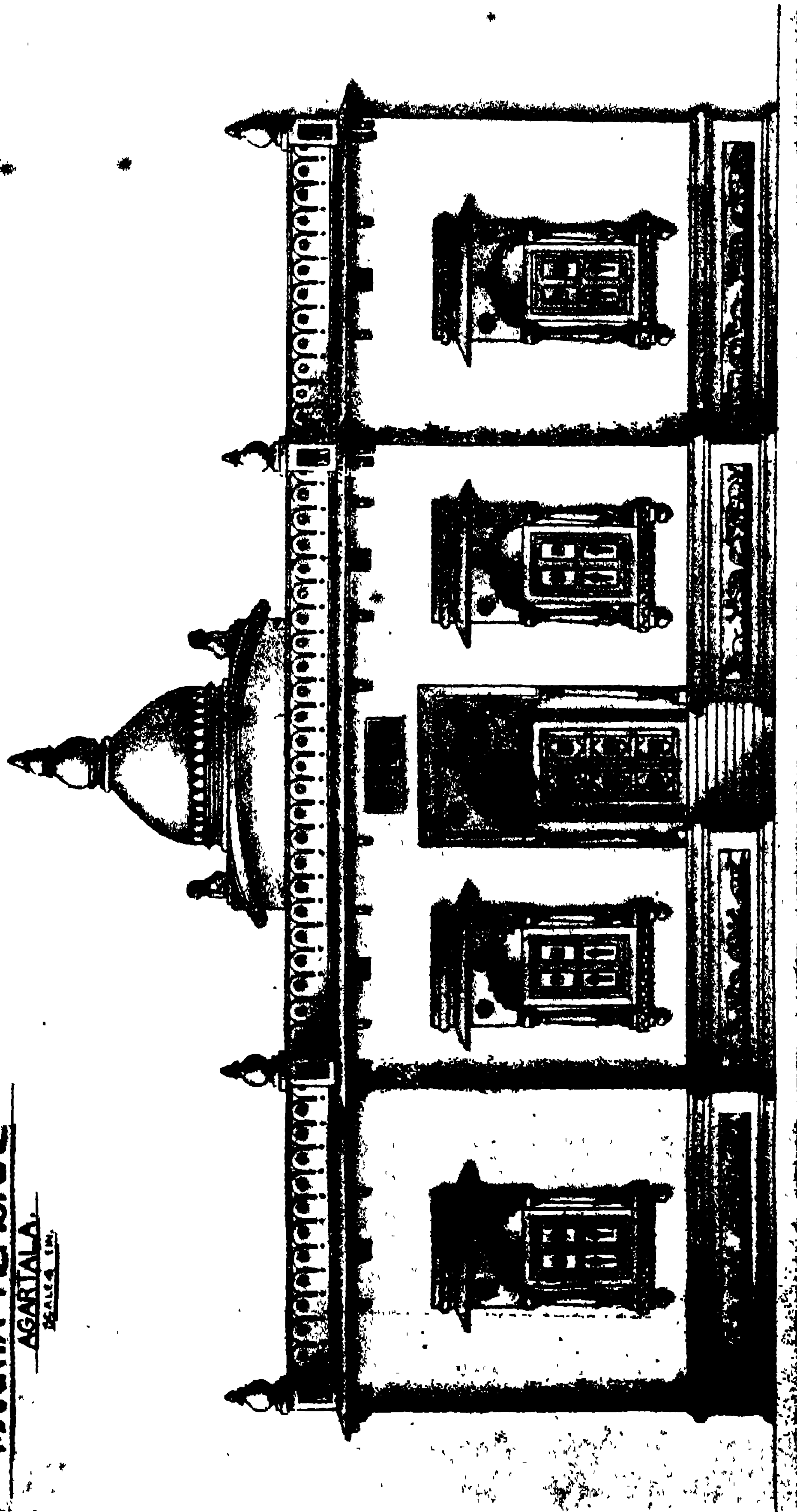
মাণিক্য স্মৃতি-মন্দির · গরতলা

হইয়া থাকা যায় না। গাছের গুঁড়িতে ধাপ কাটিয়া ঘরে উঠিবার সিঁড়ি করিয়াছে। বাঁশের চিরিয়া কুটীরের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে; মৃত্তিকার বাসন। ·অভাব তাহাদের নাই। স্বভাব সরল ও স্বাস্থ্য অটুট।

জগন্নাথের মন্দির

ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত। পূর্ব্বকালে মন্দিরটী অতি রমণীয় ছিল; বর্ত্তমানকালেও তাহা সহজে বুঝা যায়। অনেকে এই মন্দিরকে জগন্নাথের দোল বলে।

মন্দিরের সম্মুখভাগে নাটমন্দির এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ছিল; অদ্যাবধি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

এই মন্দির মহারাজ* গোবিন্দমাণিক্য এবং তদীয় ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গোবিন্দমাণিক্যের কীর্ত্তি কণিকা লইয়া "রাজর্ষি" উপন্যাস ও 'বিসর্জ্জন' নাটক রচিত হইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্যের অসংখ্য কীর্ত্তির মধ্যে আলোচ্য মন্দির একটী।"

অনন্ত যৌবন

[শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী]

সকল দেশেই সাধারণ মানবের মনে জীবনের সর্ব্বস্তরেই যুবকত্ব স্পৃহা খুবই বলবতী। শিশু যখন হাঁটিতে ও কথা বলিতে শিখিল তখন তাহার মনে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পিতার ন্যায় বড় হইয়া সেইরূপভাবে সকল কার্য্য সমাধা করিবার স্পৃহা বলবতী হইতে থাকে। তারপর শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার যৌবন স্পৃহাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই প্রবল ও দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তিই তাহাদের দ্রুত বৃদ্ধির কারণ। সেই জন্য যে বালককে ১০ বৎসর বয়সে দেখিয়াছি তাহাকে ১৬ বৎসরে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না; 'কিন্তু যাহাকে ২৫ বৎসর বয়সে দেখিয়াছি তাহাকে ৪০ বৎসর বয়সেও চিনিতে পারা বিশেষ কষ্টকর হয় না। কৈশোরের পর একদিন অভাবনীয় অপ্রত্যাশিতভাবে ও আপনার অজ্ঞাতসারে সেই যৌবন-জোয়ার মানবজীবনে আসিয়া জীবন নদীকে প্লাবিত করিয়া দেয়। যাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সংযম থাকে তাঁহারাই এই জোয়ারের শক্তিকে হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিয়া তদ্দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন ও জগতের সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়ায় সহায়তা করেন। কিন্তু যাঁহাদের সেরূপ শিক্ষা হয় নাই যাঁহারা ইহার আগমনের সকল তথ্য অবগত নহেন তাঁহাদের অনেকেই এই যৌবনস্রোতে ভাসিয়া যান। কাহারও বা জীবনতরী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে ডুবিয়া যায়; কেহ বা নদীর স্রোতচালিত তৃণখণ্ডের ন্যায় তীর হইতে তীরান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পর যখন তাঁহাদিগকে এই যৌবনের সীমা

অতিক্রম করিতে হয় তখন তাঁহারা যে দৃশ্যের অবতারণা করেন সাধারণ ক্ষেত্রে তাহা অতি করুণ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকল প্রকার ভোগ হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয়। জীর্ণ শরীরকে যৌবনের তেজ ও সঞ্জীবতা দানের জন্য তাঁহাদের সে কি প্রাণান্তকর প্রয়াস। সাধারণ মনুষ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকেও পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার বার্দ্ধক্য বা আনুসঙ্গিক দৈহিক বা মানসিক লক্ষণসমূহের কথা উল্লেখ করিলে তাঁহাকে বিশেষ বিমর্ষ, এমন কি, ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায়। তাহা হইলে বাস্তবিকই কি জগতের এই যৌবন কালই একমাত্র সত্য, আর ভগবান কি মানবজীবনের যত সুখ যত আনন্দ এই কয়েক বৎসরের জন্যই সঞ্চিত করিয়া রাখেন

তাহা নহে। বিশেষ লক্ষ্য করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য শরীরের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা প্রকৃত-পক্ষে অন্তরের ও মনের ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানব যদি প্রকৃত সহজ ও সরল জীবনযাপন করে, তাহা হইলে এই যৌবন জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সহচর হইয়া তাহাকে সকল সুখের অধিকারী করে ও তাহার সকল দুঃখ মোচন করে।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য প্রত্যেকটী সকল মানবের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। একটীর প্রকৃত ও পূর্ণ স্ফুরণ হইলে অপরটী সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হইবে। একের প্রকাশে অপরটি নষ্ট হইয়া যায় না। অবশ্য যদি আমরা স্বহস্তে তাহাকে নিষ্পেষিত ও নিগ্রহ না করি। সেই জন্য সেই শিশু, সেই কিশোর, সেই যুবক, সেই প্রৌঢ় ও সেই বৃদ্ধই প্রকৃত পূর্ণত্ব লাভ করে, যাহার ভিতর এই পঞ্চপুষ্পের পূর্ণবিকাশ হইয়া প্রত্যেকটী তাহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও সঞ্জীবতা রক্ষা করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থান করে। সেই পূর্ণ মানবের মধ্যে জীবনের সকল বয়সেই ও সকল সময়েই শিশুর সারল্য, কিশোরের স্বপ্নময় দূরদৃষ্টি, যুবকের উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মপ্রেরণা, প্রৌঢ়ের জ্ঞান ও বৃদ্ধের নিশ্চিন্ততা বর্ত্তমান থাকে।

যদি ইহাই জীবনের নিগূঢ় ও প্রকৃত তথ্য হয়, তাহা হইলে জগতে এ অশান্তি ও নিরানন্দের নিত্য লীলা কেন? তাহার কারণও যথেষ্ট আছে। জীবনের দশ বৎসর শৈশবের রাজত্ব অবাধগতিতে চলিল। যথাসময়ে কৈশোর আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। শৈশব স্বেচ্ছায় জীবনের রশ্মি ছাড়িয়া দেওয়াতে কৈশোর নিজস্থান অধিকার করিল, কিন্তু গর্ব্বিত কৈশোর জীবন সিংহাসন অধিকার করিয়া শৈশবকে অবজ্ঞা করিল। যে শিশু সমুদ্রে ডুবে নাই, হস্তিপদতলে নিষ্পেষিত হয় নাই, অগ্নিতে পুড়ে নাই, পর্ব্বত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া মরে নাই, সে আজ অনাদর অবহেলা সহ্য করিতে না পারিয়া জাগ্রত কৈশোরের ও সুপ্ত যৌবনের অজ্ঞাতসারে শুকাইয়া গেল। জীবন নাটকে দুঃখের লীলার ইহাই প্রারম্ভ। তারপর কৈশোরের রাজত্ব-কাল ফুরাইয়া গেল। যৌবন আসিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিল। যদি যৌবনের মত্ততা না থাকে তাহা হইলে জীবনের অবাধগতিকে সংযত করিয়া কৈশোরকে পার্শ্বে বসাইয়া শৈশবকে সঙ্গে লইয়া প্রৌঢ়ত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া সৌরজগতের গতির সহিত আপন গতি মিলাইয়া দিয়া ধর্ম্মজগতে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশুখৃষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের সৃষ্টি হইল; কর্ম্মক্ষেত্রে অশোক, ওয়াসিংটন, লেনিন্, কামালপাশা, শিবাজী, দেশবন্ধু, তিলক

শ্রীকৃষ্ণ
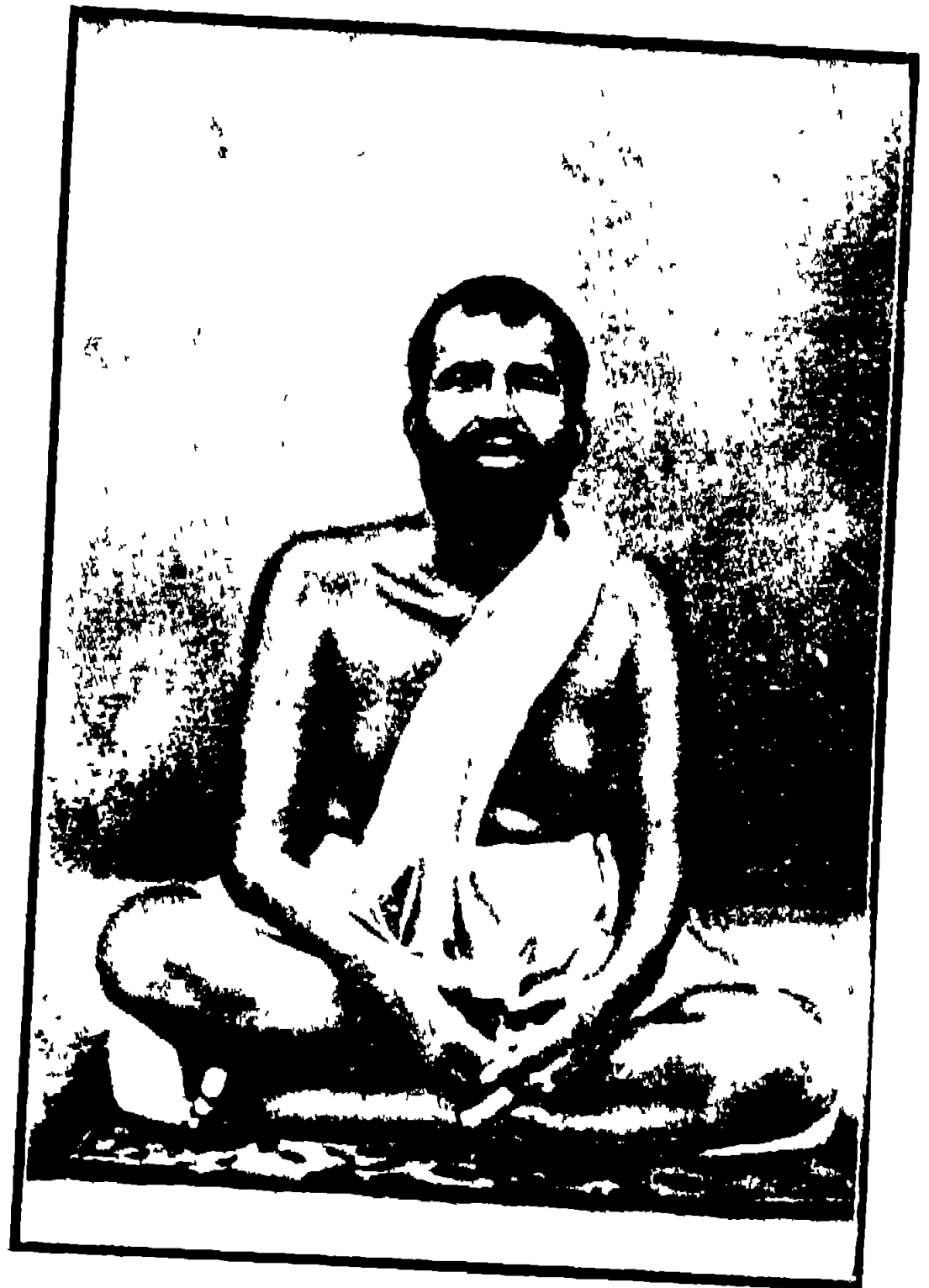
পরমহংসদেব

দেশবন্ধু

মতিলাল

স্বামীজী

তিলক

ডাণ্ডির পথে মহাত্মা

বল্লভভাই

প্রভৃতির উদ্ভব হইল। আর যেখানে যৌবন আপন গর্ব্বে মত্ত হইয়া কৈশোরকে ও কৈশোরের অভ্রান্ত স্বপ্নকে অবহেলা করে এবং আপন কনিষ্ঠ শৈশবকে সম্মান করিয়া সঙ্গে না লইয়া জীবনযাত্রায় অগ্রণী হইবার প্রয়াস করে সেখানে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা অহরহঃ চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি।

সেইরূপ জীবনের যে পাঁচটী অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা সকল সময়েই মানবজীবনের মধ্যে নিহিত থাকে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক মানব সকল অবস্থাই উপভোগ করিতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া চলা ও অধরে শিশুর সারল্য ও হাসি লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এতবড় বয়সের একজন লোক হামাগুড়ি দিয়া চলিলেও তাহা দেখিতে এরূপ সুন্দর হয় এরূপ তিনি কোথাও দেখেন নাই। শিশু প্রহ্লাদের জ্ঞানভক্তি জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক ডাণ্ডি যাত্রা যৌবনের উদ্যম ও শক্তিকে ম্লান করিয়া দেয়। দেশবন্ধু তাঁহার যুবক অনুচরগণকে যে অমরবাণী শুনাইতেন তাহাও উল্লেখ-যোগ্য। যখন তিনি দেশের মধ্যে কর্ম্মের অগ্নিতে জীবনকে জাগাইতে তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন তখন তিনি প্রায়ই বলিতেন "আমার ইচ্ছা হয়, দেশের বৃদ্ধ যুবকগণের হৃদয়ে একটু প্রাণের সঞ্চার করিয়া দেই।"

৭০ বৎসর বয়স্ক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ইহজগত পরিত্যাগ করিবার মাত্র কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীর-বাসী হইবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাহা হইলে বিগত যৌবন হইবার ভয় থাকে কোথায় ?

ইহাই অনন্ত যৌবন ও জীবন বিজ্ঞানের প্রকৃত তথ্য। জগতে প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক কর্ম্মীর জীবনে এই অনন্ত যৌবনই অনন্ত কাল কাজ করিয়া চলিয়াছে।

চয়ন

কনাদার জাতীয় লোহবর্ত্মে ১৩০ পাউণ্ড ওজনের পাটি ব্যবহার হইবে। সিড্‌নির (নোভাস্কোশিয়া) ডোমিনিয়ন ষ্টীল কোম্পানী এই পাটি প্রস্তুত করিতেছেন।

ক্যাণ্টন নগরে ২ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি সিমেণ্ট মাটির কারখানা বসান হইতেছে। এখানে দৈনিক ১২০০ পিপা মাল প্রস্তুত হইবে।

আফ্রিকার ৩ জায়গায় নূতন স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটিতে এক টন মাল পরিষ্কার করিয়া ৭ আউন্সেরও অধিক স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। এইটি অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের রক্সভিলি জেলায় অবস্থিত।

ইঙ্গ-নরওয়েজিয় ধীবরবাহিনী দক্ষিণ মহাসাগরে এত তিমি মাছ ধরিয়াছে যে, তাহার তেলের পরিমাণ ২,০৬,৫০০ পিপা এবং মূল্য ৮,৬০,৪০০ পাউণ্ড। ইহা ১৯৩০-৩১ খৃঃ অব্দের প্রথম ১৭ সপ্তাহে ধৃত হইয়াছে।

শ্যামদেশের রাজকীয় লৌহবর্ত্মের জন্য ৫০০ টন ইস্পাতের আবশ্যক ছিল। প্রতিযোগিতায় জাপান ইহা যোগাইবার ভার পাইয়াছে। মার্কিন ও ইউ-রোপীয় প্রতিযোগিগণ হটিয়া গিয়াছে।

চিকাগোর ফ্যানষ্টীল কোম্পানী র‍্যামেট্ নামক একটি কর্ত্তনকারী মিশ্রধাতু প্রস্তুত করিয়াছেন। নিকেলকে ট্যান্টালাম্ কার্ব্বাইড্ যোগে কঠিন করিয়া এই ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে। শতকরা দশ হইতে পনর ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাতের ঢালাই করা ধাতু ইহার দ্বারা কর্ত্তিত হইবে।

বোসনিয়ার বাঞ্জালুকার সন্নিহিত টেসাঞ্জ নামক স্থানে সেকো বিষের বিস্তীর্ণ স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই খনিজের শতকরা ৬২ ভাগ সেকো বিষ এবং শতকরা ২৮ ভাগ গন্ধক।

এল্‌বার্টার ক্যালগারি নামক স্থানের ট্রাম লাইন তুলিয়া লইয়া বাস চলাচলের ব্যবস্থা হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

(ক) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রাস্তার গতির প্রতিরোধ ক্ষমতার তারতম্য :—

রাস্তার শ্রেণী—	প্রতি টন মালের উপর প্রতিরোধ ক্ষমতা পাউণ্ডে (শক্তি)
মেটে রাস্তা	৯২ হইতে ২১৮
কাঁকরের রাস্তা	৭৫ হইতে ৮২
সাধারণ পাকা রাস্তা	৭২
পিচ্ ঢালা রাস্তা	৪৯
সিমেন্ট-খোয়ার রাস্তা	২৭ হইতে ৩০

(খ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রাস্তায় গাড়ীটানার শক্তি উৎপাদক কয়লার খরচের তারতম্য :—

রাস্তার শ্রেণী—	১ টন মাল ১ মাইল লইতে খরচ সেণ্টে
মেটে রাস্তা	১·৭১
কাঁকরের রাস্তা	১·১৫
সিমেন্ট-খোয়ার রাস্তা	·০·৭৭

(গ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রাস্তায় মোটর গাড়ীর টায়ারের ক্ষয়জনিত ক্ষতির তারতম্য :—

রাস্তার শ্রেণী—	১ খানি গাড়ী ১ মাইল চালাইতে টায়ার ক্ষয়-জনিত ক্ষতির পরিমাণ পাউণ্ডে (অর্থ)
কাঁকরের রাস্তা	০·০১০৫৫
সাধারণ পাকা রাস্তা	০·০২৩২৩
সিমেন্ট-খোয়ার রাস্তা	০·০০৫৩৩

(ক) ও (খ) আমেরিকার আইওয়া প্রদেশের সরকারী-পথ-কমিশনের অনুসন্ধানলব্ধ।

(গ) আমেরিকার ওয়াসিংটন্ কান্‌শাশ্ কলেজ-দ্বয়ের পরিমাণের ফল।

সাঙ্ঘাই এ ৩০ লক্ষের উপর লোকের বাস। তন্মধ্যে ৩৬১৪ জন মার্কিন দেশের অধিবাসী, ৯৩৩১ জন ইংরাজ, ১৭৭৬ জন ফরাসী, ১৬১০ জন জার্ম্মান, ২৫৬৫০ জন জাপানী এবং ৭৬৮৭ জন রাসিয়ান।
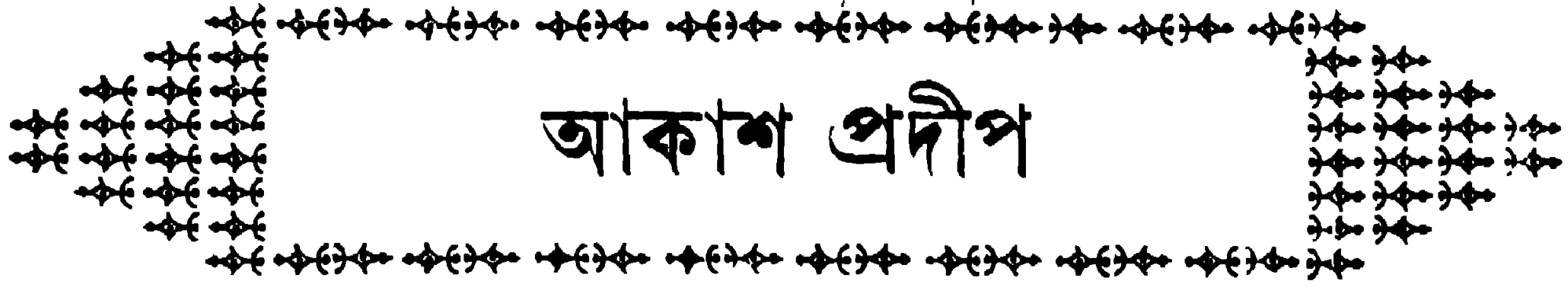
আকাশ প্রদীপ

স্বপ্ন নয় সত্য

চীনদেশে আজও যাহা কিছু কার্য্য হয়, তাহা সান-ইয়াৎ-সেনের নাম লইয়াই হয়। চীনাগণের হৃদয়ে সান-ইয়াৎ-সেনের যে স্থান বাঙ্গালীর হৃদয়ে দেশবন্ধুর স্থান সেইরূপই। সেই জন্য আজও বাঙ্গালা দেশে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দেশবন্ধুর দোহাই দিয়া হইয়া থাকে। কলিকাতা কর্পোরেশনে দেশবন্ধু যখন ইহার প্রথম 'মেয়র'রূপে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কর্পোরেশনের ভিতর দিয়া দরিদ্রনারায়ণ সেবার যে কয়েকটী পন্থার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন তাহার সকলগুলি তখন দেশবাসীর চক্ষে স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তাঁহার অনুচরগণের একনিষ্ঠতায় সেগুলি আজ সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

দেশবন্ধু যে সকল কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন, কলিকাতার নাগরিকগণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা তাহার অন্যতম। কলিকাতা কর্পোরেশনের তখন মাত্র ১৯টী বিদ্যালয় ছিল (১৯২৩ সাল)। আজ সেখানে ৭ বৎসরের মধ্যে ২১৪টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩৪টী বিদ্যালয় ছাত্রগণের ও ৮০টী বিদ্যালয় ছাত্রীগণের জন্য। এই সকল বিদ্যালয়ে ২৬,৫৬০ জন শিক্ষার্থী পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়সমূহ স্থাপনের প্রাক্কালে প্রস্তাব হয় যে, গভর্ণমেণ্ট কিছু টাকা দিবেন ও কর্পোরেশন কিছু টাকা দিয়া বড় বড় থামওয়ালা বাড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রতি ওয়ার্ডে ১টী বা ২টী করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। যদি সেরূপ ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে অদ্য ২১৪টী বিদ্যালয়ের স্থলে মাত্র ৫০।৬০টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইত; কিন্তু কর্পোরেশনের শিক্ষাসচিব মহাশয়ের দূরদর্শিতায় সে প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য না হইয়া বাটী ভাড়া করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা হয়। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ইট পাথরে যে টাকা বদ্ধ হইয়া থাকিত তাহা আজ কলিকাতাবাসীর প্রকৃত শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতেছে। অবশ্য সকল স্থানে উপযুক্তরূপ বৃহৎ গৃহ না পাওয়াতে সাময়িক কিছু অসুবিধা হইলেও কার্য্যতঃ যে পরিমাণ লাভ হইয়াছে তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

আমরা আশা করি, দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কলিকাতা কর্পোরেশনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষাকল্পে অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিবেন না।

সম্পাদকীয়

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে **"পথ"** দেশসেবার নূতনের সূচনার প্রয়াসী; এ নিমিত্ত ১৩৩৮ সাল হইতে পথের দ্বিতীয় বর্ষ আরব্ধ হইল। সর্ব্বপ্রকার হিতৈষীবৃন্দের নিকট নববর্ষের শুভকামনা ভরসা করি।

"বাংলার প্রকৃত সম্পদ" নাম দিয়া এই পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে আমরা আমাদিগের দেশবাসীর নিকট বাংলা দেশের বনে, জঙ্গলে, বাগানে, পতিত জমিতে যে সকল ফসল উৎপন্ন হইতে পারে ও যাহাতে রীতিমত পরিশ্রম দ্বারা প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, তাহার বিবরণ বিশদভাবে প্রকাশ করিব। বাস্তবিক যে দেশের লোক নিজের দেশের গুড়ের ন্যায় স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য ফেলিয়া সাদা বিলাতী চিনি খায়, যে দেশের লোক নিজের দেশের চিঁড়ার ন্যায় উপাদেয় ও লাল আটার ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য ফেলিয়া টিনে মোড়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার 'ওট্‌স্‌ নামক ভূষিমাল প্রচুর অর্থব্যয়ে গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়—সে দেশের লোকদের যা দুর্দ্দশা হওয়া উচিত, আমাদের তাহাই হইয়াছে। তাহার কম বেশী কিছুই হয় নাই। সেই জন্য কেবলমাত্র দেশবাসীর সম্মুখে আমাদের দেশের প্রকৃত সম্পদের উৎপন্ন ও ব্যবহার অর্থনৈতিক, শারীরিক ও পারমার্থিক সকল দিক দিয়াই কিরূপ প্রয়োজন তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণ এ বিষয়ে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া দেশবাসীর আদর্শস্বরূপ হইতে পারিবেন।

বিদেশী ভাষা, বিদেশী বস্ত্র, বিদেশী চিনি, বিদেশী সিগারেট প্রভৃতি জিনিষগুলি যাহা অতি অল্পায়াসেই আমাদের দেশে উৎপাদিত হইয়া নিজেদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াও সারা দুনিয়া ছাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার প্রত্যেকটীর প্রচলনে এ দেশের উপর একটী ধ্বংসকারী পরিণাম আছে। ইহারা আমাদের সমাজজীবন ও অর্থনৈতিক জীবনকে তিলে তিলে ধ্বংস করিতেছে। কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারাটাই কোন মানব বা জাতির একটা গৌরবের বা শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে না। যদি মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া বৃক্ষাদি অথবা পশুর ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া দাসত্ব জীবন যাপন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই প্রেয় ও শ্রেয় সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহই থাকিতে পারে না।

সেই জন্য বিদেশী বস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে এক সুপ্রভাতে এই বিদেশী ভাষাও বর্জ্জন করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের মানুষ হইতে, আমাদের লুপ্ত স্বাস্থ্য ও দেহকান্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইতে, নিষ্প্রভ চক্ষুজ্যোতিঃ পুনঃ প্রজ্বলিত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

পত্রাবলী

[বঙ্গীয় পূর্ত্ত-বিজ্ঞান পরিষদের (বর্ত্তমান
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ) সভাপতি
ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের
নিকট লিখিত পত্রের
শেষাংশ]

"শিক্ষা ভিন্ন দেশের কোন উন্নতির আশা নাই" বহুদিন হইতে এই সিদ্ধান্ত আমার প্রাণে বদ্ধমূল হইয়াছে। বিগত ১৯২৫-২৬ সনে স্বগ্রামের উন্নতি মানসে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সংশ্রবে এখানে একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিত হইয়াছিল। কার্য্যেও অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছিল। তাহার আদর্শ অনেকটা আপনাদের আদর্শের অনুরূপ ছিল। বাংলাভাষায় শিক্ষাদান আমারও সঙ্কল্প ছিল। অধিকন্তু ছাত্রবৃন্দের মাসিক মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে দৈহিক শ্রম দিবার কথা ছিল এবং তাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসবাস ও গুরুদক্ষিণার ব্যবস্থা হইবে। বলা হইয়াছিল "Earning and Learning" নীতি অনুসরণে বিদ্যালয় পরিচালিত হইবে। এই আশায় যে, বালকদের মিলিত শ্রমশক্তি বিজ্ঞান-সম্মতরূপে নিয়ন্ত্রিত করিবার ফলে প্রভূত অর্থ উৎপন্ন করা সম্ভব এবং উহার পরিমাণ সমবেত বালকদের মাস মাহিয়ানার পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। যেহেতু, অর্থ যেরূপ শ্রমকে চালিত করে, শ্রমও আবার সেই রকম অর্থ উৎপন্ন করে, এবং অনিয়ন্ত্রিত শ্রমশক্তি অপেক্ষা নিয়ন্ত্রিত শ্রমশক্তি প্রয়োগে অনেক বেশী অর্থ উৎপন্ন হইতে পারে। অপরাপর বিষয় শিক্ষার ন্যায় প্রত্যেক বালককে আশৈশব শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন ও শিক্ষা করিতে হইবে। বালকদের দৈহিক শ্রমশক্তি অর্থকরী কর্ম্মের মারফতে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। তাহাতে শতকরা ৯৯টী বালকের দরিদ্র অভিভাবক প্রাণে প্রাণে এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্যভার লাঘবকারী উপকার বুঝিতে পারিয়া বালকদের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার বিভীষিকা হইতে ত্রাণ পাইত, বালকগণও দৈহিক শ্রমশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়া গৃহাশ্রমে কৃতকৃতার্থ বোধ করিত, ইউনিয়ন বোর্ডের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইত, গুরুগৃহের মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসবাসের ফলে শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে সদাসর্ব্বদা কোন না কোন কর্ম্মে রত বালকগণ অধ্যয়নাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিবার সহজ উপায় পাইত, সমাবস্থাপন্ন বালকগণ পরস্পর অচ্ছেদ্য সাম্যমৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জ্ঞানালোকের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রফুল্লভাব অর্জ্জন করিত উহাই ৮।১০ বৎসর পরে সমাজের গৃহগুলি হর্ষোৎফুল্ল আনন্দযুক্ত করিত। এতদনুসারে শিক্ষকগণের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কথা ছিল শিক্ষকগণের প্রত্যেকেই বিশেষ নিষ্ঠাসহকারে উহা পালন করিবেন, যাহাতে বালকগণ ও তাঁহাদের নির্দ্দেশমত সর্ব্বদিনব্যাপী কর্ম্মনিষ্ঠা শিক্ষা করিয়া তাহার প্রভাবে জীবন গঠন করিতে পারে। শিক্ষা-দান সম্পর্কে অধিকপক্ষে গগনের বিশাল মণ্ডলরাশি দূরবীক্ষণ সাহায্যে অথবা অনুবীক্ষণ, চলচ্চিত্র,

ছায়াচিত্র প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে বালকদিগের সমক্ষে নানাবিধ বিষয় উপস্থিত করিয়া শিক্ষকগণ নানারূপে জ্যোতিষী, বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক গল্পের অবতারণা করিবেন। (প্রত্যক্ষ জগতের অনন্ত আকাশ ও অতি সূক্ষ্ম সৃষ্টির যত ব্যাপক পরিচয় লাভ করা যায় মহান্ ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা তত যথার্থ হয় এবং উহাতেই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করে। কথিত দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণের ব্যবস্থা এই ধারণা মূলক।) শিক্ষকগণ প্রতিদিন বালকদিগকে যে যে বিষয় শিক্ষা দিবেন রাত্রে উহা অবিকল স্মরণপথে আনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন। যথোপযুক্ত সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ উহা প্রকাশ করিবেন এবং উহাই ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইবে। শিক্ষকগণ প্রতিদিন যে পাঠ দিবেন বালকগণ উহা স্বাধিকারে পরস্পর অধ্যয়ন অধ্যাপনা সাহায্যে আয়ত্ত করিবে। সম্ভব হইলে উচ্চমানের বালকদের দ্বারা ইউনিয়নে পাড়ায় পাড়ায় কয়েকটী প্রাথমিক পাঠশালা পরিচালন করা হইবে। নিজেদের ব্যবহার্য্য শাক সবজী, দুধ ঘি প্রভৃতি উৎপন্ন করা সমগ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাধ্যতা-মূলক কর্ম্ম হইবে অর্থাৎ তাহাতে সমুদয় শিক্ষক, ছাত্র ও ভৃত্যগণ সকলেই সমবেতভাবে অংশ গ্রহণ করিবে। বালকদের জন্য অর্থকরী কর্ম্ম, যথা—সাজে মাটী ফেলিয়া পুতুল তৈয়ার করা (ছোটদের জন্য), চরকা কাটা (পাট এবং তুলা উভয় প্রকারের), পাটের বস্তা বাঁধার জন্য রসি প্রস্তুত করণ (এখানকার পাটের বাজারে প্রতি বৎসর ১৫।২০ হাজার টাকার এই প্রকার রসি আবশ্যক হয়), ইউনিয়ন বোর্ডের পূর্ত্ত কর্ম্মাদি করণ, পাটের জমি নিড়ান, মাপমত ঘর দুয়ারের সরঞ্জাম তৈয়ারী করা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের বালকদের মধ্যে যাহাদের আশু সংসার প্রবেশ আবশ্যক হইবে তাহাদের কোন বিশেষ অর্থকরী ব্যবসায় শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকটী স্বাধীন সহজ শিল্প-কর্ম্মশালা ব্যবসা হিসাবে স্থাপন করা এবং বালকগণ তাহাতে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষার্থীরূপে নিযুক্ত হইবে। কর্ম্মশালাগুলি স্বাধীন হইলে ও শিক্ষকগণের আজ্ঞায় হাতে কলমে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মতরূপে পরিচালিত হইবে ঠিক ছিল; ঋণতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি “আমরা সকলে প্রত্যেকের তরে, প্রত্যেকে আমরা সকলের তরে” শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ কার্য্যকরী শক্তিরূপে প্রযুক্ত হওয়ার কথা ছিল। অর্থ সংগ্রহের সুবিধার জন্য এখানে একটী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছিল (আজও উহা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আছে) এবং তাহার অধীনে “বায়রা শিক্ষাপরিষৎ” নামে অপর একটী শিক্ষা বিষয়ক সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। এই শিক্ষা পরিষদই, বলা বাহুল্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি হইত। (এসম্বন্ধে কতক কাগজ আপনাদের পরিদর্শনার্থ এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আর কতক কাগজপত্রসহ শ্রীমান সুনীলকুমার সেন গুপ্ত আগামী শুক্রবার প্রাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।)

সরকারপক্ষ প্রথম প্রথম আমার পরিকল্পনায় উৎসাহ প্রদানক্রমে প্রায় ৬ ছয় বিঘা জমি দখল করিয়া দেওয়া, ৫৬ হাত লম্বা ৩৬ হাত প্রশস্ত একটী “মিউজিয়ম” ঘর ও অপরাপর ঘর তোলায় সাহায্য করেন এবং ছাত্রাবাস প্রস্তুতের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রস্তাবও মঞ্জুর করিয়াছিলেন। পরিষদে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ব্যতীত অনেক সরকারী কর্ম্মচারীও সভ্য হইয়াছিলেন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমি দেশের যাবতীয় সমস্যা সমাধান চেষ্টা কল্পনা করিয়াছিলাম। ব্যয়ও সেই অনুপাতে হইতে-ছিল; কিন্তু অবশেষে মাঝ দরিয়ায় সরকারী আকাশে মেঘ দেখা দিল, সরকারের প্রবর্ত্তিত নির্দ্দিষ্ট শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কার্য্য হইতেছিল বলিয়া।

ফলে সরকার পক্ষীয় এবং পরিষদের সমুদয় প্রধান ব্যক্তি সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং শিক্ষা-পরিষৎ এক রকম কার্য্য আরম্ভ না হইতেই উঠিয়া যায়। পক্ষান্তরে ইউনিয়ন বোর্ডেরও আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সংশ্রব উঠাইয়া দেওয়া হয়। সরকার পক্ষ বিমুখ দেখিয়া স্থানীয় জনসাধারণও বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়, বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। গ্রাম্য ভদ্র সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন এবং গ্রাম্য দলাদলি-সঞ্জাত ঈর্ষা ও কতকটা কার্য্যকরী ছিল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া ব্যাঙ্ক, বোর্ড ও শিক্ষাপরিষৎ সর্ব্বত্রই কতকটা বিশেষত্ব সহকারে আমাকেই মূলতঃ পরি-চালন করিতে হইত। কোনমতেই ধরাবাঁধা আইনের গণ্ডিমধ্যে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না, কারণ বলিতে গেলে সবগুলি প্রতিষ্ঠানের গঠন কার্য্য চলিতেছিল এবং যথাসময়ে উহা বিভিন্ন পরি-চালক সমিতির হস্তে ন্যস্ত করা হইত। একারপক্ষে একসঙ্গে অনেক কাজে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহাতে আবার এক আদর্শে অনুপ্রাণিত দ্বিতীয় একজনও সহযোগী ছিল না। বৃত্তিভোগী শিক্ষক ব্যতীত আমার আদর্শানুযায়ী কোন শিক্ষক আমার ভাগ্যে আসিয়া পড়িল না। তাহারা আমার আদর্শ অনুসরণ করার পরিবর্ত্তে শিক্ষাবিভাগের আনুগত্য স্বীকার করিতে অধিকতর তৎপর ছিল, ফলে তাহাদের মধ্যে বিরুদ্ধভাব বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে বৎসর দুই নানা ঝড় ঝঞ্ঝাটের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্য্য চলিলেও পরিকল্পনার অনেক কিছু আমার মস্তিষ্ককোটরেই ছিল। শিক্ষাপরিষৎ, তথা ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন বোর্ডের সংস্রব বিযুক্ত হইলে দারুণ অর্থাভাব ঘটিল। চারিদিকে বিশৃঙ্খল দেখা দিল। আমার একারপক্ষে সাধ্য হ'ল না শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া অভিযান চালান। নানাপ্রকারের জটিলতা হইতে ইউনিয়ন বোর্ডকে বিমুক্ত করণ উদ্দেশ্যে সরকারী হুকুম হইল স্কুলের জায়গা জমি ঘরদুয়ার নিলামে বিক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের দেনাশোধ করিয়া দিতে (যথাসম্ভব যা থাকিল আমার) এবং আমার প্রচেষ্টায় বিফলতার ছাপ দিয়া দিতে। ইহাতে কোনরূপ অবিচার করা হয় নাই, কেন না কার্য্যক্ষেত্রে গোড়ায় আমার নিজেরই নানা রকম ত্রুটী বস্তুতঃপক্ষে এই ব্যর্থ প্রয়াসের কারণ। নিলামের হুকুম হইল বটে, কিন্তু এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার বড় আদরের মানস-সন্তান এবং আমার অনেক স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। উহার ভগ্নাবস্থা আজও আমার বুকে শেলসম বিঁধিয়া রহিয়াছে। তাই আমার আরও ধার থাকা সত্ত্বেও ধার করিয়া ঘরদুয়ার সমেত স্কুলের জায়গা জমি নিলামে অনেকটা সস্তায় ৩৪০০৲ তিন হাজার চারিশত টাকায় খরিদ করিয়া রাখিয়াছি। আশা ছিল যুব-সম্প্রদায়ের কাহাকেও না কাহাকেও পাইব ইহাকে পুনরায় আশ্রমের মত গড়িয়া তুলিতে। চারিদিকে গড্ডালিকা প্রবাহে নিরাশ হইতে হইল। অবশেষে সেই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় যেমন বৃদ্ধ নারী ছিল, আমিও সেই রকম এ যাবৎ প্রতীক্ষায় ছিলাম আপনাদের মত কোন সমিতির হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটী দিয়া দিতে। বলা বাহুল্য আমি কতকটা মরার মত হয়ে আছি। পোড়া হৃদ্‌রোগ সম্বল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ কোথা হইতে আসিবে তাহারই একটী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া পৃথক্ একখানি কাগজে আপনাদের পরিষদের নিকট আমার প্রস্তাবের মর্ম্ম বিবৃত করিলাম। পৃথক্ কাগজে করিবার উদ্দেশ্য উহা সাধারণের কাছে প্রকাশ করা ইচ্ছা নয়। কেবল পরিষদের পরিচালক মণ্ডলীর সভ্যগণ জানিতে পারিবেন। ২০।১১।৩০

কার্ত্তিকের "পথে" প্রকাশিত পত্রে লিখিয়াছিলাম "আপনারা অনুগ্রহ করিলে আমার আরও অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে", আজ সেই আশা প্রাণে ধরিয়া আমার প্রস্তাবে পূর্ত্ত-বিজ্ঞান পরিষদের জন্য বরণডালা সাজিয়েছি। আপনারা অনুমতি করিলে যথাশাস্ত্র উহা নিবেদন করিতে পারি। পরিষদ্ উহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে শত ব্যর্থতার মধ্যেও জীবন সার্থক হইল মনে করিব।

বড় দীর্ঘ পত্র হইল। বিরক্ত বোধ করিলে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। অত্র মঙ্গল, আগামীতে আপনার কুশলদানে বাধিত করিবেন। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

বিনীত—

শ্রীনৃপেন্দ্র মোহন রায়

পুস্তক পরিচয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পদ্যানুবাদ লেখক—প্রথিতযশা ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ, ৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০

অনেক দিন পরে গীতার একখানি অতি সুন্দর পদ্যানুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল। লেখকের অনুবাদ পূর্ব্বেও ছিল; কিন্তু তিনি এবার ইহাকে যেরূপ সহজবোধ্য করিয়া বাহির করিয়াছেন তাহা নিতান্তই প্রশংসার যোগ্য।

অবশ্য মূল সংস্কৃতের সহিত তাহার তুলনা হয় না; করাও যায় না। তবে যাঁহারা সংস্কৃত ভালরূপ বোঝেন না তাঁহারা যদি দুই চারিবার পুস্তকখানি ভাল করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে যে মূল সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিতে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে ইহা নিশ্চিত। গীতায় অব্যাখ্যাত বহুতর বাক্যের ও লুক্কায়িত ভাবের ব্যাখ্যাগুলি অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে তৃপ্ত হইতে পারিবেন। লেখক কেবল ছন্দ ও মিলের দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। তাঁহার লেখনী সর্ব্বদা গীতার প্রচ্ছন্ন ভাবধারাকে প্রতি পদবিক্ষেপে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

যাঁহারা সংস্কৃত ভালরূপ জানেন তাঁহারাই যে এ পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাঠক সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবেন লেখক কেমন করিয়া গীতার মূল ভাবধারাকে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছেন; কেমন করিয়া পাণ্ডিত্যের উগ্রতা বর্জ্জন করিয়া তাহার বক্ষের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হয় প্রবীণ লেখক বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহা প্রায় প্রতি শ্লোকের অনুবাদে অতি যোগ্যতার

সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনাবশ্যক দার্শনিক বিচারের নীরস সোপান লঙ্ঘন নাই, আছে তাহা-দিগের সিদ্ধান্তগুলির পূর্ণ সমাবেশ। গীতার গভীর উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখক যে তাঁহার নিপুণ ও মার্জ্জিত লেখনী অতি দক্ষতার সহিত চালিত করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রসার কামনা করি।

ভবিষ্যৎ বাংলা

আজ যে শিশু পরে সেই মানুষ হইয়া জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। আজ ২৫ বৎসর ধরিয়া স্বাধিকার লাভে বাংলা দেশ যেভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে ও নানাপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিতেছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বাংলা তাহারই ফল। সেই জন্য আমরা নানাপ্রকারে তাহার চিত্র আমাদের দেশের লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা সততই তাঁহাদের চিত্তপটে রাখিবার প্রয়াস করিব। যাহাতে আমরা সহস্র ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও শিশুর সারল্য ও হাসি লইয়া অগ্রগমন করিতে পারি, পাঠকপাঠিকাগণ এই প্রকারের চিত্র বিবরণসহ প্রেরণ করিলে আমরা সাদরে এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব। এই শিশুর বয়স এক বৎসর তিন মাস।

পরিভাষা
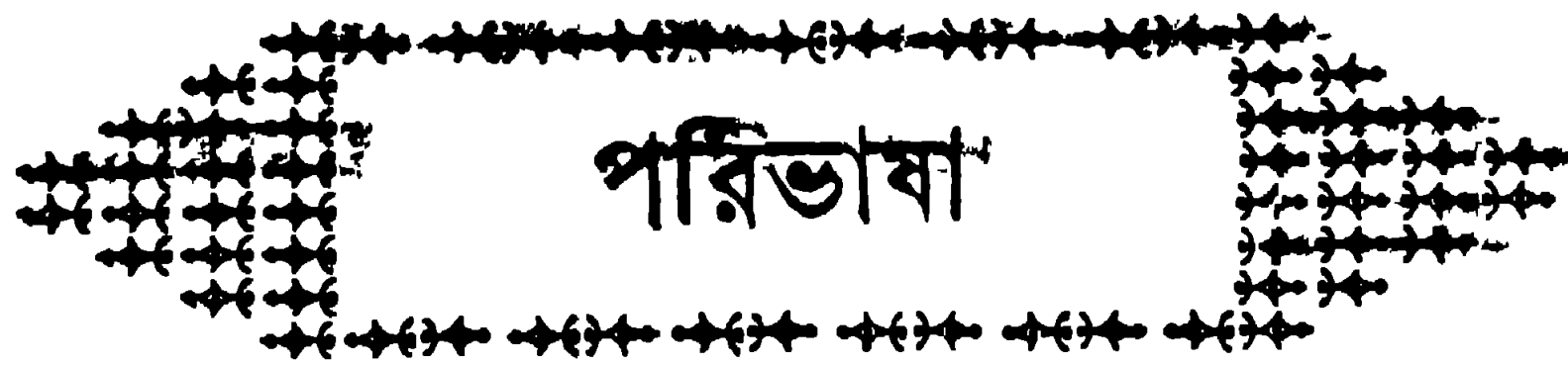
Absolute temperature—নিরপেক্ষ উত্তাপ

Adiabatic expansion—সমতাপে প্রসারণ

Article—পদার্থ

Atom—পরমাণু

Body—বস্তু

Brown—খয়িরবর্ণ

Carbon dioxide—অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান

Centrifugal—কেন্দ্রবিমুখ

Centripetal—কেন্দ্রাভিগামী

Density—গুরুত্ব

Fire-clay—তাপসহ মৃত্তিকা

Horse-power—অশ্বক্ষমতা (অশ্ববল)

Hydrochloric acid—লবণাম্ল

Internal energy—অন্তর্শক্তি

Isothermal compression—সম-উষ্ণতায় সংচাপন (সঙ্কোচন)

Isothermal expansion—সমউষ্ণতায় প্রসারণ

Kinetic energy—গতিশক্তি

Mass—সত্তা

Matter, substance—দ্রব্য;

Molecule—অণু

Polytropical—বহুতাপনিক

Potential energy—স্থিতিশক্তি

Power—ক্ষমতা

Sound box—স্বরমঞ্জুষা

Specific heat—বিশিষ্ট (আপেক্ষিক) তাপ

Sulphuric acid—গন্ধকাম্ল

Sulphurous acid—গন্ধক নিম্নাম্ল

Thermodynamics—তাপ-গতি-বিজ্ঞান

Weight—ভার

Back elevation—পশ্চাদ্দৃশ্য

Cinders—ঘেঁস

Cross section—আড়চ্ছেদ দৃশ্য

Damp proof—জলাভেদ্য

Elevation—বাহ্যচিত্র

Foundation plan—ভিত্তিচিত্র

Front elevation—সম্মুখ দৃশ্য

Isometric or bastard perspective view—কৃত্রিম ফটোগ্রাফ চিত্র

Layer—স্তর

Longitudinal section—দীর্ঘচ্ছেদ দৃশ্য

Perspective view—ফটোগ্রাফ চিত্র

Plan—তলচিত্র

Plinth level—পোতাতল

Pulley—কপিকল

Section ছেদচিত্র.

Service privy—খাটা পায়খানা

Side elevation—পার্শ্বদৃশ্য

Skylight—আওয়াজি

Ventilator—ঝাজরি

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যায় প্রকাশিত "তাপ-গতি-বিজ্ঞান"এর 'সঙ্কোচন' ও 'সঙ্কুচিত' স্থলে যথাক্রমে 'সংচাপন' ও 'সংচাপিত' পড়িতে হইবে।

২২৪ পৃষ্ঠার (চৈত্র সংখ্যা) পঞ্চম পংক্তির 'দণ্ডচক্রের' পরিবর্ত্তে 'দণ্ডযন্ত্রের' হইবে।

শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট—"পুরাণ-প্রেস" হইতে মুদ্রিত।
২৮এ, রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট—"পথ কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপিত কোন দ্রব্য ক্রয়কালীন "পঞ্চ"এর নাম উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন।

সূচী

Junkers Diesel

Simple

RELIABLE

ECONOMIC

From 8 B. H. P. upwards

Sole Agents :

Indo Swiss Trading Co Ltd.

28, Pollock Street,

CALCUTTA.

সমাজ সেবা

পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া একটি সমস্যা। ঘটকের প্রতারণায় বহু ভদ্রলোক কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও একটু শান্তি পান নাই। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা বিবাহ সমিতি স্থাপন করিয়াছি।

সমিতির নামই সদুদ্দেশ্যের পরিচয় দেয়। ব্যয় পরিচালনোপযোগী যৎসামান্য পারিশ্রমিক লইয়া থাকি। আমাদের সন্ধানে সর্ব্বশ্রেণীর পাত্র পাত্রী আছে। আবশ্যক মত ৵১০ আনার ষ্টাম্পসহ পত্রদ্বারা অথবা নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করুন।

যাঁহারা পণ দিতে ইচ্ছুক এরূপ বহু পাত্রপাত্রী আছে। সংবাদ পাইলে, আমরা বিধবা, ধর্ষিতা ও কুচরিত্রা নারীগণকে পুনরায় বিবাহ দিয়া সমাজের পঙ্কোদ্ধার করি, কারণ শেষোক্ত নারীগণকে ৺নবদ্বীপধাম ইত্যাদিতে রাখিয়াও সুফল হয় না। ভ্রূণহত্যা মহাপাপ। সংবাদ পাইলে, এরূপ শিশু-গণকে গোপনে রক্ষা করা হয়।

সমাজ সেবক—

বিনাপণে বিবাহ-সমিতি,

১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপিত কোন দ্রব্য এনকোয়ারীতে "পথ"এর নাম উল্লেখ করিয়া বাধিত করিবেন।

"পথ"এর নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি ঃ—

১। "পথ"এর বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৲, ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র, প্রতি সংখ্যা ৷৹ আনা।

২। বৈশাখ মাস হইতে নববর্ষ আরম্ভ হইল। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হয়। পত্রিকা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

	এক সংখ্যার	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০৲	২২০৲	৪০০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	২২৲	১২০৲	২২০৲
সিকি পৃষ্ঠা	১২৲	৬৪৲	১২০৲

স্বদেশী দ্রব্য প্রসারকল্পে নিম্নলিখিত **বিশেষ** হার নির্দ্দিষ্ট হইল ঃ—

	এক সংখ্যা	ষণ্মাসিক	বাৎসরিক
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲	১১০৲	২০০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১১৲	৬০৲	১১২৲
সিকি পৃষ্ঠা	৬৲	৩২৲	৬০৲
আবরণ পৃষ্ঠা	৪র্থ ৪০৲	২য় ৩০৲	৩য় ২৫৲

"পথ"এ প্রকাশের জন্য নূতন বিজ্ঞাপন ৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে, পুরাতন বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইলে ১লা তারিখের মধ্যে জানান চাই।

প্রবন্ধ লেখকগণের প্রতি ঃ—

"পথ"এ প্রবন্ধ প্রকাশ করার ভার সম্পাদকমণ্ডলীর উপর। সঙ্গে ডাক টিকিট দেওয়া না হইলে অমনোনীত কোন প্রবন্ধ ফেরত বা কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

পরিচালক "পথ"

২৮এ, মহারাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীট

শ্যামবাজার, কলিকাতা

সৌরজগতের আদি দিন

জগৎ-কথার ভূমিকা
২১১ পৃষ্ঠা

[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে]

পথ

২য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮ | ২য় সংখ্যা

মানবের অভিযান

[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্জন]

মানুষ তাহার আয়ুকে কখনও ছোট করিয়া দেখে নাই। সে বাঁচে হয়ত অল্পদিন, কিন্তু তাহার কাজ ও কীর্ত্তির মধ্য দিয়া সে বাঁচিতে চায় অনন্তকাল। এক একটি বর্ষকে সে যেন তাহার বাঁচিবার ইচ্ছারই এক একটি দীপ জ্বালিয়া জ্বালিয়া চলিয়াছে, ঘোর অজ্ঞাত পথে, নির্ভীক এবং আশাদীপ্ত প্রাণে। মৃত্যুকে সে চাহে না। যদি চাহে ত তাহার আগুনে দগ্ধ হইয়া অমর হইতে সে চাহে। নিরন্তর কর্ম্মের ভিতর দিয়া অমৃতেরই সে সন্ধান দিবারাত্র করিতেছে। এক দীপ নিবিয়া যায়, আবার নূতন করিয়া দীপ জ্বালা হয়। এইভাবে পথিক মানব বর্ষে বর্ষে চলিয়াছে। কে ধন্য হয়? নূতন বর্ষগুলির হর্ষধ্বনিতে পথিক ধন্য হয়, অথবা পথিকের মৃত্যুহীন প্রাণের স্পর্শে বর্ষগুলি ধন্য হয়?

মানবের সভ্যতার অর্থই এই যে, সে পিছাইয়া যাইতেছে না, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সে শতবার কালের বুকে আছাড় খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তথাপি সে কালের সহিত সংগ্রাম করিতেই চাহে। এ তাহার স্পর্দ্ধা হইতে পারে, কিন্তু এই স্পর্দ্ধাই তাহাকে দিনে দিনে বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব, তাহার শিল্প, তাহার সাহিত্য কাল ত বার বারই চূর্ণ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু কখনও তাহার অগ্রগতিকে দমন করিতে পারে নাই। সে মৃত্তিকার বুক চিরিয়া বহু সহস্র বৎসরের ইতিহাসকে আবার সম্মুখে আনিয়া ধরিতেছে। নিজের কীর্ত্তিগৃহ পুনরায় পূর্ণ করিতেছে। আবার নবোদ্যমে কর্ম্মসমুদ্র-মন্থনের ব্রত গ্রহণ করিতেছে। আকাশে বাতাসে জলতলে, প্রকৃতির গূঢ় গোপন ভাণ্ডারগুলি লুটিয়া লইয়া বিজ্ঞানপথে আপনাকে নিত্য নূতন সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া বলশালী করিয়া তুলিতেছে এবং জ্ঞানের পথে ও সমাজের পথে সে নিখিলকারণের অধিকারে নিজের যোগ্য উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়া দিয়াছে। অতএব, এখন এই প্রশ্ন সহজেই জাগিতে পারে যে, কাল তাহাকে জয় করিবে কি সে কালকে জয় করিবে?

এজন্য মানুষ এখন ভ্রমের মোহ কাটিয়া উঠিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে পৃথিবীর সকল দেশেই। মানুষের আত্মায় এবং মানুষের কর্ম্মে যে কতটা শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, মানুষ বিংশ শতাব্দীর দ্বারে আসিয়া সে আত্মপরিচয় পাইয়াছে বলিতে হইবে। যুদ্ধবিগ্রহে পরস্পরের ধন কাড়াকাড়ি করিয়া ধনী হওয়ার অপেক্ষা বন্ধুতায়, নৈতিকবলে ও চরিত্র-শক্তিতে পরস্পরের সহায়তায় জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির সদ্বিকাশে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির মিলিত প্রচেষ্টায় অন্তরে বাহিরে প্রকৃত ধনী হওয়াই যে নিখিল-মানবের শক্তিবৃদ্ধির প্রকৃত উপায়,—জগৎজোড়া মানুষের আজ তাহা জানিবার বাকী নাই। তাহারা যে মানুষ, সভ্য হওয়াটা যে মনুষ্যত্বের সোপান এবং সভ্যতার স্থান যে আড়ম্বরের মধ্যেও নয়, লোভের মধ্যেও নয়, অহমিকার মধ্যেও নয়, শক্তিজ্ঞানের এই মুক্তির দুয়ার আজ খুলিয়া গিয়াছে। সভ্যতা শত্রুতার মধ্যে নয়, মিত্রতার মধ্যে। স্বার্থসর্ব্বস্বতার মধ্যে নয়, স্বার্থপ্রসরণের মধ্যে। অপরের বিলুপ্তির উপরে সভ্যতার মহাসৌধও চিরস্থায়ী হইবে না, কিন্তু তথা-কথিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের প্রাণভিত্তির উপর রচিত একখানি কুটীরও যে সভ্যতার মহামূল্য মণি, আজ এই রত্নপরিচয়ের জ্ঞান মানুষের অন্তরমূলে অঙ্কুরিত হইয়াছে। এইজন্য মানুষ আজ জগৎময় মানুষকে ভাই বলিয়া কোল দিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। জাতি, ধর্ম্মাচার, মান, অর্থ সমস্তের অপেক্ষাও মানুষ আজ পরস্পরের মর্য্যাদাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিতেছে। এই নবীন মানবজাতির পতাকাতলে ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামের অভিযানের জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এ অভিনব সমর সজ্জা দেখিয়া স্বয়ং কালও হয়ত অন্তরমধ্যে চমকিত হইয়া উঠিতেছেন।

কিন্তু মানুষের সম্বল—যুগে যুগেই তাহার নিজেকে নিজে গড়িয়া তোলা। প্রাণবান্ বীরের ধর্ম্ম এই যে, পারিপার্শ্বিককে সে নিতান্ত আপন করিয়া লইয়া বাড়িয়া উঠে, চঞ্চল শিশু যেমন মাতৃক্রোড় অধিকার করিয়া লইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপন ইচ্ছামত মাতৃস্তন্য পান করিয়া বাড়ে। এই স্বভাবধর্ম্মে, যেখানেই মানুষের মধ্যে সত্য প্রাণের স্পন্দন আসিয়াছে, সেই প্রত্যেক জাতিতেই, ভোগসুখ বিলাস কিংবা অপরের অনুকরণ স্পৃহা ঘুচিয়া গিয়া প্রথমে দৃষ্টি পড়িয়াছে আপন আপন দেশমাতৃকার দিকে।

অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের চুম্বকশলাকা জগৎ-মানবের মহামিলনক্ষেত্রের অভিমুখেই রহিয়াছে। এইখানেই মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানবতার যোগ্যতা অর্জ্জনের বিত্ত তাহার এইখানে। অন্নে অবহেলিতা, স্বাস্থ্যে অবহেলিতা, ভাষায় অবহেলিতা, জ্ঞানৈশ্বর্য্যে অবহেলিতা মাতা যাহার গৃহে, বাহিরের সংগ্রামে তাহার অধিকার কিসে? মাতৃস্তন্য সুধায় যতদিন না সে নিজেকে পূর্ণ সবল করিতে পারে, ততদিন কোন পতাকা বহনের অধিকার দাবী করিতে সে কি লজ্জিত নহে? অথচ সে মানুষ, যেখানে যে মানুষ আছে তাহার সহিত কোন একটা সম্পর্ক রাখা তাহার ধর্ম্ম।

প্রাচীন জগতের সভ্যতার মূলে যে দর্শন ছিল, হয়ত ভাব, গুণ বা কর্ম্মগত, বংশগত অথবা ব্যক্তিগত ভিত্তি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে, এমন কি, ধর্ম্মসংস্কারের উপরেও ঐ যুগের ঐ প্রকারের কোন কোন ব্যাখ্যাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের পবিত্র সঙ্গীতে, মিশরীয় বিরাট স্থাপত্যে, গ্রীক সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে, রোমক ন্যায়-বিধিতে, চৈনিক শিল্পে, দিগ্বিজয়ীদের বীরত্বে, নাইট্-এরাণ্ডদের নিজ জীবনে, অশোকের স্তম্ভে স্তম্ভে এবং এ সকলের পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসের প্রত্যেক জীবনে এবং চিহ্নে প্রত্যেক সভ্যতার বিকাশ চেষ্টাই যে একটি সত্যে নিত্য অনুস্যূত হইয়া চলিয়াছে, ইহা ধ্রুব। সেই সত্যটি হইতেছে, আপনার জাতির সংগঠন এবং জগৎপ্রতিবেশীর সঙ্গে যোগ। সেই যোগের অবশ্য প্রকারভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সকল সভ্যতাই নিজেকে পুষ্ট করিয়াছে তাহার আপ্রাণ চেষ্টায়, এবং হয়ত জগতে দিয়াছে তাহারও বেশী।

এখন নূতন যুগের দান-প্রশ্নের কাছে আসিয়া প্রত্যেক জাতি একবার নিজেকে ভাবিয়া লইতেছে। যাহার কিছু আছে সে ভিন্ন কেহ দিতে পারে না। অথচ দিতে না পারিলে জগৎ-সভ্যতায় গণনার সংখ্যায় তাহার স্থান নাই। এই জন্যই ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ওসেনিয়া—প্রত্যেক মহাদেশ-বাসীর সম্মুখে এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহারা কি করিয়াছে এবং কি করিতে পারে। হয়ত কোন মহাদেশের ঝুলিটি কোন কোন হীরামণিরত্নে ভারী; কিন্তু তাহার কোন রত্ন হয়ত এ যুগে অচল, আবার কোন মহামূল্য রত্ন হয়ত একালে ভাঙ্গান চলে না, অত মূল্য কে সঞ্চয় করিয়াছে যে দিতে পারিবে? সুতরাং সমস্যা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে,—"কৈ, কতই তোমরা চেষ্টা করিলে, তোমাদের বুভুক্ষা কেন দূর হয় নাই? বুকের পাঁজরে দুঃখও তোমাদিগকে কেন শেলবেধ বেদনা দিতেছে, সুখও কেন সূচীবেধ বেদনা দিতেছে? গৃহে গৃহে কোথাও কেন অন্তরে নির্ব্বিঘ্ন শান্তি নাই?" মানুষ হইয়াও আজও যে অশান্তির সাহচর্য্য ছাড়িয়া নিজেকেই শান্তি দিতে পারিল না, সে কোন্ জোরে আর দিবার কথা বলিবে? তাহা হইলে এত শতাব্দীর যুদ্ধ সে কি বৃথা হইয়াছে?

মানুষ একথাটি এখন গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে। কর্ম্মসমস্যা, অন্নবস্ত্রের সমস্যা, অভাব অভিযোগ, বিলাস-লালসার সমস্যা—সকলেরই ভিতর দিয়া সে দেখিতে পাইতেছে, তাহার গন্তব্য পথের সূত্র সে হারাইয়াছে কি না। সম্ভবতঃ তাহা হারায় নাই, কিন্তু কেন জীবনগতি জটিল হইয়া যাইতেছে? উহা সরল, শান্ত, সুপ্রীতিপদ হইয়া কেন মানুষের নামকে এখনও সার্থক করিয়া তুলিতে দিতেছে না?

সে ইহার কারণ এখন আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। সে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, কালের

সহিত মহাসমরে তাহার পক্ষের সৈন্যসজ্জার সুকৌশল এখনও সম্পূর্ণ ধরা দেয় নাই। আজ তাহার তীক্ষ্ণ ও দিব্য দৃষ্টি, হৃদয়ের গভীর চিন্তা, চেতনার বিগলিত অশ্রুধার, তাহাকে সহসা সেই অমৃতসিক্ত দিনগুলির প্রত্যূষকালে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, যে দিনে, বুদ্ধ, লোকপ্রাণের সঙ্গে আপন প্রাণ মিলাইয়া, চাহিয়াছিলেন—

সংঘের শরণ লও

খ্রীষ্ট চাহিয়াছিলেন—

সবার দুঃখভার আমাকে দাও

হজরত চাহিয়াছিলেন—

তিনিই এক, তাঁর সন্তান সকলেই ভ্রাতা

এবং আজিকার যুগমানবের মনঃপ্রাণও ব্যাকুলতায় দ্রব হইয়া চাহিতেছে—

এস মানুষ! এস আমার পরম আপন! এস নারায়ণ!

ঋষিরা ভুবনপ্রত্যূষে বলিয়াছিলেন,—"তে অমৃতস্য পুত্রাঃ!" অমৃতের যাহারা সন্তান, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মৃত্যু কোনরূপে আসিয়া কেন স্থান পাইবে? নারায়ণ শুধুই দরিদ্রের ভিতরেই কি শুধু ধনীর ভিতরেই নন, অথবা কেবল দুর্ব্বল বা কেবল প্রবলের ভিতরেই নন, তিনি সকলেরই মধ্যে। তাঁহার অতুল্য শক্তি ও বিরাট ঐশ্বর্য্য বিশ্বে ছড়ান রহিয়াছে—রাজার চিত্তে, কাঙালের বুকে, মধ্যবিত্তের প্রাণে, সবখানেই অপরিমিত হইয়া। তিনি কাহাকেও কাহারও করুণাভিখারী করিয়া রাখেন নাই। মানুষের সেই আত্মবলের প্রকৃত জ্ঞান সেই অপরূপ ঐশ্বর্য্যের সন্ধান যে জাতির মধ্যে যখনই মিলিয়াছে, তখনই সে জাতি অসীমরূপে সমৃদ্ধ হইয়াছে। সমাজ প্রভৃতির মিথ্যাচারের পঙ্ক হইতে যে জাতি মুক্ত হইয়াছে, সেই এ সমৃদ্ধির দর্শনলাভ তখনই করিয়াছে। প্রাচীন নবীন সমস্ত ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে। প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস অতীত ও বর্ত্তমানের এই হিসাবকে আর তুচ্ছ করিতে পারিতেছে না এবং প্রত্যেক জাতির, ধরিতে গেলে, এখন এমন কি প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিত্বই, ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্বের সকল গণ্ডি ভেদ করিয়া—প্রকৃত সত্যের সম্মুখে, সমান ক্ষেত্রে আসিয়া, নবীন উদ্যমে জীবন্ত জীবনের প্রমাণ দিবার কর্ত্তব্যে ও গৌরবলিপ্সায় হৃদয় দিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে হৃদয়খানিই তাহাকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়াছে এবং তাহাকে জীবনরণের সৈন্যসজ্জার সুসন্ধান দিয়াছে। নবীন জগতের নূতন অভিযানের নবীন মানবের জন্ম এই হৃদয়ক্ষেত্রে।

সর্ব্বত্রই ও সকলেই এই নব বিশ্বমানবশিশুর অভিনন্দন করিতেছে। এ অভিনন্দনের অর্থই হইতেছে—দৈন্য হইতে মুক্তি, লজ্জা হইতে উদ্ধার এবং মহামানবত্বের প্রথম সবুজ রেখাটি অঙ্কন করা। মানবীয় ধর্ম্মের উপযুক্ত এই সবুজ ছায়াচ্ছন্ন পথেই যে মানুষ আত্মদর্শনের আনন্দখানিকে জিনিয়া লইয়া জাগতিক এবং উন্নততর উভয় জীবনেরই সকল প্রকার রণের সম্মুখীন হইবার পূর্ণ বল সঞ্চয় করিবে তাহার সন্দেহ কোথাও নাই।

সকল জাতিতে এই জন্যই মায়ের মন্দিরে হর্ষ-কোলাহল শ্রুত হইতেছে। শিশুগোপালরূপে নারায়ণ জননী যশোদাকে বিশ্বদর্শন করাইয়াছিলেন। আবার যৌবনোজ্জ্বল পূর্ণ জীবনের স্বর্ণসামায় তিনি সখা অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপের জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। আজ বিংশ শতাব্দীর নবীন বিশ্বমানবও তাহাদের ব্যথার মধ্যে, তাহাদের বুভুক্ষার অন্তরালে, তাহাদের কর্ম্মের পিপাসার সাগরতটে দাঁড়াইয়া বলিতেছে——মা! আমার শিশুহস্তের বাঁধন খুলিয়া দাও, আমাকে কর্ম্ম-প্রেরণার কোলে তুলিয়া লও, আমি তোমাকে বিশ্ব-

দর্শন করাইব; তোমার ক্ষীর ও ননীর ভাণ্ডারে আমাকে ক্ষুদ্র দস্যু ও তস্কর করিয়া রাখিয়া তৃপ্ত হইও না, ভাণ্ডারে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রফুল্ল ও পুষ্ট হইয়া একদিন বিশ্বধেনু দুহিয়া তোমার পুরীতে মহাভাণ্ডারের মহাপ্রতিষ্ঠা করিব; আমি সন্তানরূপে ধন্য হইব, তুমি জননীরূপে ধন্যা হইবে। আবার প্রত্যেক জাতির প্রাজ্ঞ হৃদয়খানি প্রতিবেশীকে বলিতেছে, সখা, কালকে জয় করিতে হইবে, মানুষকে তাহার শ্রেষ্ঠ 'স্বধর্ম্ম' পালন করিতে হইবে; আমরা অচ্ছিন্ন, আমরা ত ক্ষুদ্র নহি, আমরা বিরাট; যাহা কিছু অসৎ মানুষের জগৎ হইতে তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তোমার রথের গতিকে জগন্মুখী করিতে হইবে, এস, তোমার রথরশ্মি আমরা গ্রহণ করিব, পরস্পরে ধন্য হইব।

এইরূপে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মান, ঘৃণা, মাৎসর্য্য, হিংসা, লোভ এবং দুর্ব্বলতা ইত্যাদিকে দলন করিয়া, মাতৃদুঃখমোচনের গৌরবনবনীর যাচ্ঞায় এবং সুহৃদত্বের করপ্রসারণে 'অভিজাত', 'নিম্ন', 'উচ্চ', 'মধ্য', 'সংখ্যালঘিষ্ঠ', 'সংখ্যাগরিষ্ঠ', 'কর্ম্মী', 'বেকার', 'অস্পৃশ্য', 'নিরক্ষর', 'বিদ্বান্', 'দরিদ্র', 'ধনী', 'শিল্পী', 'সাধু', 'স্ত্রী' ও 'পুরুষ'—ভুবনময় ব্যাকুল গোপালদল এবং জগতের জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর ও কর্ম্ম সারথিগণ উন্মুখ হৃদয়ে একত্র হইতেছেন, তাহারই বেণুরব ও কম্বুগীতি গৃহে, মিলনে, পথে, প্রান্তরে এবং সমুদ্রের কূলে কূলে সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হইতেছে।

ধ্বনিত হইতেছে আপন আপন বুকের মাতৃ-ভাষায়। কেন না ব্যথার ক্রন্দন এবং উৎসাহের আনন্দ সকলের অপেক্ষা প্রকাশের নিত্য স্থান এইখানে। আপনাকে বিগলিত করিয়া এবং আপনাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া বুঝানো যায় এই-খানে। শ্রেয়তর আর উপায় নাই। এইজন্যই দেশে দেশে বেণুগান এবং কম্বুনাদ এইরূপেই বাজিয়া উঠিতেছে। সে পবিত্র গীতে বাতাস পবিত্র হইতেছে। দেশ এবং বীরেরাও পবিত্রতর হইতেছেন। কারণ এই যে, প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেকের আপন মর্ম্মের নিগূঢ় চরম কথা যেমনই আত্মমর্য্যাদায় তেমনই মর্ম্মগভীর ব্যাকুলতায় অগোপনভাবে একেবারে বুকের ভিতর হইতে স্পষ্ট করিয়া দিয়া বলা হইতেছে। অসাধারণ এবং সাধারণের সকল বাণীকেই এইরূপে নিঃসন্দিগ্ধভাবে এক দেহে মূর্ত্ত হইয়া জগৎপদ্মদলে যেন আপন আপন বীণাবাদনে নিরত দেখা যাইতেছে।

ইহাতে জাতির শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণ পরিচয় সকল ব্যাপারে অকপট হইয়া উঠিয়া সকল কালিমা ধুইয়া দিতেছে। জাতির প্রকৃত মূল্যের সাক্ষাৎ পাওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সম্মানবোধ বাড়িতেছে। হৃদয়ভাব প্রকাশের বাধ্যবাধকতাহীন মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে আপন আপন সম্মানের আনন্দ লইয়া জাতিতে জাতিতে প্রাণের নিবিড়তম যোগের সেতু দৃঢ় হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। তাহাতে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই উৎসাহ এবং মুখে হাসি দেখা যাইতেছে। মনে হই-তেছে, জীবনগঠনের রক্তধারা এবং কালসংগ্রামে পথ কাটিয়া লইবার প্রধান তরবারি তাহারা পাইয়াছে, তাই তাহাদের এত জয়গান। জগৎ-মানবের মধ্যে সুদূর ভবিষ্যতে মহামিলনের ফলে কোনও দিন মানবের সকল দেশের ভাষা এক ভাষা হইবে কিনা আজ তাহা বলা যায় না, কিন্তু অতি নিকটে সে দিন, যে দিন এক এক জাতির মাতৃভাষার এক একটি রঙের ——সর্ব্বসমন্বয়ে গড়া হইবে নিখিলমানবের পতাকা।

এই পতাকাতে আপনার রং যোগাইয়া দেওয়া আজও যাহাদের বাকী আছে, আজ তাহাদিগকে উঠিতে হইবে। নিজের শিল্পে এবং নিজের সাহিত্যে

যে রসধারা, তাহা যেমন জগতের তৃপ্তির জন্য ধরিতে হইবে, তেমনি, উহাই জাতির আপন জীবন পোষণের দুগ্ধ। সাংসারিক প্রয়োজন পূরণে, গুণের বিকাশে, উপার্জ্জনের প্রধান উপায় শিল্প; আর মানুষকে নিত্য অন্তরে মানুষ করিয়া গড়ে সাহিত্য। পরস্পর দুটির সহায়তা জাতির গতিকে দ্রুততর এবং বহুমুখে বিস্তৃততর করিয়া দেয়। দেখিতে দেখিতেই জাতিকে অগ্রগামী করে। একথা ভারত আগেও জানিয়াছে। উচ্চ নীচ সকল জ্ঞানকে সহজ সরল সাধারণ ভাষার ভিতর দিয়া এবং মহান্ শিল্পজ্ঞানকে বহুল ও সুপ্রচুর করিয়া দিয়া বৌদ্ধভারত আসমুদ্র বৃহত্তর ভারতের সর্ব্বসাধারণকে একদিন সত্যই এই দুগ্ধ পান করাইয়াছিল। আজও যাহারা জীবনকে ত্যাগে সরল করিবার এবং গ্রহণে সমুন্নত করিবার বিধিটী আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিতেছে, তাহারাই সবলতাকে করতলগত করিবার উপায়টি পাইতেছে সহজে। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে আদর্শকে অন্তরগত করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের ভিতরে বিশ্বের সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকটীকে ধরিয়া, সুবিবেচিত পথের প্রজ্বলিত দীপে বিশাল কর্ম্মভূমির মধ্য দিয়া যাহাদের যাত্রার আরম্ভ, সত্য বীরের আখ্যা একদিন তাহারাই পাইবে। তাহার জন্য প্রতিটি জাতিকে তাহার শিক্ষা ও সমাজকেই সকলের আগে এই উজ্জ্বল জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু উপায়ের নির্দ্দেশ নূতন বসন্তের মুকুলের মত উদ্গত হইবে, সমাজ পরস্পরের বেদনার সহানুভূতিতে হইবে পূর্ণ, শিক্ষা হইবে সংশোধিত, লোকশিক্ষা হইবে প্রচুর এবং নানা শাখায় কার্য্যকরী, অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যা হইবে স্বাবলম্বনে সার্থক; ভাষা আপন জাতির সমস্ত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা কুড়াইয়া আনিয়া এমন শক্তিশালিনী হইবে, যে, বিরাট কর্ম্মযন্ত্রকে চালাইবে সে। অকাতর শ্রম এবং পরস্পরের সহায়তা, জাতির এই দুইটি বাহু সকল আপদ অপসারিত করিয়া, সকলেরই ধর্ম্মকে মানবত্বের যে অমল পদ্মাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহার সকলগুলি দলই শুভ্র, সুন্দর সুসমঞ্জস।

তখন ঈষৎ বিশ্রামক্ষণে সেই দুইটী সংবদ্ধ বাহুর মধ্যে যে হৃদয়, সেই হৃদয়ের রঙে জগজ্জনের পতাকার মধ্যে অকস্মাৎ যে রংটি লিখিত হইবে, প্রভাতের তপনকে তাহার উপরে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া ভাবিতে হইবে, আজ কাহার আমি? কালের অথবা মানুষের?

মানুষও নিশ্চয় ভাবিবে, কত যুগ পার হইয়া আসিয়াছে, এইবার আবার কত নূতন যুগ পার হইতে হইবে!

যুগ-উষার শুভ এমন মুহূর্ত্তটিতে কোন জাতির কোনরূপে ব্যর্থ হইবার অবসর নাই। কেন না এ আহ্বান সমগ্র জগতের। জগতের আহ্বানের উত্তর, যে মানুষ, তাহাকে দিতেই হইবে। আপনার দান বঙ্গভূমি জগতে কখনও অল্প করিয়া দেয় নাই। আজও তাহাকে তেমনই করিয়া দিতে হইবে। নারায়ণ তাহার প্রতিটি চিত্তে, ভাবে এবং কর্ম্মে সচল এবং প্রাণভরা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন, তাহার প্রতিটি ধূলিকণা জাতির ও জগজ্জাতির রত্নপ্রসূ বিত্তসম্পদে পরিণত হইবে; মুক্তগগনের আলোর মত তাহার মস্তিষ্ক, উদার মাঠের মত তাহার হৃদয়, নদীর সাগরাভিমুখী ধারার মত তাহার সহস্রমুখ প্রয়াস—জলে, স্থলে পল্লীতে, নগরে, নিজেকে সুসার্থক করিয়া তুলুক। যেন কোন ছেদ ইহাতে না থাকে। তাহার জ্ঞানপুরী ও কর্ম্মপুরীর ভিতরে বাহিরে জীবনের সাড়া তাহার খ্যাতিকে অমৃতনিষিক্ত করিয়া জাগিয়া উঠুক। অন্দরে এবং সদরে বিশ্বের সঙ্গে যে সে চলিবে জগৎলোকের গণনার সংখ্যায় যে তাহার নামের উল্লেখ স্পষ্ট

রহিবে শুধু তাহাই নয়, তাহার গতির মর্য্যাদা সুনির্ম্মল রহিবে, যদি তাহা অভিযানের প্রথম প:ক্তিটিই আশ্রয় করে। বাঙ্গালার সাধনা, বাঙ্গালার ভাষা যদি বিশ্বের বিজয়গান রচনার আনন্দস্থর দিয়া থাকে, তবে মানবের নব অভিযানের বোধনের প্রভাতে, তাহার অধিকারও অশেষ।

রঞ্জেন রশ্মির ইতিহাস

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে অধ্যাপক রঞ্জেনের এক্স-রেজ্ আবিষ্কার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কিন্তু তাঁহার আবিষ্কার অপ্রত্যাশিত অথবা এই আবিষ্কার এতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকাই অপ্রত্যাশিত তাহা ঠিক বলা যায় না, কারণ খুব সম্ভব বিয়োগরশ্মি লইয়া পরীক্ষাকালে অনেকেই এই নূতন রশ্মির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইহাকে চিনিতে বা ইহার গুণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্ এক সময় তাঁহার পরীক্ষাগারে সযত্নে রক্ষিত কতকগুলি ফটোগ্রাফের কাচকে বিকৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা যে ক্রুক্‌স্-গোলক হইতে নিঃসৃত রঞ্জেন রশ্মির কার্য্য সে সময় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানের কোন প্রসিদ্ধ আবিষ্কারই একজনের চেষ্টায় সফল হয় নাই। বিয়োগরশ্মি লইয়া অনেকেই সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন অধ্যাপক রঞ্জেন।

১৮৯৫ সালের শেষভাগে রঞ্জেন তাঁহার নব আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, ইহা বেরিয়ম্ প্ল্যাটিনোসাইনাইডের উপর পড়িয়া উহাকে দীপ্তিমান করে, মোটা কাগজ, কাষ্ঠ, চামড়া, মাংস বা হাল্‌কা ধাতুফলক সহজে ভেদ করিয়া যায় ও ফটোগ্রাফের কাচকে বিকৃত করে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে এই রশ্মির ভেদশক্তি পদার্থের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে; যেমন মাংস যত সহজে ভেদ করিতে পারে, অস্থি তত সহজে নয়। য়্যালুমিনিয়ম্ ইত্যাদি লঘু ধাতুফলক সহজে ভেদ করিতে পারে, কিন্তু সীসক প্রভৃতি গুরুভার ধাতু ইহার নিকট অস্বচ্ছ। রঞ্জেন যদিও এই নবরশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহা যে বিয়োগরশ্মি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা দেখাইলেন, কারণ বিয়োগরশ্মির ন্যায় ইহার প্রবাহ-পথ চুম্বক দ্বারা বাঁকাইতে পারা যায় না। ইহার সঠিক প্রকৃতি নির্ণীত না হইলেও সাধারণ আলোকের সহিত অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলেন।

এদিকে তখনও পর্য্যন্ত বিয়োগরশ্মির প্রকৃতি নিরূপিত হয় নাই, তাহার উপর অধ্যাপক রঞ্জেনের এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক মহলে নূতন কৌতূহল উদ্দীপিত করিল। অনেকেই ইহার তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন, সুতরাং পুনরায় বাগ্-বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। একদল বলিলেন, ইহা

বিয়োগরশ্মির ন্যায় জড়কণা সমষ্টিমাত্র তবে তাড়িতভারবিহীন বলিয়া চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। অপর দল স্বীকার করিলেন যে ইহা সাধারণ আলোক রশ্মিপুঞ্জের ন্যায় ঈথরতরঙ্গ উদ্ভূত বটে; কিন্তু ইহা সাধারণ আলোকতরঙ্গের ন্যায় ঈথরকণার তির্য্যক্‌কম্পন দ্বারা উৎপন্ন নহে। ইহা শব্দতরঙ্গে বায়ুকণার ন্যায় তরঙ্গপথে লম্বালম্বি কম্পন দ্বারা উৎপন্ন। তৃতীয় দল বলিলেন যে, আলোকতরঙ্গের সহিত কোনও পার্থক্য নাই।

যাহা হউক, রঞ্জেন রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় লইয়া এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ১৮৯৭ সালে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক স্যার জে, জে, টম্‌সন্‌ তাঁহার বহু নিপুণ পরীক্ষা ও গণনা দ্বারা বিয়োগরশ্মি যে অতি সূক্ষ্ম বিযুক্তাড়িত কণিকার সমষ্টিমাত্র সে বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই সকল কণিকা ক্রুক্‌সের মতানুযায়ী জড়কণিকা অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম, ইহাদের জড়ত্ব কিছুই নাই, ইহারা খাঁটি তাড়িত। অধ্যাপক টম্‌সন্‌ ইহাদের তাড়িতের পরিমাণ, গতিবেগ (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৯০০০ মাইল), দ্রব্যমান বা মাত্রা (সর্ব্বাপেক্ষা লঘু উদজান পরমাণুর সত্তার $\frac{১}{১৮০০}$ অংশ) ইত্যাদি সকল তথ্য নিরূপণ করিলেন। তিনি এগুলির নাম দিলেন অতি পরমাণু; কিন্তু পরে জনষ্টন্‌ ষ্টোনি প্রদত্ত নাম অনুসারে ইহারা বিযুক্তাড়িতন নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে এক গ্র্যাম (১৫.৪৩২ গ্রেণ) বিযুক্তাড়িতন পাশাপাশি রাখিলে সেই পংক্তিটি (লাইন) এত দীর্ঘ হইবে যে উহা, পৃথিবী হইতে সূর্য্য পনর বার ঘুরিয়া আসিতে পারে। ইহাকে বৈজ্ঞানিকগণ বিযুক্তাড়িতের পরমাণু বা ক্ষুদ্রতম অংশ ধার্য্য করিয়াছেন এবং পরে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বিযুক্তাড়িতনই একমাত্র মূল পদার্থ যাহাদ্বারা বিশ্বের সকল পরমাণু গঠিত; ইহাই একমাত্র শক্তি যাহা সকল ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত।

বিয়োগরশ্মির এই বিযুক্তাড়িতনের কোথা হইতে উৎপত্তি? বায়ু নিষ্কাশিত গোলকের ভিতর তাড়িতপ্রবাহ চালাইলে বায়ুর অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং এই বিশ্লিষ্ট অংশের কতকগুলি বিযুক্তাড়িত ও কতকগুলি যুক্তাড়িত যুক্ত থাকে। বিযুক্তাড়িতযুক্ত বিশ্লিষ্ট অংশগুলি গোলকের যুক্ত তাড়িতদ্বার ও যুক্তাড়িতযুক্ত অংশগুলি বিযুক্ত তাড়িতদ্বারের দিকে আকৃষ্ট হয়। গোলকের ভিতর বায়ুর চাপ হ্রাস হইলে যুক্তাড়িতবাহক কণিকাগুলি অতি দ্রুতবেগে বিযুক্ত তাড়িতদ্বারের দিকে ধাবিত হইয়া তাড়িতদ্বারের উপর আঘাত করিবার ফলে উহা হইতে বিযুক্তাড়িতন নির্গত হয়। ইহা ব্যতীত যুক্ত তাড়িতদ্বারের নিকটস্থ বায়ুকণাও ধাক্কাধাক্কির ফলে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিযুক্তাড়িতন নিঃসৃত করে। এই মুক্ত বিযুক্তাড়িতন সমূহ বিযুক্ত তাড়িতদ্বার হইতে ভীমবেগে প্রতিহত হইয়া বিপরীত দিকে ধাবিত হয়; এবং এই বিযুক্তাড়িতনস্রোতই বিয়োগরশ্মি নামে অভিহিত।

বিয়োগরশ্মি সম্বন্ধে প্রায় সকল তথ্য জানা হইলেও বৈজ্ঞানিকগণ রঞ্জেন রশ্মির প্রকৃত তথ্যের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দেখা গেল, সাধারণ আলোকরশ্মির ন্যায় ইহা সরলরেখায় ধাবিত হয় এবং রশ্মিপথে রক্ষিত পদার্থের ছায়া নিক্ষেপ করে, ফটোগ্রাফের কাচ বিকৃত করে; কিন্তু সাধারণ আলোকের ন্যায় ইহাকে দর্পণে ফেলিয়া প্রতিফলিত করা যায় না, ত্রিকোণ কাচ বা কাচপুট দ্বারা ইহার পথের তির্য্যক্‌বর্ত্তন হয় না, এবং স্ফটিক জাতীয় পদার্থ দ্বারা সাধারণ সর্ব্বমুখী আলোকতরঙ্গের স্পন্দন শৃঙ্খলিত করিয়া যেমন একমুখী করা যায়

ইহাকে সেরূপ করা যায় না। তথাপি অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের ধারণা হইল যে ইহা সাধারণ আলোক পর্য্যায়ভুক্ত, যদিও ইহাদের প্রকৃতি সকল বিষয়ে অনুরূপ নয়। তাঁহারা বলিলেন যে, রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাধারণ আলোকতরঙ্গের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রচলিত উপায়ে উভয়ের সাদৃশ্য প্রমাণ করা যায় না। দর্পণ, পারদ প্রভৃতি দ্বারা সাধারণ আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইবার কারণ এই যে, উহাদের উপরিতল নিখুঁতভাবে মসৃণ না হইলেও সে অসমতা আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় উপেক্ষণীয়; কিন্তু রঞ্জেন রশ্মিতরঙ্গ এত ক্ষুদ্র যে অতিশয় মসৃণ পদার্থও ইহার তুলনায় বন্ধুর, সেজন্য এই সকল পদার্থের দ্বারা ইহার প্রতিফলন সম্ভব নহে। কক্ষ-প্রাচীর বা বৃক্ষাদি দ্বারা শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হইতে পারে, কিন্তু আলোকতরঙ্গ পারে না, কারণ আলোক-তরঙ্গ শব্দতরঙ্গ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। দৃশ্য আলোক-তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\frac{১}{৫০০০০}$ ইঞ্চির কাছাকাছি, কিন্তু শ্রুতি-গ্রাহ্য শব্দতরঙ্গদৈর্ঘ্য ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রাচীর বা বৃক্ষাদি আলোক-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় বন্ধুর হইলেও শব্দতরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তুলনায় মসৃণ বলা যাইতে পারে। রঞ্জেন রশ্মির ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্যই যে সকল উপায়ে সাধারণ আলোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করা যায় সে সকল উপায় এক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় না।

যাহা হউক, স্যার জর্জ্জ ষ্টোক্‌স্ ও পরে স্যার জে, জে, টম্‌সন্ রঞ্জেন রশ্মির উৎপত্তির এই কারণ স্থির করিলেন যে, বায়ুনিষ্কাশিত গোলক মধ্যে বিযুক্ত-তাড়িতনগুলি বিযুক্ততাড়িতদ্বার হইতে ভীমবেগে ছুটিয়া আসিয়া অপরদিকে কোন কঠিন বস্তুর উপর ধাক্কা দিবার ফলে ঐ বস্তুর পরমাণুসমূহ চঞ্চল হইয়া ঈথরে স্পন্দন সৃষ্টি করে এবং এই স্পন্দনজাত আলোকই রঞ্জেন রশ্মি।

যাহাতে বিযুক্ততাড়িতনগুলি আসিয়া ধাক্কা মারিতে পারে সেজন্য রঞ্জেন রশ্মি উৎপাদন করিবার কাচগোলক (রঞ্জেনগোলক) মধ্যে বিযুক্ততাড়িত-দ্বারের ঠিক বিপরীত দিকে কোন গুরুভার ধাতুনির্ম্মিত তাড়িতদ্বার (লক্ষ্যদ্বার) এইরূপ বক্রভাবে রক্ষিত হয়, যেন রশ্মিপুঞ্জ যতদূর সম্ভব গোলকের (৬নং চিত্র) একপার্শ্বে সংগৃহীত হইতে পারে।

লক্ষ্যদ্বার
মুক্ততাড়িত দ্বার
বিযুক্ত তাড়িত দ্বার
পর্দ্দা
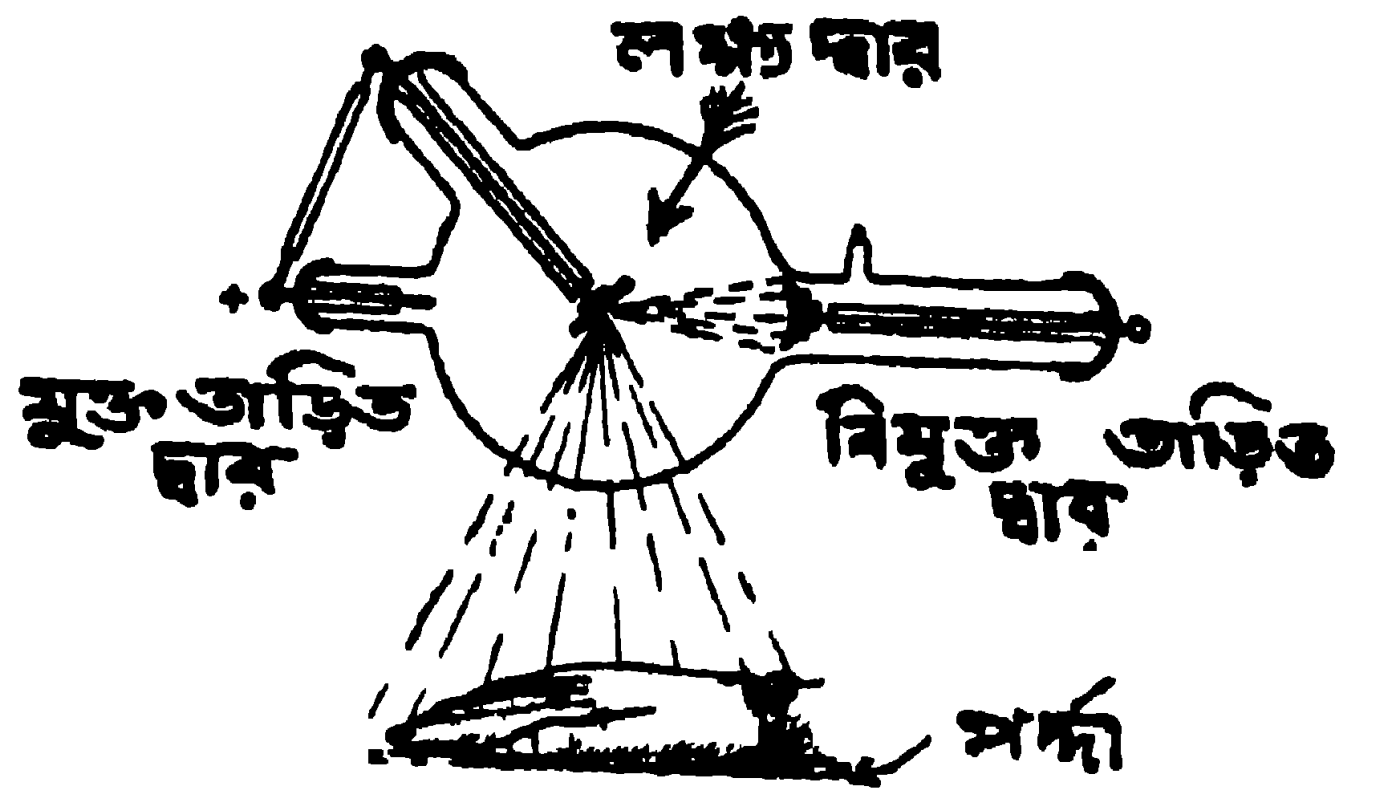
৬নং চিত্র

বিযুক্ততাড়িতন স্রোতকে লক্ষ্যদ্বারের উপর কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য বিযুক্ততাড়িতদ্বারকে নতোদর করা হয়। বিযুক্ততাড়িতনের আঘাতের ফলে লক্ষ্যদ্বার অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, সে নিমিত্ত ইহার জন্য সহজ দ্রবণশীল ধাতুর পরিবর্ত্তে প্রথমে প্ল্যাটিনম্ ব্যবহৃত হইত। অধুনা অধিকাংশস্থলে ইহা 'টাংষ্টেন' নামক ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত হয়। গোলকমধ্যস্থ বায়ুশূন্যতার মাত্রা ও তাড়িতপ্রবাহের চাপের উপর উহা হইতে প্রাপ্ত রশ্মির কার্য্যকরী শক্তি নির্ভর করে।

১৯০৪ সালে অধ্যাপক বার্ক্‌লা রঞ্জেন রশ্মি-তরঙ্গের স্পন্দন শৃঙ্খলিত করিয়া একমুখী করিতে সমর্থ হইয়া সাধারণ আলোকের সহিত ইহার সাদৃশ্যের প্রমাণ দৃঢ় করিলেন। পরে ১৯০৭ সালে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ভান্ স্থির করিলেন যে, সাধারণ আলোকতরঙ্গদৈর্ঘ্য রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষা

প্রায় দশ সহস্রগুণ অধিক। এইরূপে উভয় আলোকের সাদৃশ্যের প্রমাণ দূরীভূত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ১৯১২ সালে ইহার সকল সন্দেহ দূর করিলেন জার্ম্মানীর অন্তর্গত ম্যুনিক্ সহরের অধ্যাপক ফন্ লাওয়ে। তিনি রঞ্জেন রশ্মির প্রকৃতি পরীক্ষা করিবার জন্য এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিলেন। তিনি বলিলেন যে রঞ্জেন রশ্মির অতিশয় ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য কাচ, জল, পারদ প্রভৃতি সাধারণ বস্তু দ্বারা ইহার প্রতিফলন, তির্য্যগ্-বর্ত্তন প্রভৃতি আলোকধর্ম্ম পরীক্ষা সম্ভব হয় না, কিন্তু সকল দানাদার বস্তুর ভিতরে অণুপরমাণুগুলি এরূপ সূক্ষ্ম প্রণালীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে যে উহাদের অন্তরস্থ অণুপরমাণু দ্বারা রঞ্জেন রশ্মির প্রকৃতি পরীক্ষা কার্য্য চলিতে পারিবে। অধ্যাপক লাওয়ের এইরূপ মত প্রচারের পর ফ্রিড্রী এবং ক্লিপ্পিং একত্রে পর বৎসরেই ঐ মতানুযায়ী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া রঞ্জেন রশ্মি সাধারণ আলোক হইতে বিভিন্ন এইরূপ মতবাদিগণকে নীরব করিলেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে মিছরি, লবণ প্রভৃতি যে সকল জিনিষের দানা দেখা যায় তাহারাই যে শুধু দানাদার তাহা নয়। অধিকাংশ পদার্থই দানাদার। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, তুলা বা রেশম দানাদার, কিন্তু কাচ দানাদার নয়।

প্রতিফলন ও তির্য্যগ্বর্ত্তন ব্যতীত সাধারণ আলোকের আরও একটি ধর্ম্ম আছে। কোন পুষ্করিণীর দুই স্থলে একই সময়ে দুইটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে ঐ দুই স্থান হইতে উৎপন্ন তরঙ্গসমূহ চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইবার কালে উহাদের মধ্যবর্ত্তী কোন যায়গায় দেখা যাইবে যে, উভয় দিক হইতে আগত তরঙ্গে তরঙ্গে কাটাকাটি হইয়া কোথাও কোথাও দুই তরঙ্গই লোপ পায়। বায়ুর ভিতরে শব্দতরঙ্গও এইরূপ কাটাকাটি হইয়া দুই বা ততোধিক শব্দে মিশিয়া নিঃশব্দতা আনয়ন করে। জলতরঙ্গ ও শব্দতরঙ্গের ন্যায় সাধারণ আলোকতরঙ্গেরও এইরূপ কাটাকাটির ফলে আলোকে আলোকে মিশিয়া আঁধার ঘটে। আলোকের এই ধর্ম্মকে ব্যতিকরণ বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক লাওয়ের আবিষ্কার বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। ফ্রিড্রী ও ক্লিপ্পিংএর পরীক্ষার পর ইংরাজ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ব্র্যাগ্ ও তাঁহার পুত্র দানাদার বস্তুর বিভিন্ন তলে সজ্জিত পরমাণু দ্বারা প্রতিফলিত রঞ্জেন রশ্মিতরঙ্গের সাধারণ আলোকতরঙ্গের ন্যায় ব্যতিকরণ ধর্ম্ম পরীক্ষার পর এই উভয় আলোকই যে সমপ্রকৃতিসম্পন্ন এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র মতদ্বৈধ রহিল না।

সাধারণ রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্র (Spectroscope) রঞ্জেন রশ্মি পরীক্ষার অনুপযুক্ত বলিয়া অধ্যাপক ব্র্যাগ্ এই কার্য্যের উপযোগী নূতন রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তদ্দ্বারা বহু দানাদার পদার্থ পরীক্ষার ফলে শুধু রঞ্জেন রশ্মি সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করিলেন তাহা নহে, তিনি ঐ সকল দানাদার পদার্থের অভ্যন্তরস্থ অণুপরমাণু বিন্যাসের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের পিতাপুত্রের গবেষণা ধাতু ও স্ফটিক বিদ্যায় নবরূপ দান করিয়া রসায়ন বিজ্ঞানকে চিরঋণী করিয়াছে। যে কার্য্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা এতকাল প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, রঞ্জেন রশ্মি সেই সব গূঢ় তত্ত্ব বাহির করিয়া দিল। একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অনেকেই জানেন যে গ্রাফাইট্ ও হীরক একই অঙ্গারের রূপান্তর মাত্র; কিন্তু গ্রাফাইট্ জিনিষটি বেশ নরম ও সহজলভ্য বলিয়া সস্তা, আর হীরক অতীব কঠিন ও মহার্ঘ। কি কারণে একই পদার্থের এই প্রকার বিভিন্ন রূপ ও গুণ হইল ইহার প্রকৃত তথ্য

ইতিপূর্ব্বে রাসায়নিকেরা ঠিক করিতে পারেন নাই। কিন্তু অধ্যাপক ব্র্যাগ্ তাঁহার রঞ্জেন রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্র দ্বারা গ্রাফাইট্ ও হীরক পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বিভিন্ন তলে অবস্থিত পরমাণুসমূহ দ্বারা প্রতিফলিত রশ্মির তীব্রতা মাপিয়া বা আলোকচিত্র উঠাইয়া তাহা হইতে উহাদের অণুপরমাণু বিন্যাসের নমুনা গঠন করিয়া দেখাইলেন যে বিভিন্ন বিন্যাসই উহাদের কাঠিন্য, ভঙ্গপ্রবণতা, দ্রবণোত্তাপ, স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মের হেতু। ব্র্যাগের প্রস্তুত এই দুই পদার্থের আভ্যন্তরীণ গঠনচিত্র (৭নং ও ৮নং চিত্র) দেওয়া গেল। ব্র্যাগ্ এইরূপ বহু দানাদার জিনিষ লইয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ গঠনরহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই কার্য্যে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক হাল্ ও ইংরাজ বৈজ্ঞানিক মোজ্লের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মণ্ডলী ইহার সম্বন্ধে নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত থাকিলেও সাধারণ জগৎ উহা গ্রাহ্য না করিয়া এই রশ্মি জনসাধারণের কি কার্য্যে লাগিবে ও কতদূর উপকারে আসিবে তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষতঃ অস্ত্র চিকিৎসকগণের মহদুপকার সাধন করিবে, চিকিৎসকগণ অচিরেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। অতি শীঘ্রই দেশবিদেশে এই অদ্ভুত রশ্মির বিষয় প্রচারিত হইয়া রঞ্জেনের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল ও তিনি নানা সম্মানের অধিকারী হইলেন। স্বয়ং জার্ম্মান সম্রাট্ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অস্ত্র চিকিৎসায় রঞ্জেন রশ্মির উপকারিতা এত শীঘ্র সকলেই উপলব্ধি করিলেন যে, আবিষ্কারের পর সামান্য এক বৎসরের মধ্যেই ইহা সকল দেশের চিকিৎসকগণ দ্বারা ব্যবহৃত হইতে লাগিল, এবং
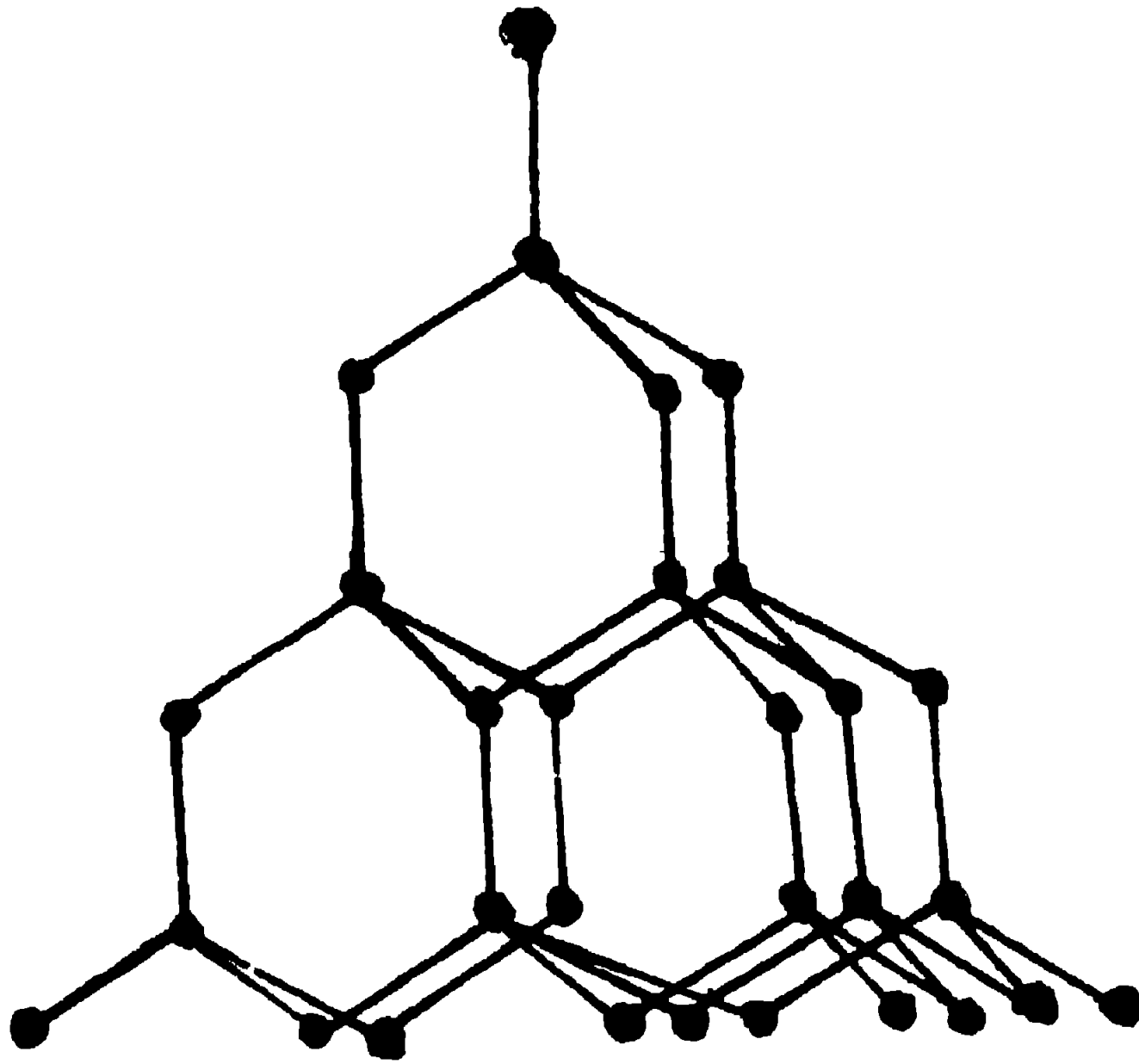
(৭নং চিত্র)

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রঞ্জেনের অপূর্ব্ব রশ্মি আবিষ্কারের পর হইতেই নানাদেশের বৈজ্ঞানিক-

অন্যান্য রোগনির্ণয় বিষয়েও ইহার কার্য্যকারিতা ১৮৯৭ সালের প্রারম্ভেই জানা গেল।
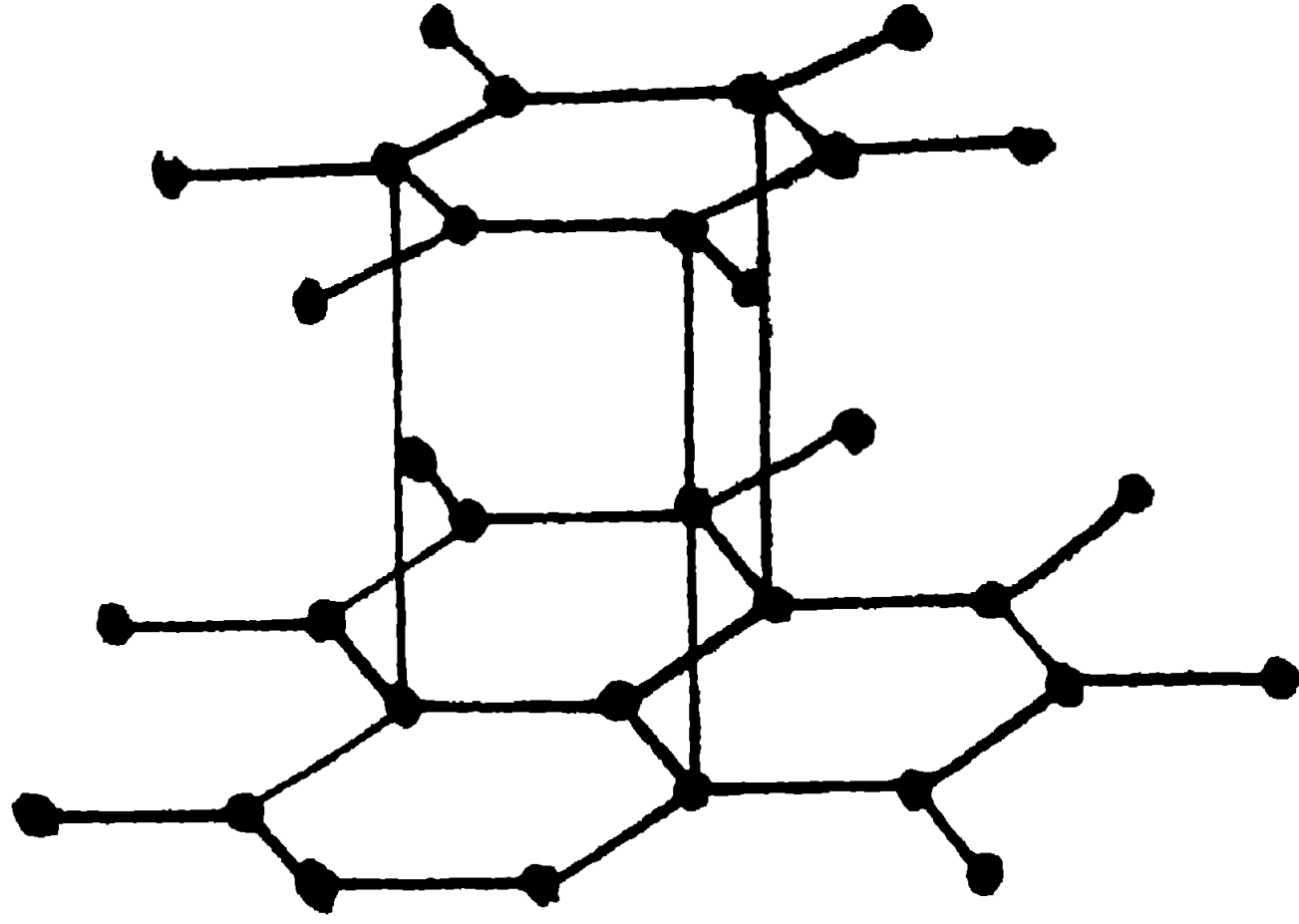
(৮নং চিত্র)

রঞ্জেন রশ্মির উপকারিতা চতুর্দ্দিকে বিদিত হইবার প্রারম্ভকালে অনেক কৌতুকপ্রদ ঘটনা শুনিতে পাওয়া যাইত। একজন স্ত্রীলোক পায়ের অঙ্গুলিতে কিছুকাল হইতে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ করিত। যন্ত্রণা এক এক সময় এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত যে, তাহার মনে হইত, অঙ্গুলি কাটিয়া না ফেলিলে উহার উপশম হইবে না।

যন্ত্রণার জন্য জুতা ব্যবহার করা দূরে থাক সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। ডাক্তার উপর হইতে ফোড়া ইত্যাদি কিছুরই লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যেরূপ মাপের জুতা ব্যবহার করা উচিত বরাবর তদপেক্ষা ছোট জুতা জোর করিয়া ব্যবহার করার ফলে পদাঙ্গুলির অস্থি বাঁকিয়া গিয়াছে, সুতরাং অন্য চিকিৎসার পূর্ব্বে তাহার ছোট জুতা ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকটি কিন্তু ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করিতে বা ছোট জুতা ব্যবহার করিতে রাজী হইল না। ডাক্তার তখন নবাবিষ্কৃত রঞ্জেন রশ্মিদ্বারা তাহার পদাঙ্গুলির অস্থির ছায়াচিত্র দেখাইয়া স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস উৎপাদন ও তাহাকে ছোট জুতা ব্যবহার ত্যাগ করিতে রাজী করাইলেন।

ইংলণ্ডে এই রশ্মির প্রথম উপকারিতা লাভ করিল উনিশ বৎসর বয়সের একটি বালক। ক্রিকেট খেলায় তাহার হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপর বলের এরূপ আঘাত লাগে যে তাহাতে অঙ্গুলিটী একেবারে বাঁকিয়া রহিয়া ছিল। অঙ্গুলি সোজা করিতে বা হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিতে গেলে সে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করিত। চিকিৎসকগণ বলিলেন যে, অঙ্গুলিটী সম্পূর্ণ কাটিয়া ফেলা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। তখন কেহ কেহ নূতন রশ্মির সাহায্য লইয়া অঙ্গুলি মধ্যে প্রকৃত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পরামর্শ দিলেন। রঞ্জেন রশ্মি পরীক্ষায় দেখা গেল যে, অঙ্গুলি মধ্যে একটি নূতন অস্থি উদ্গত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহার শেষ দুই গ্রন্থিকে সংযুক্ত করিয়াছে। তখন সামান্য অস্ত্রোপচার দ্বারা নূতন অস্থিটী কাটিয়া ফেলায় সহজেই রোগ নির্ম্মূল হইল এবং অঙ্গুলিটীও রক্ষা পাইল।

ইংলণ্ডের স্যার রিচার্ড গ্রেগরী তাঁহার নিজের একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। রঞ্জেন

রশ্মি প্রচারিত হইবার অনতিকাল পরে অধ্যাপক হার্বার্ট্ জ্যাক্সন্ একদিন তাঁহার দুই একজন বন্ধুকে ঐ নব রশ্মির অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্যার রিচার্ড গ্রেগরী বন্ধু গৃহে যাইবার পথে একটি ছাতা ক্রয় করিলেন। ক্রয় করিবার সময় দোকানদারকে বিশেষ করিয়া বলিলেন যেন ছাতার হাতল ও দণ্ডের ভিতর কোন জোড়া না থাকে। ঐ উপদেশ অনুযায়ী দোকানদার তাঁহাকে একটি ছাতা দিয়া বলিয়া দিল যে উহার হাতল ও দণ্ড একই কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত। স্যার রিচার্ড দোকানদারের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া বন্ধুগৃহে পৌঁছিয়া নব রশ্মির দ্বারা উহা পরীক্ষা করিবার কল্পনা করিলেন। অধ্যাপক জ্যাক্সন্ রঞ্জেন রশ্মি সাহায্যে ছাতাটির ছায়াচিত্র লইয়া দেখিলেন যে, হাতলটি দণ্ডের সহিত স্ক্রু দিয়া জোড়া আছে। অবশ্য উপর হইতে স্ক্রুর অস্তিত্ব কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না। যাহা হউক, ফিরিবার পথে যখন ছাতাটি ফিরাইয়া দেওয়া হইল, তখন দোকানদার যে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি?

চিকিৎসাবিভাগে রঞ্জেন রশ্মি যে ক্রমশঃ সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। ইহার সাহায্যে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট সূচ হইতে আরম্ভ করিয়া গোলাগুলি পর্য্যন্ত কোথায় ও কিরূপভাবে অবস্থিত আছে, তাহার সঠিক নির্দ্ধারণ কিম্বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে বা কোথাও নূতন অস্থি জন্মাইলে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া চিকিৎসকগণের অস্ত্রোপচার কার্য্য অনেক সহজ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত যকৃৎ ও পাকস্থলী সম্বন্ধীয় রোগ, পাথরী, যক্ষ্মা ও অন্যান্য নানাবিধ রোগনির্ণয় কার্য্য ইহা দ্বারা অতি সহজে ও সংশয়শূন্যরূপে সম্পন্ন হয়। চিকিৎসাবিভাগ ছাড়া আরও কত প্রকারে—বিশেষতঃ ব্যবসাক্ষেত্রে যে ইহা মানবসমাজের উপকারে আসিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া কঠিন।

রঞ্জেন রশ্মির সাজসরঞ্জাম (৯নং চিত্র) বিনা আধুনিক যুদ্ধায়োজন অসম্পূর্ণ; কিন্তু যুদ্ধে ইহা যে কেবল আহত সৈনিকের অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। যুদ্ধে ব্যবহৃত গোলাগুলির ভিতর ফাটল বা অন্য কোন খুঁত আছে কিনা তাহাও এই রশ্মি সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। ইহা ব্যতীত কত বিবিধ ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে ইহা প্রযুক্ত হইতেছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গল্ফ্ খেলার বল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যোমযানের বিভিন্ন অংশের কাষ্ঠ ও লৌহাদি ইহার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ইহার সাহায্যে হীরক ও অন্যান্য মণিমুক্তাদি নকল কি আসল তাহা জানিতে পারা যায়, চিনি ময়দা ইত্যাদিতে বালু, খড়ি ইত্যাদি মিশ্রিত আছে কিনা বুঝিতে পারা যায়। শুনা যায় যে অনেক 'চকোলেট্' ব্যবসায়ী চকোলেটের ভিতর কোন ধাতুর গুঁড়া ইত্যাদি মিশান আছে কিনা রঞ্জেন রশ্মি দ্বারা তাহা পরীক্ষা করে। শুল্ক আফিসের কর্ম্মচারীগণ সন্দেহ হইলে রুদ্ধ ও শীলমোহরাঙ্কিত বাক্সের ভিতরের জিনিষপত্রাদি ইহার সাহায্যে দেখিয়া লইতে পারেন। ইহার ব্যবহার ক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে, কোন কোন জুতার দোকানেও এই রশ্মির সরঞ্জাম প্রস্তুত থাকে যাহা দ্বারা জুতা ক্রয়কালে নূতন জুতার ভিতর পায়ের অস্থিগুলি কিরূপ সহজ অবস্থায় আছে তাহার ছায়াচিত্র (১০ নং চিত্র) তখনই ক্রেতাকে দেখাইয়া দেওয়া হয়।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, এই সামান্য সময়ের মধ্যে রঞ্জেন রশ্মি চিকিৎসাশাস্ত্রে, রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান, পূর্ত্ত-বিজ্ঞান এবং শিল্প ও ব্যবসা-

(৯নং চিত্র)

ক্ষেত্রে—সর্ব্বত্রই উচ্চাসন গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে ইহার সাহায্যে জগতের আরও অধিক উন্নতি সাধিত হইবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

(১০নং চিত্র)

বিজ্ঞানপথে ভগবান
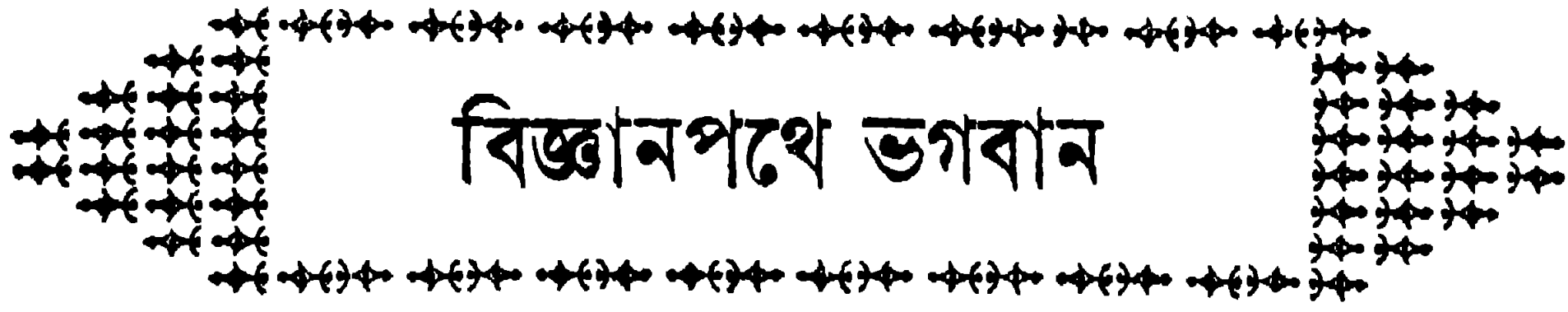
[শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী]

লীলাময়ী প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের সম্পূর্ণতা ও তাহার শক্তির খেলার মৃদুতা ও উদ্দামতা লক্ষ্য করিলে কাহার হৃদয়ে না স্বতঃই এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভাবুক ভক্ত গাহেন—

—"বল্‌রে তরু বল,
কে তোরে সাজায়ে দিল পত্র পুষ্প ফল।"

তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ; কিন্তু হয়ত জগতের সহস্র ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণ ও ব্রহ্মময়ীর মায়া ভাবুকের উচ্ছ্বাসকে বিপথে চালিত করিয়া কোনও সময়ে তাঁহার হৃদয়ের ভাবধারা শুকাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক হৃদয়ের ভাবের সহিত জড় চক্ষেও বৃক্ষের অস্তিত্বের অণুপরমাণুর সহিত পরিচিত হইয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারে যে কে তাহাকে এরূপ নিখুঁতভাবে পত্রপুষ্পফলে সাজাইয়া দিয়াছে সে কখনও যোগভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্ট হইবে না। আমরা আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, পশুপক্ষী ও মনুষ্যরাজ্যে অসংখ্য রকমের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্রিয়া দেখিয়া ভগবানের লীলায় অভিভূত হইয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকি; কিন্তু যদি আমরা আরও সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারি যে এই পঞ্চভূতের অন্তরতম প্রদেশে কি প্রবল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সকল চলিতেছে তাহা হইলে আমরা চিরদিনই ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব ও ভোগ করিয়া পরমানন্দে দিনপাত করিতে পারিব। তরুলতা প্রভৃতি কিভাবে আমাদের পরিত্যক্ত নিশ্বাসের বিষাক্ত বায়ু নীলকণ্ঠের ন্যায় নিজেরা গ্রহণ করিয়া লইয়া নিজেদের বৃদ্ধি সাধন করে ও আমাদের প্রশ্বাসের বায়ু অনবরত অক্লান্তভাবে সানন্দে পরিষ্কার করিয়া দিতেছে, কিভাবে জীবের জীবনদায়ী বায়ুর অমৃতও অতিরিক্ত গ্রহণে যাহাতে তাহা আমাদের ক্ষতি সাধন না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ভগবান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিলে সংশয়িতা হৃদয়ও সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে।

প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত কর্ম্মী আপন হৃদয়তন্ত্রী সৃষ্টিশক্তির সুরের সহিত মিলাইয়া জগতের সকল তথ্য অবগত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ভগবানকে জানিবার এবং তাহাদিগকে প্রকৃত সুখ ও আনন্দের উৎস কোনখানে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে অনেক প্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া ভগবৎ সাধনা বা ভগবৎ প্রাপ্তির পরও বিজ্ঞান সাধনা প্রাচীন ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

বৃক্ষের যে প্রাণ আছে তাহা ভারতের প্রাচীন ভিষকৃগণ অবগত ছিলেন বলিয়া মানবব্যাধি দুরীকরণের জন্য কোন বিশেষ ঔষধ প্রস্তুতকালে কোন বৃক্ষোৎপাটন করিতে হইলে তাঁহারা প্রাণীহত্যার তুল্য কষ্ট উপভোগ করিতেন ও সেই সকল বৃক্ষের

নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহাদের মূলোৎপাটন করিতেন।

বজ্রের শক্তি দেখিয়া আমরা ইন্দ্রের শক্তি পরিমাপ করি, কিন্তু অণুপরমাণুর মিলন ও বিচ্ছেদে যে শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা জগতের অতি বড় জড়বাদী ও অবিশ্বাসীর হৃদয়েও ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছে। বিজ্ঞানের চরম জ্ঞান যদি বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপের ভাবরাজ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ঐ জ্ঞানের প্রসার কিরূপ সুফল প্রসব করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বাস্তবিকই আজকাল ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্ম্ম কোথায়? বেহার ও যুক্তপ্রদেশবাসিগণ সকল বিষয়েই অতিরিক্ত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন। তাঁহারা বাঙ্গালীকে মৎস্য ও মাংসভোজী বলিয়া ঘৃণা করেন ও নিজেরা ধর্ম্মের দিকে অনেকটা অহিংসব্রতী। তাঁহারা দিবা-রাত্র নিজের শরীরকে স্থূল হইতে স্থূলতর করিতেছেন কেবলমাত্র কিভাবে লাঠি দ্বারা নিজের দেশের লোকের মস্তক চূর্ণ করিবে সেই উদ্দেশ্যে ঐ বেহারদেশবাসী গোয়ালারা কিরূপ নির্ম্মমভাবে 'গোমাতাকে' শোষণ করিতেছে, গোবৎসের চর্ম্মনির্ম্মিত কৃত্রিম গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া ঐ গাভীগুলিকে কিরূপ নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর-ভাবে প্রতারিত করে তাহা দেখিয়া অতিবড় পাষণ্ডের, অতিবড় অধার্ম্মিকের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা ঐ সকল পূর্ণযৌবনা গাভীগুলিকে কসাইয়ের হস্তে সমর্পণ করে। বাস্তবিক যদি ঐ সকল ব্যক্তি নিজেদের প্রকৃত ধর্ম্মকে বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা ঐরূপ জঘন্য কার্য্যে কখনও লিপ্ত হইত না। সন্ধ্যায় ইহারা শ্রীকৃষ্ণের ও রামসীতার ভজনা করে, অথচ সারাদিন ঐ সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকে। ইহাই কি ঘোর কুসংস্কারের ফল নয়?

আমাদের দেশেও দেখিতে পাই আজকাল পল্লী-গ্রামবাসিগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সদ্ভাব বলিয়া কোন জিনিষই নাই। ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হইতেছে মৈত্রী, কিন্তু পল্লীতে অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য কারণে গ্রাম্য বিবাদ আরম্ভ হয় পরে তাহা প্রবলাকার ধারণ করিয়া দশ বিশ, এমন কি, পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়াও চলিতে থাকে। ফলে গ্রাম্য শ্রী গ্রাম পরিত্যাগ করে। ধর্ম্ম তখন কোথায় থাকে?

সেই জন্য দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে হইলে দেশব্যাপী বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রচারের প্রয়োজন হইবে। তাহা হইলে দেশ কুসংস্কার বর্জ্জিত ও মোহমুক্ত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের ও কর্ম্মের পথে চলিতে শিখিবে ও স্বরাজ লাভ করিয়া জগতকে আদর্শ জীবনযাত্রার প্রণালী শিক্ষা দিতে পারিবে। যদি আমরা বিজ্ঞান পাঠ করি ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নানারূপ রাসায়নিক পরীক্ষা সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে ও দেখিতে পারিব কি এক অপূর্ব্ব শক্তি দ্বারা এই জগৎ চালিত হইতেছে, আপাতদৃষ্ট বিবদমান বিষয়গুলির মধ্য দিয়া কি এক একতার মধুর ফল্গুপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। সাধারণভাবে বোঝা কঠিন ও কষ্ট-সাধ্য হইলেও আমরা যদি বিজ্ঞানাগারে 'বিগ্রহপাত' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, তাহা হইলে 'স্বধর্ম্ম', 'পরধর্ম্ম' ও বিগ্রহের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া জীবনকে সরল ও সহজ পথে চালিত করিতে পারি। নানারূপ আপাত মনোহর ও পরস্পর বিরোধী শক্তি সকল আমাদিগকে আর বিচলিত বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবে না।

তারপর জড়বিজ্ঞান মানুষকে বস্তুতন্ত্রবাদী করিয়া তোলে বলিয়া তাহা ঘৃণা করা চলে না। কারণ আমাদেরই শাস্ত্রে আছে জড় বলিয়া কোন জিনিসই নাই, সবই প্রাণবন্ত। আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র বসু মহোদয় ধাতু ও প্রস্তরের জীবন স্পন্দন দেখাইয়াছেন; ধাতব পদার্থেরও মানব ও পশুপক্ষীর ন্যায় ক্লান্তি

আছে। জড়ের আবার ক্লান্তি কেন? এ সকল তথ্য অবগত হইলে জগতে সুখ ও শান্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে।

আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে এরূপ প্রবলভাবের ও শক্তির বন্যা এক সময়ে আসিয়াছিল যাহা দ্বারা এদেশ-বাসিগণ তখন ইচ্ছা করিলে নিজেরা ত স্বাধীন থাকিতে পারিতই, অধিকন্তু জগতের সকল দেশের স্বাধীনতা লাভের সহায়ক হইতে পারিত; কিন্তু সে শক্তি, সে ভাবের বন্যা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, নিজেদের সমাজ-জীবনকে বিধিনিষেধের লৌহনিগড়ে বন্ধন করিতে ও তাহার চতুর্দ্দিকে বহির্জগতের সহিত সর্ব্ব সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী প্রাচীর গাঁথিতে।

যদি তথাকথিত জড়বিজ্ঞান বা জীবন-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে আমাদের কণামাত্র জ্ঞান থাকিত, যদি কিছুমাত্র দূরদৃষ্টি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে কৌলিন্যের দোহাই দিয়া সে সময়ে যে বহু বিবাহের প্রচলন করিয়া নিজেদের অদম্য ও অফুরন্ত শক্তি-প্রবাহকে অবাধে ভোগের পথে ও ক্ষয়ের নদীতে চালিত করিয়াছিলাম, তাহা কখনই করিতে পারিতাম না।

মহাদেব হইলে আমি গৌরীদানে বিশ্বাস করি। কিন্তু যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে অথবা মানুষের ভবিষ্যৎ ভালমন্দের একটুও জ্ঞান কাহারও থাকিলে কেহ কখনও তাহার অল্প বয়স্কা কন্যা বা নাতনীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীগৃহে প্রেরণ করিতেন না। কি শক্তির জোয়ার না বাঙ্গালাদেশে তখন আসিয়াছিল? সেই শক্তির জোয়ার রাখিয়া গিয়াছে বাঙ্গালাদেশে ন্যায় ও তন্ত্র; কিন্তু তাহার অপব্যয়ে সে হারাইয়াছে তাহার স্বাধিকার। এই শক্তির এবরূপ ব্যবহারে আজ ইংলণ্ডবাসী ভারতেশ্বর হইয়া নিজদেশে ভারতের সকল ধনরত্ন লইয়া যাইতেছে। সেই জন্য আমার মনে হয়, আমাদিগকে এক্ষণে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আবার সেই শক্তির তরঙ্গ আসিতেছে। আমরা যেন অচল অটলভাবে তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া দেশমাতৃকার উদ্ধারকল্পে ও তাঁহার সেবায় তাহা ব্যয় করি। জড়, জীব ও অধ্যাত্ম বা আত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা ইহা সম্ভব হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য ও আদর্শ সফল করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞানপথে দেশের জন-সাধারণ যতদূর স্বাধিকার ও ভগবান লাভে সমর্থ হয়, তাহার জন্য দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

তাপ-গতি-বিজ্ঞান

[ডক্টর যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

দহন

দহন—প্রজ্বলনের সময় দাহ্য পদার্থের উপাদানের (অঙ্গার, উদ্‌জান, গন্ধক ইত্যাদি) সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংমিশ্রণকে দহন বলে। এই কার্য্য সম্পাদনকালে তাপ উৎপন্ন হয়।

নিম্নলিখিত তালিকায় দাহ্য উপাদানের এবং যৌগিক পদার্থের অণু ও পরমাণু ভার দেওয়া হইল :—

	পরমাণুভার	অণুভার
উদ্‌জান H_2	১	২
অম্লজান O_2	১৬	৩২
নেত্রজন N_2	১৪	২৮
অঙ্গার C	১২	
গন্ধক S	৩২	
জল H_2O		১৮
অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান CO_2		৪৪
অঙ্গার-প্রথমাম্লজান CO		২৮
গন্ধক-দ্বি-অম্লজান SO_2		৬৪

ইন্ধনের দহনকার্য্য—নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা এই প্রক্রিয়ার ফল নির্দ্দেশিত হইয়াছে এবং সাঙ্কেতিক অক্ষরের নিম্নে নিজ নিজ অণুভার লিখিত হইয়াছে।

(১) উদ্‌জানের দহনকার্য্য :—

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

২×২ ৩২ ২×১৮

৪ ৩২ ৩৬
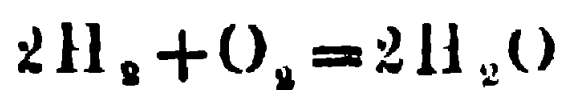
অর্থাৎ ৪ পাউণ্ড উদ্‌জান গ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে দহন করিতে হইলে ৩২ পাউণ্ড অম্লজানের প্রয়োজন এবং তাহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণে ৩৬ পাউণ্ড জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। সুতরাং ১ পাউণ্ড উদ্‌জানের জন্য ৮ পাউণ্ড অম্লজানের প্রয়োজন এবং ইহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণে ৯ পাউণ্ড জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবে। এইরূপ প্রজ্বলনে ১ পাউণ্ড উদ্‌জান গ্যাস প্রায় ৩৩৮৩০ সি, এইচ্, ইউ, তাপ প্রদান করে; কিন্তু ৯ পাউণ্ড জলীয় বাষ্প প্রায় ৪৮৩০ সি, এইচ্, ইউ, তাপ গ্রহণ করে বলিয়া অবশিষ্ট ২৯০০০ সি, এইচ্, ইউ, তাপ আমরা পাইয়া থাকি।

(২) অঙ্গারের দহনকার্য্য—

$$C + O_2 = CO_2$$

১২ ৩২ ৪৪
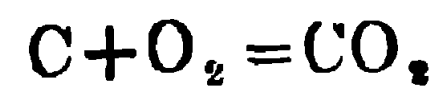
১ পাউণ্ড অঙ্গারকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিতে ২·৬৬ পাউণ্ড অম্লজানের প্রয়োজন এবং তাহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণে ৩·৬৬ পাউণ্ড অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান উৎপন্ন হয়। এইরূপ দহনের ফলে ১ পাউণ্ড অঙ্গার প্রায় ৮০৮০ সি, এইচ্, ইউ, তাপ প্রদান করে।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অম্লজানের অভাবে অঙ্গার যখন সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইতে পারে না, তখন নিম্নের সমীকরণ দ্বারা তাহা নির্দ্দেশিত হয়।

$$2C + O_2 = 2CO$$
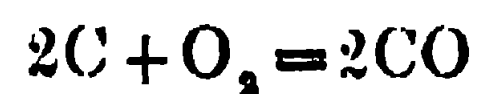
এইরূপ অবস্থায় প্রতি পাউণ্ড অঙ্গার প্রায় ২৪৪০

সি, এইচ্, ইউ, তাপ প্রদান করিয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্বতাপের হ্রাস (৮০৮০—২৪৪০)=৫৬৪০ সি, এইচ্, ইউ। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অঙ্গারকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিতে না পারিলে প্রদত্ত তাপের পরিমাণ হ্রাস হয়।

(৩) গন্ধকের দহন—

$$S+O_2=SO_2$$
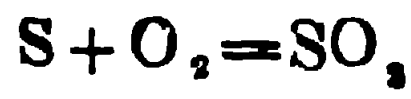
৩২ ৩২ ৬৪

উপরোক্ত সমীকরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১ পাউণ্ড গন্ধককে দহন করিতে হইলে ১ পাউণ্ড অম্লজানের আবশ্যক হয় এবং ইহাতে ২ পাউণ্ড গন্ধক-দ্বি-অম্লজান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ দহনে ১ পাউণ্ড গন্ধক প্রায় ২২২০ সি, এইচ্, ইউ, তাপ প্রদান করে।

বায়ুতে অম্লজান এবং নেত্রজনের অনুপাত—

	ভারে	আয়তনে
অম্লজান	২৩%	২১%
নেত্রজন	৭৭%	৭৯%

অর্থাৎ ১০০ পাউণ্ড বায়ুতে প্রায় ২৩ পাউণ্ড অম্লজান এবং প্রায় ৭৭ পাউণ্ড নেত্রজন আছে, সুতরাং $\frac{১০০}{২৩}$=৪·৩৫ পাউণ্ড বায়ুতে প্রায় ১ পাউণ্ড অম্লজান এবং প্রায় (৪·৩৫—১)=৩·৩৫ নেত্রজন আছে।

১০০ ঘনফুট বায়ুতে প্রায় ২১ ঘনফুট অম্লজান আছে। সুতরাং $\frac{১০০}{২১}$=৪·৭৬ ঘনফুট বায়ুতে প্রায় ১ ঘনফুট অম্লজান এবং প্রায় (৪·৭৬—১) =৩·৭৬ ঘনফুট নেত্রজন আছে।

সম্পূর্ণরূপে দহন করিতে ন্যূনতম বায়ুর ভার এবং আয়তন—

মনে কর, ১ পাউণ্ড ইন্ধনে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আছে—

	C	পাউণ্ড	অঙ্গার,
	H	"	উদ্জান,
	O	"	অম্লজান,
এবং	S	"	গন্ধক।

পূর্ব্বে আমরা পাইয়াছি

১ পাউণ্ড অঙ্গার সম্পূর্ণ দগ্ধ করিতে ২·৬৬ পাউণ্ড অম্লজানের প্রয়োজন হয়,

১ পাউণ্ড উদ্জান সম্পূর্ণ দগ্ধ করিতে ৮ পাউণ্ড অম্লজানের প্রয়োজন হয়,

১ পাউণ্ড গন্ধক সম্পূর্ণ দগ্ধ করিতে ১ পাউণ্ড অম্লজানের প্রয়োজন হয়,

সুতরাং C পাউণ্ড অঙ্গার, H পাউণ্ড উদ্জান, এবং S পাউণ্ড গন্ধককে দহন করিতে অম্লজানের পরিমাণ যদি ভ১ পাউণ্ড হয়,

তাহা হইলে

ভ১ $=C\times$২·৬৬$+H\times$৮$+S\times$১ পাউণ্ড।

কিন্তু ইন্ধনে O পাউণ্ড অম্লজান বর্ত্তমান আছে বলিয়া ভ১ হইতে O পাউণ্ড কম পরিমাণ অম্লজান হইলেই দহনকার্য্য সম্পূর্ণ হইবে এবং ভ২ পাউণ্ড যদি এই অম্লজানের পরিমাণ হয়,

তাহা হইলে

ভ২ = ভ১ $-$ O পাউণ্ড।

আমরা জানি, প্রায় ৪·৩৫ পাউণ্ড বায়ুতে ১ পাউণ্ড অম্লজান থাকিতে পারে; সুতরাং ভ২ পাউণ্ড অম্লজানের জন্য বায়ুর পরিমাণ যদি ভ পাউণ্ড হয়,

তাহা হইলে

ভ = ভ২ $\times$ ৪·৩৫ পাউণ্ড।

স্বাভাবিক উত্তাপ এবং চাপে * ১ পাউণ্ড বায়ুর আয়তন প্রায় ১২.৩৯ ঘনফুট।

সুতরাং ঐ অবস্থায় ভ পাউণ্ড বায়ুর আয়তন = ভ × ১২.৩৯ ঘনফুট।

দহনোৎপন্ন দ্রব্য—

আমরা জানি,

১ পাউণ্ড অঙ্গারকে সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে ৩.৬৬ পাউণ্ড অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান (CO_2) উৎপন্ন হয়,

১ পাউণ্ড উদ্জানকে সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে ৯ পাউণ্ড জলীয় বাষ্প (H_2O) উৎপন্ন হয়,

১ পাউণ্ড গন্ধককে সম্পূর্ণ দগ্ধ করিলে ২ পাউণ্ড গন্ধক-দ্বি-অম্লজান (SO_2) উৎপন্ন হয়;

সুতরাং

যদি প্রতি পাউণ্ড পাথুরিয়া কয়লায়

	C	পাউণ্ড	অঙ্গার,
	H	"	উদ্জান,
	S	"	গন্ধক,
	N	"	নেত্রজন,
এবং	ম	"	ভস্ম থাকে,

তাহা হইলে দহনোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ

অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান— $C \times ৩.৬৬ = ভ_{CO_2}$ পাউণ্ড

জলীয় বাষ্প— $H \times ৯ = ভ_{H_2O}$ "

গন্ধক-দ্বি-অম্লজান— $S \times ২ = ভ_{SO_2}$ "

নেত্রজন = N + দহনের জন্য গৃহীত বায়ুস্থ নেত্রজন

$= N +$ গৃহীত বায়ুর পরিমাণ $\times \frac{৭৭}{১০০} = ভ_N$ পাউণ্ড

এবং ভস্ম ———————— ম পাউণ্ড

সুতরাং দহনোৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি যদি ভ পাউণ্ড হয়,

* Normal Temp. and Pressure (N. T. P.)—স্বঃ উঃ চঃ

তাহা হইলে

$$ভ = ভ_{CO_2} + ভ_{H_2O} + ভ_{SO_2} + ভ_N + ম \text{ পাউণ্ড।}$$

এক্ষণে যদি দহনোৎপন্ন দ্রব্যের আয়তন নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

মনে কর,

$অ_H$ = ১ পাউণ্ড উদ্জানের আয়তন

= ১৭৮.৫৭ ঘনফুট

তাহা হইলে যে কোন ১ পাউণ্ড গ্যাসের আয়তন

$$= \frac{২ \times অ_H \times ১}{\text{ঐ গ্যাসের অণুভার}}$$

সুতরাং

$ভ_{CO_2}$ পাউণ্ড অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান গ্যাসের আয়তন

$$= \frac{ভ_{CO_2} \times ২ \times ১৭৮.৫৭}{৪৪} = অ_{CO_2}$$

$ভ_{H_2O}$ পাউণ্ড জলীয় বাষ্পের আয়তন

$$= \frac{ভ_{H_2O} \times ২ \times ১৭৮.৫৭}{১৮} = অ_{H_2O}$$

$ভ_{SO_2}$ পাউণ্ড গন্ধক-দ্বি-অম্লজান গ্যাসের আয়তন

$$= \frac{ভ_{SO_2} \times ২ \times ১৭৮.৫৭}{৬৪} = অ_{SO_2}$$

$ভ_N$ পাউণ্ড নেত্রজনের আয়তন

$$= \frac{ভ_N \times ২ \times ১৭৮.৫৭}{২৮} = অ_N$$

সুতরাং দহনোৎপন্ন দ্রব্যের আয়তন যদি অ হয়, তাহা হইলে

$অ = অ_{CO_2} + অ_{H_2O} + অ_{SO_2} + অ_N$

এক্ষণে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজানের শতকরা আয়তন

$$= \frac{অ_{CO_2}}{অ} \times ১০০\%$$

" জলীয় বাষ্পের শতকরা আয়তন

$$= \frac{অ_{H_2O}}{অ} \times ১০০\%$$

এইরূপে অপরগুলিরও শতকরা আয়তন নির্দ্ধারিত হয়।

যখন বায়ু প্রয়োজনীয় অপেক্ষা অধিক লওয়া হয়, তখনও অন্যান্য গ্যাসের আয়তন সমভাবেই থাকে, কেবলমাত্র নেত্রজন ও অম্লজানের আয়তনের বৃদ্ধি হয়।

মনে কর, পূর্ব্বের প্রয়োজনীয় বায়ু অপেক্ষা ক% অধিক বায়ু লওয়া হইল, তাহা হইলে দহনোৎপন্ন দ্রব্যে ক% অধিক নেত্রজন এবং ক% অধিক অম্লজান থাকিবে।

সুতরাং নেত্রজনের নূতন আয়তন

$$= \text{ইহার পূর্ব্ব আয়তন} + \frac{ক \times \text{পূর্ব্ব আয়তন}}{১০০}$$

$$= অ_N + \frac{ক \times অ_N}{১০০}$$

এবং $ভ_O$ পাউণ্ড যদি সম্পূর্ণ দহনের জন্য অম্লজানের ন্যূনতম পরিমাণ হয়, তাহা হইলে ইহার আয়তন

$$অ_O = \frac{ভ_O \times ২ \times ১১৮.৫৭}{৩২}$$

সুতরাং ক% অধিক বায়ু লওয়ার জন্য অম্লজানের আয়তন

$$\frac{ক \times অ_O}{১০০}$$

পরিষেক বিন্দু—যে বিশেষ উত্তাপে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করে, তাহাকে পরিষেক বিন্দু বলে।

মনে কর, প্রতি পাউণ্ড "ফ্লু" গ্যাসে $অ_{H_2O}$ আয়তন জলীয় বাষ্প আছে,

তাহা হইলে ইহার আংশিক চাপ

$$= ৭৬০ \times অ_{H_2O} \text{ মিঃ মিঃ পারদ উচ্চ।}$$

এক্ষণে উত্তাপ এবং চাপের তালিকা হইতে ঐ চাপে যে উত্তাপ পাওয়া যাইবে, তাহাই ইহার পরিষেক বিন্দু।

ফ্লুগ্যাসের বিশ্লেষণ হইতে প্রতি পাউণ্ড ইন্ধনের দহনের জন্য বায়ুর পরিমাণ নির্ণয়—

C = ১ পাউণ্ড ইন্ধনে অঙ্গারের ভার,

CO_2 = প্রতি পাউণ্ড ফ্লুগ্যাসে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজানের ভার,

CO = প্রতি পাউণ্ড ফ্লুগ্যাসে অঙ্গার-প্রথমাম্লজানের ভার,

N = প্রতি পাউণ্ড ফ্লুগ্যাসে নেত্রজনের ভার,

O = " " " অম্লজানের ভার।

আমরা জানি, ৭৭ পাউণ্ড নেত্রজন পাইতে হইলে ১০০ পাউণ্ড বায়ুর প্রয়োজন হয়, সুতরাং N পাউণ্ড নেত্রজনের জন্য $\frac{N \times ১০০}{৭৭}$ পাউণ্ড বায়ুর প্রয়োজন।

১ পাউণ্ড অঙ্গার দগ্ধ করিলে $\frac{১১}{৩}$ পাউণ্ড অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান এবং $\frac{৭}{৩}$ অঙ্গার-প্রথমাম্লজান উৎপন্ন হয়, সুতরাং CO_2 এবং CO ভারের অঙ্গার-দ্বি-অম্লজান এবং অঙ্গার-প্রথমাম্লজান উৎপন্ন করিতে অঙ্গারের পরিমাণ—$(CO_2 \times \frac{৩}{১১}) + (CO \times \frac{৩}{৭})$ পাউণ্ড এবং

এই পরিমাণ অঙ্গার দগ্ধ হইতে $\frac{N \times ১০০}{৭৭}$ পাউণ্ড বায়ুর প্রয়োজন হইয়াছে ; সুতরাং প্রতি পাউণ্ড অঙ্গারের জন্য বায়ু এবং অঙ্গারের অনুপাত—

$$=\frac{N \times \frac{১০০}{৭৭}}{(CO_2 \times \frac{১২}{৪৪})+(CO \times \frac{১২}{২৮})}$$

$$=\frac{১০০ \times N}{২১\ CO_2 + ৩৩\ CO}$$

এক্ষণে,

১ পাউণ্ড ইন্ধনে C পাউণ্ড অঙ্গার আছে, সুতরাং ১ পাউণ্ড ইন্ধনের জন্য বায়ুর পরিমাণ

$$=\frac{১০০ \times N \times C}{২১\ CO_2 + ৩৩\ CO} \text{ পাউণ্ড।}$$

কিন্তু ফ্লুগ্যাস বিশ্লেষণ করিলে দহনোৎপন্ন গ্যাসগুলি সাধারণতঃ আয়তনে পাওয়া যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্যাসকে তাহাদের স্ব স্ব অণুভার দ্বারা গুণ করিলেই বায়ুর পরিমাণ ধার্য্য হইবে।

মনে কর,

C = ১ পাউণ্ড ইন্ধনে অঙ্গারের ভার,

CO_2 = ১ „ ফ্লুগ্যাসে অঙ্গার-দ্বি-অম্লজানের আয়তন,

CO = ১ পাউণ্ড ফ্লুগ্যাস অঙ্গার-প্রথমাম্লজানের „

N = „ „ „ নেত্রজনের „

এবং

অঙ্গার-দ্বি-অম্লজানের অণুভার—৪৪

অঙ্গার-প্রথমাম্লজানের „ —২৮

নেত্রজনের „ —২৮

সুতরাং

প্রতি পাউণ্ড ইন্ধনের জন্য বায়ুর পরিমাণ

$$=\frac{১০০ \times ২৮ \times N \times C}{২১ \times ৪৪ \times CO_2 + ৩৩ \times ২৮ \times CO}$$

$$=\frac{১০০ \times N \times C}{৩৩\ (CO_2 + CO)} \text{ পাউণ্ড।}$$

ব্যবহৃত বায়ু এবং অতিমাত্রিক বায়ু নির্ণয়—

ব্যবহৃত বায়ুর পরিমাণ সাধারণতঃ অধিক হয় এবং ইহা ফ্লুগ্যাসের বিশ্লেষণ হইতে আমরা নির্ণয় করিতে পারি।

মনে কর, ফ্লুগ্যাসের প্রতি একক আয়তনে

CO — অঙ্গার-প্রথমাম্লজানের আয়তন,

N — নেত্রজনের আয়তন,

O — অম্লজানের আয়তন।

এক্ষণে প্রতি একক আয়তনে ফ্লুগ্যাসে ব্যবহৃত বায়ুর আয়তন নির্দ্ধারণ করিতে পারি ; কারণ ইহাতে নেত্রজনের আয়তন আমরা পাইয়াছি এবং ব্যবহৃত বায়ুর আয়তন $=\frac{N \times ৭৯}{১০০}$; কিন্তু আমরা জানি, অঙ্গার-প্রথমাম্লজানকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিতে প্রতি একক আয়তনের জন্য $\frac{১}{২}$ আয়তন অম্লজানের প্রয়োজন হয়, সুতরাং CO আয়তনের অঙ্গার-প্রথমাম্লজানের জন্য $\frac{CO}{২}$ আয়তন অম্লজানের প্রয়োজন হইবে।

সুতরাং প্রতি একক আয়তন ফ্লুগ্যাসে ন্যূনতম

$$\text{নেত্রজনের আয়তন} = N - \frac{৭৯}{২১}\left(O - \frac{CO}{২}\right)$$

এবং প্রতি একক আয়তন ফ্লুগ্যাসে ন্যূনতম বায়ুর

$$\text{পরিমাণ} = \frac{১০০}{২১}\left\{N - \frac{৭৯}{২১}\left(O - \frac{CO}{২}\right)\right\}$$

সুতরাং $\frac{\text{ব্যবহৃত বায়ু}}{\text{ন্যূনতম বায়ু}}$

$$= \frac{N \times \frac{১০০}{৭৯}}{\left\{N - \frac{৭৯}{২১}\left(O - \frac{CO}{২}\right)\right\} \frac{১০০}{৭৯}}$$

$$= \frac{N}{N - \frac{৭৯}{২১}\left(O - \frac{CO}{২}\right)}$$

$$= n$$

"n" কে আমরা অধিক বায়ুর গুণক বলিয়া থাকি এবং ইহা সাধারণতঃ ১ হইতে ১.৫।

আমরা ইন্ধনের উপাদানগুলি দ্বারা পূর্ব্বের সংজ্ঞা অনুসারে দহনের জন্য ন্যূনতম বায়ুর আয়তন স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে ব্যবহৃত বায়ুও নির্ণয় করা যাইতে পারে।

এক্ষণে অধিক বায়ুর পরিমাণ—ব্যবহৃত বায়ু এবং ন্যূনতম বায়ুর অন্তর,

অর্থাৎ অধিক বায়ু=ব্যবহৃত বায়ু—ন্যূনতম বায়ু।

পথিক
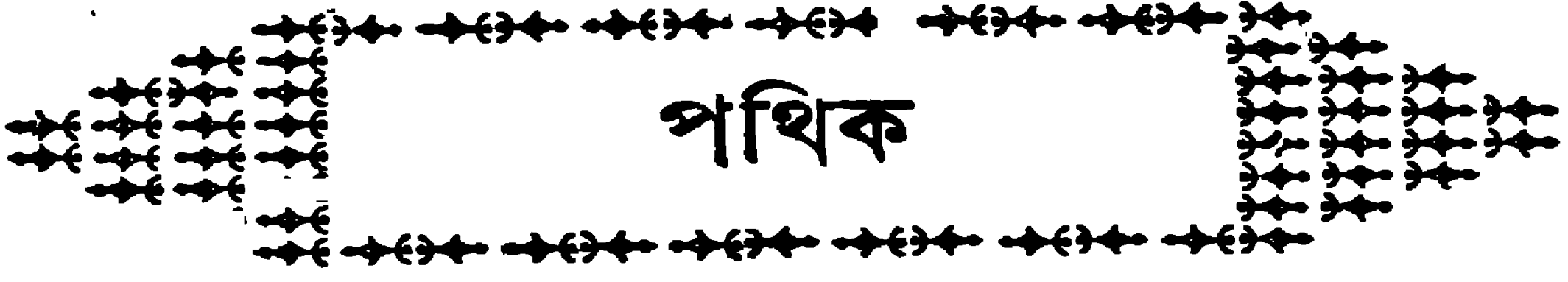
[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্জন]

হে পথিক !
পথ চলো !
চির নবীনের আরতিপ্রদীপ জ্বালার সময় হলো !

নিবিড় আঁধ'রে সীমাহীন পথ বাহি'
উতলা বাতাসে বাহিরিলে যারা সর্ব্বহারার দল,
দিবস ও রাত্রি অসীমের গান গাহি'
চলেছ যাহারা পাথেয় সঙ্গে—প্রাণের অশ্রুজল,
আশার নিশান জড়ানো বুকের মাঝ
সবারি যাত্রা সার্থক হলো আজ,
আহ্বান আসিছে ভুবনে, পথিক ! পথ চলো ! পথ চলো !
চির নবীনের আরতিপ্রদীপ জ্বালার সময় হলো !

মেঘেরা কোথায় টুটে যায় কোন্ দূরে,
বনবীথি, বাট, প্রান্তর, ঘাট, রঙেরি আলোতে মগ্ন,
পথিকপ্রাণের স্বপ্ন-অলকা-চূড়ে
গহন তারার ছায়াপথরেখা সহসা ঈষৎ লগ্ন !
কর্ম্মসাগরে নৃত্য উছল ঢেউ,
পার হয় ঐ পথিকেরা বুঝি কেউ !
অচল-শিয়রে শিলা পাতে বুক,—পথ চলো ! পথ চলো !
চির নবীনের আরতিদীপের বোধন সময় হলো !

যুগান্ত আজ ডুবিছে দিগন্তরে,
দিকে দিকে ঐ মহামন্দিরে খুলিছে স্বর্ণদ্বার।
মিলন পথেরি ধূসর ধূলার 'পরে
সবারি বুকের ফুটিছে আজিকে পূজার অর্ঘ্যভার।
শঙ্খের রোল ঘোষে মানবের জয়,
ধ্রুবতারকার হর্ষ সবিস্ময়।
নিখিল পথিক পথে পথে চলে, পথ চলো। পথ চলো
চির নবীনের নব আরতির প্রদীপ উজ্জল হলো।

আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান

[শ্রীযুক্ত নির্ম্মলাপদ চট্টোপাধ্যায়, এম, এস্‌সি,]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রস্তর, বালুকা ও কর্দ্দমযুক্ত দ্রব্যের মধ্যে কর্দ্দমের প্রয়োজনীয়তা চাষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রস্তর ও বালুকায় বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না। কর্দ্দমের মধ্যে সাধারণতঃ 'য়্যালুমিনা' ও 'সিলিকা' (বালু) নামক দুই প্রকার দ্রব্য থাকে। কেহ কেহ বলেন, দুই প্রকার নহে, এক প্রকার দ্রব্যেই উক্ত দুইটী দ্রব্য যুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা 'কলয়েড' গুণ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকিয়া ইহারা মাটির ভিতর আঠা আঠা ভাবটী বর্ত্তমান রাখে। যে সকল দ্রব্য দ্রব অবস্থায় থাকে তাহারা এই 'কলয়েড' (কণাদল) কর্ত্তৃক শোষিত হয়। এই কারণে উক্ত 'য়্যালুমিনা' ও 'সিলিকা' মূলতঃ বালুকাময় দ্রব্য হইলেও উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। যখন উদ্ভিদ্ মাটি হইতে দ্রব দ্রব্য টানিয়া লইতে থাকে, তখন এই 'কলয়েড'ই সেই শোষিত দ্রব্য সরবরাহ করে। ইহা ছাড়া কণাদলের অন্য কোন গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

'য়্যালুমিনা' ও 'সিলিকা' ছাড়া আরও কয়েক প্রকার 'কলয়েড' মাটির ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পঙ্কশৈবাল (হিউমাস্) নামক পদার্থ একটি। এই পঙ্কশৈবাল শাক সবজি, বৃক্ষ, লতা, পাতা ইত্যাদি পচিয়া উৎপন্ন হয়। ইহার মূল উপাদান এখনও সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই, তবে ইহা জানা গিয়াছে যে, ইহা একটি জৈব দ্রব্য। মাটির মধ্যে আরও অন্যান্য কণাদল থাকে, যথা—জীবাণু, 'ইষ্ট' ইত্যাদি।

এই শেষোক্ত 'কলয়েড'গুলির কার্য্যপ্রণালী অদ্ভুত এবং এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাহিরে। ইহারাই বায়ু হইতে নাইট্রোজেন লইয়া উহাকে নাইট্রেট্ অবস্থায় রূপান্তরিত করে। অম্লজান গ্যাসের সহিত যুক্ত হইলে ইহারা পঙ্কশৈবালের উপর ক্রিয়া আরম্ভ করে এবং ঐ পঙ্কশৈবালকে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী নানাপ্রকার 'নাইট্রোজেন' ঘটিত দ্রব্যে পরিণত করে। তখন ঐ খাদ্য উদ্ভিদ্ আহরণ করিয়া লইতে পারে। অতএব যেস্থানে পঙ্কশৈবাল তৈয়ারী হইবার সম্ভাবনা বেশী সেরূপ মাটির ভিতর অম্লজান চলাচল করিবার সুবিধা থাকা চাই, নতুবা পঙ্কশৈবাল গাছের পক্ষে উপকারী না হইয়া অপকারী হইয়া দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, ভূগর্ভস্থ কয়লার খনি পঙ্কশৈবালের স্তূপ হইতে হইয়াছে। বহুশতাব্দী ধরিয়া গাছপালা পড়িয়া পড়িয়া যেস্থানে এককালে পচিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অম্লজানের সংস্পর্শে আসিতে না পারায় মাটির ভিতর গাছের খাদ্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কাজেই অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া ক্রমে 'হাইড্রো-কারবনে' ও পরে 'কারবনে' অর্থাৎ অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। কাজেই যে জমিতে পঙ্ক-

শৈবাল অতিমাত্রায় বর্ত্তমান সেরূপ জমিতে উত্তমরূপ কর্ষণ কিম্বা কোন কৃত্রিম উপায়ে ঐ কণাদলের ধ্বংস-সাধন করা অতিশয় প্রয়োজনীয়। অবশ্য অম্লজান মাটির ভিতর ঢুকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। মাটি অত্যন্ত কঠিন ও ঠমাট না হইলে দেখা গিয়াছে, উহা প্রায় ৫০ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।

জলের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে এরূপ দ্রব্যগুলি সহজেই পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে 'নাইট্রেট্ অব্ সোডা' কিম্বা 'পটাশ' ফস্ফরিক্ অম্ল, চুণ ইত্যাদি অন্যান্য আরও কয়েকটী দ্রব্য শস্যের পক্ষে অতি অধিক প্রয়োজনীয়। মাটির ভিতর 'নাইট্রেট্' তৈয়ারী হয়, বায়ু হইতে নাইট্রোজেন লইয়া। মাটির ভিতর যে এমোনিয়া জীবাণুর কথা বলিয়াছি, তাহাদের সাহায্যে নাইট্রোজেন প্রথমতঃ এমোনিয়া ও পরে নাইট্রেটে পরিণত হয়। ফস্ফরিক্ অম্ল প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যগুলি মাটির ভিতর বর্ত্তমান থাকে। অভাব হইলে অন্যস্থান হইতে আনিয়া দিতে হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও প্রাচীনকালে জমিতে সার দিবার সেরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না, তাহা হইলেও দুই হাজার বৎসরের উপর প্রাচীন জমিতে প্রতিবৎসর নিয়মিত চাষ করিয়াও উক্ত দ্রব্যগুলির অভাব কোন দিন অনুভূত হয় নাই এবং তজ্জন্য ফসলের পরিমাণও কমিয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সম্বন্ধে এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় ইহার অভ্যন্তরভাগ একটি গলিত ধাতুপিণ্ড ছিল। পরে জলের সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল ধাতব দ্রব্য শীতল হয় ও নানাপ্রকারে জলের সহিত মিশিয়া যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ এই জলরাশির মধ্যে একটি অবিশ্রান্ত স্রোত বর্ত্তমান আছে। এই স্রোতে উক্ত দ্রব ধাতব দ্রব্যগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে ছড়াইয়া পড়িতে পড়িতে উহারা এমন কোন যৌগিক দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, যাহাতে উহাদের পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ায় একটি নূতন দ্রব্য সৃষ্ট হয়। এই নূতন দ্রব্য যদি জলে দ্রবীভূত হইতে না পারে, তাহা হইলে উহা জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই স্থানে স্তূপীকৃত হইতে থাকে। এইরূপে ভূগর্ভের বিভিন্ন স্থানে আমরা বিভিন্ন প্রকারের ধাতব দ্রব্যের স্তূপ দেখিতে পাই। ভূগর্ভস্থ এইরূপ জলস্রোত নিয়তই বর্ত্তমান। মাটির ভিতর দিয়া এই জল ক্রমশঃ চুয়াইয়া উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করে। জলের ভিতর দ্রব অবস্থায় যে দ্রব্যগুলি থাকে তাহারাও ঐ সঙ্গে উপরে উঠিতে থাকে। এইরূপ ভাবে উপরে উঠিবার সময় যদি কোন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ না ঘটে, তবে উক্ত দ্রব্যগুলি ভূপৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই প্রতিবৎসর চাষ করিলেও সারের অভাব ঘটে না। সার দ্রব্যগুলি অন্তর্বাহিনী জলস্রোতের দ্বারা প্রতিনিয়তই জমিতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

উপরোক্ত কারণে বিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন প্রকার গুণবিশিষ্ট হয়। ভূগর্ভের যেস্থানে যে দ্রব্যের স্তূপ বর্ত্তমান আছে কিম্বা যে দ্রবমিশ্রিত জলস্রোত বহিতেছে ও চুয়াইয়া চুয়াইয়া নিয়তই উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সেই স্থানে সেইরূপ ফসল ফলিবে। মালদহের মাটিতে আম যেমন হয় বঙ্গে এমন আর কোথাও হয় না, ইহার অন্যতম কারণ মালদহের মাটির অভ্যন্তরে এমন কোন বিশিষ্ট দ্রব্যের স্তূপ বা অনুরূপ কিছু বর্ত্তমান আছে যাহা আম্রবৃক্ষের পক্ষে অনুকূল কোন সার সরবরাহ করে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মাটির ভিতর যে সকল উপাদান বর্ত্তমান তাহাদের মধ্যে যে সকল দ্রব্য জলের সঙ্গে মিশিতে পারে তাহারাই উদ্ভিদের

পক্ষে প্রয়োজনীয়। কণাদল, বালুকা, প্রস্তর এবং জীবাণু ইহারা সাক্ষাৎভাবে উদ্ভিদের প্রয়োজনে আসে না। ইহারা দ্রবীভূত দ্রব্যগুলিকে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী করিয়া তোলে মাত্র।

এইবার দেখা যাউক উদ্ভিদ্ কিভাবে মাটির সহিত তাহার সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। মাটির ভিতর উদ্ভিদের শিকড় প্রবেশ করিয়া থাকে মাত্র। বাকী অন্যান্য অংশ উপরেই থাকে। শিকড়ই মাটি হইতে আহার সংগ্রহ করিবার একমাত্র অঙ্গ। এই শিকড়ের উপর ছালের যে পর্দ্দাটী থাকে উহার ভিতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি এরূপ যে, উহার ভিতর দিয়া জল বা দ্রাবণ অনায়াসে চলাচল করিতে পারে, কিন্তু কণাদল যাইতে পারে না। ইংরাজীতে এরূপ পর্দ্দাকে বলিয়া থাকে কণাদল প্রতিরোধক পর্দ্দা (সেমি-পারমিয়েব্‌ল্ মেম্‌ব্রেন্)। এই পর্দ্দা থাকার জন্য সিলিকা, য়্যালুমিনা, পঙ্কশৈবাল বা কোন জীবাণু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। উহারা বাহিরে থাকিয়া শিকড়ের আহার যোগাড় করিতে থাকে মাত্র। দ্রব দ্রব্যগুলি অবলীলাক্রমে শিকড়ের ভিতর চলিয়া যায় এবং সেখানে তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়া আরম্ভ করে। প্রাণীদেহের ভিতর দিয়া কিম্বা মাটির ভিতর দিয়া যেরূপ নানাপ্রকার জলীয় দ্রব্যের প্রবাহ থাকে, উদ্ভিদের ভিতর তাহা নাই। শিকড় মাটি হইতে জল শুষিয়া লয় ও তাহা উদ্ভিদের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে পর উক্ত জল পাতার মধ্য দিয়া বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। এই উপায়ে একটি অবিশ্রান্ত জলপ্রবাহ গাছের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা ছাড়া অন্য কোন প্রকার প্রবাহপ্রণালী নাই। এই জলপ্রবাহের সহিত দ্রাবণগুলি গাছের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে।

এই দ্রাবণের ভিতর যে সকল দ্রব্য থাকে তাহাদের মধ্যে 'পটাসিয়ম্' ঘটিত দ্রব্যগুলি অন্যতম। দেখা যায় যে, পটাসিয়ম্ ঘটিত দ্রব্যগুলি না থাকিলে উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন কিছুতেই হয় না। উদ্ভিদের মূল উপাদান হইল 'কার্‌বো-হাইড্রেট্', শ্বেতসার, 'সেলুলোজ,' 'প্রোটোপ্ল্যাস্‌ম্' ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই উপাদানগুলির কোনটীর ভিতরেই পটাসিয়ম্ পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, পটাসিয়ম্ শিকড়ের পর্দ্দা পার হইয়া ভিতরে ঢুকিয়াই কোন এক অজ্ঞাতনামা 'কলয়েড'রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় ইহার রাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি থাকে না, ইহারা তখন জোটক (ক্যাটালিষ্ট) হইয়া পড়ে। জোটকের গুণ এই হইল যে, তাহারা নিজে কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় যোগ দিবে না, কিন্তু তাহাদের নিকট অন্য যে সকল দ্রব্য থাকিবে তাহাদের ভিতর দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ করাইয়া দিবে। রসায়ন শাস্ত্রে এরূপ জোটক অনেক আছে। 'কলয়েড্' অবস্থায় পটাসিয়মের এই গুণ থাকায় ইহা উদ্‌জান, অম্লজান প্রভৃতির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া বাধাইয়া দিয়া কারবো-হাইড্রেট্, শ্বেতসার ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া লয়। তাহা ছাড়া পটাসিয়মের অন্য একটি গুণ আছে। উদ্ভিদের ভিতর প্রতিনিয়তই নানাপ্রকার অম্ল তৈয়ারী হয়, যথা—'অকজ্‌্যালিক্', 'টারটারিক্', 'সাইট্রিক্' ইত্যাদি। ইহারা বেশী পরিমাণে সঞ্চিত হইলে উদ্ভিদের অন্তরস্থ কোষগুলি (সেল) নষ্ট হইয়া যায়। পটাসিয়ম্ ঘটিত দ্রব্য বর্ত্তমান থাকার জন্য অম্ল কখনই বেশী হইতে পারে না। ইহাকে বলে রোধকের (বাফার) ক্রিয়া। রোধকের ক্রিয়ার মোটামুটি ব্যাপারটী হইল এই যে, যখন কোন অম্লের ভিতর কিছু পরিমাণ পটাসিয়ম্ ঘটিত বা অনুরূপ কোন দ্রব্য মিশাইয়া দেওয়া হয়, তখন অম্লের শক্তি সহজে কমিতে বা বাড়িতে পারে না। প্রাণীদেহে রক্তের ভিতর সোডিয়ম্ ঘটিত একপ্রকার দ্রব্য বর্ত্তমান আছে। এই জন্য রক্তের ভিতর কখনই অম্ল বাড়িতে বা কমিতে

পারে না। যখন বিশেষ কোন কারণে অম্ল বাড়ে বা কমে অমনি দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, উক্ত রোধক ক্রিয়ার সাহায্যে উদ্ভিদের কোষগুলি সুস্থ থাকে এবং গাছের পুষ্টি সাধিত হয়। কাজেই পটাসিয়ম্ উদ্ভিদের উপাদানে না থাকিলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। প্রাণীদেহে সোডিয়মের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু পটাসিয়ম্ না হইয়া কেন যে সোডিয়ম্ হইল তাহার উত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহই দিতে পারে নাই।

ক্যাল্সিয়ম্ ঘটিত দ্রব্য বর্ত্তমান না থাকিলে উদ্ভিদের ভিতর 'সেলুলোজ' ও 'ফাইবার' (ছিবড়া) তৈয়ারী হয় না। ক্লোরিণ বর্ত্তমান থাকায় শ্বেতসার পত্র হইতে ফলে নীত হয়। ফস্ফরস্ উদ্ভিদের সর্ব্বত্র শ্বেতসার পরিচালিত করে। 'লেসিথিন্' জাতীয় প্রোটীনের ভিতর ফস্ফরস্ পাওয়া যায়। য়্যাল্-বুমিনয়েডের ভিতর গন্ধক থাকে। ক্লোরোফিলের ভিতর সামান্য ম্যাগ্নেসিয়ম্ পাওয়া যায়। সিলিকা ও সোডিয়মের কোন উপকারিতা বুঝা যায় না।

মোটামুটিভাবে মাটির সহিত উদ্ভিদের এইরূপ সংযোগ দেখা যায়. কিন্তু উদ্ভিদের জাতি পৃথিবীতে মাত্র একপ্রকার নহে এবং তাহাদের খাদ্যাখাদ্যও এক-প্রকার নহে। কণাদল সংযুক্ত মাটিতে সার মিলাইয়া তাহাতে নিয়মিত কর্ষণ ও জলচালনা করিলেই যে, সকল প্রকার ফসল উত্তমরূপে চিরকাল ধরিয়া ফলিবে তাহা বলা যায় না। অনেক বৃক্ষ আছে যাহা ভূপৃষ্ঠের সারবান মাটি পরিত্যাগ করিয়া গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত শিকড় চালাইয়া দেয়। তাহাদের পক্ষে সাধারণ মাটি অপকারীই হইবে। কতকগুলি শস্য আছে যাহারা অন্য কোন শস্যের সহিত এক সঙ্গে জন্মাইতে পারে না, যেমন—ধান, গম ইত্যাদি। জমিতে ছোট ছোট যে সকল আগাছা জন্মে তাহাদিগকেও উক্ত শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে। আবার এমন শস্যও আছে, যাহা অন্য কোন শস্যের সহিত ভাল জন্মায়। অনেক শস্য আছে যাহা কোন পতিত জমি চাষ করিয়া প্রথমেই লাগাইলে ভাল ফলে না; অন্য কোন শস্য উৎপন্ন করার পর উহা লাগাইতে হয়। কোন কোন শস্য আবার প্রথম চাষে না লাগাইলে ভাল হয় না।

একই শস্য প্রতি বৎসর চাষ করিলে, সার দেওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় দেখা যায় ফসলের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। প্রতি বৎসর ফসল তুলিয়া লওয়ার পর সেই ফসলের যে শিকড়গুলি মাটির নীচে থাকিয়া যায় উহারাই পরিমাণ কমাইবার মূলীভূত কারণ। এই শিকড়গুলির উপর জীবাণুর ক্রিয়া আরম্ভ হইলে পর যে সকল দ্রব্য সৃষ্ট হয় তাহারা সকল সময়ে রোপিত শস্যের খাদ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। কাজেই এ অবস্থায় সেই শস্যের চাষ করিলে মাটি হইতে খাদ্য সরবরাহ না হইয়া বিষ সরবরাহ হয় এবং শস্যের অবস্থা শোচনীয় হইতে থাকে। অনেক সময় এরূপ হয় যে, কোন প্রকার কীটবিশেষের পক্ষে উক্ত শিকড় অতি উত্তম খাদ্য হইয়া দাঁড়ায়। প্রতি বৎসর একই শস্য রোপণ করিলে ঐ কীটগুলি বরাবর উত্তম খাদ্য পাইতে থাকে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শস্যের সর্ব্বনাশ করে।

এইজন্যই জমি মাঝে মাঝে চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়; কিম্বা অন্য শস্যের চাষ করিতে হয়। ইংরাজীতে ইহাকে বলে 'ক্রপ্ রোটেশন্'। জমি ফেলিয়া রাখিলে উক্ত বিষ বা কীট ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। অন্য শস্য রোপণ করিলে ভাল ফসল হয়, কারণ যে দ্রব্য এক প্রকার শস্যের পক্ষে বিষ তাহা অন্য প্রকার শস্যের পক্ষে সুখাদ্য হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তাহা ছাড়া যে কীট কোন বিশেষ শস্যের শিকড় খাইয়া প্রাণধারণ করে অন্য কোন শস্যের শিকড় তাহার পক্ষে বিষবৎ। বিলাতে আনারসের চাষ করিবার সময় একই জমিতে বার বার

আনারস লাগাইবার পর সত্যসত্যই এক প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, যাহা উক্ত চারাগাছের শিকড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। দু'এক বৎসর সেই জমিতে ঘাস বুনিয়া দেওয়ার পর সমস্ত কীট বিনষ্ট হয় তখন আনারসের চাষ আশানুরূপ হইতে থাকে। কৃত্রিম সার আনিয়া জমিতে দিলে অনেক সময় এই সকল বিষ ও কীট নষ্ট হয়।

জমিতে আগাছা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয় দুইটী কারণে। এক, ইহারা জমির সারপদার্থ টানিয়া লয়; দুই, ইহাদের শিকড় হইতে শস্যের পক্ষে অনিষ্টকারী দ্রব্য সৃষ্ট হয়। যে সকল শস্য ঘন সন্নিবিষ্ট করিয়া লাগাইতে হয়, যেমন—শাক, মটর ইত্যাদি তাহাদের ভিতর আগাছা জন্মাইতে পারে না, কারণ শস্যের শিকড়ের পরিমাণ অনুপাতে অধিক হওয়ার জন্য ইহারাই আগাছার উপর বিষের ক্রিয়া করে। কিন্তু আলু, মূলা, কপি প্রভৃতি শস্য ফাঁক ফাঁক করিয়া লাগাইতে হয়। কাজেই ইহাদের ভিতর আগাছা জন্মাইতে পারে।

মাটির যে সমস্ত গুণ এ পর্য্যন্ত বলা হইল, কিম্বা মাটির সহিত উদ্ভিদের যে সকল সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা হইল, কিম্বা জীবাণুর যে সমস্ত ক্রিয়ার কথা বলা হইল, সে সকল সমস্তই নির্ভর করে মাটির ভিতর যে পরিমাণ অম্ল বা ক্ষার থাকে তাহার উপর। যে সকল মাটিতে অম্ল বা ক্ষার উভয়েই কম, বেশীর ভাগ শস্য সেইরূপ মাটিতে উত্তমরূপ ফলে; কিন্তু চা, আলু প্রভৃতি কোন কোন শস্য অম্লযুক্ত মাটিতে ভাল ফলে। এইজন্য কোনরূপ ক্ষারবিশিষ্ট সার চা কিম্বা আলুর পক্ষে অনিষ্টকর। জলজ উদ্ভিদ্ সকল ক্ষারযুক্ত মাটিতে ভাল হয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, যে সকল জীবাণু মাটির ভিতর আহার তৈয়ারী করিবার সহায়তা করে তাহাদের এক একটি এক এক প্রকার শক্তিবিশিষ্ট অম্ল বা ক্ষারযুক্ত মাটিতে কার্য্যকরী হয়। 'য়্যাজোটো-ব্যাক্‌টর্' নামীয় যে জীবাণু বায়ু হইতে নাইট্রোজেন লইয়া এমোনিয়া তৈয়ারী করে উহার কার্য্যকরী শক্তি না অম্ল না ক্ষারযুক্ত মাটির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার 'নাইট্রোব্যাক্‌টর্' নামীয় যে জীবাণু এমোনিয়া হইতে নাইট্রেট্ তৈয়ারী করে উহা সামান্য ক্ষারযুক্ত মাটিতেই কায্যকরী হয়। জীবাণুর সংখ্যা ও জাতি অসংখ্য। যে জীবাণু যে শস্যের পক্ষে উপকারী সেই জীবাণুর উপযুক্ত অম্ল বা ক্ষার মাটিতে না থাকিলে সে শস্য ভাল জন্মিতে পারে না। চুণ-জাতীয় দ্রব্যগুলি ক্ষারবিশিষ্ট এবং ফস্‌ফেট্ জাতীয় দ্রব্যগুলি অম্লবিশিষ্ট। কাজেই সার দিবার সময় ক্ষার কিম্বা অম্ল প্রয়োজন, তাহা অগ্রে নিরূপণ করিয়া পরে প্রয়োজন মত সার দেওয়া উচিত।

মাটির ভিতর অম্ল আপনা আপনিই তৈয়ারী হইতে দেখা যায়। অধুনা এই অম্ল তৈয়ারী হওয়ার কারণ নির্ণয় সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা চলিতেছে। মাটির উপাদানে যে সিলিকা ও য়্যালুমিনা থাকে তাহা হইতেই যে এই অম্লের উদ্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি উপায়ে উহা উদ্ভব হয় এবং মাটির উপাদান সত্যসত্যই সিলিকা ও য়্যালুমিনা কিনা কিম্বা উহা উভয়ের সংযোগ ঘটিত অন্য কোন যৌগিক দ্রব্য, এ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগে, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ল্যাবরেটরীতে গবেষণা চলিতেছে।
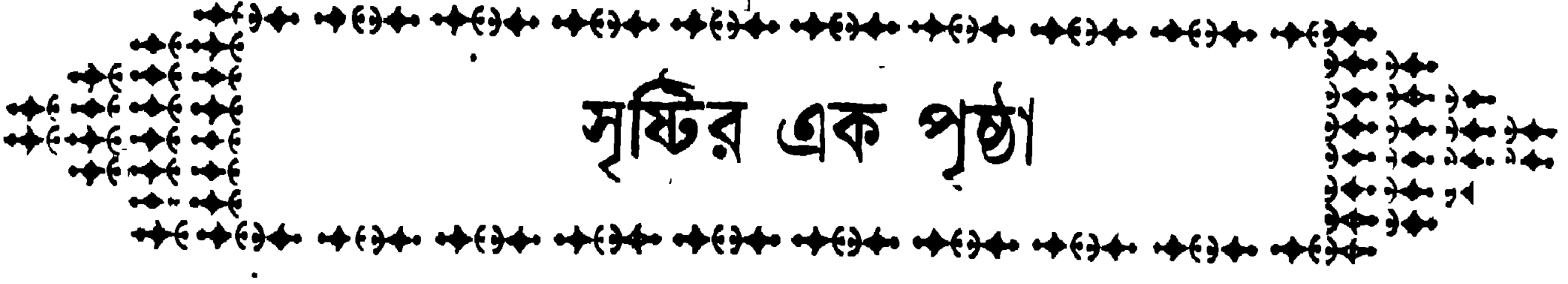
সৃষ্টির এক পৃষ্ঠা

[শ্রীমতী সুবাসিনী বালা বসু]

সে আদিম যুগের কথা।

নারী বাস করে গাছের কোটরে, পুরুষ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আর শিকার করে।

নারী ভাবে কি নিষ্ঠুর ওটা। বুকটা কি চওড়া। দেখ্‌লে ভয় লাগে। হাতে আবার ওসব কি? দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না, চলে যেতে যেতে, ভ্রূকুঞ্চিত করে চলে যায়।

পুরুষ ভাবে কি বিশ্রী ওটা। না পারে একটু দৌড়তে। না পারে একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে। কেবল গাছের কোটরে বসে থাকে। ভালও লাগে ওর। অবজ্ঞায় মুখ ফেরায়। এখানে ওখানে দেখ্‌তে পায়, ভাল করে না দেখেই চলে যায়।

* * *

সেদিন গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। পাতায় রং ধরেছে। এলোমেলো বাতাস ফুটন্ত ফুলের বুকে চুমো দিয়ে, কচি পাতার বুকে শিহরণ তুলে, মত্ত আবেগে ছুটে চলেছে, বিরহিণী প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। আকাশের কোলে চাঁদ উঠেছে। আকাশ বাতাস জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। জ্যোৎস্না গাছের ফাঁক দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

নারী বসে আছে একটা নদীর ধারে বালির উপরে। আনমনে কি যেন ভাবছে নিজেই সে বুঝ্‌তে পারছে না। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়্‌লো নদীর স্বচ্ছ জলের উপর। দেখে মাথার উপরেও একটি চাঁদ, জলের নীচেও একটি চাঁদ। দুটি চাঁদ, সে বড় সুন্দর, বড় সুন্দর। এবার কি যেন আনন্দের আবেগে সে উঠে দাঁড়ালো বড়ই যেন ভাল লাগ্‌লো তার কাছে চারিদিকের সব। কি যেন সুন্দর খেলা। চেয়ে দেখে গাছে গাছে সব ফুল ফুটে রয়েছে। সে গাছ থেকে ফুল তুলে লতা দিয়ে গেঁথে মাথায়, গলায়, বুকে, হাতে, কোমরে ও পায়ে পর্‌লো। তারপর যেন বনেরই আপনহারা হরিণীর মত কতই খুসীতে বনের পথে পথে সে ছুটে চল্‌লো।

গাছের কোটরে গেল। বড় খুসী। কিন্তু যেন একা। আবার চল্‌লো সেই নদীর ধারের দিকে সেই চাঁদের কাছে। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ পথে নারী দেখ্‌লো সাম্‌নে সেই কঠোর পুরুষ। আধ আধ জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষ দেখ্‌লো যে আস্‌ছে ধীরে ধীরে সেই নারী। দূরে দূরে দুজন দুজনের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়ে রইলো। তখন জ্যোৎস্নার আলো গাছের ফাঁক দিয়ে দুজনের মুখের উপর এসে ঢলে পড়্‌ছিল।

পুরুষ দেখ্‌লে যেন তাকে সুন্দর মনে হয়। নারী দেখ্‌লে সে যত কঠোর দেখায় সে তত কঠোর নয়।

দুজনে তখন এক পা এক পা করে এগিয়ে এলো। অনেক কাছে কাছে। দুজনেই দুজনকে দেখ্‌লো, কি সুন্দর! পাতাগুলি দুলিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল, নীরবে দুজনে তেম্‌নি চেয়ে রইলো। কতক্ষণ, কেউ তা জানে না। যখন তাদের জ্ঞান হলো, তখন

প্রভাতের বাতাসে পাখীর মধুর তান ভেসে আস্‌ছিলো।

পুরুষ তারপর থেকে ভাবে নারীকে কেমন করে সুখে রাখ্‌বে।

নারী ভাবে গাছের কোটরে আর ভাল লাগে না। পুরুষ তখন গাছের পাতা দিয়ে ছেয়ে, ডাল দিয়ে ঘিরে নারীর সুখের জন্য কুটীর রচনা করে।

সেদিন পুরুষ শিকার থেকে ফিরলো, হাতে তার হরিণের চামড়া। নারী উচ্ছ্বসিত আনন্দে তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

পুরুষ তখন ছালখানা নারীর কোমরে জড়িয়ে দিলো। তারপর তাকে দেখে সে আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠ্‌লো।

প্রথম লজ্জায় হেসে নারী মাথা নীচু করলে।

* * *

নারী ভাবে সে কেমন করে পুরুষকে সুখী করবে। যখন পুরুষ কুটীর ছেড়ে শিকারে যায়, তখন সে কুটীরের দ্বার ধরে তার প্রতীক্ষায়, পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন সে ফেরে তখন হাসিমুখে তার অভ্যর্থনা করে। ফল জল এনে সাম্‌নে ধরে। একলা খেতে চায় না। তখন সেও তার সঙ্গে খেতে বসে।

বিশ্ব চরাচর কাঁপিয়ে যখন মেঘ ডাকে, ময়ুর ময়ুরী নাচে, কচি পাতার আড়ালে বসে কোকিল ডাকে, জ্যোৎস্না হাসে জলের কলতান শোনে, তখন তারা ভাবে বিভোর হয়ে নাচে, হাসে, কাঁদে। এই ভাবে তাদের দিন যায়। তারা ভাবে এতো বেশ !

তার নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি হোল সেই দিন, যখন জ্যোৎস্নার মত আর একজন তাদের ঘর আলো করলে। আর কি গৌরবে যেন ভরে উঠ্‌লো পুরুষের বুক। দুজনে তারা ভাবে বিভোর হয়ে নূতন ছোট্ট মানুষটির দিকে চেয়ে থাকে !

সন্তানের প্রথম কাকলি নারীর প্রাণের পরতে পরতে কি মধু ঢেলে দিলে ! যখন সে তার ছোট ছোট হাত-পা নেড়ে হাসে, তখন নারী উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাকে বুকে চেপে ধরে। চুমায় চুমায় তার সমস্ত শরীর ভরে দেয়। তারপর তার মুখে আপনার বুকের পীযূষধারা ঢেলে দেয়।

আর পুরুষ ? মনের আনন্দে বনে বনে শিকার করে আর ফিরে ছুটে আসে তাকেই বুকে তুলে নিতে।

এইভাবে সৃষ্টির প্রথম অঙ্ক রচিত হয়।

[একটি ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

অজৈব রসায়ন

[শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়]

(১৭)

নাইট্রোজেন

সঙ্কেত N_2। সংযোগ ভার ১৪।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলে ৮০ % ভাগ নাইট্রোজেন। ফস্ফরস্ কিছু বদ্ধ বায়ুর ভিতর দগ্ধ করিয়া উক্ত বায়ু হইতে অম্লজান অপসৃত করিলে নাইট্রোজেন গ্যাস অবশিষ্ট থাকে। ইহার পরীক্ষাপ্রণালীও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

পরীক্ষার নিমিত্ত এই গ্যাস প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় 'এমোনিয়ম্ নাইট্রাইট্' নামক দ্রব্যকে তাপযোগে বিচ্ছিন্ন করা :—

$$NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$$
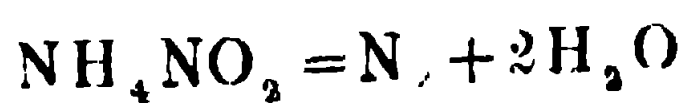
এই উদ্দেশ্যে অম্লজান প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিবার প্রণালী (৩০ নং চিত্র) অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এমোনিয়ম্ নাইট্রাইট্ তাপযোগে প্রথমতঃ তরলিত হয়, তাহার পর নাইট্রোজেন বিমুক্ত করিতে থাকে।

নাইট্রোজেন গ্যাস বর্ণ-স্বাদ-গন্ধহীন। দাহ্য বা দহনসহায়ীও নহে।

নাইট্রোজেনের রাসায়নিক প্রকৃতি জড়। কোনও সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহাকে সংযুক্ত করিতে পারা যায় না। তবে বায়ুর ভিতর প্রবল শক্তিবিশিষ্ট তড়িৎস্ফুলিঙ্গ চালনা করিলে অম্লজান ও নাইট্রোজেন সংযুক্ত হয়। নাইট্রোজেনের ভিতর দিয়া তড়িৎস্ফুলিঙ্গ সঞ্চালন করিলেও গ্যাসটী জড়-প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ম্যাগ্নেসিয়ম্, ক্যাল্সিয়ম্ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের সহিত সংযোগক্ষম হয়।
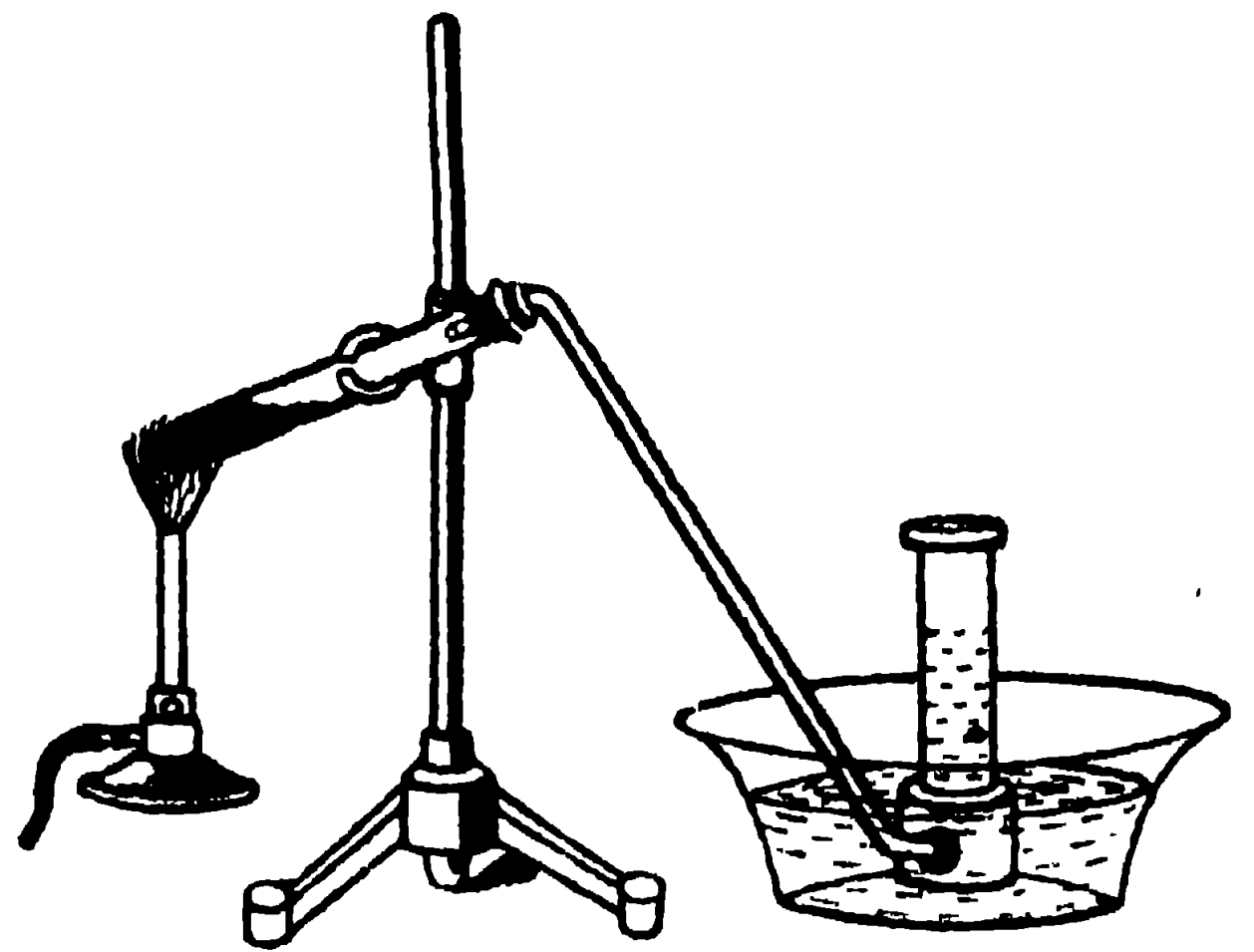
(৩০নং চিত্র) সিলিণ্ডারে সংগৃহীত গ্যাস নাইট্রোজেন

বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের প্রধান কার্য্য দহন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার যথোপযুক্ত সংযম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ অম্লজানে দহনাদি অম্লজানযোগ-ঘটিত প্রক্রিয়া দ্রুতবেগে সম্পন্ন হয়। এ অবস্থায় জীবনধারণ অসম্ভব।

যুক্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন জীবজগতে অপরিহার্য্য। উদ্ভিদ্ মৃত্তিকা হইতে পুষ্টির জন্য যুক্ত নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের মূলে এক জাতীয় সূক্ষ্মদেহী

জীব বাস করে, তাহারা বায়ুস্থ নাইট্রোজেন কিয়ং পরিমাণে অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত যুক্ত করিতে সক্ষম। এই যুক্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন উদ্ভিদ্ কর্তৃক শোষিত হয়। জমিতে সার দেওয়ার একটি প্রধান উদ্দেশ্য নাইট্রোজেন যোগান।

জীবশরীরে নাইট্রোজেন মাংসপেশী প্রভৃতিতে বর্ত্তমান। জীব খাদ্যের সহিত যুক্ত অবস্থায় এই উপাদান সংগ্রহ করে। প্রয়োজনাতিরিক্ত নাইট্রোজেন শরীর হইতে মল ইত্যাদিরূপে নির্গত হয়।

সাধারণ পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত উপায়ে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন যুক্ত অবস্থায় আহরণ করা যাইবে। একটি নিকেলনির্ম্মিত মুচিতে প্রায় অর্দ্ধেক ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ চূর্ণ লওয়া হইল। মুচিটির মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া বন্ধ করা হইল। পরে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করা হইল। এক্ষণে তাপযোগে মুচির উত্তাপ উচ্চ করিয়া অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল এই অবস্থায় রক্ষা করা হইল। মুচিটি শীতল হইলে উহা উন্মুক্ত করিয়া ভিতরের দ্রব্যটী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, সে দ্রব্যটী হইতে এমোনিয়া নামক গ্যাস উৎপন্ন হইতেছে। এমোনিয়া নাইট্রোজেন ও উদ্‌জানের সংযোগফল, সুতরাং নাইট্রোজেন যুক্ত হইয়াছে।

(১৮)

নাইট্রোজেন-একাম্লজান

—হাস্যোদ্দীপক গ্যাস

সঙ্কেত N_2O।

'এমোনিয়ম্ নাইট্রেট্' নামক দ্রব্য হইতে তাপযোগে নাইট্রোজেন-একাম্লজান গ্যাস বিচ্যুত হয় :—

$$NH_4NO_3 = N_2O + 2H_2O$$

নাইট্রোজেন প্রস্তুত ও সংগ্রহের অনুরূপ প্রণালীতে এই গ্যাসও সংগৃহীত হয়।

সংগ্রহের সময় পাত্রে উত্তপ্ত জল ব্যবহার করা হয়, কারণ শীতল জলে এই গ্যাস অল্প পরিমাণে দ্রবণীয়। জলের পরিবর্ত্তে পারদও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নাইট্রোজেন-একাম্লজান গ্যাস বর্ণ-স্বাদহীন; কিন্তু ইহার একটি বিশেষ গন্ধ আছে। আঘ্রাণ করিলে উদরের স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া হাস্যের উদ্রেক করে, এইজন্য ইহার অপর এক নাম "হাস্যোদ্দীপক গ্যাস"। ইহা অধিক পরিমাণে আঘ্রাণ করিলে শরীরের স্নায়ু বিকল হইয়া যন্ত্রণা বোধ দূর হয়। এইজন্য দন্ত চিকিৎসা প্রভৃতি সামান্য অস্ত্রপ্রয়োগের সময় ক্লোরোফর্ম্মের পরিবর্ত্তে উক্ত গ্যাসই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্লোরোফর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। 'নাইট্রাস্ অক্সাইড্' গ্যাস ব্যবহারের পর এরূপ কোনও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় না।

একটি বাতি জ্বালাইয়া এই গ্যাসের ভিতর আনয়ন করিলে দহন সতেজ হয়। তাহার কারণ, উক্ত গ্যাস যে দহনসহায়ী তাহা নহে। গ্যাসটী অত্যন্ত বিয়োগ-প্রবণ এবং দহনজাত তাপের সংস্পর্শে বিযুক্ত হইয়া অম্লজান বিচ্যুত করে। এই অম্লজানই দহনকে সতেজ করে। একখণ্ড গন্ধক অল্প জ্বালিয়া নাইট্রোজেন-একাম্লজান গ্যাসের ভিতর প্রবেশ করাইলে উহা নির্ব্বাপিত হয়। এক্ষেত্রে তাপ গ্যাসকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপযুক্ত নহে।

উক্ত গ্যাস জলের সহিত সংযোগে একটি অম্ল উৎপন্ন করে। অম্লটীর নাম 'হাইপো-নাইট্রাস্' অম্ল।

$$N_2O + H_2O = H_2N_2O_3$$
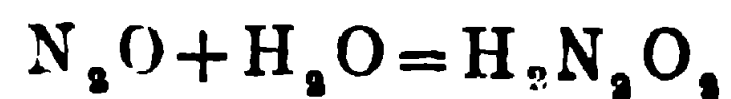
এ অম্ল অত্যন্ত বিয়োগপ্রবণ।

(১৯)

নাইট্রোজেন-দ্বি-অম্লজান

সঙ্কেত N_2O_2 বা NO।

উদ্‌জান প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিবার জন্য যেরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ যন্ত্র (৩১নং চিত্র) সজ্জিত করিয়া দস্তার পরিবর্ত্তে তাম্র এবং গন্ধকাম্লের পরিবর্ত্তে নাইট্রিকাম্ল ব্যবহার করিলে নাইট্রোজেন-দ্বি-অম্লজান গ্যাস উৎপন্ন হয় :—

(৩১নং চিত্র) নাইট্রোজেন-দ্বি-অম্লজান গ্যাস সিলিণ্ডারে সংগৃহীত হইতেছে

$$3\,Cu + 8HNO_3 = 3\,Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$$

প্রথমতঃ ফ্লাস্কে রক্তবর্ণ ধূম উৎপন্ন হয়। ইহা উক্ত গ্যাসের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের সংযোগজাত নাইট্রোজেন-চতুঃ-অম্লজান N_2O_4 বা NO_2 :—

$$2NO + O_2 = N_2O_4$$

ফ্লাস্ক হইতে সমস্ত বায়ু ক্রমে অপসৃত হইলে এই ধূমও অন্তর্হিত হয় এবং নাইট্রোজেন-দ্বি-অম্লজান গ্যাস সিলিণ্ডারে সংগৃহীত হইতে থাকে।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বায়ুর সংস্পর্শে গ্যাসটী হইতে রক্তবর্ণ ধূম নির্গত হয়। একটি সিলিণ্ডারের মুখ একটু উন্মুক্ত করিলেই ইহা দেখা যাইবে।

উক্ত গ্যাস দাহ্য বা দহনসহায়ী নহে ; কিন্তু একখণ্ড জ্বলন্ত ম্যাগ্‌নেসিয়ম্‌ তার ইহার অভ্যন্তরে আনয়ন করিলে দহন সতেজে অগ্রসর হয়। তাপে নাইট্রোজেন-দ্বি-অম্লজান বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অম্লজান বিচ্যুত হইয়া দহনের সহায়তা করে। বাতি বা গন্ধক জ্বালাইয়া এই গ্যাসের ভিতর প্রবেশ করাইলে নির্ব্বাপিত হয়।

এই গ্যাসটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহা 'ফেরস্‌ সল্‌ফেট্‌' বা হীরাকষ দ্রাবণে স্বতঃ দ্রবণীয়। দ্রাবণটী খদির বর্ণ। তাপপ্রয়োগে এই দ্রাবণ হইতে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন-দ্বি-অম্লজান পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া গ্যাসটী শোধন করা হয়।

(২০)

নাইট্রোজেন-ত্রি-অম্লজান

সঙ্কেত N_2O_3।

নাইট্রিক্ অম্লকে জলমিশ্রিত করিয়া ১·৩ গুরুত্বে পরিণত করা হইল। এই জলমিশ্রিত অম্লের সহিত আর্সেনিয়স্ অক্সাইড্ মিশ্রিত করা হইল। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রণটী তির্য্যক্‌পাতন করিলে নাইট্রোজেন-ত্রি-অম্লজান উদ্গত হয়। এই গ্যাস শিলাজায়ী মিশ্রণে রক্ষিত একটি U-আকৃতিবিশিষ্ট নলের (৩২ নং চিত্র) ভিতর দিয়া নীত হইলে ঘনীভূত ও সংগৃহীত হয়।

(৩২নং চিত্র) U-আকৃতিবিশিষ্ট নলমধ্যস্থ তরল দ্রব্য নাইট্রোজেন-ত্রি-অম্লজান
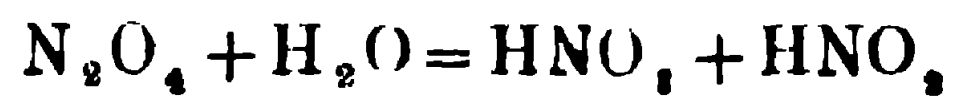
দ্রব্যটী হরিৎ বর্ণের তরল দ্রব্য। ইহা অত্যন্ত বিয়োগপ্রবণ। জলে দ্রবীভূত হইলে 'নাইট্রাস্' অম্ল উৎপন্ন করে :—

$$N_2O_3 + H_2O = 2HNO_2$$

(২১)

নাইট্রোজেন-চতুঃ-অম্লজান

সঙ্কেত N_2O_4 বা NO_2।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, নাইট্রোজেন-দ্বি-অম্লজানের সহিত অম্লজান যোগে নাইট্রোজেন-চতুঃ-অম্লজান উৎপন্ন হয়। পরীক্ষাগারে 'লেড্ নাইট্রেট্' নামক দ্রব্য হইতে তাপযোগে এই দ্রব্য বিচ্যুত করা হয়। শিলাজায়ী মিশ্রণে রক্ষিত আধারে ইহা হরিদ্বর্ণ তরল দ্রব্যরূপে সংগৃহীত হয়।

N_2O_4 জলে দ্রবণীয়; সংযোগে দুইটী অ নিশ্রণ উৎপন্ন হয় :—

$$N_2O_4 + H_2O = HNO_3 + HNO_2$$

(২২)
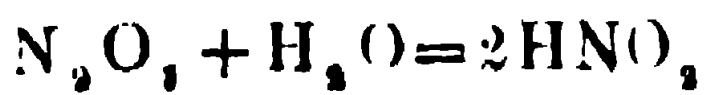
নাইট্রোজেন-পঞ্চাম্লজান

সঙ্কেত N_2O_5।

এই দ্রব্য প্রকৃতপক্ষে নাইট্রিক্ অম্লজ অক্সাইড্। জলের সহিত সংযোগে নাইট্রিক্ অম্ল উৎপন্ন করে :—

$$N_2O_5 + H_2O = 2HNO_3$$

পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিতে এই সাম্যের বিপরীত প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ নাইট্রিক্ অম্ল

হইতে ফস্ফরস্-পঞ্চাম্লজানযোগে জল বিচ্ছিন্ন করা হয়। উক্ত দুইটী দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া তির্য্যক্-পাতন করা হয় ও শিলাজায়ী মিশ্রণে রক্ষিত আধারে N_2O_5 সংগৃহীত হয়।

$$P_2O_5+2HNO_3=N_2O_5+2HPO_3$$
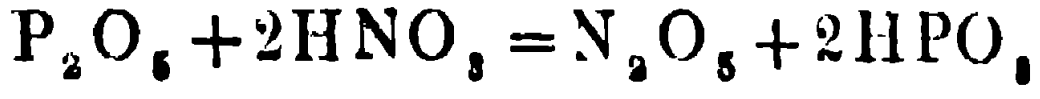
N_2O_5 অতি সহজেই বিচ্ছিন্ন হয় :—

$$2N_2O_5=2N_2O_4+O_2$$
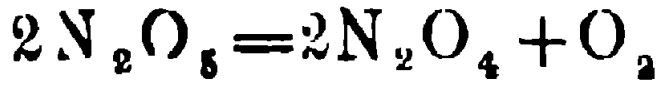
(২৩)

নাইট্রিক্ অম্ল

সঙ্কেত HNO_3।

এই অম্লের প্রধান ব্যবহার তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের ধাতু হইতে স্বর্ণ ও 'প্ল্যাটিনম্' নামক ধাতু পৃথক্ করিবার জন্য। নাইট্রিক্ অম্লের ক্রিয়া উপরোক্ত মূল্যবান্ ধাতু দুইটী ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর উপর অত্যন্ত সতেজ।

ধাতুর উপর নাইট্রিক্ অম্লের ক্রিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্য প্রথমতঃ ধাতু বিশেষে ও দ্বিতীয়তঃ (অম্লটীর) গুরুত্বের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন। যথা—তাম্রের সহিত প্রক্রিয়ায় প্রথমতঃ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী উদ্জান নির্গত হয় :—

$$3\,Cu+6HNO_3=3\,Cu(NO_3)_2+3H_2$$
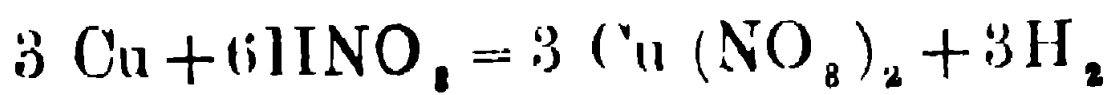
এই উদ্গত উদ্জানও নাইট্রিক্ অম্লদ্বারা আক্রান্ত হয় :—

$$3H_2+2HNO_3=4H_2O+2NO$$
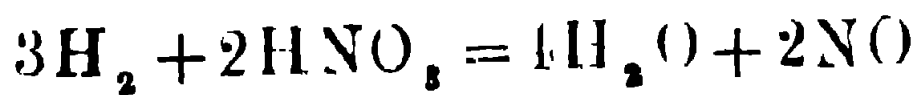
এবং নাইট্রোজেন-দ্বি-অম্লজান বিচ্যুত হয়।

দস্তার উপর সজল নাইট্রিক্ অম্লের ক্রিয়ায় নাইট্রোজেন-একাম্লজান উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ উদ্জান নির্গত হয় :—

$$4\,Zn+8\,HNO_3=4\,Zn(NO_3)_2+4H_2$$
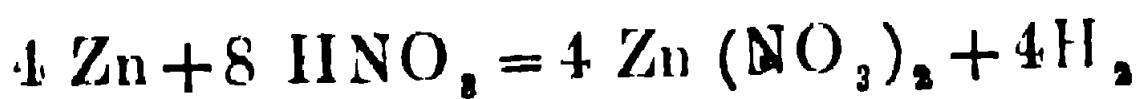
উদ্জান পুনরায় নাইট্রিক্ অম্লের সহিত নিম্নলিখিত সঙ্কেত অনুসারে সংযুক্ত হয় :—

$$4H_2+2HNO_3=5H_2O+N_2O$$

রাঙ্ বা টিনের সহিত প্রক্রিয়ায় এমোনিয়া উৎপন্ন হইতে পারে।

একটি রিটর্টে রিসীভার (৩৩ নং চিত্র) সংলগ্ন করিয়া রিসীভারটী শীতল জলের উপর আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় রক্ষিত হইল। রিটর্টে কিছু সোরা বা 'পটাসিয়ম্ নাইট্রেট্'ও নির্জ্জল গন্ধকাম্ল স্থাপিত হইল। রিটর্টে বার্ণারের শিখা সাহায্যে ধীরে ধীরে তাপ প্রদান করা হইল এবং রিসীভারের উপর জলধারা বহিতে দেওয়া হইল। নাইট্রিক্ অম্ল উৎপন্ন হইয়া রিসীভারে সংগৃহীত হয় :—

$$2KNO_3+H_2SO_4=K_2SO_4+2HNO_3$$
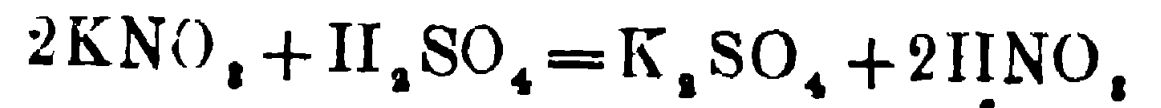
এই উপায়ে অম্ল প্রস্তুত হইলে, সাধারণতঃ তাহা নানাবর্ণবিশিষ্ট হয়। ইহার কারণ নাইট্রোজেন-চতুঃ-অম্লজানও অল্প পরিমাণে নিষ্ক্রান্ত হয়। অম্লের ভিতর দিয়া বায়ুপ্রবাহ কিছুক্ষণ সঞ্চালন করিলে বর্ণ দূর হইয়া বিশুদ্ধ অম্ল পাওয়া যায়।

একটি 'টেষ্ট টিউবে' অল্প নাইট্রিক্ অম্ল লইয়া তাহাতে একখণ্ড উত্তপ্ত অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হইল। অঙ্গার খণ্ডটী সতেজে জলিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই অম্ল হইতে অল্লায়াসে অম্লজান বিচ্যুত করিতে পারা যায়। এই অম্লজানই দহন সাহায্য করে।

একটি টেষ্ট টিউবে কিছু "নীল" দ্রাবণ লইয়া তাহাতে ২।৪ বিন্দু নাইট্রিক্ অম্ল যোগ করিলে নীলের বর্ণ নষ্ট হয়। কিছু 'ফেরস্ ক্লোরাইড্' দ্রাবণে কয়েক বিন্দু নাইট্রিক্ অম্ল দিয়া উত্তপ্ত করিলে হরিদ্রাভ বর্ণ উৎপন্ন হয়। ফেরস্ ক্লোরাইডের সহিত অম্লজান যোগে 'ফেরিক্ ক্লোরাইড্' উৎপন্ন হইয়া উক্ত প্রকার বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ুর ভিতর তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ চালনা করিলে অম্লজান ও নাইট্রোজেন সংযুক্ত হয়। এই সংযোগের ফলে নাইট্রোজেন-পঞ্চাম্লজান
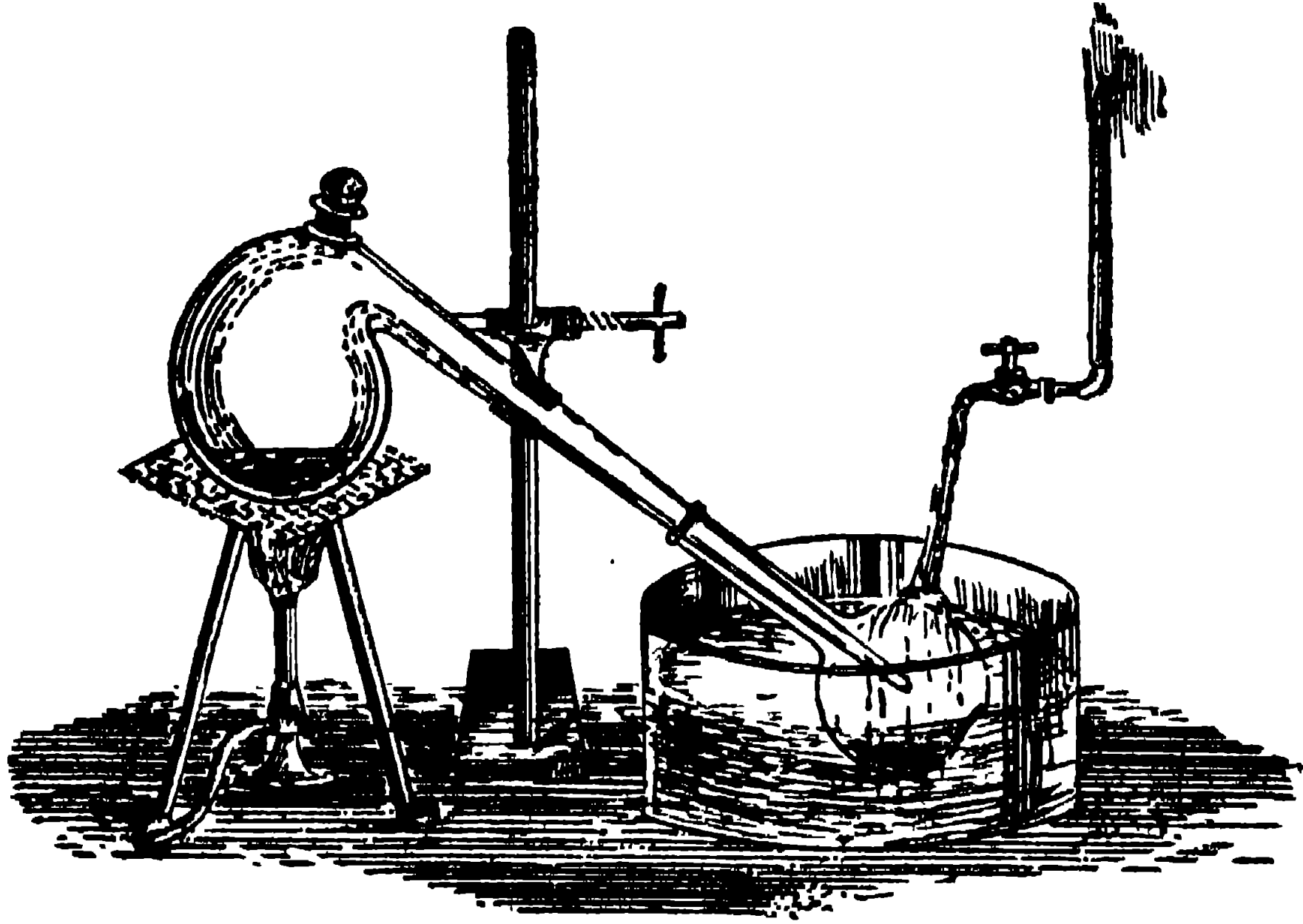
(৩৩নং চিত্র) রিসীভারে সংগৃহীত তরল দ্রব্য নাইট্রিক অম্ল

সৃষ্ট হয় ও বায়ুস্থ জলবাষ্পের সহিত ইহা সংযুক্ত হইয়া নাইট্রিক্ অম্ল উৎপন্ন করে :—

$$2N_2+5O_2=2N_2O_5$$

$$2N_2O_5+2H_2O=4HNO_3$$
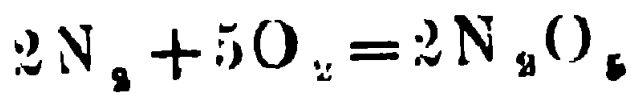
জার্ম্মানীতে এই উপায়ে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক্ অম্ল প্রস্তুত করা হয়।

নাইট্রিক্ অম্লের বোতল উন্মুক্ত হইলেই ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে অম্লের বাষ্প বায়ুস্থ জলবাষ্পের সহিত আকৃষ্ট ও মিলিত হইয়া এই ধূমের সৃষ্টি করে। বাষ্পহীন বায়ুতে এরূপ হয় না।

সজল নাইট্রিক্ অম্লকে ফুটাইলে প্রথমতঃ নাইট্রিক্ অম্ল নির্গত হয়। ক্রমে এমন একটি মিশ্রণ প্রস্তুত হয়, যাহা হইতে আর অম্ল বিচ্যুত হয় না। তরল দ্রব্যটী মিশ্রণ হইলেও একটি দ্রব্যের ন্যায় তির্য্যক্-পাতিত হয়। এই অবস্থা ৬৬% অম্ল ও ৩৪% জলের মিশ্রণ (১০০° সেঃ)।

কিছু শুষ্ক কাষ্ঠচূর্ণ বা কয়েক বিন্দু তার্পিণ নির্জ্জল নাইট্রিক্ অম্লের উপর নিক্ষেপ করিলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

ব্যবসাক্ষেত্রে নাইট্রিক্ অম্লের নিয়োগ গন্ধকাম্ল প্রস্তুত করিবার জন্য। নাইট্রোগ্লিসারীন, 'গান্ কটন' প্রভৃতি বিস্ফোরক ও 'কোল টার' হইতে নানাপ্রকার রঙ্ প্রস্তুত করিবার জন্য।

যে কোনও নাইট্রেট্ হইতে উক্ত অম্ল প্রস্তুত হইতে পারে। অন্যান্য দেশে 'সোডিয়ম্ নাইট্রেট্' সুলভ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে সোরাই সুপ্রাপ্য ও সুলভ।

একটি টেষ্ট টিউবে কিছু নাইট্রিক্ অম্ল লইয়া টিউবের গাত্র বহাইয়া ধীরে কিছু 'ফেরস্ সল্ফেট্' (হীরাকষ) দ্রাবণ যোগ করিলে উভয় দ্রব্যের সঙ্গম-স্থলে খদির বর্ণের রেখা সৃষ্ট হয়। কিছু নাইট্রেট্ দ্রাবণ ও হীরাকষ দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া নির্জ্জল গন্ধকাম্ল ধীরে যোগ করিলেও এই প্রকার রেখা দৃষ্ট হয়।

এই পরীক্ষা নাইট্রিক্ অম্ল ও নাইট্রেট্ জাতীয় লবণের পরিচয়।

নাইট্রিক্ অম্ল হইতে ধাতব দ্রব্যাদির সংযোগে যে লবণজাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাদের সাধারণ নাম নাইট্রেট্। তাম্র হইতে কপার নাইট্রেট্ এবং রৌপ্য হইতে সিলভার নাইট্রেট্ উৎপন্ন হয়।

নাইট্রেট্ জাতীয় লবণ হইতেও অম্লজান বিচ্ছিন্ন হইয়া দহনকার্য্য সম্পাদন করে। কিছু সোরা গলাইয়া তাহার উপর একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিলে দহন সতেজ হয়।

নাইট্রেট্ লবণ, গন্ধকাম্ল ও তাম্র (ধাতব) যোগে উত্তপ্ত হইলে খদির বর্ণের ধূম নির্গত হয়।

উল্লিখিত পরীক্ষা সকল নাইট্রেট্ লবণের পরিচয় প্রদান করে।

(২৪)

এমোনিয়া

সঙ্কেত NH_3।

নাইট্রোজেন ও উদ্জানের সংযোগে অনেকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এ সকলের মধ্যে এমোনিয়াই প্রধান।

কিছু নিশাদল বা এমোনিয়ম্ ক্লোরাইড্ ও চূণ একত্রে মিশ্রিত করিলে একটি তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। ইহা এমোনিয়া গ্যাসের গন্ধ।

$$CaO + 2NH_4Cl = CaCl_2 + 2NH_3 + H_2O$$

যে কোনও এমোনিয়ম্-লবণ ক্ষারের সহিত মিশ্রণে এমোনিয়া ত্যাগ করে।

পরীক্ষাগারে এই গ্যাস প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিবার প্রণালী ৩৪ নং চিত্র হইতে বোধগম্য হইবে। এমোনিয়া হইতে জলবাষ্প অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে ফ্লাস্কে নিশাদল ও চূণের মিশ্রণ হইতে তাপযোগে উৎপন্ন গ্যাস একটি শুষ্ক চূণপূর্ণ পাত্রের ভিতর দিয়া চালিত হয়। চূণ জলবাষ্পকে আকর্ষণ করিয়া অপসৃত করে ও বিশুদ্ধ এমোনিয়া সিলিণ্ডারে বায়ুর ঊর্দ্ধমুখ স্থানচ্যুতি দ্বারা সংগৃহীত হয়।

গ্যাসটী জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। এই দ্রাবণ সাধারণতঃ "এমোনিয়া" বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। দ্রাবণ গ্যাসের সমস্ত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

গ্যাসটী বর্ণহীন। ইহা দাহ্য বা দহনসহায়ী নহে; কিন্তু অম্লজানের ভিতর এমোনিয়া প্রজ্জলিত করা যায়। এমোনিয়ার জলের সহিত দ্রাবণে গমন করিবার ক্ষমতা অবলম্বন করিয়া একটি সুন্দর পরীক্ষা প্রচলিত আছে। একটি ফ্লাস্কে দুই ছিদ্রবিশিষ্ট কর্ক পরান হইল। কর্কটির একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি সূক্ষ্মমুখ কাচনল ফ্লাস্কের ভিতর চালনা করা হইল। অপর ছিদ্রটী কাচনলের সাহায্যে একটি পাম্পের সহিত যুক্ত হইল। ফ্লাস্কটীতে এমোনিয়া সংগ্রহ করা হইল। সূক্ষ্মমুখ নলটীর অপর প্রান্ত একটি বীকারের জলে নিমজ্জিত রহিল। এক্ষণে পাম্পযোগে কিছু চাপ হ্রাস করা হইলে সূক্ষ্মমুখ নলের ভিতর দিয়া জল বেগে উৎসাকারে ফ্লাস্কে (৩৫নং চিত্র) প্রবেশ করিবে।

একখণ্ড লোহিত লিট্মস্ কাগজ সিক্ত অবস্থায় এমোনিয়া গ্যাসের সংস্পর্শে আনিলে কাগজটীর বর্ণ নীল হয়। সুতরাং এমোনিয়া ক্ষারজাতীয়।

একটি কাচের দণ্ড লবণাম্লে সিক্ত করিয়া এমোনিয়ার সংস্পর্শে আনিলে ঘন শ্বেতবর্ণের ধূম নির্গত হয়। অম্লের সহিত এমোনিয়া সংযোগে এমোনিয়ম্ ক্লোরাইড্ উৎপন্ন হয়, ইহাই ধূমের আকার প্রাপ্ত হয়:—

$$NH_3 + HCl = NH_4Cl$$
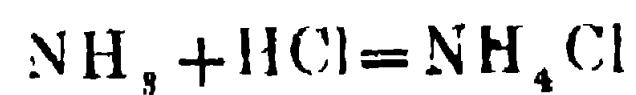
জলের সহিত এমোনিয়া সংযুক্ত হইয়া এমোনিয়ম্ ক্ষার সৃষ্টি করে:—
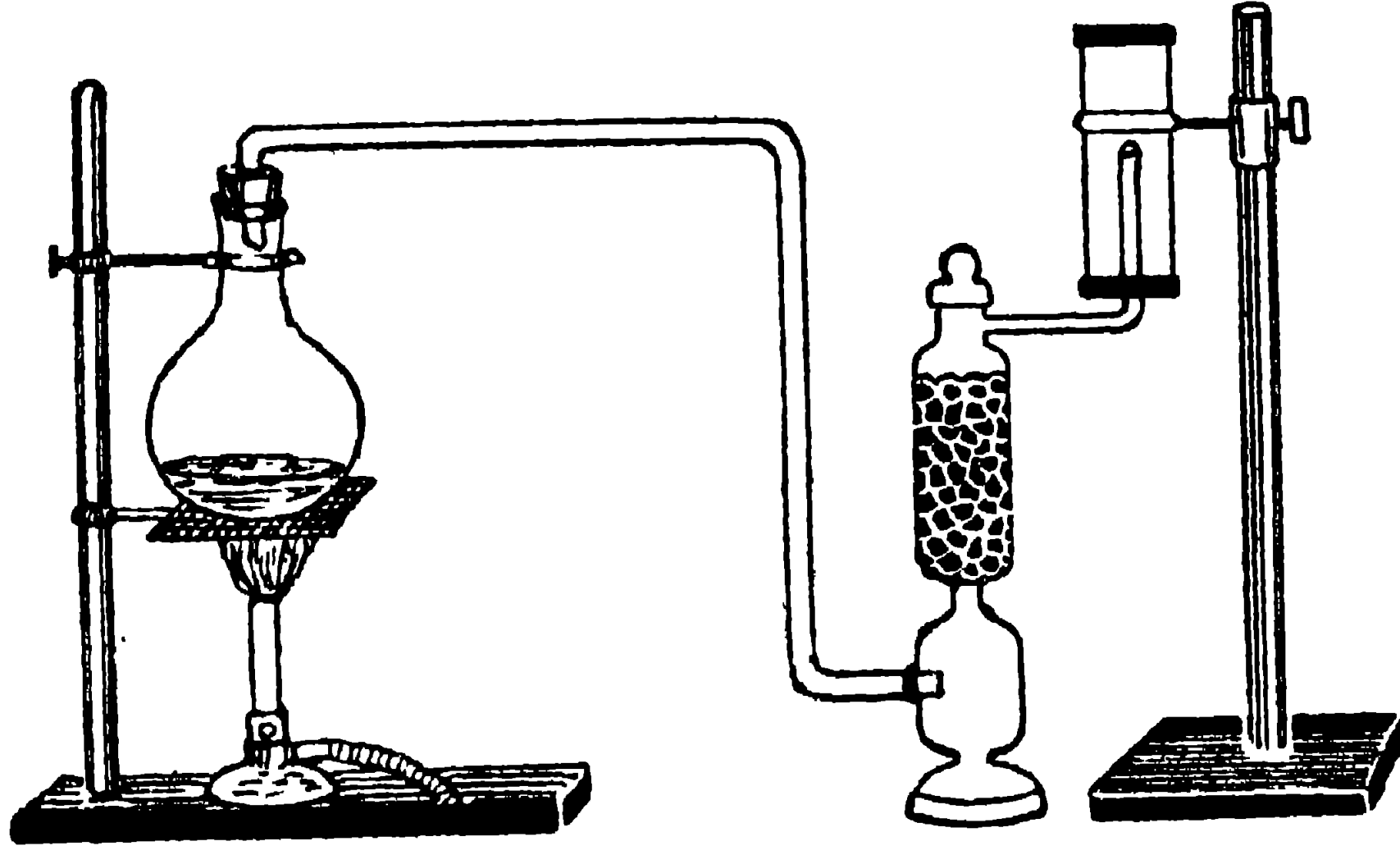
(৩৪ নং চিত্র) বিশুদ্ধ এমোনিয়া সিলিণ্ডারে সংগৃহীত হইতেছে

$$NH_3 + H_2O = NH_4OH$$
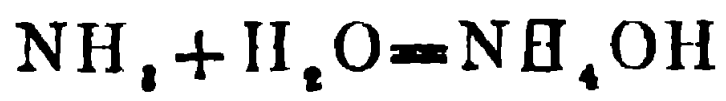
এই পরমাণুসমষ্টি NH_4 সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় একটি পরমাণুর ন্যায় ব্যবহার করে; কিন্তু বিযুক্ত অবস্থায় NH_4 পাওয়া যায় না। এইরূপ পরমাণুসমষ্টিকে গুচ্ছ বলে।

এমোনিয়ম্ লবণের সাধারণ ধর্ম্ম, তাপযোগে একেবারে বাষ্পাকার প্রাপ্ত হওয়া। একটি টেষ্ট টিউবে কিছু এমোনিয়ম্ ক্লোরাইড্ বা সল্‌ফেট্ লইয়া তাপ প্রদান করিলে লবণটী বাষ্পাকার প্রাপ্ত হয় ও টেষ্ট টিউবের উপরিভাগে পুনরায় কঠিন হইয়া প্রলিপ্ত হয়। কর্পূর এই শ্রেণীর দ্রব্য।

ব্যবসাক্ষেত্রে এমোনিয়ার নিয়োগ বরফ প্রস্তুত করিবার জন্য। এমোনিয়া দ্রাবণ একটি বদ্ধপাত্রে রক্ষিত হয়। তাপযোগে উক্ত পাত্র হইতে এমোনিয়া গ্যাস বিচ্যুত করাইয়া কুণ্ডলীকৃত নলের ভিতর দিয়া নীত হয়। এইস্থানে তাপযোগে এমোনিয়া তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও পুনরায় বাষ্পাকার প্রাপ্তির সময় তাপহরণ করে। কুণ্ডলীকৃত নল কিছু জলের সংস্পর্শে স্থাপন করিলে জলটী বরফে পরিণত হয়।

আমাদের 'স্মেলিং সল্ট' প্রকৃতপক্ষে এমোনিয়ম্ কার্ব্বনেট্। এই দ্রব্য হইতে আপনিই এমোনিয়া উদ্ভূত হইতে থাকে। একটি শিশিতে কিছু নিশাদল ও চূণ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেও এই ফল পাওয়া যায়।
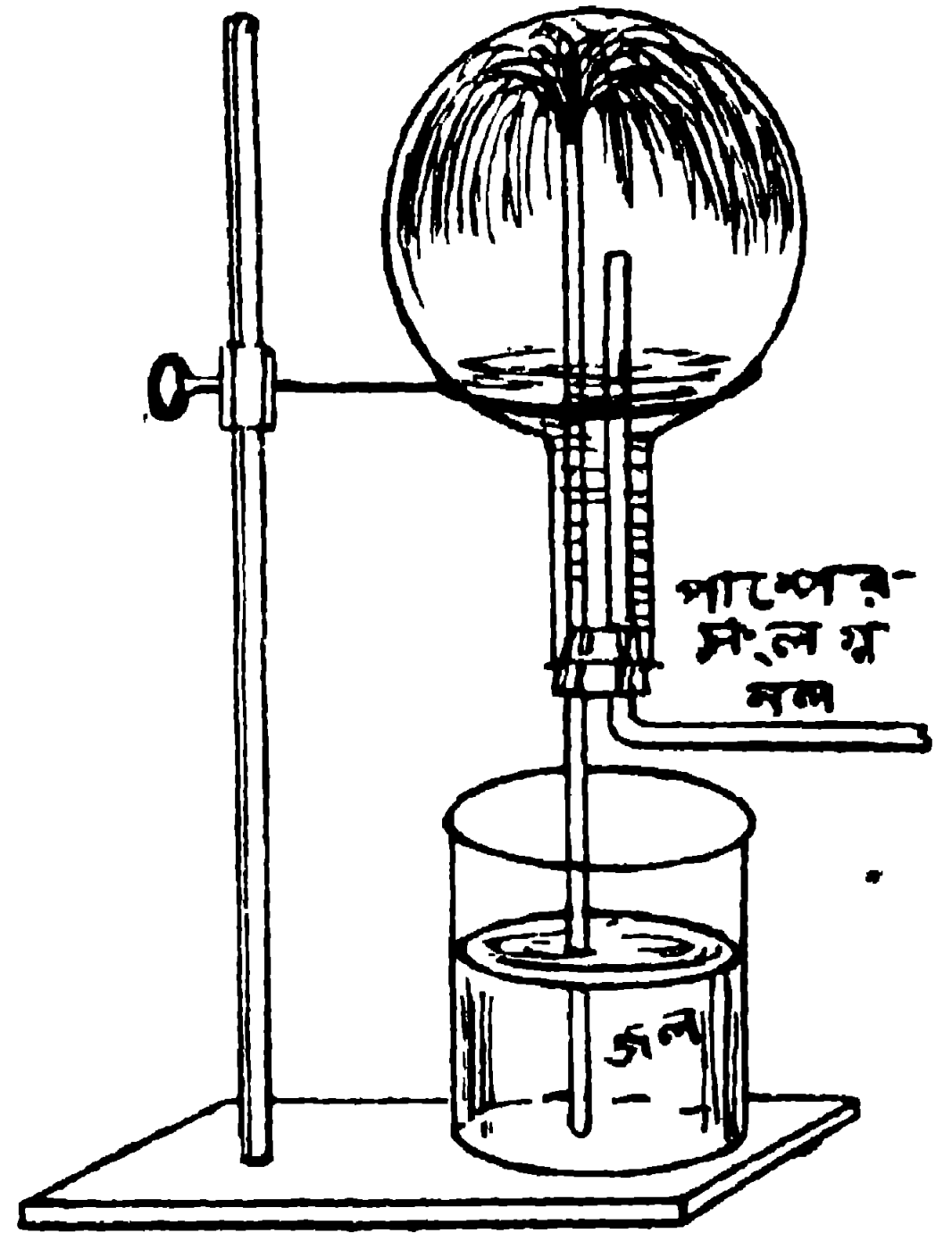
(৩৫নং চিত্র)

(ক্রমশঃ)

উদ্ভিদের চেতনা ও অনুভূতি সম্বন্ধে মহাভারতের যুক্তি

[শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী]

উদ্ভিদের চেতনা ও অনুভূতি সম্বন্ধে আজ বিজ্ঞানে যাহা প্রমাণিত হইতেছে, আর্য্যভারতে তাহা অবিদিত ছিল না। এ বিষয়ে কতকগুলি যুক্তি মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের প্রাণের সহিত যে উহার স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তি এবং রসনেন্দ্রিয়ও আছে, তাহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও আর্য্যঋষিগণ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। শান্তিপর্ব্বের ১৮৪ অধ্যায়ে মহর্ষি ভৃগু ও ভরদ্বাজের কথোপকথন প্রসঙ্গে মহাভারতকার এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকের ন্যায়ই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

ভরদ্বাজ মুনি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দেখুন, বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদিগের শরীরেও রুধিরাদি দ্রব পদার্থ, অগ্নিসম তেজঃ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই, তবে উহারা কিরূপে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।"

ভৃগু কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূলদৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদ্গম হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপদ্বারা উহাদিগের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সমুদয় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদিগের ফলপুষ্প বিশীর্ণ হয়, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে উহাদিগের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দৃষ্টিহীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতাসমুদয় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে, তখন উহাদিগের দর্শনশক্তি বা দর্শনশক্তিবৎ কোন ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপদ্বারা রোগমুক্ত হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিশ্চয়ই আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূলদ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। উৎপলনাল সাহায্যে যেমন মুখদ্বারা জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবনসহযোগে মূলদ্বারা সলিল পান করে। এইরূপ যখন উহাদিগকে সুখদুঃখ সংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদিগের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূলদ্বারা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্যযুক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়।" (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ হইতে)

কর্ম্মক্ষেত্র
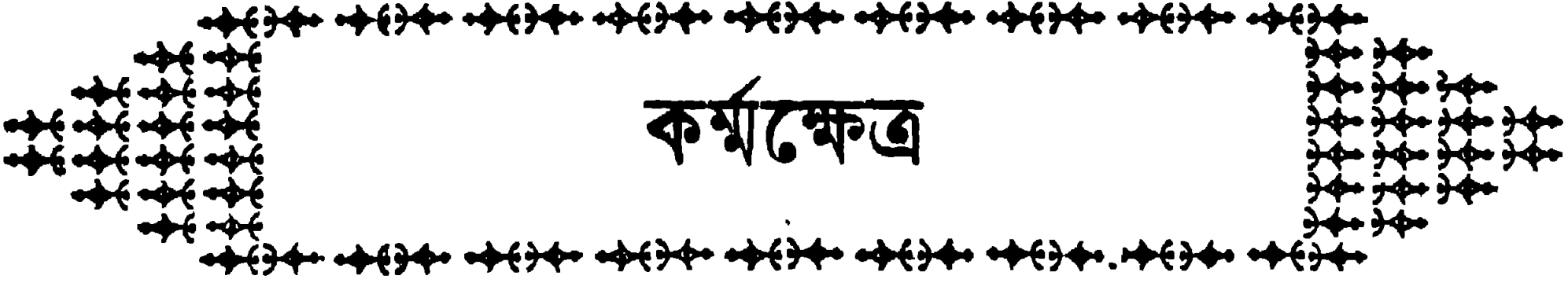
[শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী]

আমাদের দেশের যুবকগণের সম্মুখে অসীম কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক সামর্থ্যশালী দেশবাসীর কর্ত্তব্য সেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া নিজেকে ও দেশকে উন্নত ও ঐশ্বর্য্যশালী করা। কত সামান্য সামান্য জিনিষ বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া শত প্রকারে আমাদের জীবনের লাঞ্ছনাকে চরমে তুলিয়া দিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগের উদ্যমহীনতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিমাণ করা দুরূহ হইয়া উঠে।

আজ দুইশত বৎসর হইল ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইতে চলিল কত রকমের শিল্পশিক্ষার প্রবর্ত্তন এই দেশে হইয়াছে, তথাপি মাত্র কয়েক বৎসর হইল বৈদ্যুতিক পাখার ন্যায় একটি সামান্য জিনিষ এই দেশে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 'ক্লাইড' পাখা সর্ব্বপ্রথম এদেশে প্রস্তুত হয়, তৎপর 'ইণ্ডিয়া' পাখা তাহার অসামান্য গুণ সকল লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পাখার পরিকল্পনা করেন। ইহা বিলাতে পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত রকম পাখা আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে এই পাখাতে কম বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হয়, অথচ হাওয়াও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক এইরূপ সফলতা লাভ করে ও কার্য্যকরী হয়। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালী জগজ্জয়ী হইতে পারে।

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন এক প্রকারের বৈদ্যুতিক পাখা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি স্বয়ং পাখানির্ম্মাণ শিল্পালয়টী দেখিয়া আসিয়াছি। সামান্য একটি টিনের চালের ঘরে (১নং চিত্র) ইহার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। আর সেই সঙ্গে মনে হয়, "ভগবান, আর কতদিন আমরা ভারতের রঙ্গমঞ্চে এইরূপ 'বোকার' অংশ অভিনয় করিব।"

ঐ চিত্রে চক্রধারণ করিয়া যিনি বসিয়া আছেন তিনি আর্ম্মেচারের জন্য লোহার গোল পাত কাটিতেছেন ও তাহাতে সমব্যবধানে ছিদ্র কাটিতেছেন। এই যন্ত্র এরূপ সুন্দর ও সরল যে, একটি বালক ইহাকে চালাইয়া কার্য্য করিতে পারে। এই যন্ত্রটীও কর্পোরেশনের কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ যন্ত্রের টেবিলের পার্শ্বে যে স্তূপাকার গোল লৌহপত্র সকল রহিয়াছে তাহাও কলিকাতার রাস্তায় পরিত্যক্ত মরিচাধরা লৌহ হইতে সংগৃহীত। এইরূপ আপাততঃ মূল্যহীন দ্রব্যের ব্যবহারেই ত প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চিত্রে যে পাখাগুলি ঝুলিতেছে সেগুলির সহগুণ রীতিমতভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে। ইহাদ্বারা বুঝা যাইবে যে, ইহার ভিতর ফাঁকির বা চালাকির লেশমাত্র নাই। একেবারে না থামিয়া ৭৬ ঘণ্টা চলিলেও ইহার নামমাত্র তাপবৃদ্ধি হয়। ইহা হইতে

প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল পাখা কিরূপ উন্নত ধরণের।

প্রদর্শিত হইয়াছে। ঢালাই লোহার খোল, পাখার পত্রগুলি, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও আর্ম্মেচার যে সকল

(১নং চিত্র) [মিউনিসিপ্যাল গেজেট এর সৌজন্যে]

যে সকল অংশ একত্রিত করিয়া একটি সম্পূর্ণ পাখা নির্ম্মিত হয়, তাহা নিম্নের চিত্রে (২নং চিত্র)

লৌহপত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।
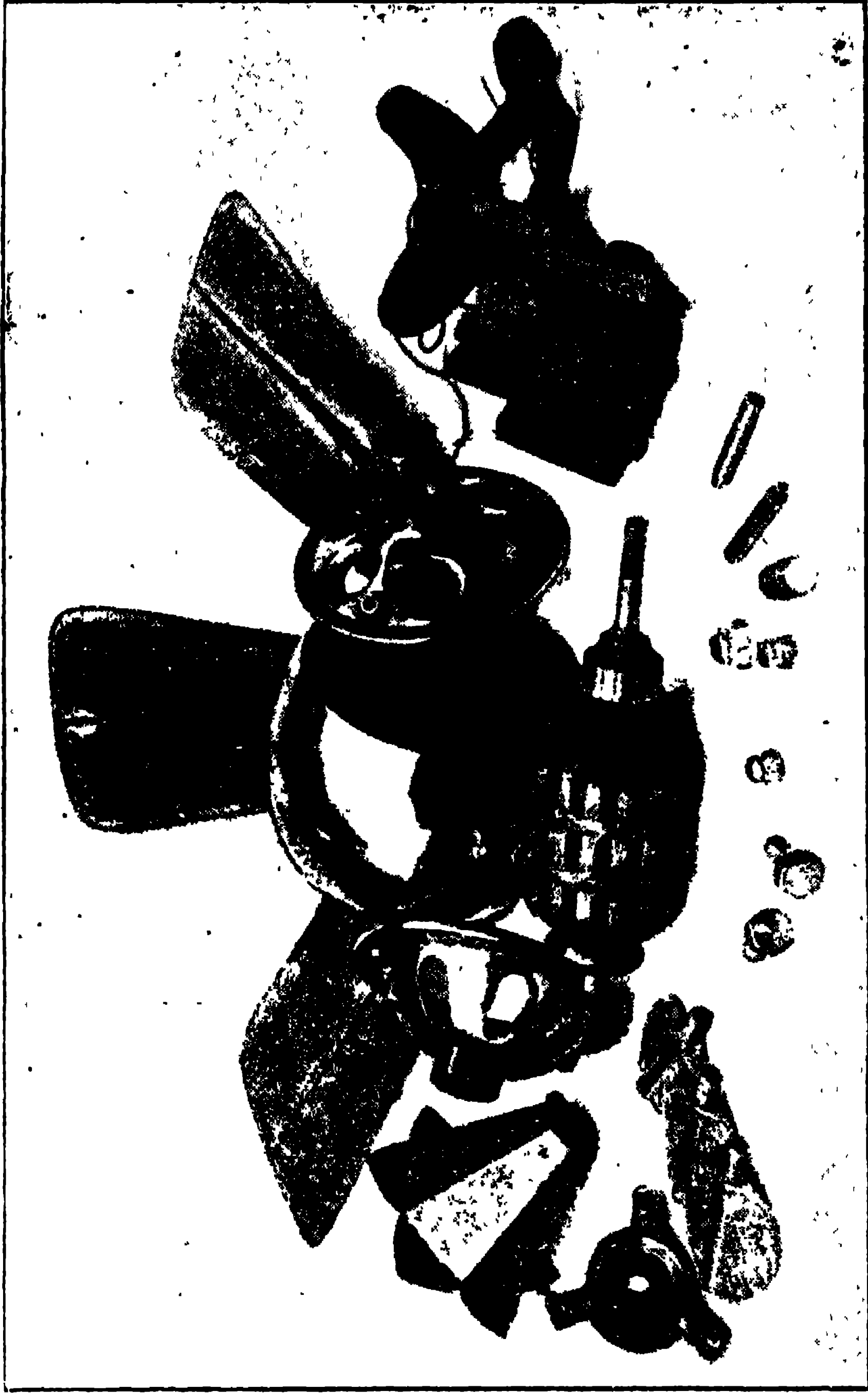
(২নং চিত্র) [মিউনিসিপাল গেজেট এর সৌজন্যে]

পাখার আবরণটী ঢালাই লোহার দ্বারা প্রস্তুত। প্রথমে উহা রং করা হইত; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, রং করিতে খরচ বেশী পড়ে সেজন্য বৈদ্যুতিক উপায়ে উহা তামাদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইতে লাগিল। তাহাতে উহার বাহ্যিক আকৃতিও খুব সুন্দর ও চক্‌চকে হইল (৩নং চিত্র)। ইহা ছাড়া তামার পালিশটী অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছে। তজ্জন্য খরচ কিছু কমিয়াছে। ঐ শিল্পগৃহের এক অংশে

তামার পালিশের বন্দোবস্ত আছে। এই ইলেক্ট্রোপ্লেট করায় ইহার সৌন্দর্য্য অন্যান্য পাখা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে।

বিলাতী দ্রব্য গুণমুগ্ধ অনেক শিক্ষিত চক্ষুষ্মান্ অন্ধ দেশবাসী এখনও পর্য্যন্ত সম্ভবপর হইলে নিজ দেশস্থ প্রতি পয়সাটি পর্য্যন্ত দেশবাসীকে বঞ্চিত-
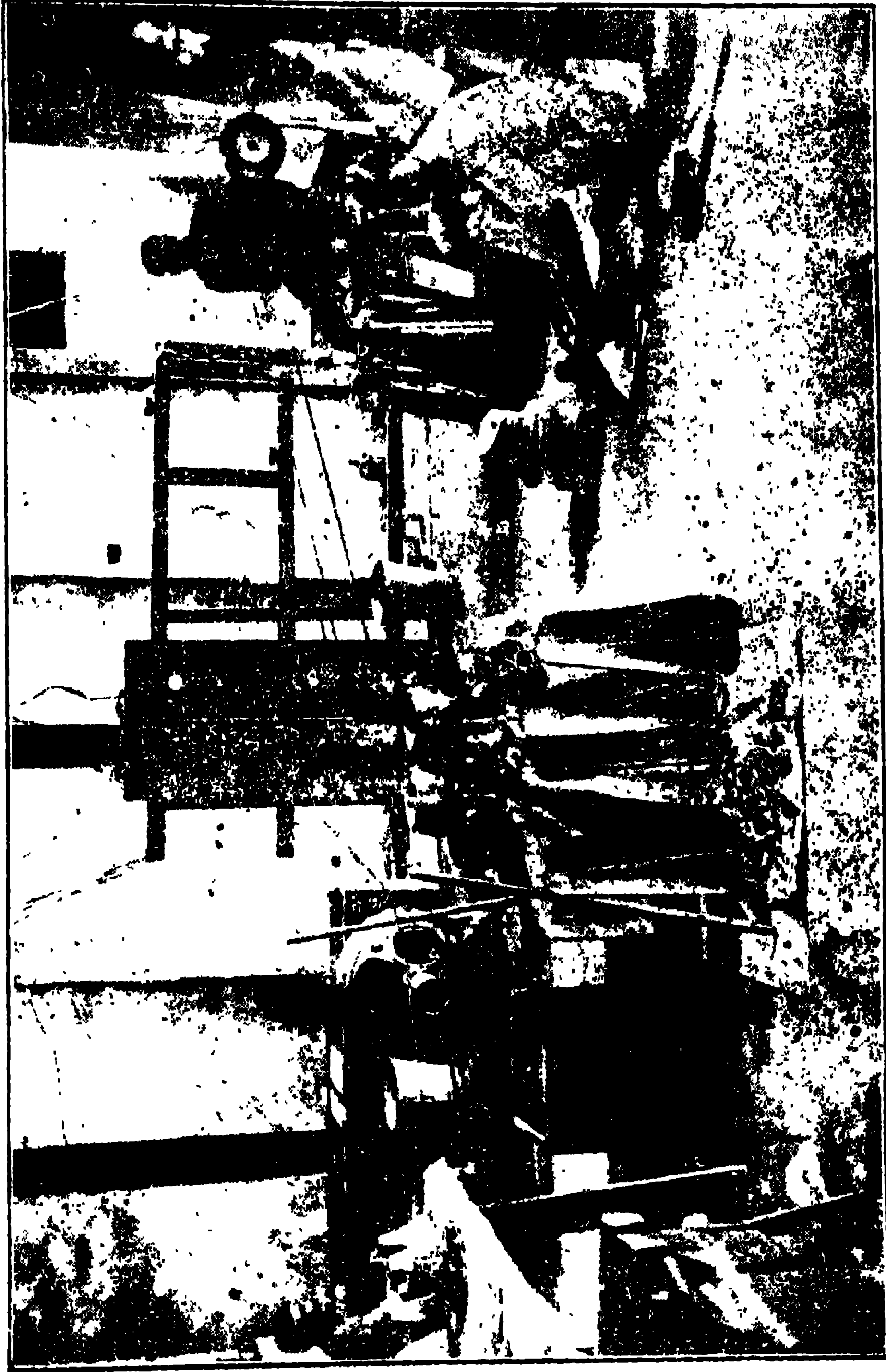
(৩নং চিত্র) [মিউনিসিপ্যাল গেজেট এর সৌজন্যে]

নিম্নে ঐ পাখার একটি সম্পূর্ণ চিত্র (৪নং চিত্র) প্রদর্শিত হইল।

করিয়া জাহাজে তুলিয়া সমুদ্রপারে পাঠাইতে পারিলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। আমরা আশা
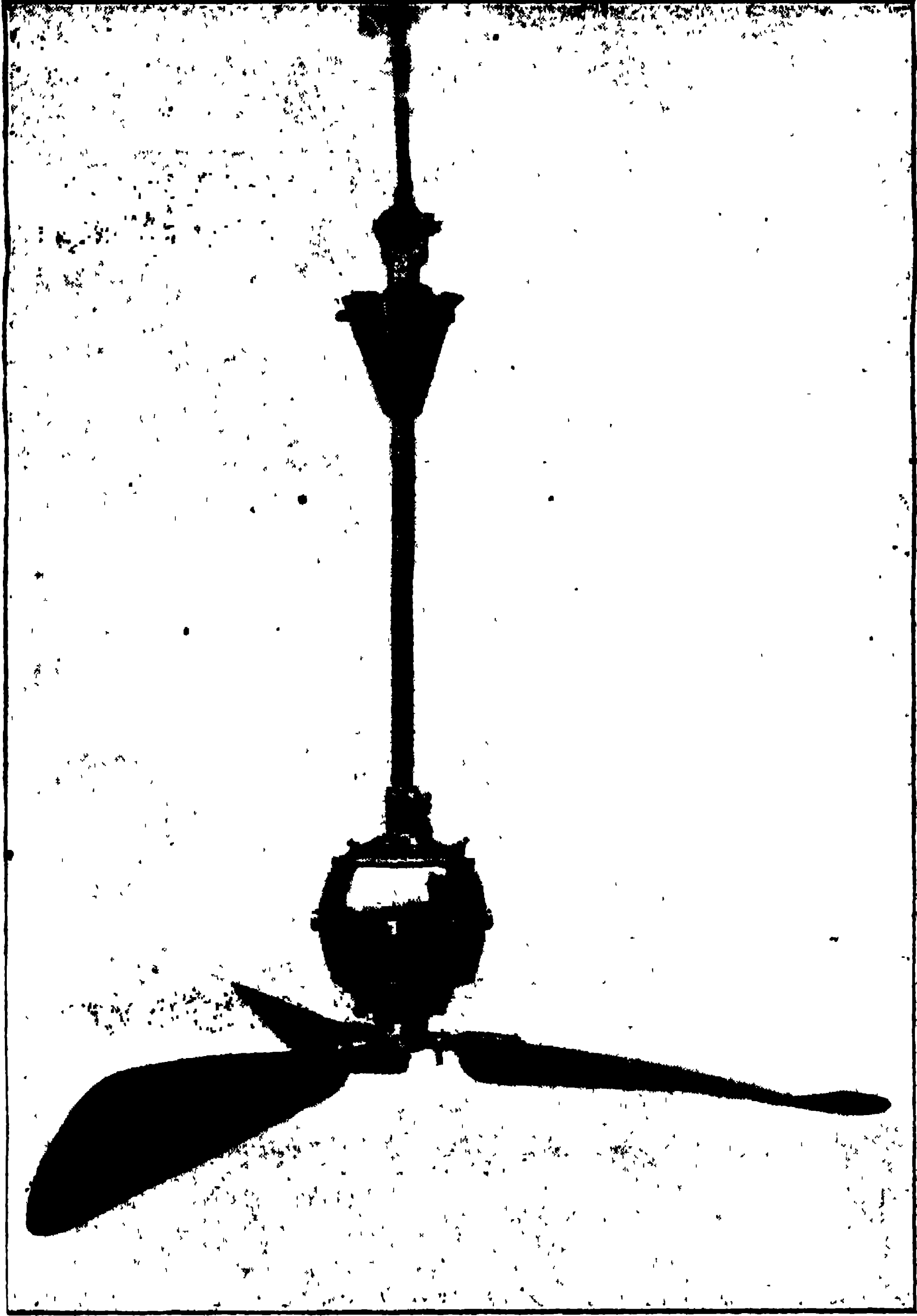
(৪নং চিত্র) ['মিউনিসিপ্যাল গেজেট'এর সৌজন্যে]

করি, অতঃপর তাহারা এই স্বদেশে প্রস্তুত ও উচ্চাঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্য নিজেরা ব্যবহার করিয়া ইহার উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিবেন।

সাধারণ বিদেশী পাখায় ১৩২ হইতে ১৩৪ ওয়াট্ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হয়। প্রবন্ধে বর্ণিত পাখায় মাত্র ৭২ ওয়াট্ ব্যয় হয়, অর্থাৎ পরিচালন ব্যয় মাত্র অর্দ্ধেক। ইহা প্রস্তুত করিতে মাত্র ৩০৲ টাকা ব্যয় হয় ও ইহা স্বচ্ছন্দে ৪৫৲ টাকায় বিক্রয় করা যাইতে পারে। মজুমদার মহাশয়, ঐ পাখা পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আরও কিছু

যন্ত্রপাতি বসাইতে পারিলে ২৫৲ টাকায় পাখা প্রস্তুত হইতে পারে, অথচ সাধারণ পাখার বাজার দর ৬০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ দেশের লোককে শিল্প ও বিজ্ঞানের জ্ঞানদানে ব্রতী হইয়াছে। ইহার কর্ত্তৃত্বাধীনে কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাহাতে তদনুরূপ পাখা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে, দেশের সুধিগণের ইচ্ছা হইলে তাহার ব্যবস্থা অতি সত্বরই করা যাইতে পারিবে। ছোট বড় এইরূপ বহু দ্রব্য আমরা অতি অল্পব্যয়ে এদেশে প্রস্তুত করিয়া কুবেরের ধনরত্ন দেশের ভাণ্ডারে আনয়ন করিতে পারিব।

কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথ

[শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেশভাব

স্বাবলম্বী স্বাধীনচেতা রাজেন্দ্রনাথ যে সময় পরানুগ্রহ পাপে লিপ্ত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া কেবলমাত্র আত্মশক্তি সহায়ে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা নিজের জীবিকার্জ্জনের উপায় আবিষ্কারের জন্য সমস্ত জগতের লোকের উপরোধ, অনুরোধ, ভয়, মৈত্রী, লোভ প্রদর্শন প্রভৃতি তাচ্ছিল্যভরে ত্যাগ করিয়া আপাততঃ দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় বঙ্গসমাজের বিশেষতঃ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের মনোবৃত্তির দিকে একবার দৃষ্টিদান আবশ্যক, নচেৎ রাজেন্দ্রনাথের স্বজাতিপ্রেমিকতা, রাজেন্দ্রনাথের দেশ-কাল অভিজ্ঞতার বিষয় এবং ফল ও ভবিষ্যদ্বাণীর ফল বুঝিতে পারা যাইবে না।

যে সময় রাজেন্দ্রনাথ মেসের বাসায় আগমন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ের তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে শ্রবণ করা গিয়াছে যে, অনেক সময় তাঁহারা বন্ধুবর্গ সমবেত অবস্থায় তৎ-কালীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, এবং সে সময় অনেকবার সকলে রাজেন্দ্রনাথকে চাকরী গ্রহণে অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন।

সেই কথার প্রত্যুত্তরে রাজেন্দ্রনাথ বহুবার তাঁহা-দিগকে বলিতেন যে, বাঙ্গালী অত্যন্ত অলস ও পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া উঠিতেছে। তাহারা চিন্তাশীলতার স্থান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিলাসী এবং দাসমনোবৃত্তির অনুগামী হইয়া পড়িতেছে। তাহার পরিণাম হইতেছে যে, কালে এই বাঙ্গালীর হস্তে আর কোনরূপ ব্যবসায় বাণিজ্য থাকিবে না।

রাজেন্দ্রনাথের এই বাক্য যে তাঁহার জীবদ্দশায় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতে এবং বুঝিতে পারিতেছেন। সেই সময় রাজেন্দ্রনাথ বহুবার বলিয়া-ছেন যে, তোমরা দেখিতে পাইবে ইহার পরিণাম হইবে বাঙ্গালীর দরিদ্রতা। তাঁহার বাক্য এক্ষণে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বাস্তবিক যে সময়ে রাজেন্দ্রনাথ স্বাধীন জীবিকার জন্য লালায়িত, সেই সময়ের বঙ্গসমাজের বিষয় আলোচিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যদিও তখন শিক্ষিত যুবকগণের মধ্য হইতে ডিরোজীওর প্রবর্ত্তিত উচ্ছৃঙ্খলনীতি অনেকাংশে প্রশমিত হইয়াছে, তথাপি তখন সেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণামে গভীর অবসাদ আগমন করিয়াছে। যেমন সুরাপায়ী দারুণ মত্ততাবস্থার অবসানের সময় দারুণ অবসাদগ্রস্ত হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ।

রাজেন্দ্রনাথের পাঠ্যাবস্থায় কিম্বা যৌবনের প্রারম্ভে ডিরোজীওর প্রবর্ত্তিত প্রভাব হইতে বঙ্গসমাজ মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তখন অনুরূপ ভাব আগমন করিয়াছে। ডিরোজীওর নীতিতে বঙ্গীয় যুবকগণ কেবলমাত্র উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় উন্মত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহারা স্বাধীন মনোবৃত্তির হাত হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

সেই যুগ প্রথম ইংরাজী শিক্ষার যুগ। তখন বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে এরূপ এক উৎকট মনোবৃত্তি আগমন করিয়াছিল যে, সুরাপানই সভ্যতার মূল কেন্দ্র এবং প্রচলিত সমাজে যাহা কিছু বর্ত্তমান, তাহা কেবলমাত্র কুসংস্কারের প্রতিমূর্ত্তি। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছিল কেবলমাত্র, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ, সুরাপান প্রভৃতি।

সেই উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান হইয়াছিল মহাত্মা রামমোহন রায়ের আগমনে। সেই মহাত্মার অক্লান্ত চেষ্টায় যখন বঙ্গীয় যুবকগণ স্বস্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল, তখন কিন্তু তাহারা স্খলিত পদ হইয়া এরূপ এক আলস্য ও অবসাদ কূপে নিপতিত হইল যে, এখনও পর্য্যন্ত তাহারা তথা হইতে উত্থিত হইতে সমর্থ হয় নাই।

রাজেন্দ্রনাথের জীবন প্রারম্ভ হইতেছে সেই অবসাদযুগের প্রথমাবস্থা। যদিও তখন বঙ্গীয় যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আত্মমুখী হইয়া স্বঘরে আগমন করিয়াছে, নিজের সমস্তই চিনিতে পারিয়াছে, তথাপি তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সেই অবস্থা এখনও বর্ত্তমান।

সেই যুগের অবস্থা হইতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় প্রাণপণ করিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, পরে কোন স্থানে কোন চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইয়া, তাহারই নিয়মিত বেতনদ্বারা অবশিষ্ট জীবন সুখদুঃখের ভিতর যাপন করা। এই অবস্থার অন্যতম অবস্থা ছিল এবং আছে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন বিচারালয়ে আইনজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করা।

এই ব্যবসায় হইতেছে স্বাধীন জীবিকার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। অন্য কোনরূপ ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা স্বাধীন-ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ তৎকালে ঘৃণ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতে আরম্ভ করিল।

এই আইন পরীক্ষার প্রলোভনে পতিত হইবার একটী কারণ বর্ত্তমান। এই ব্যবসায় তৎকালে প্রচুর অর্থাগমশীল হইয়াছিল। তৎকালের আইন ব্যবসায়ীর উপার্জ্জন এবং এ কালের আইন ব্যবসায়ীর অর্থাগমের অবস্থা বিভিন্ন। এক্ষণে সর্ব্বস্থানেই দুই একজন ভিন্ন অপর সকলেরই আর্থিক অবস্থা প্রায় সমভাব।

অন্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ যে কেবলমাত্র আইন পরীক্ষার জন্য লালায়িত হইতে আরম্ভ করিল, তাহার কারণ তৎকালে বঙ্গসমাজের মধ্যে আত্মকলহ এবং আত্মবিচ্ছেদ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তাহা না হইলে বিদেশী অনায়াসে এত বড় বৃহৎ শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে বিনাক্লেশে করায়ত্ত করিয়া ইহার উপর প্রভুত্ব পরিচালন করিতে সমর্থ হইত না। এই আত্মবিচ্ছেদ এবং আত্মকলহের নিমিত্ত বঙ্গসমাজে ঝগড়া কলহ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে ছিল এবং

ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে সেই কলহ, মারামারি, জোর-জুলুম ও দলাদলির দ্বারা পরিসমাপ্তি হইত। ইংরাজ আগমনের পরে এবং তাহাদের কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনে সেই জোরজুলুম, মারামারি প্রভৃতি একরূপ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু নিজেদের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। তখন তাহাদের সেই আত্মকলহ এবং আত্মবিচ্ছেদ মীমাংসার একমাত্র উপায় হইল ইংরাজের স্থাপিত বিচারালয়।

এদিকে নিয়ম হইল বিচারালয়ে গমন করিলে বিচার খরিদ করিয়া লইতে হইবে। তখন আইন-ব্যবসায়ীগণ তাহাদের ব্যবসায়ের উপকরণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল এবং বঙ্গবাসিগণ আত্ম কলহের ফলস্বরূপ নিজেদের যাহা কিছু ধনসম্পত্তি নির্ব্বিচারে কেবল জেদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া অবশেষে ক্ষুণ্নমনে গৃহে প্রত্যাগত হইতে লাগিল। সেই অবস্থা বঙ্গসমাজ হইতে এখনও বিদূরিত হয় নাই, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শমিত হইয়াছে।

তৎকালে দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি হইতেন যিনি নানাপ্রকারে মোকদ্দমার উদ্ভব করিতে সমর্থ এবং দুই নিরাহ প্রতিবেশীর মধ্যে কলহ সংঘটন করাইয়া দিয়া একটা বৃহৎ মামলার উপায় সৃজন করিতে পারগ। বাঙ্গালার চিন্তাধারা তখন অন্যান্য সমস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই পথে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

দেশের মধ্যে ব্যবসায়ীর সম্মান রহিল না, দেশের মধ্যে বলশালীর সম্মান রহিল না, দেশের মধ্যে শিল্পীর সম্মান রহিল না, দেশের মধ্যে কলাবিদ্যাবিশারদের সম্মান রহিল না, কেবলমাত্র সম্মান রহিল আইনজীবীর এবং সেই আইনজীবীর পৃষ্ঠপোষক দেশের মামলা মোকদ্দমার উদ্ভাবনকর্ত্তার।

সেই চিন্তাধারার আশু ফল হইল যে, আজ বঙ্গ-সমাজ হইতে ব্যবসায়ীর অন্তর্ধান হইয়াছে, বলশালী অন্তর্ধান করিয়াছে, শিল্পীশূন্য হইয়াছে, কলা-বিদ্যাবিশারদ লোপ হইয়া গিয়াছে, কেবল বর্ত্তমান আছে হাহাকার।

ইহার সত্যার্থ নির্ণয়ে বাঙ্গালার যে কোন পুরাতন ধনশালীর বর্ত্তমান জরাজীর্ণ প্রাসাদতুল্য আলয়ে গমন করিয়া তাহাদের দুরবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসু হইলে জানিতে পারা যাইবে যে, সামান্য এককাঠা জমি কিম্বা একটা আমড়া গাছের সত্ত্ব লইয়া তাহাদের পিতা কিম্বা পিতামহ মোকদ্দমা করিয়া এবং সেই মোকদ্দমায় পরিশেষে হয়ত জয়লাভও করিয়া অদ্য তাহাদের এই দুর্দ্দশা। এবং আরও জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, এই মোকদ্দমার প্রণোদক ছিলেন তাহাদের এক দরিদ্র অতি বুদ্ধিমান প্রতিবেশী অমুকলোক।

তবে তৎকালে দেশের লোকের অর্থ ছিল, শোষণক্রিয়ার ফলে তখনও সমস্ত অর্থ দেশবহির্ভূত হয় নাই তাই তৎকালের আইনজীবীগণ বহু অর্থের অধিস্বামী হইতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে দেশবাসীর হস্তে আর অর্থ নাই এবং দেশের লোকও নিজেদের বিষয় অনুভব করিতে সক্ষম হইতেছে, তাই এক্ষণে আইনজীবীর অবস্থাও ধীরে ধীরে ক্ষুণ্নতার আসনে অবতরণ করিতেছে।

সেই কারণে তখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইনের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তাহার ধনসম্পত্তি এবং সম্মানের অবধি থাকিত না। তাহাতেই তৎ-কালের মেধাশালী বঙ্গীয় যুবকগণ সর্ব্ব ব্যবসায় পরি-ত্যাগ করিয়া আইনব্যবসায় গ্রহণ করিতে লালায়িত হইত, এবং তাহারই ফলস্বরূপ আমরা কতকগুলি উর্ব্বর মস্তিষ্কসমন্বিত আইনব্যবসায়ী প্রাপ্ত হইয়াছি।

সে ঘোর এখনও আমাদের অপনীত হয় নাই।

এখনও বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে আইনের নেশা সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান। যদিও এক্ষণে তাহাতে আর পূর্ব্বফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি সংস্কারের হাত হইতে তাহারা মুক্ত হইতে পারে নাই।

এই যে বঙ্গসমাজের মধ্যে আজ পণপ্রথা পণপ্রথা বলিয়া আন্দোলন স্থরু হইয়াছে, ইহার উপারম্ভ কোথায় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ইহার প্রথম সূত্র আরব্ধ হয়, এই অবসাদ যুগের সময় আইন ব্যবসায়ের উন্নততর অবস্থা হইতে।

যখন ধনী পিতা দেখিলেন যে কোন পাত্র আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অজস্র অর্থ আনয়ন করিতেছে এবং তৎকালীন সমাজে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মানসম্ভ্রম, তখনই পিতার মন লালায়িত হইল যে আমার স্নেহের দুহিতাকে ঐ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলে আমার দুহিতা বেশ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবনাতিবাহিত করিতে সমর্থা হইবে। সেই কারণে তখন তিনি সেই পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের জন্য উৎসুক হইলেন।

সেই সময় তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর ধনীও ঠিক সেইরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া সেই পূর্ব্বোক্ত পাত্রেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন উভয় কন্যাকর্ত্তার নিলামের ডাকে পাত্রের দরও উচ্চে উঠিল এবং সেই সঙ্গে পণপ্রথাও আবির্ভাব হইল।

তৎপরে আইনজীবীর ব্যবসায়ের নিম্নে, সেই যুগ হইতে অন্য আর একটী ভয়ঙ্কর জীবিকোপায় আরব্ধ হইল, যাহা এই বঙ্গসমাজের দরিদ্রতার অপর কারণ, তাহা চাকরীর উপার্জ্জন। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে চাকরীর প্রথা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। তৎকালে নবাবদিগের দরবারে সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিকে কর্ম্মচারীরূপে রক্ষা করিলে তৎকালীন রাজত্ব একরূপ পরিচালিত হইত।

কিন্তু ইংরাজ তাহা অপেক্ষা দেশকে সুশাসনে শাসিত করিতেছেন, সেই জন্য ইঁহাদের বহু কর্ম্মচারী আবশ্যক হয়, এবং তাহা ছাড়াও বহু ইউরোপীয় সওদাগর পাশ্চাত্য প্রথায় এই দেশে কারবার স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেও বহু লোকের আবশ্যক হয়। এই দেশবাসী সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদের মন হইতে ক্রমশঃ ব্যবসায় প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এই চাকর প্রথার মূল সূচনা হইতেছে প্রথমে কতকগুলি বাঙ্গালী ইংরাজের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া অসম্ভাবিতরূপে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহাদের পথানুসরণ করিতে গমন করিয়া অদ্য এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

ইংরাজ ভারতের রাজদণ্ড প্রথমে বঙ্গদেশেই ধারণ করেন, পরে অন্য অন্য প্রদেশে। কিন্তু তাঁহাদের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া যখন রাজত্ব পরিচালনা করা আবশ্যক হইল এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশ করতলগত করিতে ইচ্ছুক হইলেন. তখন তাঁহাদের দেশীয় লোকেরও আবশ্যক হইল। কিন্তু সেই সকল লোক তাঁহাদের ভাষায় শিক্ষিত না হইলে কর্ম্ম পরিচালন করা অসম্ভব, তাই ইংরাজ এদেশবাসী কতকগুলি লোককে তাঁহাদের ভাষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ইংরাজ সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশ জয় করেন, সেইজন্য বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র ভারতের মধ্যে ইংরাজীভাষা শিক্ষা করেন। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীই প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে, ইংরাজ বাঙ্গালীকেই সর্ব্বস্থানে চাকরীতে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহাতে বঙ্গদেশীয় আপামর বহু বাঙ্গালীর হস্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুদ্রা আগমন করিতে আরম্ভ করিল।

সেই মুদ্রার লোভ বাঙ্গালী এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা একটু অন্যরূপ ছিল। তৎকালে অর্থ সাধারণের নিকট এরূপ ব্যাপকভাবে ছিল না। অর্থ ধনীর হস্তেই প্রায় থাকিত, তবে খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সাধারণের মধ্যে ছিল। অর্থের বিশেষ আবশ্যক হইত না। সেই সময়ে কড়িদ্বারাও ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সমাধা হইত, কিন্তু ইংরাজ আগমনের পর খাদ্যসামগ্রী দুর্ম্মূল্য হইতে আরম্ভ করিল, সেই সঙ্গে অর্থ সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

সাধারণ লোক তখন আবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রীর অনটনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অর্থের দিকে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিল এবং সেই অর্থাকৃষ্টতাই চাকরীর মূলসূত্র।

ইংরাজের নিকট প্রথম চাকরী গ্রহণের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অর্থাগমশীল এবং সম্মানের চাকরী ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রাপ্ত হইল কমিসরিয়েটের মধ্যে, অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সৈন্যদিগের রসদের বন্দোবস্ত করা। সেই কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট নানাভাবে প্রচুর অর্থাগমের সুবিধা ছিল এবং সেই কর্ম্মচারী অতি শীঘ্রই নিশ্চিন্তভাবে প্রচুর ধনশালী হইয়া উঠিতেন।

এই কমিসরিয়েটের চাকরী প্রবর্ত্তনের একটু কারণ বর্ত্তমান। কারণ তৎকালে ইংরাজ একমাত্র বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতের সর্ব্ব প্রদেশেই যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। সেই হেতু সৈনিকবৃন্দের আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য দেশীয় লোকের আবশ্যক হইত, কিন্তু তখন ভারতের অপর প্রদেশের লোক ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং ইংরাজজাতিও তাহাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিতে অসমর্থ, সেই কারণ দেশীয় কর্ম্মচারীর স্থান পূরণ হইত বাঙ্গালীর দ্বারা। তাহাতেই বাঙ্গালীর তৎকালে চাকরী প্রাপ্তির সুবিধা হইয়াছিল।

সেই সময় কতকগুলি বাঙ্গালী এই কমিসরিয়েটে কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহাদের অকাতরে অর্থোপার্জ্জন দেখিয়া সকলেই তাহাতে লোভাকৃষ্ট হয়। তখন অনেকে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল যে কিরূপে কোম্পানীর সংস্পর্শে আগমন করা যায়। তৎকালে এরূপ মনোভাব প্রকটিত হইয়াছিল যে কোম্পানীকে, এমন কি, কোন সাহেবকে স্পর্শ করিলেও ধনশালী হওয়া যায়।

এইরূপ মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে ক্রমশঃ ব্যবসায় বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়া সাহেব স্পর্শের জন্য লালায়িত হইতে লাগিল। ব্যবসায়বাণিজ্য বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইবার ইহা অন্যতম কারণ।

এই কারণ ব্যতীত অন্য কারণ বর্ত্তমান ছিল। লোকে যখন ইংরাজী শিক্ষা করিয়া নানারূপ চাকরীতে নিয়োজিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন সেই কর্ম্মে নিযুক্ত লোকগণ ইংরাজের ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া সাধারণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেও বিরত হইল না।

ধনশালী ব্যবসাদার দেখিল যে তাহার দরিদ্র প্রতিবেশী কোনরূপে কোম্পানীর চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া, হয়ত সেই সময় সেই প্রতিবেশী পুলিশ বিভাগে কিম্বা বিচার বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং অদ্য তাহার উপর প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেছে। তখন তাহার মন ঈর্ষান্বিত হইয়া নিজের পুত্রকে আর ব্যবসায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট না করাইয়া চাকরীর উপযুক্ত করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। পুত্রও ক্রমে সেই অনুরূপ শিক্ষিত হইয়া পিতৃ পিতামহের ব্যবসায় কার্য্যকে ঘৃণ্য মনে করিয়া কোন চাকরীতে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইল।

বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে বিরল নহে। এরূপ দেখা গিয়াছে পিতার বিস্তীর্ণ কারবার, কিন্তু তিনি পুত্রকে ব্যবসায় কার্য্যে শিক্ষিত না করাইয়া মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করাইয়া একজন ডাক্তার প্রস্তুত করিলেন। সেই পুত্রের অপর ভ্রাতা কিন্তু ব্যবসায়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া ডাক্তার পুত্র অপেক্ষা ধনশালী হইতেছেন, ইহা দেখিয়াও কাহারও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না

ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা পাশ্চাত্য প্রভাবও বাঙ্গালী-জাতির উপর গভীরভাবে আপতিত হইয়াছে। তবে বাঙ্গালীজাতি পাশ্চাত্যের বাহিরের আবরণ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার অন্তরের জিনিষ লইতে পারে নাই। বাঙ্গালা ইংরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার পোষাক পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে মাত্র

বাঙ্গালীর হস্ত হইতে ব্যবসায় বাণিজ্য চ্যুত হইবার অন্যতম কারণ হইতেছে, এই পোষাক বিভ্রাট। পাশ্চাত্য পোষাকে ভূষিত হইয়া আর মুদীর দোকানের দ্রব্য তুলাদণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করিয়া খরিদ্দারকে প্রদান করা যায় না। কারণ সাধারণ বাঙ্গালী দেখিয়াছে যে, পাশ্চাত্যজাতি এদেশে তাহার জাতীয় পোষাকে ভূষিত হইয়া তৈল লবণ প্রভৃতির খুচরা বিক্রয় কার্য্য করে না। বাঙ্গালী যেটুকু দেখিয়াছে সেইটুকু করিবে। সেই জন্য পোষাকের মায়াতে আবদ্ধ হইয়া অনেক সময় বাঙ্গালা যুবক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরীর অনুসন্ধানে ধাবিত হয়।

বহু বঙ্গীয় যুবক পাশ্চাত্য প্রদেশে জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য গমন করেন, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় তথা হইতে তাহারা কেবলমাত্র আইন কিম্বা দুই একজন চিকিৎসা এবং অতি অল্পই ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কেহই কোনরূপ কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশে আগমন করিয়াছেন এরূপ কদাচিৎ শ্রুত হওয়া যায়।

কদাচিৎ যাঁহারা কার্য্যকরী বিদ্যায় কিম্বা কোনরূপ শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাগত হয়েন, তাঁহারা সেই জ্ঞান দ্বারা দেশবাসীর কোন মঙ্গলজনক শিল্পোদ্ধার কার্য্য কিম্বা সেই শিল্পদ্বারা নিজে কোন ব্যবসায়ের সৃষ্টি না করিয়া এদেশে অবস্থিত কোন বৈদেশিকের শিল্পাগারে চাকরীতে আত্মনিয়োগ করিয়া বৈদেশিকেরই অর্থাগমের সুবিধা করিয়া দেন

ইহা ছাড়াও বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক ব্যবসায় বাণিজ্য পরিত্যক্ত হইবার অন্যতম কারণ লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এ সম্বন্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, ইহার প্রবর্ত্তনের দ্বারা বৈদেশিক সওদাগরদিগের যে এদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই

তাহাতে বৈদেশিক সওদাগরদিগের উপর বিশেষ দোষ প্রদর্শিত হইতে পারে না। জাড্যাক্রান্ত হইয়া সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অপরে যে সেই অবকাশে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বাঙ্গালা সে চিন্তার নিকট গমন করে নাই। আলস্যপ্রিয় জাতি যখন রাজশক্তি কর্ত্তৃক একটা স্থায়ী আয় প্রাপ্ত হইল, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনাকে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া একেবারে নিশ্চিন্তের সাগরে নিমজ্জিত করিল।

দেখা যায়, তৎকালে দেশের জমিদারবর্গই দেশমধ্যে ধনশালী ছিলেন। তাঁহারা যখন এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের বলে একটা স্থায়ী আয়ের উপস্বত্বভোগী হইলেন, তখন তাঁহারা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারা ধনবৃদ্ধির উপায় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে আলস্যে এবং বিলাসে দিনাতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, সামান্য কোনরূপ শ্রমসাধ্য কর্ম্মকেই তাঁহারা অপমানজনক বলিয়া মনে করেন।

তাঁহারা যে ভূস্বামী, বিলাস উপভোগ ছাড়া যে তাঁহাদের আর কোন করণীয় কর্ম্ম নাই, এই ধারণাই তাঁহাদের বদ্ধমূল হইয়া গেল। তাঁহারা সেই কারণে নিজেদের অর্থ ব্যবসায় কার্য্যে নিয়োজিত না করিয়া তাহাদ্বারা বিলাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন দেশের জমিদারগণ ব্যবসায়কে ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করিলেন, তখন সাধারণের নিকটও তাহা ঘৃণাজনক বলিয়া উপেক্ষিত হইল। লোকের নিকট সামান্য অর্থ সঞ্চিত হইলেই সেই অর্থ কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদ্বারা জমিদারী খরিদ করিতে ব্যস্ত হইল।

এক্ষণে বাঙ্গালার জমিদারগণের দুর্দ্দশা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব সম্পত্তি অতি ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত হইয়া তাহারই সামান্য আয়ে পরিতৃপ্ত হইয়া পূর্ব্ব গর্ব্বের চিন্তায় মগ্ন আছেন; কিন্তু তাঁহারা এখনও যে ব্যবসায় কার্য্যকে ঘৃণিত বলিয়াই উপেক্ষা করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিশেষতঃ জমিদারপুত্র ব্যবসায় করিবে ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না।

এইরূপ নানা কারণে বাঙ্গালীর মন হইতে যখন ব্যবসায় বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া দাসত্বের পথে ধাবিত হইল, তখন অবাঙ্গালীগণ ধীরে ধীরে এদেশে আগমন করিয়া বাঙ্গালীর পরিত্যক্ত ব্যবসায় ক্ষেত্রকে অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালী কিন্তু তাহা দেখিয়াও মোহাচ্ছন্নবশতঃ সে দিকে গমন করিতে ইচ্ছুক হইল না। অবাঙ্গালী তখন তথায় একছত্র সম্রাট্-রূপে বিরাজমান হইয়া রহিল।

রাজেন্দ্রনাথ যে সময় সম্পূর্ণ নিঃসহায় এবং রিক্ত-হস্তে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চেষ্টিত, তৎকালের বাঙ্গালী যুবকগণের মনোবৃত্তি, এমন কি, অভিভাবকগণেরও মনোবৃত্তি অন্য পথে চালিত হইয়াছে, তাহার কারণ এবং অবস্থা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

তখন স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করিতে কেহই ইচ্ছুক নহে এবং স্বাধীন জীবিকাবলম্বী তখন সাধারণের চক্ষে ঘৃণা এবং উপেক্ষার পাত্র। তখন স্বাধীনতার সম্মান দেশ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। স্বাধীনতার পথে বাধাও তৎকালে বহুতর। স্বাবলম্বীর পক্ষে কেহই তখন সাহায্যকারী নাই। রাজেন্দ্রনাথ সেই যুগ-বিপর্য্যয়ক্ষণে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের জন্য অগ্রসর হইলেন, সম্বলমাত্র বিশালবক্ষের অদম্য সাহস।

[ক্রমশঃ]

প্রাথমিক পদার্থ-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী]

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধারণ জড়ধর্ম্ম

বিজ্ঞান কাহাকে বলে—'বিজ্ঞান' কথার অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা দ্বারা সর্ব্বদাই আমরা প্রকৃতির নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতেছি। আমরা প্রত্যহই দেখি যে, সূর্য্য একই দিকে উদিত হয় ও একই দিকে অস্ত যায়, বৃক্ষলতাদি আপনা আপনি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, নিরবলম্ব সকল বস্তুই উপর হইতে নীচে পতিত হয়, কোন জিনিষকে উত্তপ্ত করিলে উহা আয়তনে বর্দ্ধিত হয়,—ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে আমরা সাধারণ জ্ঞান বলি—বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয়। কোন জিনিষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সূর্য্য কেন প্রত্যহ একই দিকে উদিত হয় ও একই দিকে অস্ত যায়, বৃক্ষলতাদি কি করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, নিরবলম্ব জিনিষ কেন উপর হইতে আরও উপরে না উঠিয়া নীচে পতিত হয়, উত্তপ্ত জিনিষ কেন আয়তনে বর্দ্ধিত হয়—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ না করা পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে না।

কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তিনটি জিনিষের দরকার—পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তি। কথিত আছে যে, সুবিখ্যাত পণ্ডিত স্যার আইজাক্ নিউটন একদিন পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, ফল বৃক্ষচ্যুত হইলে উপরের দিকে না গিয়া মাটিতে পড়ে। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেকেই বৃক্ষাশ্রয়হীন হইলে ফল যে মাটিতে পড়ে এই সাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিউটন শুধু ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া আরও নানাবিধ জিনিষ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সকল পদার্থই আশ্রয়হীন হইলে উপর হইতে নিম্নে পতিত হয়, কখনও উপরের দিকে যায় না।

ইহার পর নানা যুক্তিতর্কের পর নিউটন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জগতে প্রত্যেক পদার্থ সর্ব্বদাই অপর পদার্থদ্বারা আকৃষ্ট হয়। ইহাই প্রসিদ্ধ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। ইহার প্রভাবে পৃথিবী সকল পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলিয়াই ফল বা অন্য সকল বস্তু নিরবলম্ব হইলেই উপর হইতে নিম্নে পতিত হয়। এতক্ষণে ফল কেন মাটিতে পড়ে সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইল এবং এই জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে। যে শাস্ত্র এইরূপ নানাবিধ প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা ও উত্তর প্রদান করে তাহাই বিজ্ঞান।

পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান—যাহাতে সকল জাগতিক ব্যাপার ও নানাবিধ প্রাকৃতিক নিয়মাদির ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে তাহাই পদার্থ-বিজ্ঞান। জাহাজ জলে ভাসে কেন এবং ক্ষুদ্র একটি প্রস্তরখণ্ডই বা জলে ডুবিয়া যায় কেন? চলন্ত রেল গাড়ীতে দণ্ডায়মান অবস্থায় হঠাৎ গাড়ী থামিয়া গেলে সম্মুখে পড়িয়া যাও কেন? জলমধ্যে কিয়দংশ নিমজ্জিত কোন যষ্টিখণ্ড বক্র দেখায় কেন? কাচের বোতলে গরম জল ঢালিলে বোতল ফাটিয়া যায় কেন? বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে ও পাখা ঘোরে কেন? পদার্থ-বিজ্ঞান এই সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। ইহা জড়পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার গুণ ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে বলিয়া ইহাকে **'পদার্থ-বিজ্ঞান'** বা **'জড়-বিজ্ঞান'** বলা হয়। সকল পদার্থের বাহ্যিক গুণ ও ধর্ম্মালোচনা পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিন্তু ঐ সকল পদার্থের আভ্যন্তরীণ গঠন বা উহাদের মূল উপাদানের গুণ ও ধর্ম্মালোচনা **'রসায়ন-বিজ্ঞান'** নামে অন্য এক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কোন পাত্রে কিছু জল লইয়া উহাকে উত্তপ্ত করিলে জল ক্রমশঃ বাষ্পাকারে পরিণত হইবে। ঐ বাষ্পকে কোন বরফাচ্ছাদিত পাত্রে প্রবিষ্ট করাইলে উহা ঘনীভূত হইয়া পুনরায় জলাকারে পরিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং জলীয় বাষ্প ও জল একই পদার্থের বিভিন্ন অবস্থামাত্র।

একটি সাধারণ লৌহখণ্ডের উপর চুম্বক ঘর্ষণ করিলে উহাও অন্য লৌহ আকর্ষণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করে। এখানে লৌহখণ্ডটি নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও উহা পূর্ব্বের ন্যায় লৌহ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এই সকল ব্যাপার পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এই সকল ক্ষেত্রে কোন পদার্থের আসল গঠনের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। সকল পদার্থ মূলতঃ একই থাকে শুধু রূপান্তর গ্রহণ করে মাত্র।

আবার একটি কাষ্ঠখণ্ডকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে উহার এক অংশ বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায় এবং মাত্র ভস্ম ও কয়লা অবশিষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে কাষ্ঠখণ্ডটি দগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ নূতন পদার্থে পরিণত হইল, যাহার সহিত কাষ্ঠের কোন সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ নাই। এইরূপ পরিবর্ত্তন রসায়ন-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য পদার্থ-বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ ছয় অংশে বিভক্ত করা হয়:—

(১) সাধারণ জড়ধর্ম্ম; (২) তাপ; (৩) আলোক; (৪) শব্দ; (৫) চুম্বকত্ব ও (৬) তাড়িত।

জড় কাহাকে বলে—আমরা সর্ব্বদাই নানাপ্রকার পদার্থ পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, এবং দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, আস্বাদন ইত্যাদি নানা উপায়ে ঐ সকল পদার্থের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হই। কোন পদার্থ সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ পদার্থের অস্তিত্ব আমরা স্পর্শন ও দর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে উপলব্ধি করি। বায়বীয় ও অন্য যে সকল পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না তাহাদিগের অস্তিত্ব স্পর্শন ও ঘ্রাণ দ্বারা জানিতে পারা যায়, যেমন—অন্ধকারের ভিতরেও আল-কাতরা বা পুষ্পের অস্তিত্ব ঘ্রাণশক্তিদ্বারা সহজে বুঝা যায় এবং বায়ু ও ঐ জাতীয় অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্ব স্পর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে উপলব্ধ হয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে ইষ্টক, লৌহ, কয়লা, ফল, পাতা, চেয়ার ইত্যাদি কতকগুলি জিনিসের নির্দ্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে এবং ইহারা বিভিন্ন প্রকার পদার্থদ্বারা প্রস্তুত; জল, দুগ্ধ, তৈল, পারদ ইত্যাদি

কতকগুলি জিনিষের আয়তন আছে বটে, কিন্তু কোন আকার নাই। ইহারা যখন যে পাত্রে থাকে তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। আবার বায়ু, জলীয় বাষ্প, কয়লা বাষ্প ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ আছে যাহাদিগকে চোখে দেখা যায় না এবং যাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার বা আয়তন কিছুই নাই। যে সকল মূল দ্রব্যদ্বারা জগতের এইরূপ যাবতীয় পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে পদার্থ-বিজ্ঞানে তাহাদিগকে '**জড়**' নামে অভিহিত করা হয়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই পদার্থসমূহকে জড়পদার্থ বলা হয়। এজন্য পরিদৃশ্যমান আমাদের এই জগতকে আমরা 'জড়জগৎ' বলি।

অবশ্য কোন্‌গুলি জড়পদার্থ এবং কোন্‌গুলি নয়, দুই এক কথায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলা কঠিন; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে মোটামুটি ইহা বুঝিতে পারা তত কঠিন নয়। যেমন—লৌহ, কাষ্ঠ, জল, বায়ু ইত্যাদি সব জড়পদার্থ; কিন্তু শব্দ, বায়স্কোপের চলন্ত ছবি, রামধনু ইত্যাদি জড়পদার্থ নয়। শব্দ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করি, ছবি ও রামধনু চক্ষুদ্বারা দর্শন করি এবং লৌহ ও কাষ্ঠাদির ন্যায় ইহারা স্থানাবরোধ করে এবং ইহাদের আকারও আছে বটে, তথাপি ইহারা জড়পদার্থ নয়। সুতরাং স্থানাবরোধকতা, আকার বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিই জড়পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, অর্থাৎ শুধু এই সকল ধর্ম্ম জড়পদার্থ চিনিবার একমাত্র উপায় নয়। তাহা হইলে জড়ের প্রকৃত ধর্ম্ম কি?

প্রথমতঃ **ধর্ম্ম** এই কথাটার প্রকৃত অর্থ বুঝা উচিত, কারণ সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রেই ইহা বিশেষ আবশ্যক। আমরা বলি যে চিনি মিষ্ট, অর্থাৎ মিষ্টতাই চিনির ধর্ম্ম; সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ জ্যোতিঃ বিকীরণ করাই সূর্য্যের ধর্ম্ম, সেইরূপ অগ্নির ধর্ম্ম দহন ও জলের ধর্ম্ম শীতলতা। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, প্রত্যেক পদার্থ স্ব স্ব ধর্ম্মদ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে।

জড়ের ধর্ম্ম—সকল জড়পদার্থেরই কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে। যথা—

(১) **স্থানাবরোধকতা**—সকল পদার্থই সর্ব্বদা কতকটা স্থান অধিকার করিয়া থাকে। যাহার আয়তন যত অধিক, সে তত অধিক স্থান অধিকার করে।

(২) **অভেদ্যতা**—অর্থাৎ দুইটি জড়পদার্থ একই সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না। এক বালতি জলের ভিতর একটি প্রস্তরখণ্ড ডুবাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে, বালতির জলের আয়তন যেন বাড়িয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তরখণ্ডকে জায়গা দিবার জন্যই জল উপরে উঠিয়াছে—জলের পরিমাণ বাড়ে নাই। সেইরূপ একটি কাচের বোতল মুখ নীচু করিয়া জলের ভিতর প্রবেশ করাইলে উহা জল পূর্ণ হইবে না, কারণ ঐ অবস্থায় বোতলের ভিতর যে বায়ু আবদ্ধ আছে তাহা বহির্গত হইতে পারিতেছে না এবং উহাকে বহির্গত করিতে না পারিলে জল সেস্থান অধিকার করিতে পারিবে না।

(৩) **প্রতিরোধকতা**—সকল জড়পদার্থের প্রতিরোধক ধর্ম্ম আছে। দেওয়াল, বৃক্ষ বা অন্য যে কোন পদার্থের সহিত সংঘর্ষণ হইলে উহারা যে বাধা প্রদান করে ইহা সহজেই বুঝা যায়। জলে সাঁতার দিবার সময় অথবা একটি উন্মুক্ত ছাতা লইয়া দৌড়াইবার সময় জলের এবং বাতাসেরও যে প্রতিরোধক শক্তি আছে তাহা জানা যায়

(৪) **ওজন**—জড়পদার্থ মাত্রেরই ওজন আছে। একটি খালি গেলাস মাটি হইতে উপরে উঠাইতে গেলেই উহার ওজন আছে তাহা বুঝা যায় আবার গেলাসটি জলে পূর্ণ করিয়া উঠাইলে উহা আরও ভারী বোধ হইবে, কারণ জলের ওজন আছে। বাতাস খুব হাল্কা বটে; কিন্তু ইহারও ওজন আছে, তাহা পরীক্ষাদ্বারা সহজে জানা যায়।

সুতরাং যাহাদের ওজন আছে, যাহারা স্থানাবরোধ করে ও স্থানচ্যুত করিতে গেলে বাধা প্রদান করে তাহারাই জড়পদার্থ।

জড়পদার্থের সংজ্ঞানুযায়ী এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে শব্দ, চলন্ত ছবি, রামধনু ইত্যাদি কেন জড়-পদার্থ নয়। ইহাদের ওজন বা প্রতিরোধকতা ইত্যাদি কতকগুলি ধর্ম্ম নাই।

এই সকল ধর্ম্ম ব্যতীত জড়পদার্থের আরও কয়েকটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যেমন—

(১) **বিভাজ্যতা**—ইষ্টক, কাষ্ঠ, লৌহ ইত্যাদি যে কোন পদার্থ লইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যায়। এইরূপে ভাগ করিতে করিতে অবশেষে যে অতি সূক্ষ্মাংশ পাওয়া যায় তাহাকে '**অণু**' বলে। অণুকে বিভাগ করিলে উহা আরও সূক্ষ্ম কণিকা '**পরমাণু**'তে পরিণত হয়। এই 'অণু' ও 'পরমাণু' লইয়াই সকল জড়পদার্থ গঠিত হইয়াছে।

(২) **রন্ধ্রবিশিষ্টতা**—ব্লটিং কাগজ বা স্পঞ্জের উপর জল দিলে উহা তৎক্ষণাৎ শোষিত হয়, কারণ উহারা রন্ধ্রবিশিষ্ট। এইরূপ কলস ও ইষ্টকাদি মৃন্ময় অমসৃণ পদার্থগুলিও যে জল শোষণ করে, তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। খালি চোখে দেখা না গেলেও ইহারাও যে রন্ধ্রবিশিষ্ট, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে জানা যায়। সহজে বিশ্বাস না হইলেও লৌহ, সীসক ইত্যাদি পদার্থও যে রন্ধ্রবিশিষ্ট তাহা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

(৩) **সঙ্কোচনশীলতা**—সকল পদার্থকেই চাপ দিয়া সঙ্কুচিত করা যায়। পদার্থের অণু পরমাণু মধ্যে রন্ধ্র বা অবকাশ থাকিলে উহাদিগকে চাপদ্বারা সঙ্কুচিত করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অবশ্য বায়ু বা অন্য কোন গ্যাসকে যত সহজে ও যে পরিমাণে সঙ্কুচিত করা সম্ভব, জল, কাষ্ঠ বা লৌহাদির সঙ্কোচন তত সহজ নয়। পরে দেখিবে যে, এই সকল পদার্থের অণু পরমাণুর মধ্যবর্ত্তী অবকাশের উপরই এই সঙ্কোচন ক্রিয়া নির্ভর করে।

(৪) **স্থিতিস্থাপকতা**—একটি রবারের নলকে টানিয়া লম্বা করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বাইসাইকেলের পাম্পের যে মুখ দিয়া হাওয়া বাহির হয়, উহা বন্ধ করিয়া উপর হইতে চাপদণ্ড দ্বারা চাপ দিলে ভিতরের হাওয়া সঙ্কুচিত হইয়া আয়তনে কমিয়া যায়। আবার উপরের চাপ ছাড়িয়া দিলে হাওয়া পূর্ব্বের আয়তন প্রাপ্ত হয়।

একটি কাচের মার্ব্বেল বা লৌহের বল কিছু উপর হইতে কোন প্রস্তরখণ্ডের উপর ফেলিলে দেখিবে যে, প্রস্তরখণ্ডের সহিত ধাক্কা খাইবার পর উহা যেখান হইতে ফেলা হইয়াছিল প্রায় ততদূর পর্য্যন্ত লাফাইয়া ফিরিয়া আসে; কিন্তু একটি পাথরের বল লইয়া এইরূপ পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, উহা ধাক্কা খাইবার পর অতি সামান্য দূর ফিরিয়া আসিবে; অর্থাৎ এইরূপ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসার ক্ষমতা কাচ বা লৌহের (১নং চিত্র) যত অধিক, পাথরের তদপেক্ষা অনেক কম। জড়পদার্থের এই ধর্ম্মকে **স্থিতিস্থাপকতা** বলা হয়।
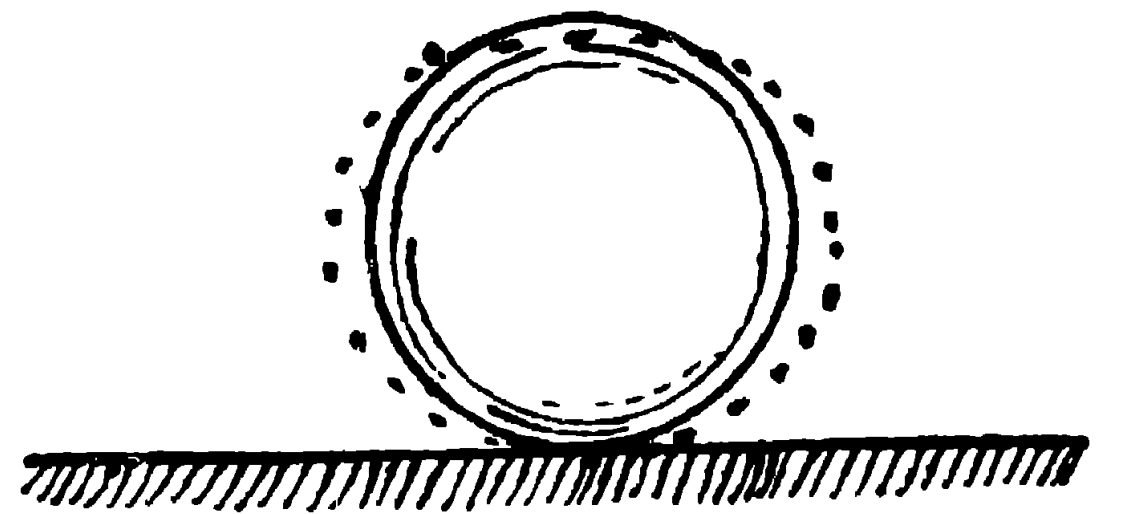
(১নং চিত্র)

১নং চিত্রে দেখ লৌহের বলটি কঠিন জিনিষের উপর পড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্য সামান্য চ্যাপ্টা হইয়া

গিয়াছে; কিন্তু স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মবলে তৎক্ষণাৎ উহা আপন শক্তিতেই পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইবে ও সেই শক্তিপ্রভাবেই লাফাইয়া উপরে উঠিবে। রবারের নলকে টানিয়া বায়ুর উপর চাপ দিয়া বা কাচের মার্বেল উপর হইতে ফেলিয়া উহাদের উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করার ফলে উহাদের আকারের সামান্য পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু বলপ্রয়োগ বন্ধ করার পরেই স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মগুণে উহারা পূর্ব্বাকার পুনঃ প্রাপ্ত য়। প্রায় সকল জড়পদার্থেরই এই ধর্ম্ম অল্পবিস্তর পরিমাণে আছে, অবশ্য সীসক, চর্ব্বি, কর্দ্দম প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের এই ধর্ম্ম নাই বলিলেই হয়। যদিও মনে হয় যে, রবার কাচ বা লৌহ অপেক্ষা অধিক সঙ্কোচ-প্রসারশীল বা স্থিতিস্থাপক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়; কারণ রবারকে প্রসারিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা ঠিক পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। বায়ুর এই ধর্ম্মের জন্য ফুটবল, বাইসাইকেলের বা মোটর গাড়ীর টায়ার বায়ুদ্বারা ভর্ত্তি করা হয়। সঙ্কোচ-প্রসারশীল ধর্ম্মের জন্য উহারা স্প্রীংএর কার্য্য করে।

(৫) **স্থিতিপ্রবণতা**— মনে কর, রাস্তায় একটি লৌহের রোলার পড়িয়া আছে। উহাকে ঘুরাইতে গেলেই কিছু শক্তি ব্যয় হইবে এবং কিছুক্ষণ ঘুরিবার পর স্থির করিবার জন্যও পুনরায় শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। রোলারটি কিছুতেই নিজে নিজে চলিতে বা নিজে নিজে স্থির হইতে পারিবে না। ভারী ও হাল্কা সকল পদার্থেরই এইরূপ নিষ্ক্রিয়তা আছে। স্থির বা গতিশীল কোন পদার্থই নিজের অবস্থা আপনা আপনি পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। জড়পদার্থের এই ধর্ম্মকে '**স্থিতি-প্রবণতা**' বা '**জড়ত্ব**' বলা হয়। পরে এই বিষয় আরও বিশদরূপে আলোচনা করিব।

জড়ের গঠন—সকল জড়পদার্থই অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকাদ্বারা গঠিত। এই সকল কণিকাকে আমরা পরমাণু বলি। পরমাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে অত্যুৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও ইহারা নয়ন-গোচর হয় না। অবশ্য আধুনিক গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ এত সূক্ষ্ম পরমাণুরও আকৃতি, প্রকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্বে মাত্র ৯২টি পরমাণুর অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি জগতের প্রত্যেক পদার্থ এবং সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সকলই মাত্র ৯২টি বিভিন্ন পরমাণুদ্বারা গঠিত। যেমন—ইষ্টক, কাষ্ঠ, লৌহ ইত্যাদি কয়েকটি জিনিষ লইয়া পর্ণকুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ এবং নানাবিধ সেতু, ষ্টীমার হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, সেইরূপ কয়েকটী মাত্র পরমাণুর বিভিন্ন বিন্যাস ও সম্মিলন দ্বারা প্রকৃতিদেবী এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাসায়নিকেরা বলেন যে, পরমাণুই জড়পদার্থের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম অংশ। এই প্রকার অথবা দুই বা ততোধিক বিভিন্ন পরমাণু সংযোগে এক একটি অণু গঠিত হয়। শুধু একই প্রকার অণু বা পরমাণু দ্বারা কোন পদার্থ গঠিত হইলে তাহাকে '**মৌলিক**' পদার্থ বলে। যেমন—উদ্‌জান, অম্লজান, অঙ্গার, লৌহ, স্বর্ণ, পারদ ইত্যাদি। যে পদার্থের অণু দুই বা ততোধিক বিভিন্ন পরমাণু সম্মিলনে গঠিত তাহাকে '**যৌগিক**' পদার্থ বলে; যেমন—জল, লবণ, চিনি ইত্যাদি। জলের অণু উদ্‌জান ও অম্লজান পরমাণু সংযোগে, লবণের অণু সোডিয়ম্ ও ক্লোরিণ নামক দুইটি বিভিন্ন পরমাণু সংযোগে এবং চিনির অণু কার্ব্বন, উদ্‌জান ও অম্লজান নামক তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর সম্মিলনে রচিত। যদিও

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে, কিন্তু দেখা যায় উদ্‌জান, অম্লজান, অঙ্গার, লৌহ, ক্যাল্‌সিয়ম্‌ ইত্যাদি কুড়ি বাইশটি মৌলিক পদার্থ দ্বারাই জগতের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

বহু আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত পরমাণু অবিভাজ্য বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল, অর্থাৎ জড়জগতে পরমাণু অপেক্ষা অন্য কোন সূক্ষ্মতর কণিকা পণ্ডিতমণ্ডলীর কল্পনাতীত ছিল; কিন্তু আধুনিক যুগের নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিঃসন্দেহরূপে স্থির হইয়া গিয়াছে যে, একথা সত্য নয়। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, সকল পরমাণুই অতি সূক্ষ্ম তাড়িত-কণিকাদ্বারা গঠিত। পরে তাড়িতের বিষয় বিশদরূপে পাঠ করিবার সময় জানিতে পারিবে যে, তাড়িত দুই প্রকার,—ঋণতাড়িত ও ধনতাড়িত। ঋণতাড়িতের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ ঋণতাড়িতের পরমাণুর নাম '**ঋণতাড়িতন**' ও ধন-সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাংশের নাম '**ধনতাড়িতন**'। ইংলণ্ডের পদার্থ-বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্যার জে, জে, টম্‌সন্‌ই প্রথমে ঋণতাড়িতনের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ধনতাড়িতনের নামকরণ করিয়াছেন অধ্যাপক রাদারফোর্ড। বৈজ্ঞানিকগণের মতে এই ঋণতাড়িতন ও ধনতাড়িতন দ্বারাই সকল পরমাণু গঠিত। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক পরমাণু-গর্ভে ধনতাড়িতনযুক্ত একটি কেন্দ্র আছে; এবং সৌরজগতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন কক্ষে প্রদক্ষিণশীল গ্রহগণের ন্যায় পরমাণুদেহের ধনতাড়িতযুক্ত কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি ঋণতাড়িতন সর্ব্বদাই ঘূর্ণায়মান থাকে। একটি উদ্‌জান পরমাণু ও 'হিলিয়ম্‌' গ্যাসের পরমাণুর চিত্র (২নং চিত্র) দিলাম। দেখ যে সর্ব্বাপেক্ষা লঘু উদ্‌জান পরমাণু কেন্দ্রের চারিদিকে মাত্র একটি ও হিলিয়ম্‌ পরমাণুতে দুইটি ঘূর্ণায়মান ঋণ-তাড়িতন আছে। এইরূপ অম্লজান পরমাণুর ঋণ-তাড়িতন সংখ্যা ৮, অঙ্গারের ৬, লৌহের ২৬, স্বর্ণের ৭৯ ইত্যাদি। এই ঋণতাড়িতনের সংখ্যা ও তাহাদের বিন্যাসের উপরেই বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর পার্থক্য নির্ভর করে—তাহা হইলে স্বর্ণের সহিত লৌহের বিশেষ পার্থক্য কোথায়? ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সকল পদার্থই মূলতঃ এক তাড়িতময়, অর্থাৎ এই জড়জগত কেবল তাড়িতেরই রূপান্তর-মাত্র।

এই ঋণতাড়িতনগুলি এত ক্ষুদ্র যে ৬,০০০,০০০,০০০,০০০টি পাশাপাশি রাখিলে উহারা মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা স্থান অধিকার করিবে, এবং ইহারা এত হাল্কা যে প্রায় ১৮০০ ঋণতাড়িতনের ওজন মাত্র একটি উদ্‌জান পরমাণুর ওজনের সমান। কিন্তু একটি উদ্‌জান পরমাণুর ওজন কত বল ত? দুই

+

উদ্‌জান পরমাণু

৪ + ২ −

হিলিয়ম্‌ পরমাণু

(২নং চিত্র)

আউন্স উদ্‌জান বাষ্পের ভিতর ৩৫ ' ' অর্থাৎ পঁয়ত্রিশের পর চব্বিশটি শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় ততগুলি পরমাণু আছে। তাহা হইলে একটি পরমাণুর ওজন কত তাহা হিসাব করিয়া দেখ এবং সেই হিসাব মত একটি ঋণতাড়িতনের ওজন কিরূপ নগণ্য তাহাও দেখ। পরমাণুর ওজন প্রধানতঃ নির্ভর করে উহার ধন-তাড়িতন সংখ্যার উপর, কারণ ধনতাড়িতনগুলি ঋণ-তাড়িতন অপেক্ষা ভারী।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাড়িত কণিকাদ্বারা গঠিত পরমাণুর আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে চাহিলে বলা যায় যে, দশকোটি পরমাণুকে পাশাপাশি রাখিলে তাহারা মাত্র এক ইঞ্চি স্থান অধিকার করে; কিন্তু দশকোটি ক্রিকেট বলকে পাশাপাশি রাখিলে তাহারা কত লম্বা স্থান দখল করিবে জান কি? পাঁচ হাজার মাইল। সুতরাং পরমাণু কত ক্ষুদ্র তাহা দেখ, এবং ঋণতাড়িতন পরমাণু অপেক্ষা আরও কত সূক্ষ্ম তাহাও দেখ। সব পরমাণুর আকার সমান নয়। উদ্‌জান সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। মোটামুটি বলা যায়, একটি পরমাণু একটি ঋণতাড়িতন অপেক্ষা প্রায় পঞ্চাশ সহস্রগুণ বড়। কেহ কেহ পরমাণু ও ঋণতাড়িতনের আয়তন তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সমস্ত পৃথিবীর আয়তনের নিকট আকাশে উড্ডায়মান একটি ব্যোমযানের আয়তন যত ক্ষুদ্র একটি পরমাণু দেহে ঋণতাড়িতন সেইরূপ ক্ষুদ্র। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, পরমাণুদেহের অধিকাংশই ফাঁপা।

জড়ের তিন অবস্থা—যদিও জগতে অসংখ্য জড়পদার্থ আছে, তাহাদিগকে মাত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

বাড়ী, ঘর, চেয়ার, টেবিল, ইষ্টক, লৌহ ইত্যাদি যাহাদের স্বতন্ত্র আকার ও আয়তন আছে তাহাদিগকে কঠিন পদার্থ বলে।

তরল পদার্থের আয়তন আছে, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। ইহারা যখন যে পাত্রে রক্ষিত হয়, তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, এবং নিশ্চল অবস্থায় ইহাদের উপরিভাগ সর্ব্বদাই সমতল থাকে। জল, দুগ্ধ, তৈল, পারদ ইত্যাদি তরল পদার্থ।

বাষ্প বা গ্যাসের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার বা আয়তন নাই। ইহাদিগকে যখন যে পাত্রে আবদ্ধ করা যায়, তখন সেই পাত্রটি সম্পূর্ণরূপে জুড়িয়া থাকে। অতি অল্পপরিমাণ গ্যাস একটি গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিলে উহা ক্রমশঃ আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত গৃহটি ভরিয়া যায়। বায়ু, উদ্‌জান, অম্লজান ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থ।

কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা কঠিন কি তরল সহজে বুঝা যায় না। গুড়, মধু, গ্লিসারিণ ইত্যাদি তরল, কিন্তু পিচ্ (যাহা রাস্তায় দেওয়া হয়), 'জেলি' ইত্যাদি কঠিন কি তরল বুঝা কঠিন। পিচ্‌কে প্রথমে কঠিন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটি পিচের স্তূপ কোন স্থানে রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, উহা ক্রমে নরম হইয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া যাইবে। এজন্য পিচ্, মোম ইহারা তরল পদার্থের অন্তর্গত, কিন্তু জেলি তরল নয় কঠিন। বালি, ময়দা ইত্যাদি স্তূপাকারে রাখিলে যদিও একস্থান হইতে অন্য স্থানে গড়াইয়া যায়, তথাপি উহারা কঠিন, কারণ উহাদের কণিকাগুলি সূক্ষ্ম হইলেও তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে; অর্থাৎ উহারা কঠিন বালুকাকণা ও ময়দার কণা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অবস্থার পরিবর্ত্তন—একখণ্ড বরফ লইয়া দেখা যায় যে, ইহার নির্দ্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে, এবং খুব ঠাণ্ডা দিনে ইহার আকার ও আয়তন সহজে নষ্ট হয় না; সেইজন্য ইহা কঠিন।

এখন বরফখণ্ডটি একটি পাত্রে রাখিয়া গরম

করিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই উহা গলিয়া জলে পরিণত হইবে। জলকে লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, উহার আয়তন আছে বটে, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই এবং উহাকে একপাত্র হইতে অন্যপাত্রে সহজেই ঢালা যায়; সুতরাং ইহা তরল।

ঐ জলকে আরও উত্তপ্ত করিলে দেখিবে, উহা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিবে ও ক্রমে সবটাই বাষ্পাকারে পরিণত হইবে ও তখন আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ গৃহ ভরিয়া যাইবে। জল বাষ্পাকারে পরিণত হইলে উহার আয়তন প্রায় ১৬০০ গুণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। বাষ্প চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই উহা ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং তখন উহা নয়ন-গোচর হয়। কেত্‌লীর ভিতর জল ফুটিবার কালে উহার নল হইতে নির্গত বাষ্পকে আমরা শ্বেতবর্ণ দেখি, কিন্তু উহা তখন বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে জলবিন্দু আকারে ঘনীভূত হয় বলিয়া আমরা দেখিতে পাই

আবার জলীয় বাষ্পের তাপহরণ করিয়া অর্থাৎ বাষ্পকে শীতল করিয়া জলে পরিণত করা এবং জলকে আরও শীতল করিয়া বরফে পরিণত করাও সম্ভব।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প একই পদার্থের কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এইরূপে সকল পদার্থই এই তিন অবস্থার যে কোনটিতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কখন কোন্ অবস্থায় থাকিবে তাহা উহার উত্তাপ বা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। কঠিন দ্রব্যকে উত্তপ্ত করিয়া তাপমাত্রা বাড়াইলে উহা গলিয়া তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, এবং তাপমাত্রা আরও বাড়িলে অবশেষে উহা বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হইবে। কিন্তু কর্পূর, আইয়োডিন ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে উহারা কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় না গিয়া একেবারে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। ইহাকে উবিয়া যাওয়া বলে।

জড় অবিনশ্বর—জড় অবিনশ্বর এই কথার অর্থ এই যে, জড়পদার্থের ক্ষয় নাই। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল জড়পদার্থের মোট ওজন ঠিক আছে; ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে ইহারা কখনও কঠিন হইতে তরল, কখনও তরল হইতে বায়বীয় এইরূপ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যদিও পৃথিবীতে প্রায়ই নূতন নূতন জিনিষের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখনও কখনও অগ্নিতে জিনিষপত্র দগ্ধ হইলে আমরা মনে করি উহারা পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল, তথাপি প্রকৃতপক্ষে কিছুই নষ্ট হয় না। একটি মোমবাতি জ্বালাইলে উহা হইতে যে একটি তরল ও একটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। পরীক্ষা করিয়া দেখ।

একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া একটি মোটা কাচের বোতল ভাল করিয়া শুষ্ক করিয়া উহার উপর উল্টাইয়া ধর। কিছু পরে দেখিবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু বোতলের ভিতরে গায়ে জমিয়া রহিয়াছে। বাতির একটি উপাদান বায়ুর একটি উপাদানের সহিত মিশিয়া এই নূতন পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

৩নং চিত্রের মত একটি মোটা কাচনল লইয়া উহার উপরের দিকে 'কষ্টিক সোডা' নামক একটি রাসায়নিক জিনিষদ্বারা ভর্ত্তি কর এবং একটি ছিপির উপর এক টুকরা মোমবাতি রাখিয়া উহাদ্বারা নলের নীচের মুখ বন্ধ করিয়া দাও। যাহাতে ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য ছিপিতে কয়েকটি ছিদ্র করিয়া লইও। ভিতরে বায়ু না যাইতে পারিলে বাতি জ্বলিবে না। এইবার কাচনল শুদ্ধ সমস্ত জিনিষটা ভাল তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া লও এবং বাতি জ্বালাইয়া
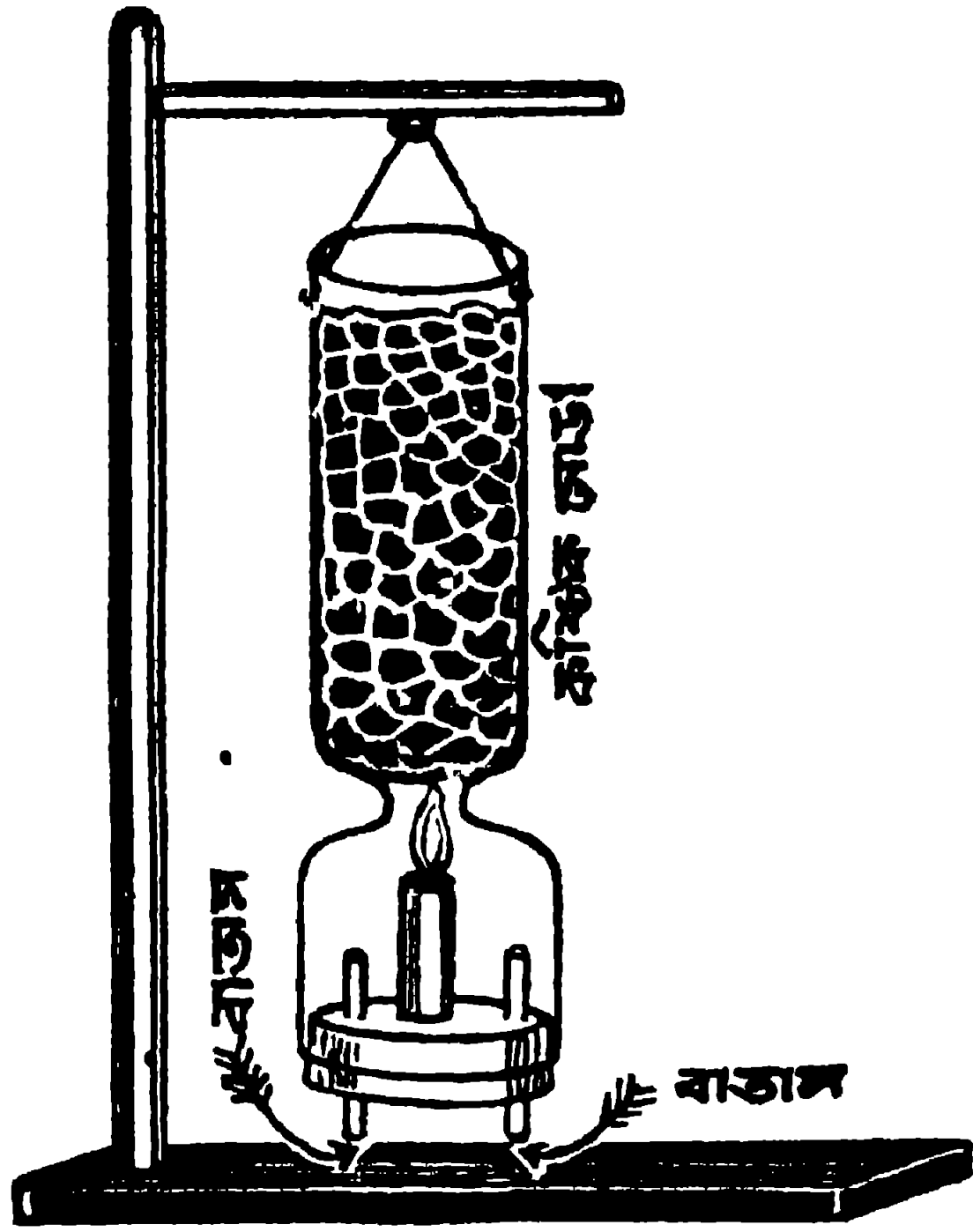
দাও। উহা হইতে উৎপন্ন জিনিষ উপরের কষ্টিক্ সোডা শোষণ করিয়া লইবে। কিছুক্ষণ পরে কাচনলটি পুনরায় ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, উহার ওজন হ্রাস হওয়া দূরে থাক বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সামান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, বাতির নিজের অংশ ব্যতীত উহা বায়ুর উপাদান অম্লজান গ্যাস লইয়া নূতন জিনিষ উৎপন্ন করিয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে, মোমবাতি জ্বালাইয়া উহার কিছুই নষ্ট হয় নাই। রাসায়নিকগণ এইরূপ নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, জড় অবিনশ্বর।

(ক্রমশঃ)

(৩নং চিত্র)

উন্নতি কোন্ পথে?

[শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়]

যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ, হাতিয়ার নির্ম্মাণ, মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ, দ্বিচক্রযান নির্ম্মাণ, রবার-শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। স্বদেশে এবং এসিয়াখণ্ডের বহু দেশে এই জাতীয় মাল এখনও অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিস্তর কাটিবে। লৌহ ও কয়লার প্রচুর বিদ্যমানতার সুবিধা আমাদিগকে লইতে হইবে। রবারও যথেষ্ট পরিমাণে এদেশে উৎপন্ন হইতে পারে। তামার খনিও দেশে আছে। তাহা হইতে তার ও পাত প্রস্তুত হইয়া বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই সব করিতে হইলে মাতৃভাষায় যন্ত্র-শিল্প, তড়িৎশিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষার দেশে বহুল প্রচার হওয়ার আবশ্যক। আর চাই দেশের ধনিক ও ব্যবসায়ীগণের সহযোগিতা। যে সমস্ত ছাত্র এই সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিবেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিদ্যা, শক্তি ও বুদ্ধির বিকাশের উপযোগী কার্য্যক্ষেত্র রচনা করিয়া দিতে হইবে—এই দেশীয় ধনিক ও ব্যবসায়ীগণকে। অপরিমিত জলস্রোতের শক্তি দেশের বিভিন্ন নদনদীতে নিয়ত অপচয় হইতেছে। এই শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া সস্তায় তড়িৎ উৎপাদন করিয়া শিল্পীর কুটীরে কুটীরে যোগান দিতে হইবে—তবে কারখানার দূষিত আবহাওয়ার বাহিরে দেশের পল্লীতে পল্লীতে শিল্প ও শিল্পী গজাইয়া উঠিয়া দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পাদন করিবে। কলকারখানার ছোট ছোট উপনিবেশগুলির দূষিত পারিপার্শিক অবস্থায় যে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করিয়া ভারতের জীবনযাত্রার সনাতন পন্থা কলুষিত করিয়া সমাজ কলঙ্কিত ও অশান্তিপূর্ণ করিতেছে তাহার প্রতিকার হইবে এই তড়িৎশক্তির সাহায্যে। তবে এই অপচায়িত শক্তিপুঞ্জকে শৃঙ্খলিত করিতে রাষ্ট্র-শক্তিই একমাত্র সক্ষম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তিকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান গণজাগরণের দিনে এই কার্য্য অসাধ্য বা বিশেষ কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। উপযুক্ত নেতার অধীনে কতকগুলি উদ্যোগী কর্ম্মবীরের আবশ্যক এই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য। দেশের মধ্যবিত্তের ঘরের ক্রমবর্দ্ধমান বেকারসমস্যা সমাধানের ইহা অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা। অন্যান্য শ্রেণীর বেকারসমস্যাও ইহাতে অনেক পরিমাণে সমাধান হইবে।

দেশের শিক্ষাধারার মধ্যে বৈপ্লবিক গতিতে পরিবর্ত্তন আনিতে পারিলে তবে কল্পনা বাস্তব আকার ধারণ করিবে। প্রাচ্যের শান্তিময় জীবন-যাত্রার ধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পাশ্চাত্যের জড়বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে নিজস্ব করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচ্যের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইলে চলিবে না। সহস্র সহস্র শতাব্দীর এই ভারতীয় উন্নত সভ্যতা ভুলিয়া গিয়া পাশ্চাত্যের হুবহু নকল

করিলে আমরা স্বাধীন হইয়াও নৈতিক পরাধী-নতাকেই বরণ করিয়া লইব। এই জাতীয় পরা-ধীনতা আয়ার্লণ্ডের আসিয়াছিল। বেচারারা নিজেদের মাতৃভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া গ্রামে, এমন কি, ঘরেও বিদেশী ভাষায় কথা কহিত। নৈতিক অধোগতিরও চরম তাহাদের হইয়াছিল। যাহা হউক, তাহাদের সে দুর্দ্দশার স্রোত ফিরিয়াছে। তাহারা মাতৃভাষাকে আবার সিংহাসনে বসাইয়াছে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের যেন সতর্ক করে; আমরা যেন আমাদের এই সুপ্রাচীন সভ্যতা বজায় রাখিয়া জড়বিজ্ঞান ও শিল্পে উন্নতি করিতে সচেষ্ট হই।

কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রচেষ্টা এ বিষয়ে পথ প্রদর্শকের কার্য্য করিবে। রাষ্ট্রশক্তি, গণশক্তি ও ধনিককুলের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করুক এই আশা।

তাপ

[শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়]

গতিশক্তি প্রভৃতির সহিত তাপশক্তির সম্পর্ক :—

একখণ্ড লৌহে "উকা" ঘর্ষণের সময় লৌহখণ্ডটী যে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এস্থলে ঘর্ষণে উপযুক্ত গতিশক্তির কিয়দংশ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

(৪১নং চিত্র) চিত্রানুযায়ী যন্ত্রসজ্জায় একটি গুরুভার বস্তুর পতনফলে জলের আলোড়ন সম্পাদন করিয়া উহার উত্তাপবৃদ্ধি নিরূপিত হইয়া থাকে। বস্তুটীর ভার ও পাতনের পরিমাণ নিরূপিত হইলে সম্পাদিত কার্য্যের পরিমাণ পাওয়া যাইবে :—

কার্য্য = ভার × পাতন

জলের ভার ও উত্তাপবৃদ্ধি নিরূপণে উহার তাপ-বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হইবে :—

তাপ = ভার × উত্তাপবৃদ্ধি

এইরূপে পরীক্ষায় নিরূপিত হইয়াছে যে, $4 \cdot 18 \times 10^7$ "আর্গ" পরিমাণ কার্য্য সম্পাদনে এক ক্যালোরী পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। সচরাচর উক্ত পরিমাণটী "J" এই অক্ষরটী দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ কার্য্য = J × তাপ।

কিছু গ্যাস একটি পাত্রে আবদ্ধ করিয়া, চাপ প্রদানে উহার আয়তন সঙ্কোচ সংঘটন করিলে উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে গ্যাসটীকে আয়তনে প্রসারিত হইতে দিলে উহার উত্তাপ নিম্নতর হয়। এই কারণে গ্যাসের তাপগ্রাহীতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে তাপপ্রয়োগের ফলে গ্যাসটী আয়তনে অবাধে প্রসারিত হইতে থাকিলে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগে উহার উত্তাপ ১° সেঃ মাত্রা উচ্চতর হয় এবং সে সময়ে গ্যাসটী আবদ্ধ থাকিলে
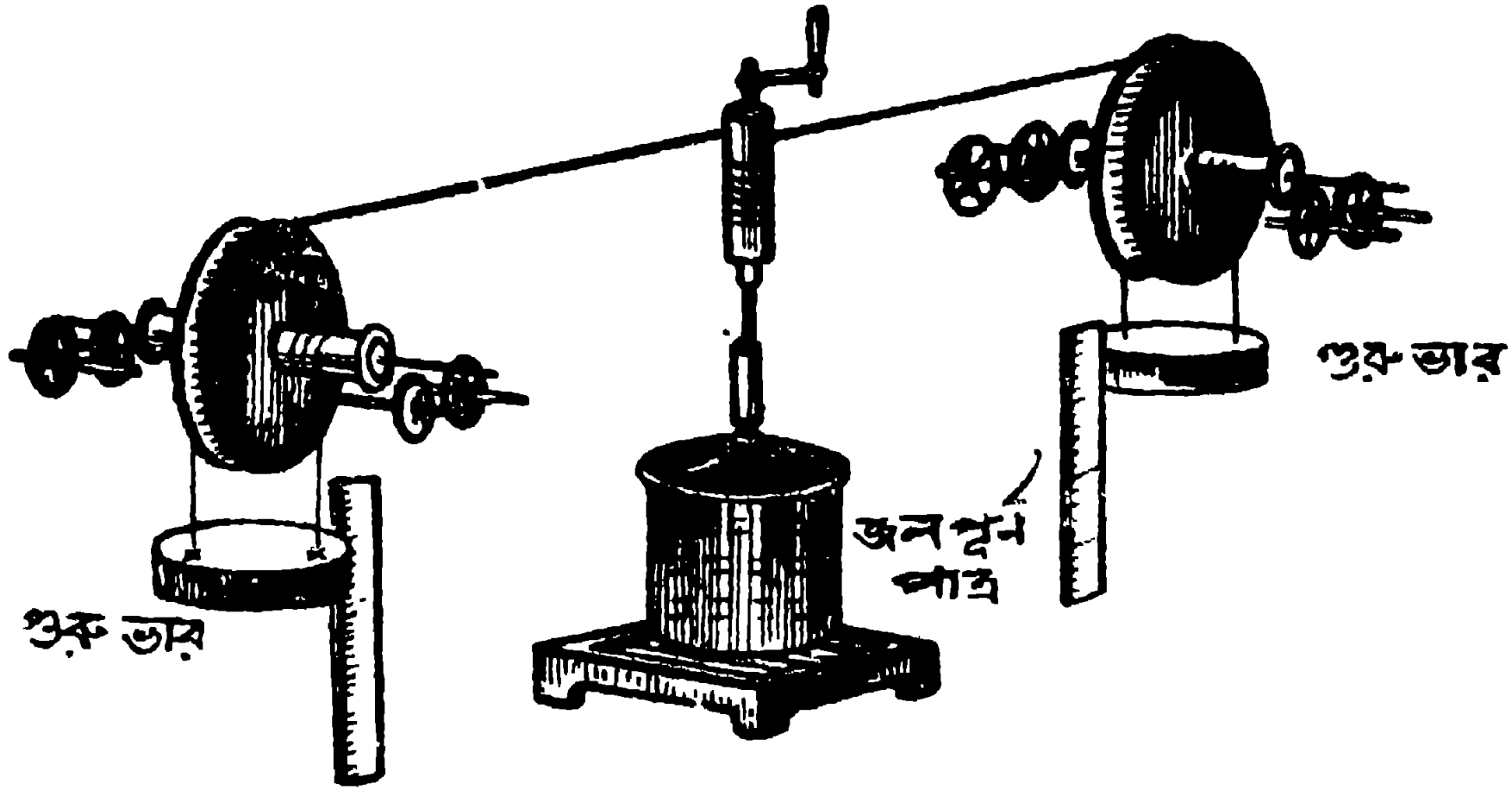
(৪১নং চিত্র)

এই পরিমাণ উত্তাপবৃদ্ধি সংঘটনে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ আবশ্যক হয়, এই দুইটী পরিমাণ বিভিন্ন। প্রথমাবস্থায় তাপগ্রাহীতা উচ্চতর। এক্ষেত্রে গ্যাসটী পারিপার্শিক চাপের বিরুদ্ধে কার্য্য সম্পাদন করে এবং প্রযুক্ত তাপশক্তির কিয়দংশ ইহাতে ব্যবহৃত হয়।

বিচারে এই তারতম্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ সহজ-সাধ্য। "আ" আয়তনবিশিষ্ট কিছু গ্যাস ত° সেঃ হইতে (ত+১)° সেঃ উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া "$আ_১$" আয়তন প্রাপ্ত হইলে সম্পাদিত কার্য্যের পরিমাণ=আয়তন-বৃদ্ধি×চাপ। বায়ুমণ্ডলের চাপ="চ" ধার্য্য হইলে

$$কার্য্য = চ \times \frac{আ}{২৭৩},$$ কারণ ১° সেঃ উত্তাপবৃদ্ধি ফলে গ্যাসের আয়তনপ্রসার $\frac{১}{২৭৩}$ অংশ।

তাপ প্রয়োগে গ্যাসের বিস্তার নিরূপণে পাওয়া যায় :—

$$\frac{আ_১ \times চ_১}{ত_১ + ২৭৩} = \frac{আ_২ \times চ_২}{ত_২ + ২৭৩} = \frac{আ_৩ \times চ_৩}{ত_৩ + ২৭৩}$$

$$= \frac{আ_৪ \times চ_৪}{ত_৪ + ২৭৩} \ldots\ldots$$

এক্ষেত্রে $আ_১$, $আ_২$, $আ_৩$, $আ_৪$……যথাক্রমে গ্যাসটীর আয়তন $চ_১$, $চ_২$, $চ_৩$, $চ_৪$ …গ্যাসটীর চাপ ও $ত_১$, $ত_২$, $ত_৩$, $ত_৪$……যথাক্রমে উত্তাপ (সেণ্টিগ্রেড), অর্থাৎ সকল গ্যাসের সকল অবস্থায় $\frac{আ \times চ}{ত + ২৭৩}$ পরিমাণটী সমানই থাকে। পরীক্ষায় নিরূপিত হইয়াছে যে, 0° সেঃ ও ৭৬০ মিমিঃ চাপে ১·২৯৩ গ্র্যাম বায়ু ১ "লিটার" আয়তন গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং ১° সেঃ উত্তাপে আনয়ন করিলে, এক গ্র্যাম গ্যাসের আয়তনবৃদ্ধির পরিমাণ $\frac{১০০০}{১·২৯৩} \times \frac{১}{২৭৩}$ (দ্রষ্টব্য :- ১ গ্র্যামের আয়তন $\frac{১০০০}{১·২৯৩}$)।

$$\therefore কার্য্য = \frac{১০০০}{১·২৯৩} \times \frac{১০৩৩}{২৭৩},$$ কারণ ৭৬০ মিমিঃ চাপ প্রতি বর্গসেমিঃ তলের উপর ১০৩৩ "ডাইন" বলের সমান, অর্থাৎ কার্য্য = ২৯২৬ গ্র্যাম সেমিঃ,

$$এবং\ তাপ = \frac{কার্য্য}{J} = \frac{২৯২৬}{৪১৮০০} = ০·০৭ \text{ ক্যালোরী}$$

(ন্যূনাধিক)। ইহাই উপরে বর্ণিত অবস্থাদ্বয়ে গ্যাসের তাপগ্রাহীতার তারতম্য।

আমাদের আধুনিক যুগের নিত্য প্রয়োজনীয় বাষ্পীয় ইঞ্জিনে তাপশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। এইরূপ ইঞ্জিনের সাহায্যে

রেলগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি চালিত হয় ও অন্যান্য নানাবিধ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ইঞ্জিন শব্দের প্রকৃত অর্থ "শক্তির আধার"। একটি আধারস্থ জল, নল অবলম্বনে স্থানান্তরিত করিয়া ইহাকে যেরূপ নানাকার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে, সেইরূপে ইঞ্জিন হইতে শক্তি আহরণ করিয়া ইহাকে বিভিন্ন স্থানে নানা প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।
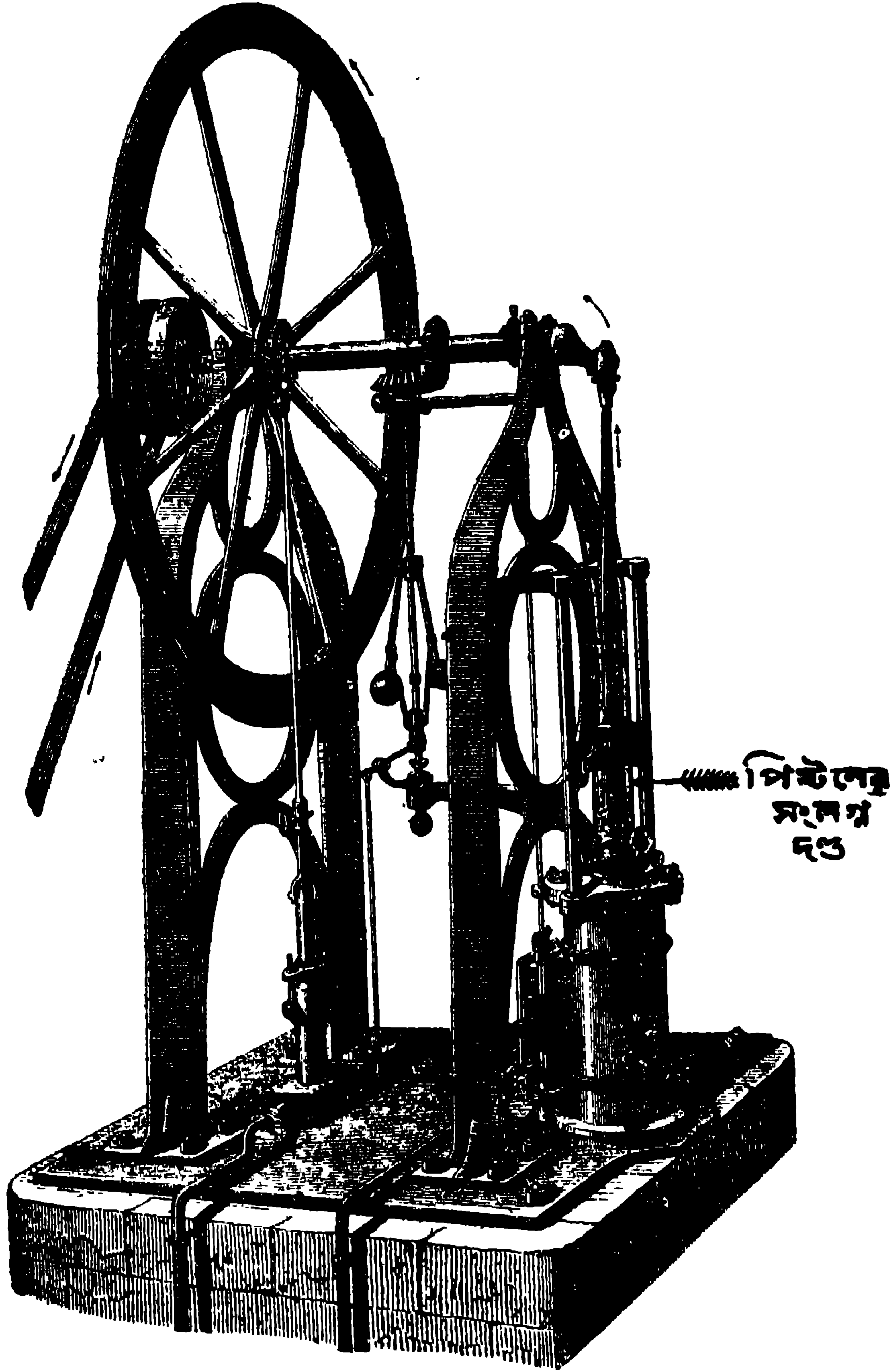
বাষ্পীয় ইঞ্জীন

(৪২নং চিত্র)

(৪২নং চিত্র) চিত্রে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কার্য্য-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জাতীয় সকল ইঞ্জিনেরই গঠনপ্রণালী মূলতঃ এইরূপ। জল হইতে তাপপ্রয়োগে উৎপন্ন বাষ্প চাপপ্রয়োগে সিলিণ্ডারের ভিতর একটি পিষ্টনকে চালনা করে। ইহা কিছুদূর চালিত হওয়ার পর সিলিণ্ডারের গাত্রে একটি নির্গম ছিদ্র উন্মুক্ত হওয়ায় বাষ্প এই পথে নিঃসৃত হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিলিত হয়। এই সময় প্রথমোক্ত ছিদ্রটী বন্ধ হইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত পথ অবলম্বনে কিছু বাষ্প সিলিণ্ডারে প্রবিষ্ট হইয়া পিষ্টনের বিপরীত পৃষ্ঠে চাপ প্রদান করায় উহা পূর্ব্বের বিপরীত মুখে চালিত হয়। এইরূপে পিষ্টনটী সিলিণ্ডারের অভ্যন্তরে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে থাকে ও নানা আকৃতির দণ্ড চক্রাদি সাহায্যে উক্ত গতি একটি চক্রে আবর্ত্তন সম্পাদন করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ চক্রের গতি হইতে রেলগাড়ীর নিম্নস্থ চক্রের গতি সম্পাদনে উহা চালিত হয়। জাহাজের "প্রোপেলার" চালিত হওয়ায় উহা জলরাশি ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়, পাম্প চালিত হয় ও অন্যান্য নানাবিধ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকারে জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন করিবার জন্য বিশেষ আকৃতি ও গঠনের পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা "বয়লার" নামে সুপরিচিত। বাষ্পীয় যন্ত্রে মূল ভাগ দুইটী :—প্রথম উক্ত "বয়লার" ও দ্বিতীয় পূর্ব্ব-বর্ণিত "ইঞ্জিন"। বয়লার হইতে নল অবলম্বনে বাষ্প ইঞ্জিনে নীত হইয়া উহাকে চালিত করে।

ইঞ্জিনের কার্য্যক্ষমতা পরিমাণের জন্য পিষ্টনের ক্ষেত্রপরিমাণ, উহার চালন ও বাষ্পের চাপপরিমাণ একত্রে গুণ করা হইয়া থাকে। যথা—একটি ৩০ বর্গ-ইঞ্চি ক্ষেত্রবিশিষ্ট পিষ্টন, ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ অর্থাৎ ১$\frac{১}{২}$ ফুট চালিত হইয়া মিনিটে ৮৪ বার উভয় দিকে চালিত হইতেছে কল্পিত হইল; বাষ্পচাপ প্রতি বর্গইঞ্চির উপর ১৪ পাউণ্ড ধার্য্য হইল। এক্ষেত্রে কার্য্যের পরিমাণ প্রতিমিনিটে=৩০×১৪×৮৪×২×১$\frac{১}{২}$ ফুট-পাউণ্ড=১০৫৮৪০ ফুঃ পাঃ। সেকেণ্ডে ৫৫০ ফুট-পাউণ্ড হারে কার্য্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতাকে এক "অশ্ববল" বলা হয়। সুতরাং উপরোক্ত উদাহরণে

কার্য্যক্ষমতা = $\frac{১০৫৮৪০}{৫৫০ \times ৬০}$ অশ্ববল। কার্য্যক্ষেত্রে উপরোক্ত পরিমাণ হইতে ৩৫% অংশ বিযুক্ত হয়; কারণ নানাক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তির ৩৫% যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ঘর্ষণাদিজনিত প্রতি-কূলাচরণ অতিক্রম করিতে ব্যয় হইয়া থাকে। অতএব কার্য্যক্ষমতা=১১৪৬৬ ফুট-পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২$\frac{১}{২}$ অশ্ববল।

খনিজ তৈল হইতে বাষ্প উৎপন্ন করিয়া তাহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় অগ্নিসংযোগে বিস্ফুরিত হইয়া থাকে। বিস্ফোরণের সময় উৎপন্ন গ্যাস আয়তনে প্রসারিত হওয়ায় প্রভূত চাপ প্রয়োগ করে। উক্ত ধর্ম্মাবলম্বনেও ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা তৈল-ইঞ্জিন নামে সুপরিচিত। এইরূপ ইঞ্জিন সাহায্যে "মোটর কার" ও "এরোপ্লেন" চালিত হইয়া থাকে। জাহাজ প্রভৃতি নানারূপ যানেও এক্ষণে ক্রমশঃ ইহার প্রচলন হইতেছে।

সমান শক্তিবিশিষ্ট তৈল ও বাষ্প ইঞ্জিন তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শেষোক্তটী গুরুতর ভারযুক্ত। ইহার চালনের জন্য যে পরিমাণ দাহ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক, তৈল-ইঞ্জিনে তাহা অপেক্ষা অল্পতর তৈল আবশ্যক। এইজন্য গমনাগমনে ব্যবহার্য্য ইঞ্জিন তৈল-জাতীয় হওয়া আবশ্যক।

আহরণীয় শক্তির মূল—

আহরণীয় শক্তির মধ্যে সৌরশক্তি প্রধান। ইহারই ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত থাকিয়া জীবজন্তু উদ্ভিদাদির

বাসোপযোগী হইয়াছে। খনিজ কয়লা ও তৈল পরোক্ষভাবে সৌরশক্তি হইতে উৎপন্ন। কারণ, নানারূপ উদ্ভিজ্জ বস্তু ভূগর্ভস্থ হইয়া বহুকাল পরে উক্ত প্রকার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্ জীবনে সৌরশক্তি একটি প্রধান উপকরণ। একটি অন্ধকার স্থানে বীজ বপন করিলে উহা অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় এবং অঙ্কুরটী নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। স্থানটীতে আলোক প্রবেশ করিতে দিলে, আলোক প্রবেশের পথে অঙ্কুরটী প্রসারিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণ তাপের অভাবেও উদ্ভিদ্ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুষারপাতকালে এইজন্য বহু উদ্ভিদ্ নষ্ট হয়।

উদ্ভিদ্ জীবনের ন্যায় অন্যান্য প্রাণী জীবনেও সৌর-শক্তির প্রভাব সুপ্রচুর।

দেহে উপযুক্ত পরিমাণ সূর্য্যালোক গ্রহণ না করিলে নানারূপ জটিল ব্যাধি সৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রৌদ্র গ্রহণ করিলে এই সকল ব্যাধির প্রতিকার হয়। এই জন্যই আমাদের দেশে সদ্যজাত শিশুর প্রত্যহ রৌদ্র সেবনের ব্যবস্থা আছে।

বায়ুশক্তির সহায়তায় পালযোগে নৌকা সঞ্চালন সকলেরই সুবিদিত। কোনও কোনও দেশে এইরূপে বায়ুশক্তি অন্যান্য প্রয়োজনেও নিযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—যাঁতা চালনা করিবার জন্য, সেচনাদির জন্য, জল উত্তোলন উদ্দেশ্যে ইত্যাদি। বায়ু প্রবহনেরও প্রধান কারণ সৌরতাপ। সৌরতাপে স্থানবিশেষের বায়ু লঘুতর হইয়া উর্দ্ধমুখে আরোহণ করে ও অন্যান্য স্থানের গুরুতর শীতল বায়ু প্রথমোক্ত স্থানাভিমুখে সঞ্চালিত হয়।

জলপ্রপাতের শক্তিও অনেক স্থানে মানবের প্রয়োজনসাধনে নিযুক্ত হইতেছে। আমাদের দেশে দার্জ্জিলিং ও শিলংএ জলপ্রপাতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া তাহার সাহায্যে পথ, ঘাট, গৃহাদি আলোকিত হইতেছে। বোম্বাই প্রদেশে এই-রূপে আহরিত শক্তি নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। আমেরিকায় বিখ্যাত ন্যায়গ্রা প্রপাতের শক্তি হইতে বহু নগর আলোকিত হয় ও নানা কারখানায় যন্ত্রপাতি প্রয়োজনানুযায়ী চালিত হইয়া থাকে। বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার মূলেও সৌরশক্তি। কারণ নদনদীর মূল—বৃষ্টি ও পর্ব্বতশিখরের তুষাররাশি। ইহাদের উৎপত্তি সৌরকর সাহায্যে।

তাপের বিভিন্ন উৎপত্তি—

খাদ্য, পানীয়াদি জীর্ণ হইবার সময় রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে মানবদেহে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আরও বহুপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়াফলে তাপ উৎপন্ন হয়:—সজল গন্ধকাম্লে কিছু দস্তাযোগে উদ্জান গ্যাস উৎপাদনের সময় প্রচুর তাপও যে উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

ঘর্ষণের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অনেক সময় গ্রীষ্মকালে প্রবল রৌদ্রে শুষ্ক শাখাপ্রশাখা পরস্পরের ঘর্ষণফলে উত্তপ্ত ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং বনভূমির বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্নি বিস্তৃত হইয়া উহাকে ধ্বংস করে। পুরা-কালে ব্রাহ্মণদের হোম প্রভৃতি ধর্ম্মকৃত্যের জন্য অগ্নি দুইখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের একত্র ঘর্ষণে উৎপন্ন হইত। দুইটী প্রস্তরখণ্ডের পরস্পর আঘাত ফলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও আমাদের দেশে অগ্নি উৎপাদক একখণ্ড প্রস্তর (ইহাকে "চকমকি" বলা হইত) ও একখণ্ড ইস্পাতের আঘাত দ্বারা উৎপন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈলসিক্ত নানা সুদাহ্য দ্রব্যের উপর ধরা হইত। ইহারা শীঘ্রই অগ্নি সংযুক্ত হইত ও উহা হইতে রন্ধনের জন্য কাষ্ঠ প্রভৃতি ইন্ধনে অগ্নি প্রদান করা হইত। এ যুগে উক্ত কার্য্যে "দিয়াশলাই" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠশলাকার অগ্রভাগে নানা প্রকার

সুদাহ্য দ্রব্য প্রলিপ্ত থাকে ও ইহা পেটিকার গাত্রে ঘর্ষিত হইলে, উৎপন্ন তাপ ফলে উক্ত দাহ্য দ্রব্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

বায়ব্য দ্রব্য চাপপ্রয়োগে সঙ্কুচিত হইলে উহার উত্তাপ উচ্চতর হয়, পক্ষান্তরে চাপমাত্রা নিম্নতর করিয়া উহাকে প্রসারিত হইতে দিলে উহার উত্তাপ নিম্ন হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বনে গ্যাস তরলাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়। আমাদের বায়ুও তরলাবস্থায় এই উপায়ে প্রাপ্তব্য। বায়ু—২০০° সেঃ উত্তাপে তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরল বায়ু লইয়া পরীক্ষা করিলে নানা দ্রব্যের উপর প্রবল শৈত্যের বিচিত্র প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—একটি সীসক-নির্ম্মিত তার তরল বায়ুতে নিমজ্জিত হইবার পর উহা পূর্ব্বের ন্যায় আকর্ষণে বিস্তৃত হয় না। একটি রবারনির্ম্মিত “বেলুন” বায়ুপূর্ণ অবস্থায় তরল বায়ুতে নিমজ্জিত হইবার পর উহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে কাচের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। জীবদেহে ত্বকের উপর প্রবল তাপ ও প্রবল শৈত্যের প্রভাব অনুরূপ। উভয়ক্ষেত্রেই ত্বক্ নষ্ট হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চ পর্ব্বতাদির শিখরে উত্তাপ নিম্নতর হওয়ার প্রধান কারণ বায়ুমণ্ডলের চাপহ্রাস। বিপরীত কারণে ভূগর্ভস্থ গভীর খনির তলদেশে উত্তাপ উচ্চতর হইয়া থাকে। নিম্ন তালিকায় উত্তাপহ্রাস মাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তালিকা

ভূপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা	উত্তাপের হ্রাস	
	নির্ম্মল আকাশ	মেঘাবৃত আকাশ
0 ফুট হইতে ১০০০ ফুট পর্য্যন্ত	প্রতি ১৩৯ ফুটে ১ ফাঃ হারে	প্রতি ২২২ ফুটে ১° ফাঃ হারে
„ „ „ ১০,০০০ „ „	প্রতি ২৮৮ ফুটে ১° ফাঃ হারে	প্রতি ৩৩১ ফুটে ১° ফাঃ হারে
„ „ „ ২০,০০০ „ „	প্রতি ৩৬৫ ফুটে ১° ফাঃ হারে	প্রতি ৪৬৮ ফুটে ১° ফাঃ হারে

ভূমণ্ডলে "বিষুবরেখা"র সন্নিকটস্থ স্থান গ্রীষ্মপ্রধান ও মেরুদ্বয় সন্নিহিত স্থান শীতপ্রধান হওয়ার কারণ, প্রথমোক্ত স্থানে সৌরশক্তি লম্বরেখাক্রমে পতিত হয় ও শেষোক্ত স্থানে তির্য্যক্‌রেখানুক্রমে পতিত হয়। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিষুবরেখার অন্তর্গত দেশে যে রশ্মিসমষ্টি ১ বর্গফুট স্থানে পতিত হয়, মেরু সন্নিহিত স্থানে হয়ত ১½ বর্গফুট স্থান ব্যাপিয়া তাহারই সমান রশ্মিগুচ্ছ পতিত হইবে অর্থাৎ বিষুবরেখায় ১বর্গফুট স্থান যে হারে তাপ প্রাপ্ত হইতেছে, মেরুতে প্রাপ্ত তাপ তাহার ⅔ অংশ মাত্র। দিবসব্যাপী সৌরশক্তি প্রাপ্তে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় ও রাত্রে তাপ বিকীর্ণ হওয়ায় উত্তাপ নিম্নতর হইয়া থাকে।

স্থানীয় উত্তাপ, আকাশ মেঘাবৃত থাকিলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ হয়, কারণ বায়ু আবদ্ধ হওয়ায় জলবাষ্প প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জল বিলম্বে বাষ্পে পরিণত হয়। শুষ্কদেশে জল দ্রুতবেগে বাষ্পে পরিণত হইতে পারে। এইজন্য এরূপ দেশে রাত্রের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত নিম্ন হয়। পাঠক শীতকালে "পশ্চিমাঞ্চলে" ভ্রমণ করিতে গিয়া, রাত্রে গৃহের বহির্দ্দেশে একখণ্ড কম্বলের উপরস্থ একটি থালায় জল রাখিলে প্রভাতে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ জল বরফে পরিণত হইয়াছে।

বায়ুপ্রবাহ—বায়ু যে শীতল স্থান হইতে উষ্ণতর স্থানাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নবর্ণিত পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। শীতের সময় দুইটী সংলগ্ন কক্ষের একটিতে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল। উভয় কক্ষের মধ্যস্থ দ্বারে ভূমির সন্নিকটে ও উপরে ছাদের নিকটে এক একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইল। প্রদীপ দুইটীর শিখা বায়ুপ্রবাহমুখে আনত হইবে। দেখা যায় যে, উপরের দীপশিখা শীতল কক্ষ অভিমুখে ও নিম্নের দীপশিখা উষ্ণ কক্ষ অভিমুখে বায়ুপ্রবাহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

সমুদ্রতীরে কিছুকাল বাস করিলেই লক্ষ্য হয় যে, দিবসে সমুদ্র হইতে শীতল বায়ু তীর অভিমুখে ও রাত্রে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ জলের উচ্চমাত্রা তাপগ্রাহীতার জন্য; দিবসে রৌদ্রের ফলে জল অপেক্ষা তীরভূমির উত্তাপ উচ্চতর হইয়া থাকে। সুতরাং জলের উপরস্থ শীতলতর বায়ু তীর অভিমুখে প্রবাহিত হয়। রাত্রে ভূমি দ্রুততর শীতল হওয়ার ফলে উহার উত্তাপ জল অপেক্ষা নিম্নতর হইয়া থাকে; সুতরাং বায়ু সমুদ্রাভিমুখে সঞ্চালিত হয়।

আমাদের দেশের সুপরিচিত "মৌসুমী" বায়ুপ্রবাহ বর্ষাগমের প্রারম্ভে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে প্রবাহিত হয়। ইহার ও ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বপ্রকার বায়ু প্রবাহের কারণ একই। পূর্ব্বকালে এই সকল স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ অবলম্বনে অর্ণবপোত চালিত হইত। একালে বাষ্পশক্তির নিয়োগে এ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং বায়ুপ্রবাহের প্রাধান্য এজন্য দূর হইয়াছে।

ফলতঃ কোনও স্থানে স্বাভাবিক বায়ুচাপ নিম্নমাত্রা হইলেই সে স্থানাভিমুখে বায়ু সঞ্চালিত হইবে। চাপহ্রাসের পরিমাণানুযায়ী প্রবাহবেগ "মৃদু মলয়" হইতে "প্রবল বাত্যা"র আকার গ্রহণ করিবে। চাপমান যন্ত্রে চাপের হ্রাস সূচিত হইবামাত্র বাত্যার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

ঝটিকাবর্ত্ত বা ঘূর্ণিবাত্যা—উপরোক্ত কারণের সহিত ভূমণ্ডলের আবর্ত্তনবেগ একত্রিত হইয়া ঝটিকাবর্ত্ত বা ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করে। এইরূপ বাত্যার শক্তি অত্যন্ত প্রবল ও ইহার ফলে প্রভূত ক্ষতি হয়। বিষুবরেখার উত্তরে বাত্যার আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে ও দক্ষিণে ঘড়ির কাঁটার মুখে।

বায়ুমান যন্ত্র—বায়ুবেগে বায়ুমান যন্ত্রের দণ্ডসংলগ্ন লঘু গোলার্দ্ধ চারিটী সঞ্চালিত হইয়া দণ্ডের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে ও ইহার বেগ সংলগ্ন "ডায়াল"এ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সাগরপ্রবাহ—বায়ুপ্রবাহ যে কারণে ঘটিয়া থাকে, সাগর জলও তদনুরূপ কারণে প্রবাহিত হয়। অবশ্য তাপবৃদ্ধি ফলে বায়ু অপেক্ষা জলের অল্পতর প্রসার ক্ষমতার জন্য সাগরপ্রবাহ বেগও নিম্নতর। বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ উচ্চ সাগর জল উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিমুখে প্রবাহিত হয় ও সাগর-তলের শীতল জলপ্রবাহ বিপরীতমুখী। পরীক্ষায় নিরূপিত হইয়াছে যে, বিষুবরেখান্তর্গত সাগর জলের উত্তাপ ৪° সেঃর অধিক তারতম্য হয় না।

প্রচলিত বায়ুপ্রবাহে কোন কোন স্থানে সমুদ্র-প্রবাহ সৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ একটি জলপ্রবাহ মেক্সিকো উপসাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতঃ আয়ার্লণ্ড ও নরওয়ে দেশের তীর স্পর্শ করিয়া মেরুসমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। ঐ প্রবাহের জল উষ্ণ বলিয়া উহা যে যে তীর স্পর্শ করিয়াছে, তাহারা নিকটস্থ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উষ্ণতর। এই কারণে একই দ্রাঘিমার অন্তর্গত জার্ম্মানী ও আয়ার্লণ্ড দেশের মধ্যে শেষোক্ত উষ্ণতর। প্রবাহটী "গাল্‌ফ ষ্ট্রীম্‌" নামে বিখ্যাত।

সাগর জলের অন্যতম সুনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ "জোয়ার" ও "ভাটা" নৈসর্গিক কারণে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ ফলে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহার সহিত উপরে বর্ণিত প্রবাহের কোনও সম্পর্ক নাই।

গ্রীক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ত্ব

[শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মেগাস্থেনীসের বিবরণ

মেগাস্থেনীসের বিবরণ অনুসারে ভারতবর্ষ চতুষ্কোণাকৃতির ন্যায়। ইহার পশ্চিমে সিন্ধুনদ, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সাগরের পরিবেষ্টন, উত্তরে হেমোডাস্‌ পর্ব্বতরাজি পশ্চিম সীমানায় উত্তরস্থ পর্ব্বত হইতে সিন্ধুনদের মোহনা পর্য্যন্ত দূরত্ব ১৩০০০ 'ষ্টেডীয়া' * সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বদিকে 'পালিবোথ্রা' (পাটলিপুত্র, বর্ত্তমান পাটনা) নগর পর্য্যন্ত ১০,০০০ ষ্টেডীয়া, পাটলিপুত্র হইতে সাগর পর্য্যন্ত (গঙ্গানদীর মোহনা) ৬০০০ ষ্টেডীয়া। এ পর্য্যন্ত সকলেই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকের বিস্তৃতিকে ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য এবং উত্তর দক্ষিণের বিস্তৃতিকে ইহার প্রস্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন;

* এক ষ্টেডীয়াম্‌ প্রায় এক 'ফার্লং' এর সমান।

মেগাস্থেনীসের বিবরণেই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের প্রকৃত দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য—ন্যূনতম ২২,০০০ ষ্টেডীয়া; প্রস্থ—ন্যূনতম ১৬,০০০ ষ্টেডীয়া।

ভারতবর্ষে অনেক বিশালাবয়ব পর্ব্বতশ্রেণী আছে; এই সকল পর্ব্বত সকলপ্রকার ফলবৃক্ষ সমন্বিত। আবার এই দেশে বহু নদনদী সমন্বিত অনেক বিস্তৃত উর্ব্বর ক্ষেত্রও বর্ত্তমান। অনেক ক্ষেত্রে বৎসরে দুইবার ফসল উৎপন্ন করা হয়। দেশে সকল প্রকার আকার ও শক্তি সম্পন্ন স্থলচর ও খেচর—সকল প্রকার প্রাণীর পরিচয় প্রচুর পরিমাণেই আছে, বিশালকায় হস্তীর কথা বিশেষরূপেই প্রসিদ্ধ।† ভূ-নিম্নে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি সকল প্রকার খনিজ দ্রব্যের আকর আছে।

দেশের অধিকাংশই সমতল ভূমি এবং এই ভূমি পলি মৃত্তিকায় গঠিত বলিয়া অনুমিত। মেগাস্থেনীসের বিবরণে নদনদীর পরিচয় খুব বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায়। দেশে এত নদনদীর কারণস্বরূপ দেশীয় লোকেরা বলেন যে, ভারতবর্ষের চারিদিককার দেশসমূহ উচ্চভূমি হওয়াতে সকল দিক হইতে জলধারা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া নদনদীর সৃষ্টি হইয়াছে।

গঙ্গা নদী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার সহিত 'নাইল' অথবা 'ডেনিউব' নদীর তুলনাই হয় না। একস্থলে লিখিত আছে, নাইল নদীর পরে সিন্ধুনদই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ *, ১৫টি উপনদী সিন্ধুনদে আসিয়া মিশিয়াছে—এই ১৫টির প্রত্যেকটি এসিয়ার অন্য যে কোন নদী অপেক্ষা বৃহত্তর।

গঙ্গা নদীর গড় প্রস্থ ১০০ ষ্টেডীয়া এবং ন্যূনতম গভীরতা ২০ গজ। গঙ্গা নদীর সহিত তাহার একটি উপনদীর (বর্ত্তমান শোননদ) সঙ্গমস্থলে পালিবোথ্রা (পাটলিপুত্র) ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগর। ইহার দৈর্ঘ্য ৮০ ষ্টেডীয়া এবং প্রস্থ ১৫ ষ্টেডীয়া। এই নগর চতুষ্কোণাকৃতি এবং চারিদিকে কাষ্ঠ প্রাচীর বেষ্টিত—এই প্রাচীরে ৬৪টি দ্বার এবং ৫৭০টি তোরণ ছিল এবং তীর নিক্ষেপ করিবার সুবিধার জন্য প্রাচীর গাত্রে বহু সংখ্যক ছিদ্র ছিল। এই প্রাচীরের চারিদিকে ৬০০ ফুট প্রশস্ত এবং ৩০ হস্ত গভীর এক পরিখা ছিল—নগরের রক্ষার নিমিত্ত এবং নগরের সমস্ত পয়ঃপ্রণালী আসিয়াও এই পরিখাতেই পড়িত।

দেশে নগরের সংখ্যা অসংখ্য। নদী বা সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগরসমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং সুরক্ষিত স্থানের নগরসমূহ ইষ্টকনির্ম্মিত হইত।

তারপরে দেশের জাতিসমূহের বিবরণ, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা, দেশের রীতিনীতি, শাসনতন্ত্র, সমাজ ব্যবস্থা; তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আমোদপ্রমোদ, শিকার—হস্তী শিকার পর্য্যন্ত অনেক তথ্যই মেগাস্থেনীসের বিবরণে আছে। সে সব ইতিহাসের তত্ত্ব বলিয়া বর্ত্তমান স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

এরাটোস্থেনিস্

মেগাস্থেনীসের পরে এরাটোস্থেনিস্। মিশর দেশের টলেমীরাজগণ আলেকজেন্দ্রিয়া নগরীতে যে বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, এরাটোস্থেনিস্ ছিলেন সেই গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রকৃতভাবে বিজ্ঞানের আলোকে ভূগোলচর্চ্চার ভিত্তি স্থাপন করেন (২৪০ খৃঃ পূঃ)। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবী বর্ত্তুলাকার এবং বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। অনেকের ধারণা যে, এই ধারণার মূলে থেইল্স্ (৬০০ খৃঃ পূঃ) এর নাম সম্পৃক্ত; কিন্তু ইহার জন্য মূল কৃতিত্ব

† গ্রীক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের হস্তীতত্ত্ব—প্রবাসী।

* এরিয়ান্ এর বিবরণে আছে যে, গঙ্গা নদী এবং সিন্ধুনদ প্রত্যেকেই এবং এমন কি, সিন্ধুনদের শাখানদী একেসিন্স্ ও বর্ত্তমান 'চেনাব' নাইল অথবা ডেনিউব অপেক্ষা বড়। এস্থলেও গঙ্গা নদীকে সিন্ধু অপেক্ষা বড় বলা হইয়াছে।

পিথাগোরাসেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। কোন কোন স্থলে অসামঞ্জস্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষেই এরাটোস্থেনিস্-এর ভূ-বৃত্তান্ত শুধু যে তিন শতাব্দী পরবর্ত্তী টলেমীর ধারণা অপেক্ষা সত্যের অধিকতর সন্নিহিত, তাহা নয়; এমন কি, বর্ত্তমান সময়ের দুই শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভূগোলবিদ্যায় যতটা উন্নতি হইয়াছে, এরাটোস্থেনিস্-এর ভূগোল মোটামোটি হিসাবে তাহার চেয়েও উৎকৃষ্টতর। ভারতবর্ষের বিবরণের জন্য তিনি নির্ভর করিয়াছেন, সেকেন্দর সাহের অভিযানের ঐতিহাসিকগণ এবং মেগাস্থেনীসের বিবরণের উপর।

ষ্ট্র্যাবো

এরাটোস্থেনিসের প্রায় দুই শতাব্দী পরে ষ্ট্র্যাবো (৬০ খৃঃ পূঃ—১৯ খৃঃ অব্দ)। ষ্ট্র্যাবোর ভূগোল বৃত্তান্ত লিখিবার উদ্দেশ্য ছিল, বিশাল রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানজনিত জ্ঞানের আলোকে পুরাতন ভূগোলের সংস্কার সাধন করা। তিনি এরাটোস্থেনিস্‌কে ছাড়াইয়া বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, বরং অনেক বিষয়ে তাঁহার নীচেই ছিলেন। তবে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের বর্ত্তুলাকার ক্ষেত্রকে সমতল ক্ষেত্র-রূপে প্রদর্শন করিতে হইলে—যেমন মানচিত্রে করিতে হয়—আকার ও আয়তনের হিসাবে কতকটা গরমিল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ষ্ট্র্যাবো তাঁহার ভারতবর্ষের বিবরণের জন্য অপরের (বিশেষ মেগাস্থেনীসের) উপর নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া সেই বিবরণের প্রতি তিনি নিজেই সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান ছিলেন না।

প্লিনী

ষ্ট্র্যাবোর অব্যবহিত পরেই প্লিনী (খৃষ্টাব্দ ২৩—৭৯)। প্লিনীর গ্রন্থরাজি (Natural History) প্রায় বিশ্বকোষের সামিল, জগতে এমন বিষয় নাই যে তিনি আলোচনা না করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে এসিয়ার বিবরণ অনেকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত দেখা যায়—প্রাচ্য জগতের সহিত ইউরোপের নানা বিষয়ে আদানপ্রদান যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহারই পরিচয়। এই সময় হিপ্পালস্ নামে একজন নাবিক ভারত মহাসাগরের বায়ুপ্রবাহের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মৈসুমী বায়ুর গতিপ্রণালী আবিষ্কার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য সম্বন্ধ অনেকটা সহজ হইয়া পড়িল, কারণ নাবিকেরা এখন আর তীর ধরিয়া না গিয়া মৈসুমী বায়ুর সাহায্যে সোজাসোজি সমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে যাইতে লাগিলেন। হিপ্পালস্ নিজে গিয়াছিলেন ৭৯ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে। এই সকল যাত্রীদের অনেক কাহিনী প্লিনী'র বিবরণে পাওয়া যায়। প্লিনী নিজে একজন নিপুণ লেখক, তাঁহার লিখিবার উপাদানও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক বিশ্বাস প্রবণতার দরুণ প্রকৃত বিবরণের সহিত এত কথাকাহিনী এবং অত্যুক্তি মিশিয়া গিয়াছে যে তাহার বিবরণের উপর খুব বেশী নির্ভর করা যায় না।

তথ্যপ্রদর্শিকা—এই সময় ভারতবর্ষের সহিত গ্রীকদের বাণিজ্য সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তথ্যপ্রদর্শিকার আবশ্যক হইল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন বেনামা লেখক * একখানা তথ্যপ্রদর্শিকা বাহির করিলেন। 'পেরিপ্লাস্ অব্ দি এরিথিয়ান্ সি' যে সময় মিশর দেশ রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই সময়ে লোহিত সাগর এবং আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের সহিত যে বাণিজ্য ব্যাপার চলিত তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবরণ এই প্রদর্শিকাতেই পাওয়া যায়। এই প্রদর্শিকাতে নদীর মোহনা ও বন্দর

* বোধ হয়, আর্তেমিডোরাস্।

সমূহের নাম এবং পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকের দূরত্ব, আমদানী ও রপ্তানীর দ্রব্যতালিকা প্রভৃতি যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, লেখক নিশ্চয়ই জলযাত্রায় বাহির হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমুদ্রতীর প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। অবশ্য তট-ভূমির নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনে এখন আবার পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভবপর নয়। অপর-পক্ষে এই লেখকই অন্তর্ভারত সম্বন্ধে যে সব তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা নির্ভরযোগ্য নয়।

এরিয়ান্—তারপরে এরিয়ান্ (১৪৬ খৃষ্টাব্দ)। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি সেকেন্দর সাহের এসিয়ার অভিযানের বিবরণ। ভারতবর্ষের বিবরণে তিনি প্রধানতঃ মেগাস্থেনীসের এবং এরাটোস্থেনীসের বিবরণের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, সুতরাং ভারতবর্ষের ভূগোলতত্ত্ব হিসাবে তাঁহার নিকট নূতন তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

টলেমী

এরিয়ানের পরে টলেমী (১৫০ খৃঃ)। টলেমীই এই যুগের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি—তাঁহার হস্তেই প্রাচীন-কালের ভূগোলবিদ্যা সর্ব্বোচ্চস্তরে উন্নীত হয়। টলেমী ছিলেন একাধারে সঙ্গীতবেত্তা, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্ষী এবং ভৌগলিক। তাঁহার ভূগোলও গণিতের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং গণিতের পথেই চালিত। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর মানচিত্রের সংস্কার সাধন করা। তিনি ভূগোলশাস্ত্রে জ্যামিতিক প্রণালীর আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানচিত্র প্রস্তুত করিতে হইলে তাহা জ্যোতিষিক গণনার উপর নির্ভর করিতে হইবে। তিনি কোন স্থানের উল্লেখ করিতে হইলে সেই স্থানের অক্ষরেখা ('পেরালেল্ অব্ রোড্স্') এবং দ্রাঘিমার ('কেনারিজের ফেরো') হইতে নির্দ্দেশ করিতেন। এইরূপ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভূগোল পরিচালনই টলেমীর বিপুল খ্যাতির মূলীভূত কারণ, কিন্তু তাঁহার প্রণালী খুব সুসঙ্গত হইলেও তাঁহার গণনায় কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল।

(১) তাঁহার কল্পিত বিষুবরেখা প্রকৃত বিষুব-রেখা হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া পড়িল এবং তাঁহার পূর্ব্ব দ্রাঘিমা গণনায়ও প্রায় ৭ ডিগ্রী অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িল।

(২) বিষুবরেখার উপর দ্রাঘিমা এবং অক্ষ-রেখার প্রতি ডিগ্রীর মূল্য তিনি ধরিলেন ৫০ মাইল, প্রকৃত হিসাবে হওয়া উচিত ৬৯ মাইল।

(৩) এই সকল অসামঞ্জস্যের ফলে তাঁহার মানচিত্রে উত্তরভাগে অবস্থিত দেশসমূহ উত্তরাভি-মুখের বিস্তৃতিতে ক্রমেই সরু হইয়া পড়িয়াছে এবং যে দেশ যত দক্ষিণে অবস্থিত সে দেশ পূর্ব্বপশ্চিমা-ভিমুখে ততই অযথা বিস্তৃতরূপে দেখান হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, এসিয়ার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত দেশসমূহ তাহাদের প্রকৃত অবস্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দেখান হইয়াছে।

(৪) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বিন্দু-মাত্রও জ্ঞান ছিল না। সমস্তই শুনা কথার উপর নির্ভর, আর সে সময়ে জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণও হইয়াছিল অতি সামান্য। এই সকল কারণে এবং পূর্ব্বোক্ত হিসাবের অসঙ্গতিতে তাঁহার রচিত ভারত বর্ষের মানচিত্র এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার হিসাবে গঙ্গা নদীর মোহানার অবস্থান হয় চীনের ক্যাণ্টন নগরের নিকটে, মহানদী প্রবাহিত হয় শ্যামদেশ ও ক্যাথ্বডিয়ার উপর দিয়া, পাটলিপুত্র নগরের অবস্থান হয় ব্রহ্মদেশেরও পূর্ব্বভাগে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, টলেমীর হিসাবের একটা সামঞ্জস্য স্থির করিয়া লইতে না পারিলে প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ত্ব বিচারে তাঁহার বিবরণের উপর বিশেষ নির্ভর করা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সেকেন্দর সাহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা বিবরণ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই বিবরণ পরে প্যাট্রোক্লসের হস্তগত হয়। প্যাট্রোক্লস্ ছিলেন সেকেন্দর সাহের পরে সেলেক্কসের অধীনে সিরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটা ছত্রপের শাসনকর্ত্তা। তিনি তাঁহার শাসনকালে নিজেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন, এই সব তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে এরাটোস্থেনিস্ এবং ষ্ট্র্যাবোর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সেকেন্দর সাহের অভিযানে তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে পর্য্যায়ক্রমে যতটা পথ অতিক্রম করিতেন, তাহা পরিমাপ করিবার বন্দোবস্ত ছিল, এই কার্য্যের ভার ছিল খুব সম্ভবতঃ ডাইওগ্নেটাস্ এবং বেইটন নামে দুই ব্যক্তির উপর। মেগাস্থেনীসের বিবরণে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সেকেন্দর সাহের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি সমুদ্রপথেও ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি নিয়ারকাস্ নামে তাঁহার অধীনস্থ এক কর্ম্মচারীকে এক পর্য্যবেক্ষণ অভিযানে প্রেরণ করেন। এই বিখ্যাত অভিযানে প্রধান কাপ্তান ওনেসিক্রিটাস্ যে বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা লোপ পাইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দের প্রথমভাগে নিয়ারকাস্ সিন্ধুনদের মোহনা ছাড়িয়া সমগ্র বহর লইয়া পারস্য উপসাগর অভিমুখে অগ্রসর হন। সিন্ধুনদ পথে যে যে স্থলে তাঁহারা রাত্রিযাপনের জন্য নোঙর করিয়াছিলেন, সে সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এই সকল বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া। এরাটোস্থেনিস্ প্রভৃতি পরবর্ত্তী লেখকগণ যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের আকার অনেকটা চতুষ্কোণাকৃতির ন্যায়—ইহার পশ্চিম সীমানায় সিন্ধুনদ, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সাগরের পরিবেষ্টন এবং উত্তরে পর্ব্বতরাজি। পর্ব্বতরাজি তখনও ককেসাস্, হেমোডাস্, পেরোপেমিসস্ ইত্যাদি নামে পরিচিত—গ্রীক সাহিত্যে হিমালয় নামের উল্লেখ দেখা যায় না। পশ্চিম সীমানায় সিন্ধুনদের উপরে সেকন্দর সাহের সেতু হইতে মোহনা পর্য্যন্ত দূরত্ব (নদের দৈর্ঘ্য) ১০,০০০ ষ্টেডীয়া অথবা ১১৪৯ মাইল *; সেতু হইতে উত্তরে হিমানীমণ্ডিত পর্ব্বতরাজি পর্য্যন্ত দূরত্ব ৩০০০ ষ্টেডীয়া—কাহারও মতে ২০০০ ষ্টেডীয়া। তখন ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য গণনা করা হইত পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে। সিন্ধুনদ হইতে পাটলিপুত্র ১০,০০০ ষ্টেডীয়া, পাটলিপুত্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত (গঙ্গার মোহনা) ৬০০০ ষ্টেডীয়া. গঙ্গার মোহনা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ ১৬০০০ ষ্টেডীয়া, কুমারিকা হইতে সিন্ধুনদের মোহনা ১৯০০০ ষ্টেডীয়া কাহারও মতে ১৬০০০ হাজার ষ্টেডীয়া। মেগাস্থেনীসের হিসাবে "দক্ষিণ সমুদ্র" হইতে ককেসাস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দূরত্ব ২০,০০০ ষ্টেডীয়া। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে "দক্ষিণ সমুদ্র" হিসাব করিয়া ২০০০০ ষ্টেডীয়ার হিসাব মিলান কঠিন। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সিন্ধুনদের মোহনা হইতে সেকেন্দর সাহের সেতু পর্য্যন্ত ১০০০০ ষ্টেডীয়া। কানিংহাম সাহেব (Ancient Geography of India) যেরূপভাবে এই ব্যাপারের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ম্যাকক্রিণ্ডল্ তাঁহার Ancient India গ্রন্থরাজিতে আরও কয়েকজন প্রাচীন লেখকের

* ইহা কানিংহাম সাহেবের হিসাব—Ancient Geography of India—ইহাতে ষ্টেডীয়ামের পরিমাপ হয় ৬০৬ ৬৭৫ ফুট। Chambers' Twentieth Century Dic- অনুসারে ষ্টেডীয়ামের পরিমাপ ৫৮২ ফুট।

বিবরণ অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ভূগোল-তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহাদের বিবরণের বিশেষ মূল্য নাই।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জ্ঞানসম্পদ্ অনেকটা চাপা পড়িয়া গেল। গ্রীকদের পৃথিবী গোলাকার তত্ত্বের স্থলে হিব্রুদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল যে, পৃথিবী সাগরপরিবেষ্টিত এক সমতল ক্ষেত্র; তাহার দিকে দিকে বিশালাকার স্তম্ভসমূহ দণ্ডায়মান, সেই স্তম্ভসমূহের উপরে আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। গ্রীকদের প্রাচীন জ্ঞানসম্পদ্ তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু তাহার স্থলে নূতন কিছু দান করিতে পারিলেন না। এদিকে পাশ্চাত্য জগতের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ অব্যাহতই ছিল। টলেমী-রাজগণ তাঁহাদের লোহিত সাগরের উপকূলস্থিত বন্দরসমূহ হইতে আরব দেশে এবং ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার বন্দরসমূহে প্রতি বৎসরই বাণিজ্য-পোতের বহর প্রেরণ করিতেন। এসিয়া মাইনর এবং সিরিয়া তখন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; ভারত-বর্ষ, পারস্যদেশ প্রভৃতিও রোমীয়দের পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের সহিত রোমীয়দের ঘনিষ্ঠতাই বিশেষরূপে ভূগোলবিদ্যার সম্প্রসারণের একটা কারণ বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়।

বাইবেলে যতটা ভূবৃত্তান্তের পরিচয় আছে তাহাতে তৎকালে জ্ঞাত ভূভাগের পূর্ব্বতম সীমানায় ভারত-বর্ষের নাম পাওয়া যায় এবং খোঁজ করিলে ভারতবর্ষ-জাত দ্রব্যসম্ভারের একটা তালিকা বাইবেল হইতেই সংগ্রহ করা যায়। এই যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কস্‌মাস্ নামে একজন মিশর-দেশীয় বণিকের কৃত Ehe Christian Topography of the Universe। এই গ্রন্থকার মিশর হইতে ভারতবর্ষ এবং সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন (৫৫৭ খৃষ্টাব্দ)। তাহারই ফলে পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানের নাম এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত কিছু খবর তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতবর্ষের ভূগোলতত্ত্ব বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রাচীন (তাঁহার মতে) বিধর্ম্মী জাতিদের তাঁহাদের পৃথিবী-গোলাকার-তত্ত্বের জন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া তিনি পৃথিবীর এক মানচিত্র প্রস্তুত করেন—ইহাই খৃষ্টীয়দের প্রস্তুত সর্ব্বপ্রথম মানচিত্র—তাহাতে পৃথিবীকে দেখান হইয়াছে সাগরপরিবেষ্টিত এক সমচতুষ্কোণাকৃতি ক্ষেত্ররূপে, এই সাগরের পরপারে অবশ্যই অপরাপর দেশসমূহ বিদ্যমান। ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানেও এরূপ প্রাথমিক অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়।

(প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের গৌহাটী শাখার অধিবেশনে পঠিত—লেখক)

জগৎ-কথার ভূমিকা

[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বাণীরঞ্জন]

উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ, সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, সুনীল সাগর, পর্ব্বত-বনানী-নদী-প্রান্তর-নগর-পল্লীতে পরিপূর্ণ বিপুল-সুন্দর এই ধরণীতে মানুষ আনন্দে বসতি করিতেছে। কিছুরই অভাব তাহার নাই। আলোতে, বাতাসে, আহার্য্যে, জলে,—ভ্রমণে, শ্বাসে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়—তাহার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হইতেছে। বুদ্ধি ও চেষ্টার সাহায্যে নূতন নূতন অভাব সে পরিপূরণ করিয়া লইতেছে। কত অগণন জীব এবং কত প্রকারের কার্য্য তাহার সহায়। সে-ই প্রকৃত এই পৃথিবীর রাজা।

কিন্তু তবুও মানুষের মন কিসের জন্য ব্যাকুল?

মানুষের মন ব্যাকুল শুধু, **জানার** জন্যে। কি আহার, কি নিদ্রা, কি ধন জন, কি শক্তি সামর্থ্য, কিছুতেই মানুষকে কোনদিন তৃপ্তি দিতে পারে নাই। পৃথিবীর যেখানে যে মানুষ আছে এবং ছিল, সকল স্থানের ও সকল বয়সের মানুষ—শিশু হইতে বৃদ্ধ সব মানুষই অস্থির শুধুই জানার নিমিত্ত।

এটা কি, ওটা কি, এ কে, সে কে, এই হইতে ইহার আরম্ভ। তাহার পর জানার ইচ্ছা ক্রমেই বাড়িয়া চলে এবং শেষে অসীম হইয়া উঠে।

সন্ধ্যায় তারাখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া মানুষ নিত্য অবাক্ হইয়া থাকে, প্রভাতে সূর্য্যোদয় দেখিয়া মানুষ বিস্মিত হইয়া রহে; প্রতিদিন দেখিতেছে, তবুও বিস্ময়! ইহা ছাড়া, জীবনের শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া, আনন্দে উল্লসিত হইয়া, মানুষ বিস্মিত হয়। আকাশের মেঘ, ঝড়, বজ্র, বৃষ্টি, পায়ের নীচে পৃথিবীর ধূলা, মাটি, পাথর, চারিদিকে যাহা কিছু আছে ও যাহা কিছু ঘটে, এবং মনের মধ্যে যে কোন ভাব উপস্থিত হয় বা বাহিরে প্রকাশ হয়, মানুষের মন এ সকল বিষয়ই জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক চিরকাল। শুধু তাহাই নহে, যতই জানিতেছে, তাহার জানার পিপাসা এবং বিস্ময় ততই বাড়িতেছে।

'যাহা কিছু দেখি এসব কি? কিরূপে এসব হয়? আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? কেনই বা এ সমস্ত হয়? পরিণাম কি?—কোথায় সব যাইবে? চিরকাল কি এইরূপ সব ছিল?' এইরূপ অবিরাম প্রশ্ন জাগিয়াছে মানুষের মনে। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে। হয় তো তাহাদের কাহারও সঙ্গে কাহারও জানা নাই।

জানা না থাকিলেও, এইরূপ সব প্রশ্ন সকল জাতির মনেই উঠিয়াছে। আর এই রকমের প্রশ্ন বা এইরূপ মনোভাব হইতে মানুষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জাতিতে দুইটি অপূর্ব্ব জিনিষ গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গর্ব্ব। একটি দর্শন আর একটি বিজ্ঞান। দুইটি, যেন যমজ ভাই। মানুষের অন্তরের জিজ্ঞাসার বা অনুসন্ধানের আলো হইতে জন্মলাভ করিয়া, সার্থক পুত্রের মত, সকল অন্ধকারের ভিতর দিয়া দুইজনে দুই হাতে ধরিয়া মানবজগতকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে, অনন্ত রহস্যের দুয়ার মানবের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে এবং খুলিয়া যাইতেছে।

ইহাতে লাভ হইয়াছে অনেক। আহার বিহারে

সুখে জীবন ধারণ করারও অনেক উচ্চে—মানুষের প্রধান সম্পত্তি, **জ্ঞান**। জ্ঞানের আলোতে এই পৃথিবীর ও ক্রমে ক্রমে বিশ্বসৃষ্টির যত কিছু জানা এবং সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয় হইতে সত্যের অংশলাভ করিতে করিতে, প্রকৃত সত্যটিকে বুঝিতে পারাই মানবজীবনের শেষ সফলতা। এ সফলতা লাভ করিতে মানুষের সম্বলমাত্র দুইটি। একটি চিন্তা আর একটি কাজ। এখন, দর্শন বেশি করিয়া যোগায় চিন্তাকে, বিজ্ঞান বেশি করিয়া যোগায় কাজকে। কাজেই, চিন্তা ও কাজ এই দুই সম্বলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়া তাহারা তাহা হইলে মানুষকে জ্ঞানের পথেই চালায়। দর্শন মনকে নানা বিষয়ে বিচার করিয়া বুঝিবার সুবিধা করিয়া দেয়, বিজ্ঞান মনকে নানা বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার সুবিধা করিয়া দেয়। যেন, দর্শন পথটি দেখাইয়া দিতে দিতে চলে; বিজ্ঞান পথের সব জানাইয়া দিতে দিতে চলে। দর্শনে যেন দেখিতে পাই, বিজ্ঞানে যেন ছুঁইতে পাই। এইরূপে দুইজনে মিলিয়া সকল বিষয়ের জানিবার যাহা কিছু, সবটা জানাইয়া দেয়। ইহাতে, সত্য কি, সহজে তাহা বুঝা যায়।

মানুষের বাঁচিয়া থাকার পক্ষে, বাঁচিবার জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা ঠিক ঠিক মত বাছিয়া লইবার পক্ষে, মানুষের মনের শোক দুঃখ প্রভৃতি দূর করিয়া মনের শান্তির পক্ষে এবং মনে যত কিছু প্রশ্ন উঠে সেগুলির উত্তর সহজে পাইবার বা সহজ মীমাংসার পক্ষে অপরিসীম সুযোগ হইয়াছে, দর্শন ও বিজ্ঞান এই দুইজনের জন্য। ইহাদের সাহায্যে মনের সকল অন্ধকার দূর করিয়া ও মনকে উন্নততর করিয়া প্রকৃত সত্যের লক্ষ্যটিতে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় কম। মানুষের সমাজে, ভালমন্দ বুঝিয়া শ্রেয়পথে চলিবার চিন্তার যে শক্তি, প্রাণের সেই সার অবলম্বনটির নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম দর্শনের উপর দাঁড়াইয়াই বড় হইয়াছে। বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া বড় হইয়াছে মানুষের জীবনীশক্তি, কাজের শক্তি; নাম তাহার **কর্ম্ম**; দুঃসাহসী চিরযুবক সে, সে তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়। দর্শন সমস্ত জগতে ছড়ানো তাহার প্রার্থনার পরম ধনকে ধ্যানে আপনার বুকের মধ্যে পায়; বিজ্ঞান সব কিছুর অণু কণার মধ্যেও আপন বুকের পরমধনকে দেখিতে ইচ্ছা করে। দুইজনে অন্তরে বাহিরে মানুষকে পূর্ণ করে।

এই পূর্ণতার আভাস মানুষ পায়, যখন, এই বিশ্বসৃষ্টির সহিত তাহার সম্পর্ক কি, সে তাহা জানিতে পারে। এইজন্যই বোধ হয়, জানার জন্য তাহার মন ব্যাকুল থাকে। এই মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, ধারণার অতীত বিরাট সৃষ্টির ভিতরে, কত অচিন্তনীয় যে সে ক্ষুদ্র, সে যখন তাহা জানে, সে স্তব্ধ হয়; ভাবে; সে নিজেকে একবার বুঝিতে পারে। অন্তরের বিরাটত্বকেও সে একবার বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারে। প্রণত হয় নিশ্চয়ই সে। কেন না, সমস্ত সুখ দুঃখের পসরা সে বোধ হয় এই বিরাটের চরণপুটে সেই নিমেষেই অঞ্জলি দিতে পারে। আবার, সে যখন জানে, এই আকাশ বাতাসে, এই ধূলিকণায় যাহা আছে, তাহার শরীরের প্রতি অণুতেও তাহাই, এই মহা বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তাহারই ঘর, এই অকূল জ্যোতির সাগরের আলোর মালা তাহারই জন্য, মহাকাশের শূন্যতার ভিতর হইতে আসিয়া, আগুনে, জলে, কোটি কোটি জন্মে অপরূপ সব পথ পার হইয়া সে আজিকার পৃথিবীর পিঠে দাঁড়াইয়াছে, কি জানি কি অপূর্ব্ব কাজের ভারে প্রফুল্ল, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল সৃষ্টির রাজ্যের পরম অমৃতকণার একজন সে!

তখন বিজ্ঞান আর শুষ্ক থাকে না। বিজ্ঞান নিশ্চয়ই তাহার নয়ন জলের অভিষেকে স্নান করে।

মানুষের ঐরূপ প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে পারে এবং গোড়ার সকল কথা বলিতে পারে সৃষ্টিবিজ্ঞান। ইহা

মানুষের আপন কথা, তাহার ঘরের কথা। বিশ্ব-সৃষ্টিরও ইহা ঘরের কথা। এই চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, দশদিকে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে এবং দেখা যাইতেছে না, সকলেরই আদি কথা ইহারই মধ্যে। বড় বিস্ময়ের। কিন্তু সত্যের ইহাই প্রথম সিঁড়ি। জগৎ-কথার বাষ্পের নিঃশ্বাসটি হইতে উহার আগুনের শিখায়, উহার আলোর কণায়, উহার পাথর ও মাটির পরতে পরতে মানুষের জীবনের সকল কোটি বৎসরের সত্য ইতিহাসটিই লিখিত আছে। নিজেকে জানিতে হইলে মানুষকে সকলের প্রথম ইহারই পাতা খুলিতে হয়।

জগতের সকল জাতির শ্রেষ্ঠ পুস্তকেই এই জন্য এই কথা লইয়াই প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞান তাহা লইয়া যুগে যুগে আরও বেশি করিয়া মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া দিয়াছে। এখনও দিতেছে। এ দেশের ও বিদেশের মহাঋষিগণ যখন ধ্যানে, পর্য্যবেক্ষণে, কি দূরবীক্ষণে, মহাগ্রহ, গ্রহ, উপগ্রহ ও উল্কা, ধূমকেতু, নীহারিকা প্রভৃতির মধ্যে সৃষ্টির গোপন রহস্যটি আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন, সে কি আনন্দের দিন! যেন আমাদের দেশটিকে আমরা জানিলাম! ঐ সুদূরের তারার নদী, যাহা ছিল আশ্চর্য্যের বিষয়——তাহা হইল এখন আনন্দের বিষয়! পৃথিবীর বুকের ভিতরে যে আমাদের কত যুগের পরিচয়ের পায়ের দাগ পড়িয়া আছে এবং তাহারও নীচে বিরাট আগুনের কুণ্ড জ্বলিতেছে, তাহার আমরা অনুসন্ধান নিত্য লইতেছি। কত সহস্র সহস্র জিনিষের মূল জিনিষটি ধরিয়া ফেলিতেছি। কোটি কোটি যোজনের দূরত্ব কোথায় চলিয়া গিয়াছে, যেন সপ্ত পাতাল আর সপ্ত স্বর্গের পথগুলি ক্রমেই আমাদের স্বচ্ছন্দ চলার পথ হইয়া পড়িতেছে! কত কোটি বৎসরের পরের জীব হইয়াও, যেন আমাদের এই সৌর জগতের আদি-দিনের কাছে উপস্থিত হইতেছি, শত শত সৌর জগতের উৎপত্তির কথা বুঝিতে পারিতেছি এবং শত শত সৌর জগতের শেষ পরিণাম কি, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। ক্ষুদ্র মানুষ এইরূপে না জানি পশ্চাতের আরও কত দূর পথে এবং সম্মুখের আরও কত দূর পথে অগ্রসর হইবে।

তাহারই কথা আগামী বারে বলিব।

স্থাপত্য-শিল্পে শ্রীশচন্দ্র

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত]

চিকাগো ধর্ম্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—

"প্রেমের দ্বারা ঘৃণাকে এবং আধ্যাত্মিকতার দ্বারা এ জগৎকে জয় করিতে হইবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

আজ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধার মহাত্মা গান্ধী ঐ সারগর্ভ উক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিয়াই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি "নোবেল প্রাইজ" লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছে। এমন কি, আজ জগতের শিক্ষিত নরনারী মাত্রেই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

পূর্ব্ববর্ণিত মহাপুরুষগণ ধর্ম্ম-দর্শন, ধর্ম্মমূলক রাজনীতি এবং সাহিত্যের বাণী জগতে প্রচার করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। অস্তগমনোন্মুখ ভারত-গৌরবরবিকে এইরূপে ভারতের এক একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান আবার পূর্ব্বাচলে আনয়ন করিয়া জগতে ভারতের নূতন প্রতিষ্ঠার পথ করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত এই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারতের অন্যান্য কৃতী সন্তানও কর্ম্মক্ষেত্রের নানা বিভাগে অগ্রসর হইতেছেন। ভারত এইরূপে আবার স্বীয় গৌরবের আসনটি ধীরে ধীরে উদ্ধার করিয়া লইতেছে।

ভারতের স্থাপত্য-শিল্প একযুগে জগতের শীর্ষ স্থানে ছিল; কিন্তু এ যুগে উহা প্রায় একরূপ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আজ আনন্দের বিষয় এই যে, সে গৌরবেরও উদ্ধারে ভারতবাসীই আবার অগ্রণী হইতেছেন। এই শিল্পকে পুনরায় উদ্ধার করিতে যিনি অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা দেশের এবং বিশেষ

মহাত্মা গান্ধী

করিয়া এই বাঙ্গালারই **সুনাম** বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা যাহার কথা বলিতে যাইতেছি, দেশের অনেকেই

স্থাপত্য-বিশারদ শ্রীশচন্দ্র

তাঁহাকে জানেন। তিনি বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি এইজন্যই যে আজ সর্ব্বত্র সুপরিচিত, তাহা নহে, তাঁহার প্রয়াসই এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম। একদিন পরাধীন জাতির গৌরব উদ্ধারের এই প্রকারের সূচনা সকল পাইয়াই হয়ত কবি গাহিয়াছিলেন,—

"ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

শ্রীশচন্দ্রের সাধনা সত্যই জগতের গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে। দেশে এবং বিদেশে উভয়ত্রই তাঁহার কার্য্য বিশেষজ্ঞগণেরও বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীর এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবনে তিনি অঙ্কশাস্ত্র, ইংরাজী এবং স্থপতিবিদ্যায়

বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি আট বৎসরকাল ভারতসরকারের অধীনে ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অতঃপর তিনি কিয়ৎকালের জন্য বিকানীর রাজ্যে সহকারী ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীশচন্দ্র দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের সময় দাসত্ব-শৃঙ্খলকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত—লুপ্তপ্রায় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার দেশবিদেশ পর্য্যটন, অধ্যয়ন, গভীর গবেষণা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল। তাঁহার শ্রম যেন উত্তরোত্তর নবীভূত হইতেছে। তাঁহার নিত্য নূতন উদ্যম ও অপূর্ব্ব কৃতিত্বে মনে হয় যে, অদূর-ভবিষ্যতেই তাঁহার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে।

তিনি বহুপ্রকারে আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াও এবং স্বদেশবাসীর যথোপযুক্ত সহানুভূতি এবং সহায়তা ব্যতিরেকেও যে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অদম্য উৎসাহের পরিচায়ক। ইহা ব্যতীত তিনি কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পৃষ্ঠপোষকরূপে বৃত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গালার বহু শিক্ষার্থীও তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে জ্ঞানলাভ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইবে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে "স্থাপত্য-বিশারদ" উপাধিতে ভূষিত করিয়া প্রকৃত গুণের মর্য্যাদা জানাইয়াছেন। আজ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাক্ষাৎভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। স্থাপত্য-শিল্পের কেন্দ্রস্থল ইটালীর রাজধানী রোমের "রয়েল একাডেমির" সদস্য ডক্টর টুচী এবং তদীয় গুণবতী পত্নী শ্রীশবাবুর প্রদর্শনী ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া বলিয়াছেন, 'অদূরভবিষ্যতে ভারতের অতীত গৌরবের যুগ ফিরিয়া আসিবে।' শ্রীশবাবুকে রোমে যাইবার আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারা একথাও বলিয়াছেন যে, ইটালীর শিল্পীগণ তাঁহার গুণের সম্যক্ সমাদর করিবে।

বিশ্ব-শিল্পভাণ্ডারে ভারতের দান অমূল্য, ইহা প্রমাণ করিবার মানসে স্থাপত্য-বিশারদ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল আমেরিকায় গমন করেন। "এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা"র স্থাপত্য বিভাগের সম্পাদক এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বহুবিধ স্থাপত্য ও শিল্পসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডক্টর হার্ভে উইলী করবেট, বোষ্টন মিউজিয়মের কর্ম্মসচিব ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রিচার্ড অক্নার প্রভৃতি স্থপতি-বিদ্যাবিদ্গণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি একথাও বলিয়াছেন, শ্রীশবাবুর নিকট পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষার্থীগণের যথেষ্ট শিক্ষা করিবার আছে। নিউইয়র্কের "Architecture" পত্রিকায় প্রকাশিতব্য শ্রীশবাবুর চিত্রসমূহ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ডক্টর করবেট বলেন, "আমরা পশ্চিমদেশবাসিগণ, আমাদের দুইশত বৎসরের কৃতিত্বেই গর্ব্বিত, কিন্তু ভারতের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম স্থাপত্য-শিল্প, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা ইত্যাদির আদৌ সন্ধান রাখি না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আজ ভারতের দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ও শিল্প লুপ্ত হইলে জগতের প্রকৃত ক্ষতি। এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বদেশের স্থাপত্য-শিল্পের পুনরভ্যুত্থানে সফলতার সহিত ব্রতী হইয়াছেন,—ইহা আমাদের বিশেষ মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য।"

শ্রীশবাবু তাঁহার সাধনাদ্বারা দেশবিদেশে স্থাপত্য-শিল্পে নূতন জীবনের প্রেরণা প্রদান করিলে দেশবাসীও তাহাতে গৌরব বোধ করিবে।

আধুনিক রুচিসম্পন্ন স্থপতিগণের পরিকল্পনার
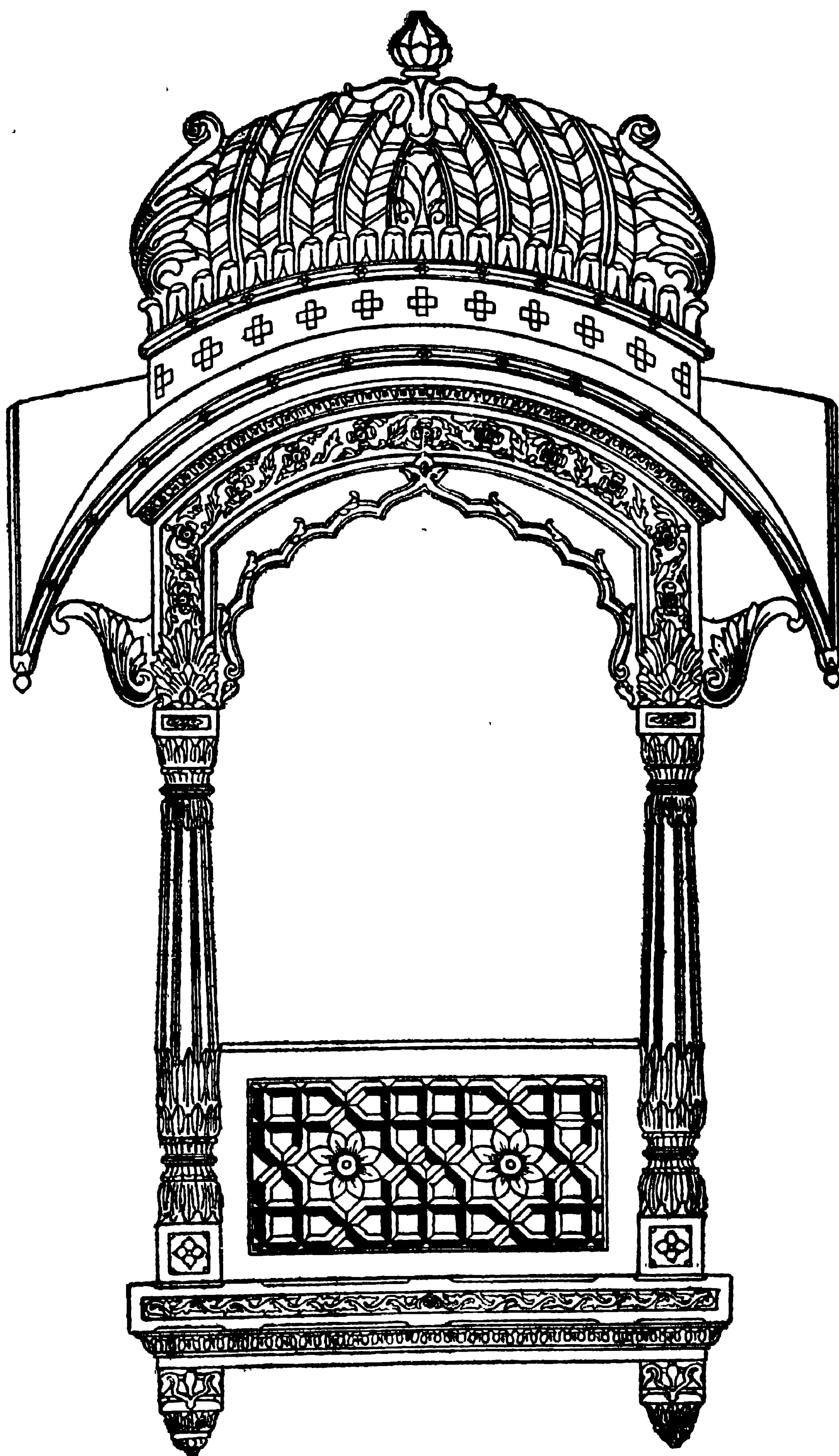
ঝরোখা—বাতায়ন সম্মুখস্থ বারাণ্ডা

সহিত তাঁহার পরিকল্পনার তুলনা করিলে কোথায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, নিম্নপ্রদত্ত চিত্রগুলি হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশের দেবালয় দেবদেবী ও পশুপক্ষীর মূর্ত্তি খোদিত ইষ্টক ও টালিতে পরিশোভিত হইত। বঙ্গদেশের নিজস্ব সেই মৃৎ-শিল্প আজ বিলুপ্ত। শ্রীশবাবু বাঙ্গালার সেই লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারেও সচেষ্ট হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁহার প্রস্তুত ইষ্টক ও টালির চিত্র হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।
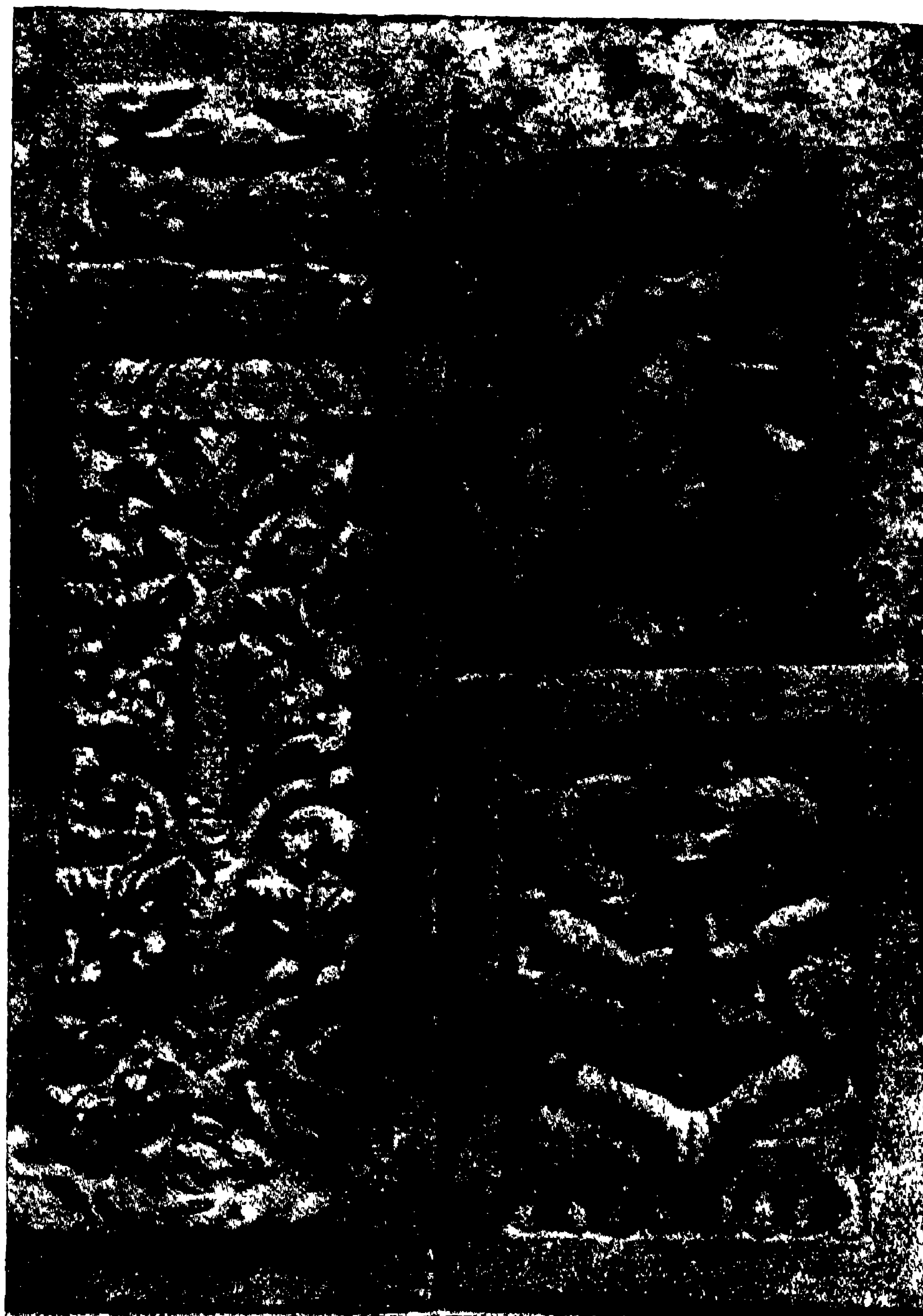
শ্রীশবাবুর প্রস্তুত টালির চিত্র

শ্রীশবাবুর প্রস্তুত টালির চিত্র
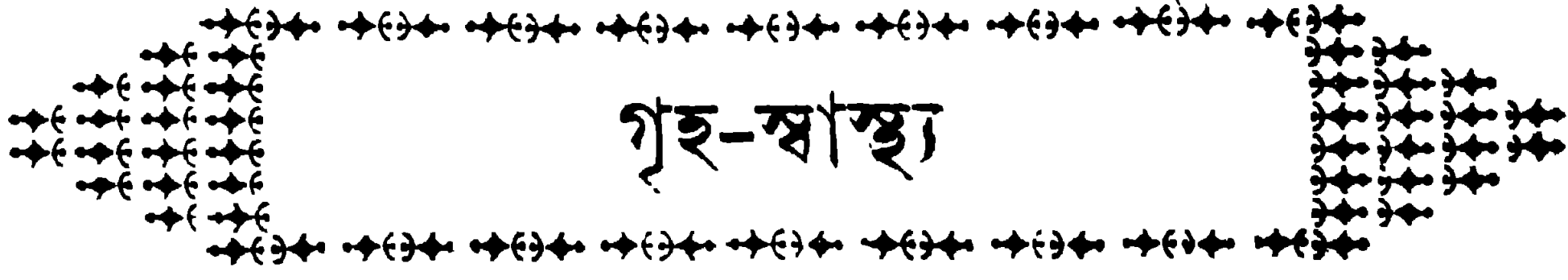
গৃহ-স্বাস্থ্য

[শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জলনিকাশের ব্যবস্থা—

বৃষ্টির জল যাহাতে জমির উপর জমিয়া না থাকে এবং স্বতঃই প্রবাহিত হইয়া বাহির হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বাটীর চতুর্দ্দিকের জমি সীমানাভিমুখে ঢালু করিয়া দিলে জলনিকাশের বিশেষ সুবিধা হয়। নির্গমনপথের অভাবে জল জমিয়া থাকিলে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা রোগের উৎপত্তি হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের কোনও স্থান উচ্চ এবং কোনও স্থান নিম্ন। ভূমি অসমান থাকায় উচ্চভূমির উপর পতিত বৃষ্টির জল নিম্নভূমির দিকে গড়াইয়া যায়। এইরূপে গড়াইয়া যাইবার সময় জলের কতকাংশ মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, কতকাংশ খানা, ডোবা, পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে যাইয়া পড়ে এবং অবশিষ্টাংশ বাষ্প হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়।

যে জল মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহা ভূমধ্যস্থ জলপ্রবাহের সৃষ্টি করে এবং সেই জলপ্রবাহ একটি বিস্তৃত নদীর ন্যায় মাটির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। কূয়া, পুষ্করিণী বা কোন গহ্বর খনন করিলে সেই জল পাওয়া যায়।

এই জলপ্রবাহ জমিতলের সন্নিকটে থাকিলে জমি আর্দ্র থাকে এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হয়। ভূমধ্যস্থ জলপ্রবাহ জমিতল হইতে ৫ হাতের মধ্যে থাকিলে সেই জমি গৃহনির্ম্মাণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। মৃত্তিকামধ্যে জল-নির্গমনের প্রণালী নির্ম্মাণ করিলে এবং সেই প্রণালা মধ্যে যাহাতে ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহ সহজে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকিলে, ভূমধ্যস্থ জল সেই প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। তাহা হইলে জলপ্রবাহের উচ্চতা কম হইবে, জমি অপেক্ষাকৃত শুষ্কাবস্থায় থাকিবে এবং রোগের সম্ভাবনা তত থাকিবে না।

জলের একটি সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, উহা নীচের দিকে গড়াইয়া যায়। বৃষ্টির জল এইরূপে নীচু জায়গায় জমিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সেই জল উপ্‌চিয়া পড়িলে (অনেকগুলি একত্রে মিলিত হইয়া) যেদিকে ঢালু পায় সেই দিকে গড়াইয়া ছোট ছোট নালায় গিয়া পড়ে—পরে ছোট ছোট নালা দিয়া বহিয়া যাইয়া বড় বড় নালায় গিয়া পড়ে। তৎপরে সেই জল বড় বড় নালা দিয়া নদীতে, অবশেষে সমুদ্রে যাইয়া পড়ে। বৃষ্টির সমস্ত জল এইরূপে বাহির হইয়া যাইলে কোন গোল থাকে না। সাধারণতঃ জল নিম্নভূমিতে আটকাইয়া থাকে এবং সেই অগভীর জলরাশি যাহাকে চলিত কথায় 'বিল' বলে তাহা জলাভূমির সৃষ্টি করে। এইরূপে সেই স্থান বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

বৃষ্টির জল জমির উপর দিয়া গড়াইয়া যাইবার সময় অনেক মাটি ধুইয়া লইয়া যায়। জলের স্রোত যখন জোরে বহিতে থাকে, তখন মাটি তলে থিতাইয়া পড়ে না, কিন্তু স্রোতের বেগ অল্প হইলে মাটি তলায় পড়িয়া যায়। এইরূপে যে সমস্ত খাল পূর্ব্বে গভীর

ছিল সেগুলি ক্রমে ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে। সেই একই কারণে গঙ্গাগর্ভে বড় বড় চরভূমি উৎপন্ন হইতেছে। খাল বিল এইরূপে ভরাট হইতে থাকিলে বর্ষার সময় জলের বেগ নূতন পথ কাটিয়া সেই পথে প্রবাহিত হয় এবং পুরাতন পথ অর্দ্ধভরাট অবস্থায় জলাভূমির সৃষ্টি করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী স্থানকে বাসের অযোগ্য করিয়া থাকে।

জলপ্রবাহ যে কেবল উক্তরূপ স্বাভাবিক উপায়েই বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। কৃত্রিম উপায়েও জল নিঃসারণে ব্যাঘাত ঘটে। বাঁধ, রাজপথ ও রেলপথ সেই বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। সেইগুলি নির্ম্মাণ করিবার সময় ছোট খাল নালা প্রভৃতি বন্ধ না করিয়া যদি প্রত্যেক স্বাভাবিক জলনিকাশের পথে এক একটি সেতুর ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার এত সর্ব্বনাশ হইত না। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিদ্রহীন প্রাচীর। তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে পুল, সাঁকো বা অপর কোন জলনির্গমনের উপায় না থাকিলে স্বাভাবিক নির্গমপথগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়—ফলে সেই দেশ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে এবং বৃষ্টিপাত অধিক হইলে দেশ ভাসিয়া যাইতে পারে।

গৃহের ছাদে বা উঠানে বৃষ্টির জল পড়িলে যাহাতে সেই জল সহজে বাহির হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। ছাদের ও উঠানের ঢালু এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে তদুপরি পতিত জল স্বতঃই নর্দ্দমার দিকে গড়াইয়া আসে। বাটীর উঠান পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা উচিত। বাটীর সমস্ত জল বাহির করিয়া দিবার জন্য বাটীর চতুর্দ্দিকে পাকা নর্দ্দমা নির্ম্মাণ করিবে এবং নর্দ্দমাগুলি যাহাতে আবদ্ধ বা ভগ্নাবস্থায় না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পানীয় জলের ব্যবস্থা—

জল আমাদের প্রধান পানীয়। পানীয় জল নির্ম্মল হওয়া একান্ত আবশ্যক। দূষিত জল পান করিলে নানারূপ পীড়া হয়।

পল্লীগ্রামে পুষ্করিণীর জলই সাধারণতঃ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। সেই জল যাহাতে দূষিত হইয়া না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পুষ্করিণী গভীর করিয়া কাটিলে তাহাতে পাটা, হেলা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ও ছোট মৎস্য থাকিলে এবং জলে রৌদ্র পড়িলে জল ভাল থাকে। ১০।১২ বৎসর অন্তর পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা উচিত। পুষ্করিণীর পাড় চারিদিকে উচু করিয়া দিলে, বাহিরের দূষিত জল পুষ্করিণীর মধ্যে আসিতে পারিবে না। পানীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীর নিকটে মলমূত্রত্যাগ বা তাহাতে স্নান বা ধৌতকার্য্য করিতে দিবে না।

পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য বলিয়া অধিকাংশ স্থলে কূপ খনন করা হয়। তজ্জন্য ৩।৪ ফুট গভীর গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে কূয়ার পাট্ (যাহা কুম্ভকারেরা মাটি পোড়াইয়া প্রস্তুত করে) বসান হয়। জমি পর্য্যন্ত বসান হইলে পাট্গুলির নীচে মাটি কাটা হয় এবং চাপ দিয়া পাট্গুলিকে নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। পরে তাহাদের উপর আরও কতকগুলি পাট্ জমিতল পর্য্যন্ত বসান হয়। এইরূপে তলা পর্য্যন্ত মাটি কাটিতে কাটিতে পাটের উপর পাট্ বসাইয়া যাইতে হয়। এইরূপ কূয়াকে কাঁচা কূয়া বা পাতকূয়া বলে। কাঁচা কূয়া সাধারণতঃ অগভীর হয় বলিয়া এবং তাহাতে ময়লা জল সহজে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া তাহার জল দূষিত হইতে পারে।

পাকা কূয়া বা ইঁদারার ভিতরে পাটের পরিবর্ত্তে গাঁথুনি করিয়া দেওয়া হয়। তজ্জন্য ৭ ফুট গর্ত্ত কাটিয়া তাহার তলায় শাল বা জাম কাঠের চাক্ সমানভাবে বসাইয়া তাহার উপর পাকা গাঁথুনি করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে তলা পর্য্যন্ত মাটি কাটিতে কাটিতে গাঁথুনি করা হয়। গাঁথুনি করিতে করিতে তাহার ভিতর দিকে 'সিমেণ্ট পয়েণ্টিং' করিয়া যাওয়া উচিত।

সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠের উপরাংশ রসবাহী অর্থাৎ তাহার ভিতর দিয়া জল সহজে প্রবাহিত হয়। তন্নিম্নে রসাভেদ্য স্তর পাওয়া যায়। রসাভেদ্য স্তরে জল সহজে প্রবেশ করিতে পারে না এইরূপ স্তরের নিম্নে পুনরায় রসবাহী স্তর—এইরূপে তাহারা উপর্য্যুপরি সজ্জিত থাকে। এই রসাভেদ্য স্তর ভেদ করিয়া তন্নিম্নস্থ রসবাহী স্তর পর্য্যন্ত কূপ খনন করা এবং তাহার চারিদিকে ৩।৪ ফুট উচ্চ করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া উচিত।

পায়খানা, পশুশালা প্রভৃতি দূষিত স্থান হইতে ৫০।৬০ ফুটের মধ্যে কূপ খনন করা উচিত নয়। সাধারণতঃ কূপের গভীরতা যত অধিক হয়, তাহার মধ্যে দূষিত স্থান তত অল্প থাকিবে। এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ময়লা দড়ি বা ময়লা পাত্রদ্বারা কূপের জল উঠান হইলে ভাল জলও দূষিত হইয়া পড়ে।

আজকাল অনেক স্থানে নলকূপের ব্যবস্থা করা হইতেছে। গভীর নলকূপের জল সাধারণতঃ দূষিত হয় না।

কূপ বা পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা স্রোতস্বিনীর জল সাধারণতঃ ভাল হয়। ঘোলা জল ফট্‌কিরির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। মলমূত্র নিকাশের নালা দিয়া ময়লা জল নদীমধ্যে পড়িলে, নদীর জলে স্নানাদি ধৌতকার্য্য করিলে, তাহাতে মলত্যাগ বা শবাদি নিক্ষেপ করিলে নদীজল দূষিত হয় বটে, কিন্তু জলস্রোতে এবং সূর্য্যালোক ও বায়ু সাহায্যে সেই জল কতক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়া যায়।

বৃষ্টির জল অধিকতর নির্ম্মল ; প্রথম বারিপাতে বাতাসের ময়লা দূর হইলে পর উহা সঞ্চয় করা উচিত ; কিন্তু তাহাতে জলের অভাব দূর হয় না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝরণার জল বিশুদ্ধ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। তথায় বৃষ্টির জল মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া পুনরায় ঝরণার আকারে উপরে উঠে।

দূষিত জল শোধন করিবার উপায় :—

(১) চুয়ান জল—সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে পানীয় জলের অভাব হইলে লবণাক্ত জল চুয়াইয়া লওয়া হয়। চুয়ান জলের মধ্যে বায়ু না থাকাতে তাহা সুস্বাদু হয় না। পরিষ্কার বায়ু মধ্য দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িতে দিলে সেই জলমধ্যে বায়ু প্রবেশ করে এবং জলও সুস্বাদু হয়।

(২) সিদ্ধ জল—১০।১৫ মিনিটকাল উত্তমরূপে ফুটাইয়া জল সিদ্ধ করিলে অধিকাংশ রোগের জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফুটান জল কয়েকবার পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালাঢালি করিলে এবং তাহাতে একটু কর্পূর দিলে সুস্বাদু হয়। জল ফুটাইয়া লওয়াই জলশোধনের সহজসাধ্য ও প্রকৃষ্ট উপায়। সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে সিদ্ধ না করিয়া জলপান করা উচিত নয়।

(৩) ফট্‌কিরি—ঘোলা জল পান করিলে পেটের পীড়া হয়—ইহা সিদ্ধ করিলে পরিষ্কার হয় না। ঘোলা জলে ফট্‌কিরি নাড়িয়া মিশাইয়া দিলে জলের কাদামাটি পাত্রের তলায় পড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে অনেক রোগের জীবাণুও তলাইয়া যায়। পরে উপরের

পরিষ্কৃত জল ধীরে ধীরে ঢালিয়া লইয়া তাহা ফুটাইয়া লওয়া উচিত।

তাম্রপাত্রে ঘোলাজল রাখিয়া দিলে জলের ময়লা নীচে থিতাইয়া পড়ে এবং জলের জীবাণুও বিনষ্ট হয়।

(৪) চূণ—টাট্‌কা চূণের দ্বারা জল অতি সহজে শোধিত হয়, কিন্তু জলে চূণের অংশ অনেক দিন থাকে বলিয়া তাহা আপত্তিকর হয়।

(৫) পারমাঙ্গানেট্ অব্ পটাস—ইহা জলের জীবাণু ও দুর্গন্ধ নাশ করে এবং জলে দিলে জলের রং বেগুনী হয়। যে পরিমাণ দিলে জলের রং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া বেগুনী থাকে, তাহার অধিক মিশাইবার প্রয়োজন নাই। ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইহা পুষ্করিণীতে ব্যবহৃত হয় না।

(৬) তুঁতে—৬০,০০০ ভাগ জলের সহিত ১ ভাগ তুঁতে মিশাইলে সেই জল শোধিত হয়। ১ ঘনফুট জলের ওজন ৩০ সের ধরিলেই হইবে। তিন দিন পরে সেই শোধিত জল পান করা যায়।

(৭) ফিল্টার বা ছাঁকিয়া পরিষ্কার করা—এদেশে গৃহস্থ বাটীতে কাঠকয়লা ও বালির সাহায্যে জল শোধন করিয়া লওয়া হয়। তজ্জন্য একটি কাঠের বা বাঁশের ভারায় চারিটী থাক্ করিয়া লইয়া উপরের তিনটী থাকে তিনটী সচ্ছিদ্র কলসী এবং সর্ব্বনিম্নে একটি ছিদ্রশূন্য ভাল কলসী থাকিবে। যে জল পরিষ্কৃত হইবে, তাহা উপরের কলসীতে ঢালিতে হয়, এবং মধ্যে দুইটী কলসীর উপরটীতে কাঠকয়লা এবং নীচেরটীতে বালি রাখা হয়। সর্ব্বোচ্চ কলসীর জল, কয়লা ও বালির ভিতর দিয়া চুঁয়াইয়া সর্ব্বনিম্ন কলসীতে জমা হয়। কয়লা ও বালি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া এবং কলসীর মুখগুলি পরিষ্কার কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত। ৩।৪ দিন ব্যবহারের পর যখন বালির উপর একটি পাতলা স্তর পড়ে, তখন হইতে জল বিশুদ্ধ হইতে থাকে। মাঝে মাঝে বালি ও কয়লা বদলান উচিত।

উক্তরূপে পরিষ্কৃত জল ব্যবহার করা সকল সময়ে নিরাপদ হয় না। প্রয়োজন হইলে বাজারে তৈয়ারী ফিল্টার ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। গৃহস্থের পক্ষে জল ফুটাইয়া পান করা সহজসাধ্য ও সকল সময়েই নিরাপদ।

কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে যথায় অনেক লোক একত্রে বাস করে, সেরূপ স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন হয়। তজ্জন্য নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা বৃহৎ পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া তাহা প্রথমে জল থিতাইবার চৌবাচ্চায় ২।৩ দিন ধরিয়া রাখা হয়। এইরূপে জলের অধিকাংশ সূক্ষ্ম ভাসমান ময়লা চৌবাচ্চার তলায় পড়িয়া যায়। বর্ষাকালে জল বড় ঘোলা থাকে, সে সময় জলে ফট্‌কিরি দিলে জল একদিনেই পরিষ্কার হইয়া যায়। এইরূপে ময়লা নীচে থিতাইয়া পড়িলে উপরকার পরিষ্কৃত জল ফিল্টারে লইয়া যাওয়া হয়।

ফিল্টারের মেঝেতে খোয়া পিটিয়া তাহার উপর সিমেণ্ট পলেস্তারা করা হয়। সেই পলেস্তারার উপর ছাঁকা জল যাইবার নালী থাকে। দুই থাক্ ইট সাজাইয়া সেইরূপ নালী তৈয়ারী করা সুবিধাজনক। নালীর উপর ৬ ইঞ্চি গভীর নুড়িপাথর, তাহার উপর বালির স্তর এবং সকলের উপর জল থাকে। ফিল্টারে পরিষ্কার চথো-বালি ব্যবহৃত হয় এবং সেই বালির স্তর ২½ ফুট হইতে ৩ ফুট গভীর হইলেই যথেষ্ট হইবে। বালিই ফিল্টার কার্য্যের প্রধান উপাদান। বালির উপর জল ঢালিয়া দিলে সমস্ত ভাসমান ময়লা বালির মধ্যে আটকাইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে বালির উপর আঠার ন্যায় একটি সূক্ষ্ম স্তর পড়ে। সেই স্তর শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবাণু দ্বারা গঠিত এবং

তাহা জলের অধিকাংশ জীবাণু আটকাইয়া রাখে বলিয়া ফিল্টারের জল বীজাণুশূন্য হইয়া থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ স্তর উৎপন্ন না হয়, তত দিন ফিল্টারের জল ব্যবহার করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে সেই বীজাণুরোধক স্তর এক ইঞ্চি আন্দাজ চাঁচিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, নচেৎ সেই স্তর ক্রমশঃ পুরু হইয়া যাইলে তাহার ভিতর জল সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। ১ ইঞ্চি হিসাবে ফুট খানেক বালি উঠান হইলে, তথায় নূতন তাজা বালি দেওয়া সুবিধাজনক। বালির উপর জলের উচ্চতা এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ফিল্টারের মধ্য দিয়া সহজে জল চলিয়া যায়। সেই উচ্চতা সাধারণতঃ ২ ফুট হইতে ৩ ফুট রাখা হয়। তদপেক্ষা অধিক উচ্চতার প্রয়োজন হইলে বালির উপরিভাগ ১ ইঞ্চি আন্দাজ চাঁচিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। জলের উচ্চতা ৩ ফুটের অধিক হইলে, তাহার চাপে জীবাণুরোধক আঠাল স্তর ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে জলশোধন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে না।

ফিল্টারের ছাঁকা জল কোন ঢাকা চৌবাচ্চায় সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় এবং খরচার জল তাহা হইতে আবশ্যকমত গ্রহণ করা হয়। যে চৌবাচ্চা হইতে সহরে জল সরবরাহ করা হয়, তাহা কোন উচ্চস্থানে নির্ম্মাণ করা সুবিধাজনক। তাহার উচ্চতা এরূপ হইবে যাহাতে সহরের সর্ব্বোচ্চ বাটীতেও জল যাইতে পারে। সেরূপ উচু জমী পাওয়া না গেলে কৃত্রিম উপায়ে উচ্চস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর ঢালা বা পেটা লোহার চৌবাচ্চা রাখা হয়। তাহা হইতে পাইপ বা নলের সাহায্যে ঘরে ঘরে জল বিতরিত হইয়া থাকে।

সুন্দরবনে শিকার

[শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে সময় আমাদের নৌকাটি সেই খালের অপর পারে আনয়ন করা হইল, সেই সময় আমরাও দুইটি বন্দুকের শব্দ করিলাম। তখন আমাদের সেই সহযাত্রীটি নৌকার আবাস-আবরণীর ভিতর হইতে বহির্দ্দেশে আগমন করিল এবং এতক্ষণ পরে তাহার মুখ হইতে প্রথম বাক্য নিঃসৃত হইল যে,—ব্যাঘ্রটী কি চলিয়া গিয়াছে? তখন আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি রহস্য করিয়া বলিল যে, না, এখনও সে এস্থান হইতে চলিয়া যায় নাই, সে এই নৌকার উপরই উপবিষ্ট আছে। তুমি ভিতরে অবস্থান কর।

যখন আমরা এইরূপ রহস্যালাপে ব্যস্ত, সেই সময় দূরে অথচ সেই খালের অপর পারে অকস্মাৎ বন্দুকের আওয়াজ শ্রবণ করিলাম। সেই বন্দুকের শব্দ শ্রুত হওয়াতে আমরা বলাবলি আরম্ভ করিলাম যে, এইবার তাহাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয়, তাহারা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথহারা হইয়া ঐদিকে যাইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে তোমরা এস্থান হইতে বন্দুকের প্রতিশব্দ করিয়া উহাদিগকে সাড়া দাও। উহারা ত তোমাদের এই সঙ্কেত প্রাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারিবে

সুন্দরবনের খাল

এবং সেই সঙ্গে আমাদের নৌকাও ঐদিকে বাহিত হউক। এইরূপ স্থির করিয়া প্রথমেই পর পর দুইটি বন্দুকের আওয়াজ করা হইল এবং নৌকাটির বন্ধনমুক্ত করিয়া সেই দিকে চালিত করা গেল; কিন্তু নৌকার মাঝি সকল অতি ভীতচিত্তে নৌকা বাহিতে আরম্ভ করিল। এদিকে আমরা তখন তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিবার জন্য এবং নৌকাটি নিরাপদ করিবার জন্য বন্দুকে গুলি পূর্ণ করিয়া নৌকার দুইদিকে দুইজন উপবিষ্ট হইলাম, এবং আমাদের অপর ব্যক্তি দুইটি আলোক প্রজ্বলিত করিয়া নৌকার আবাস-আবরণীর বহির্দ্দেশে আসিয়া উপবেশন করিল।

নৌকার বহির্ভাগে এই আলোক প্রজ্বলিত হওয়াতে নৌকা বাহিত হইবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। কারণ মাঝির চক্ষুর উপর আলোকের রশ্মি নিপতিত হইলে তাহার পক্ষে নৌকা উপযুক্ত পথে চালিত করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়। নদী-বক্ষে নৌকোপরি আলোক প্রজ্বলিত হইলে তাহার রশ্মিতে নদীস্থিত জলরাশি বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই কারণ রাত্রিকালে নৌকা চালাইতে হইলে অন্ধকারে গমন করাই নিরাপদ। এই সময় যদি আলোক জ্বালিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই আলোক নৌকার আবাস-আবরণীর মধ্যেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য, নচেৎ এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে সেই আলোকরশ্মি নৌকার কর্ণধারের চক্ষুর উপর পতিত না হয়।

আমাদের পূর্ব্বাবস্থা আগমন করাতে আমরা একটি আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া অপরটি ক্ষীণতর করিয়া নৌকার আবরণীর মধ্যে রক্ষা করিলাম। এদিকে আমরা স্থির করিলাম যে, আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমরা আমাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপনার্থে মধ্যে মধ্যে বন্দুকের শব্দ করিব এবং মধ্যে মধ্যে "সাই" (জঙ্গলের মধ্যে সঙ্কেতসূচক ডাক) দিব; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া নৌকা বাহিতে সুরু করিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই নৌকার ছাদে উপবিষ্ট আমাদের সেই সহযাত্রীটি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল, তোমরা এ কি করিলে, আলোক নির্ব্বাপিত করিলে কেন? আলোক পুনঃ প্রজ্বলিত করা হউক, নচেৎ আমাকে আমার গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হউক। তাহার এই অন্যায় বাক্য শ্রবণে হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইল এবং ক্রোধে বশীভূত হইয়া তাহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক স্থিরভাব অবলম্বন করিতে বলিলাম। আমরা তখন আমাদের পূর্ব্ব স্থিরীকৃত কর্ম্মপ্রণালী অনুসারে চলিতে লাগিলাম।

এদিকে তখন আকাশে চন্দ্রমার উদয় হইতেছে, তাহাতে ঘনীভূত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া চতুর্দ্দিকের সমস্ত স্থানই পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিবিড় অন্ধকারে আমাদের হৃদয় যেরূপ শঙ্কা-পূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোক-পাতে সে অবস্থা নিরাকৃত হওয়াতে কিঞ্চিৎ সাহস প্রাপ্ত হইলাম, এবং ক্রমশঃ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলও দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

এইরূপ প্রায় একঘণ্টা নৌকা বাহিয়া গমন করিবার পর একস্থানে উপস্থিত হইয়া যেমন "সাই" দিয়াছি, অমনই তাহারই প্রত্যুত্তরস্বরূপ আমাদিগের দক্ষিণ দিকে দূর হইতে "সাই"এর শব্দ শ্রবণ করিলাম। সেই শব্দ শ্রবণে আমাদের মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। আমরা তখন বলাবলি করিতে লাগিলাম যে, ইহারই নিকটে তাহারা কোন স্থানে অবস্থান করিতেছে, আর আমাদের অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই। এইস্থানে নৌকা বন্ধনপূর্ব্বক বন্দুকের একটি শব্দ করা যাউক এবং ঘন ঘন "সাই"

দিতে আরম্ভ করা হউক। তখন তাহাই করা হইতে লাগিল।

ওদিকে আমাদের বন্দুকের শব্দ হইবার পর তাহারাও একটি বন্দুকের শব্দ করিল, তদুপরি তাহাদের উচ্চারিত ঘন ঘন "সাই"এর শব্দও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমরা সেই শব্দ শ্রবণে মনে করিলাম, যদিও তাহারা আমাদের নিকট অবস্থান করিতেছে, তথাপি যদি আমাদের অবস্থিতির স্থান নির্দ্দেশ করিতে এক্ষণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে আবার বোধ হয় এই জঙ্গলের মধ্যে পথভ্রান্ত হইতে পারে। তাহাদের সেই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য উপায় অবলম্বিত হউক।

এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে নৌকার "লগি বাঁশ" (অর্থাৎ নৌকাকে ঠেলিবার জন্য কিম্বা কোন স্থানে নৌকা বন্ধন করিবার সময় মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহাতে বন্ধন করা যায়) এস্থলে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার মস্তকে একটি হ্যারিকেন আলো প্রজ্বলিত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হউক, আর একটি আলোক প্রজ্বলিত করিয়া নৌকার ছাদের উপর রাখিয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা দূর হইতে নৌকার স্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক নৌকায় আগমন করিতে সমর্থ হইবে। নৌকার উপর হইতে মুহুর্মুহু "সাই" দেওয়া হউক।

এই পরামর্শ হইলে সকলে তাহাতেই স্বীকৃত হইল। তখন সেই প্রণালী অনুসারে বংশদণ্ডে আলোক ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, নৌকার উপরও আলোক রক্ষিত হইল এবং অবিরত "সাই" দেওয়া হইতে লাগিল। আমাদের নৌকার মধ্যস্থিত 'সাই'এর শব্দানুযায়ী, জঙ্গলভূমি হইতেও "সাই"এর শব্দ শুনিতে লাগিলাম এবং ক্রমশঃ তাহা নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় রাত্রি যখন প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকা তখন জঙ্গলের মধ্য হইতে প্রথম বাক্য শ্রুত হইল, "বাবু, আপনারা কোথায় ?" সেই শব্দ শ্রবণে আমরা তৎক্ষণাৎ নৌকার আবাস-আবরণীর মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগকে নির্ভয় হইবার জন্য সমস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক বলিলাম, এই আমরা রহিয়াছি, কোন ভয় নাই, আলোকের দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়া আইস।

এইরূপে কিছু সময় অতিবাহিত হইলে দেখা গেল যে, সেই পৌষ মাসের নিদারুণ শীতে সর্ব্বশরীর কম্পিত এবং জলসিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় স্কন্ধের উপর একটি বৃহৎ মৃত হরিণের চতুষ্পদ বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া ঝুলাইয়া (বাঁকের ন্যায় করিয়া) সেই নৌকার নিকট নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমরা তদ্দৃষ্টে তাহাদের ক্লেশের বিষয় অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের নৌকাস্থ অপর

মৃত হরিণ

দুইজন মাঝিকে বলিলাম, তোমরা ত্বরিতগমনে তীরে উঠিয়া উহাদের নিকট হইতে হরিণটিকে লইয়া উহাদের শ্রম অপনোদনের উপায় কর। তাহারাও আমাদের বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ তীরে উঠিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে হরিণটিকে লইয়া নৌকায় আনয়ন করিল। তাহারাও সেই অবকাশে নৌকায় উপস্থিত হইলে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের শরীরে লিপ্ত কর্দ্দম ধৌত এবং সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে ও শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া গাত্রাবরণী দ্বারা গাত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক নৌকোপরিস্থিত চুল্লিতে অগ্নি প্রজ্বলনপূর্ব্বক তাহাতে কিঞ্চিৎ অগ্নি সেবন করিতে বলিলাম।

তাহারাও তখন আমাদের নির্দ্দেশমত সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিলে আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জঙ্গলের মধ্যে তাহারা কি অবস্থায় পতিত হইয়াছিল এবং আগমনের এরূপ বিলম্ব হইল কেন ?

তখন তাহারা আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "যখন আমরা নৌকা ত্যাগ করিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া হরিণের পদচিহ্ন অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, তখন ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থানে দেখিলাম, দুইটী মৃগ তথা হইতে অতি সত্বরই প্রস্থান করিয়াছে। তাহাদের টাট্‌কা পদচিহ্ন তথায় পতিত রহিয়াছে। সেই চিহ্ন দৃষ্টে বোধ হইল, তাহারা খুব বৃহৎ "শিংয়েল" অর্থাৎ লম্বা শৃঙ্গযুক্ত পুরুষজাতীয় মৃগ হইবে।

তখন আমরা সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে সুরু করিলাম। এইরূপে অনেক দূর গমন করিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সেই চিহ্ন তখন দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা দৃষ্টে আমরা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তাম্বিত অবস্থায় লক্ষ্য করিলাম যে, বামভাগের দিকে যেটী গিয়াছে সেইটীই খুব বৃহৎ এবং দক্ষিণমুখাবলম্বীটী কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হইবে, কারণ তাহাদের পদচিহ্নের দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

তখন সেই বড় মৃগটির লোভে সেই বৃহৎ পদচিহ্নের অনুগমন করিয়া বামদিকেই যাত্রা করিলাম। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এমন একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম যে, তথা হইতে আর সেই পদচিহ্ন ভালরূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইহার কারণ, সেই ভূমি উচ্চ এবং কঠিন তাহাতে পদচিহ্নের দাগ পতিত হইতে পারে না। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহার উপর দিয়া গমন করিয়াছিলাম, তাহা নিম্ন এবং সিক্ত সেইজন্যই পদচিহ্ন তাহাতে সুস্পষ্টভাবে পতিত হইয়াছিল।"

এইস্থলে সুন্দরবনের শুষ্ক ও সিক্ত ভূমির কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ সুন্দরবন জঙ্গলের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অপরিজ্ঞাত থাকিবে। আমরা প্রথমে যে ভূমির উপর দিয়া গমন করিয়াছিলাম, সেই নিম্নভূমি খুব প্রবল জোয়ারের সময় জলমগ্ন হইয়া যায়। সব দিনের জোয়ারের সময় জল তাহাতে উত্থিত হয় না। কারণ নদীর জোয়ারের তেজ তিথি অনুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

সুন্দরবনের মধ্যস্থিত নদীতে একাদশী তিথির পর হইতে যে জোয়ার আগমন করে, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতেই তাহার সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরে আবার তৃতীয়া তিথি হইতে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে হইতে নবমী দশমীতে একেবারে কমিয়া যায় এবং জল বৃদ্ধির সহিত নদীর স্রোতের বেগেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

এই কলিকাতার নিম্নে গঙ্গায় যে বান আসে যাহার বেগে সময় সময় সুদৃঢ় জেটীও ভগ্ন হইয়া যায় এবং বৃহৎ বৃহৎ নৌকাও জলমগ্ন হয়, তাহা অপর কিছুই নহে, তাহা ভাদ্রমাসের নদীর জোয়ার

আগমনের প্রথম প্রবলবেগ। ইহা অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতেই হইয়া থাকে। পঞ্চমী ষষ্ঠী তিথিতে এরূপ হয় না।

সুন্দরবন অঞ্চলে সেই কারণে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার সময় নদীর জলবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রায় সর্ব্ব ভূভাগই জলমগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে এরূপ উচ্চভূমি আছে যাহাতে ঐ সময়ও জল উঠিতে পারে না। সুন্দরবনের মধ্যে ভূমির এই উচ্চতাপ্রাপ্তিরও কারণ বর্ত্তমান। প্রথমে হয়ত কোন সময় প্রবল জোয়ারকালে ভগ্ন বৃক্ষাদি ভাসমান অবস্থায় আসিয়া ঐ স্থানে অবরুদ্ধ হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে সেইস্থানে জোয়ারের জল উঠিয়া তাহাতে পলি পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল। পরে এই পলিমৃত্তিকার দ্বারা তাহা উচ্চভূমিতে পরিণত হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জঙ্গলের মধ্যে এইরূপ স্থানেই ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুর আশ্রয়স্থল।

জঙ্গলের মধ্যে এইরূপ উচ্চ স্থানের মৃত্তিকা অতি কঠিন, তাহাতে পদচিহ্ন প্রায়ই অঙ্কিত হয় না। সেই উচ্চ ভূমি নানারূপ জীবজন্তুর পদচিহ্ন দ্বারা এরূপ হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার মধ্যে কোন্‌টী নূতন আর কোন্‌টী পুরাতন তাহা সব সময় ধারণা করিতে সক্ষম হওয়া যায় না।

যাহা হউক, অনেকক্ষণ জঙ্গলের বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই মাঝিদের বর্ণিত বিষয় বলা হউক। মাঝিরা তখন বলিতে লাগিল, "সেইরূপ স্থানে আগমন করিয়া যখন আর সেই মৃগের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে অপারগ হইলাম, তখন কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং সেই সঙ্গে হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, এরূপ একটি বৃহৎ মৃগ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হস্তচ্যুত হইবে তাহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? এই মৃগ শিকার করিয়া লইয়া বাবুদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলে তাঁহাদেরও বিশেষ আনন্দ হইবে এবং নিজেরাও তাঁহাদের নিকট শিকারীর সম্মান লাভ করিতে পারিব।

তখন এইরূপ নানা চিন্তায় পতিত হইয়া সেই স্থানের মৃত্তিকোপরি অঙ্কিত পদচিহ্ন সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে একদিকে বোধ হইল, তাহাতে যে অস্পষ্ট মৃগপদচিহ্ন রহিয়াছে তাহা একেবারেই নূতন। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, যাহা হইবার হইবে এই চিহ্নই অনুসরণ করিব। এখন আর দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া সেই পদচিহ্ন ধরিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলাম।

সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ চলিয়া যাইবার পর যখন পুনরায় নিম্নভূমির আর্দ্র মাটিতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম ইহা সেই পূর্ব্বোক্ত চিহ্নই বটে। এক্ষণে সেই পূর্ব্বপরিচিত চিহ্ন অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে সম্মুখে একটি খাল দৃষ্টিগোচর হইল। সেই সময় তাহাতে জোয়ার আগমনের নিমিত্ত জল বৃদ্ধি হইতেছে। সেই খালটী পার হইয়া যখন পরপারে উপস্থিত হইলাম, তখন আমাদের পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত হইয়া গেল। সেই অবস্থায় কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমরা মৃগটিকে দেখিতে পাইলাম।

অদৃষ্টচর হরিণটি সম্মুখে একটা ঝোপের ভিতর দণ্ডায়মান হইয়া লতা কিম্বা কোন অত্যুচ্চ বৃক্ষের শাখা চর্ব্বণ করিতেছে। তখন দূর হইতে তাহাকে গুলি করিলাম প্রথমে মনে হইয়াছিল, বোধ হয়, আমার গুলি ব্যর্থ হইয়া গেল, কারণ গুলি করিবামাত্র মৃগটি ঝোপে পলায়ন করিল। তদ্দৃষ্টে আমার সঙ্গীটি বলিল, বোধ হয় তোমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেই লক্ষ্যের স্থানটিকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আমরা দুইজন তথায় উপস্থিত হইয়া

ভাটার সময় খালের অবস্থা

দেখিতে পাইলাম যে, সেই স্থান রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে এবং মৃগের উদরমধ্যস্থিত জীর্ণ খাদ্য প্রভৃতি বহির্গত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তখন বুঝিতে পারিলাম যে গুলি ব্যর্থ হয় নাই, হরিণটি আহত হইয়াছে।

আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া আমরা সেই ভূমিতে পতিত টাট্‌কা রক্ত চিহ্ন ধরিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইলাম যে হরিণটি পলায়নের পরিবর্ত্তে ভূতলশায়ী হইয়াছে, কিন্তু হরিণটি তখন অবধি জীবিত রহিয়াছে। আমরা যে সময় হরিণটির নিকট উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়।

তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া বৃক্ষ হইতে বলার লতা কাটিয়া লইয়া তদ্দ্বারা মৃগটিকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলাম (বলা সুন্দরবনের মধ্যে একপ্রকার কঠিন লতা)। পরে একটি বৃক্ষশাখা কর্ত্তিত করিয়া তাহাতে মৃগটিকে ঝুলাইয়া স্কন্ধে বহন করিয়া আনিতে লাগিলাম।

এইরূপ অবস্থায় কিয়দ্দূর আগমন করিলে সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত খালটী জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমরা তখন সেই খাল পার হইবার অন্য কোন উপায় না পাইয়া কোনক্রমে সন্তরণযোগে তাহার পরপারে আসিয়া উপনীত হইলাম। সেই মৃত হরিণ লইয়া সেই খাল সন্তরণ-যোগে উত্তীর্ণ হওয়া যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না।”

(ক্রমশঃ)

চয়ন

নেপালের কাগজ

"নেপালেতে কাগজের মূল বস্তুহইতে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা যে অতিশয় দৃঢ় ও চিরস্থায়ি তাহা সংপ্রতি দৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কাল হইল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ব্যাঙ্ক নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে ইহার পুর্ব্বে প্রাপ্ত সকল কাগজহইতে তাহার উপরে শ্রেষ্ঠতমরূপে মুদ্রা হইয়াছে যদি ইহার মূল বস্তু প্রচুররূপে পাওয়া যাইত তবে তাহা এ দেশ-হইতে যে এক রপ্তানীর বস্তু হইত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা সে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন তাঁহারদের স্থানে আমরা শুনিয়াছি যে বর্ত্তমান কালে কাগজের যন্ত্রে যোগাইবার উপযুক্ত এই কাগজীয় বস্তু নেপালদেশে উৎপন্ন হয় না।

শণ যদি চূণেতে ডুবান না যায় এবং ঢেঁকির আঘাত যদি তাহাতে না হয় তবে তাহা হইতে উৎপন্ন যে কাগজ তাহা আমাদের দৃষ্টে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত বোধ হয় তাহা প্রায় পার্চমেণ্টের তুল্য শক্ত এবং কীটের অভেদ্য। কিন্তু তাহা এমত দৃঢ় যে তিসিজাত ছাঁট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয় তাহার তিনগুণ পরিশ্রম ইহা চূর্ণকরণে লাগে এই নিমিত্তে অধিক ব্যয় না হইলে সেই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না।"

[ভারতবর্ষ, বৈশাখ—১৩৩৮]

তুর্কীস্থানের সমরখণ্ডে সূর্য্যরশ্মি হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবার একটি যন্ত্র স্থাপিত হইতেছে। আনুমানিক ২১০ অশ্বক্ষমতার শক্তি ইহাতে দৈনিক সংগৃহীত হইবে।

মিঃ জে, কে, ডিকি অনুমান করেন যে, বিলাতে যে পরিমাণ কয়লা হইতে কোক্‌কয়লা প্রস্তুত করা হয়, তাহা আধুনিক যন্ত্রে কোকে পরিণত করা হইলে সমগ্র ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের আবশ্যকীয় গ্যাসের শতকরা ৭১ ভাগ গ্যাস ঐ প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত হইতে পারে।

অনুমান করা হইয়াছে যে, রুসদেশে বর্ত্তমানে ১১,০০০ জন জার্ম্মান, ৬০০০ জন মার্কিণ এবং ২৫০ জন ইংরাজ ইঞ্জিনীয়ার কাজ করিতেছে। দেশী লোককে এই বিদ্যা শিখাইয়া বিদেশীর স্থলে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে রুস গভর্ণমেণ্ট ১৯৩১ খৃঃ অব্দে ৫,৩০,০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিবার মনস্থ করিয়াছেন।

ভারতের কয়লার খনিগুলিতে আনুমানিক ৬৩০,০০০ লক্ষ টন কয়লা আছে; কিন্তু ইহার পাঁচ ভাগের চার ভাগ এত নীচে আছে যে, বর্ত্তমানে উদ্ভাবিত বা প্রচলিত উপায়দ্বারা উহা উত্তোলন করিবার খরচা

পোষায় না। আবার ঐ কয়লার মাত্র শতকরা ৭ ভাগ প্রথম শ্রেণীর কোক্ প্রস্তুতের উপযোগী।

উত্তর কেপ্ উপনিবেশে ৩৯৫ ফুট নীচে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩০ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে বিবরণীতে প্রকাশ যে, ছোট বড় বিবিধ প্রকারের ২৩,৫২৬টী রেলদুর্ঘটনা বৎসর মধ্যে ঘটিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ অব্দে ২৩,৪৬৮টী রেলদুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যে ৫০৬টীতে যাত্রী গাড়ীর পথচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং ৮৮টী গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। মালগাড়ীর পথচ্যুতি দুর্ঘটনার সংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ। গরু লাইনে পড়িয়া দুর্ঘটনা শতকরা ৩৯ ভাগ। বন্ধনী ছেঁড়ার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে শতকরা ১৩ ভাগ এবং কল বিকল হওয়ায় বা চালকের দোষে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে শতকরা ১৩ ভাগ।

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছে যে, মাদ্রাজ প্রদেশের নদনদীগুলি হইতে ৪ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ অশ্বক্ষমতার তড়িৎপ্রবাহ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

পুস্তক পরিচয়

"কৃষি-লক্ষ্মী"—গ্লোব নার্শরী হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্লোব নার্শরীর ন্যায় একটি পুরাতন বীজ ও বৃক্ষ ব্যবসায়ীদ্বারা এইরূপ একটি মাসিক পত্রিকা বহুপূর্ব্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। দেশের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে প্রত্যেকে তাঁহাদের নিজ নিজ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশবাসিগণকে দান না করিলে দেশের সম্যক্ উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নহে। নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে "কৃষি-লক্ষ্মী"র আবির্ভাব যে প্রকৃতপক্ষে দেশে কৃষি-লক্ষ্মীকে আনয়ন করিতে সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমরা কয়েকটী বন্ধুতে মিলিয়া খেয়ালের বশে কাগজখানা প্রকাশ করিয়াছি।" ইহা যে কত প্রয়োজনীয় খেয়াল, তাহা তাঁহারাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন। এইরূপ খেয়ালের বশে লর্ড ক্লাইভ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বহু বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানের পশ্চাতে এইরূপ দরদী খেয়ালী-দের আনন্দময় চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমই মাত্র সম্বল থাকে।

ইহাতে যে যে বিষয় ও প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের বহু বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল। কাজেই তাহার প্রত্যেকটীর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছুই নাই। পত্রিকার ছাপা ও কাগজ সুন্দর। পত্রিকার প্রকাশকগণ যদি প্রকৃত দেশের কল্যাণসাধনের পথ ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে দেশও তাহার কর্ত্তব্য ভুলিবে না। আমরা এই পত্রিকার বহুল প্রচার, অনন্তজীবন ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

সম্পাদকীয়

মাদ্রাজের নদনদী হইতে তড়িৎপ্রবাহ সংগ্রহের যে কল্পনা হইতেছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই প্রকার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, ভারতের প্রতি প্রদেশেই নদনদীর প্রবাহ হইতে তড়িৎ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই প্রকারে সংগৃহীত তড়িৎপ্রবাহ নামমাত্র মূল্যে শিল্পীদের কুটীরে কুটীরে সরবরাহ করিয়া নূতন করিয়া উন্নত প্রণালীর কুটীর-শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বড় বড় কারখানার আবহাওয়ায় মনুষ্যত্বের যে অবনতি ঘটে—যাহার প্রতিকারকল্পে মহাত্মা গান্ধী চরকার প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন—সেই অবনতির পথ রুদ্ধ হয়। কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য কারখানাজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় বাজারে দাঁড়াইতে হইলে শিল্পীর ঘরে ঘরে এইরূপে সস্তায় বিজলী সরবরাহ করিতে হইবে। পৃথিবীর কয়লা বা তৈলের ভাণ্ডার কোনও না কোনও দিন ফুরাইবে, কিন্তু জলপ্রবাহের এই শক্তি অফুরন্ত। এই শক্তি কাজে লাগাইলে বিদ্যুতের সাহায্যে রেল চলিবে, তাঁতী, কাঁসারী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, শাঁখারী সকলেরই ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আবার নানারূপ নূতন নূতন কুটীর-শিল্প গজাইয়া উঠিবে। বৈদ্যুতিক শক্তি চাষের জল তুলিবে আবার চাষীর ঘরে আলো পাখার আরাম দিবে। তবে গভর্ণমেণ্টকে এই ব্যবসায় হাতে লইতে হইবে। শক্তি উৎপাদন একটি মৌলিক কারবার। ইহা ধনিকের হস্তে না যাইয়া কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকাই ভাল।

এই পত্রিকার অন্যত্র স্থাপত্য-বিশারদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণপণা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা এ বিষয় আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীশবাবু প্রণীত "মডার্ণ ইণ্ডিয়ান আরকিটেক্চার"নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের দেশের একটি মহৎ দোষ এই যে, আমরা গুণীর গুণ উপলব্ধি করিতে একেবারেই সক্ষম নহি। যতদিন না দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী বিলাতের অথবা আমেরিকার সম্মান অর্জ্জনে সক্ষম হন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা দেশে অনাদৃত, এমন কি, সময় সময় অসম্মানিত হইয়া থাকেন। দেশে জীবনীশক্তি ও প্রাণের অভাব হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। শ্রীশবাবু অবিচলিত অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অফুরন্ত প্রাণশক্তি দ্বারা এই মৃত ও কঙ্কালসার স্থাপত্য-শিল্পকে মিউজিয়মের কবর হইতে উত্তোলন করিয়া সুন্দর অবয়ব দান ও ইহার সম্পূর্ণ সুন্দর দেহে প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

কলিকাতা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট, ত্রিপুরার মহারাজা এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান, রাজা, মহারাজা ও জমিদার তাঁহার দ্বারা কার্য্য করাইয়া তাঁহার গুণের প্রকৃত আদর করিয়াছেন। শ্রীশবাবুর আপ্রাণ চেষ্টায় ভারতে ও ভারতেতর দেশসমূহে ভারতীয় স্থাপত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মৌলিকত্ব সফলতার সহিত প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রয়োজন কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অনন্ত প্রয়োগ। আমরা আশা করি, অচিরেই ভারতের সর্ব্বস্থানে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প বক্ষে ধারণ করিয়া সহস্র সহস্র অট্টালিকা ও গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে এবং এইভাবে শ্রীশবাবুর চেষ্টা প্রকৃতরূপে ফলবতী হইবে।

পরিভাষা

Actual air—ব্যবহৃত বায়ু
Adhesion—আসঞ্জন
Catalist—জোটক, স্পর্শক্রিয় দ্রব্য
Co-efficient—গুণক
Cohesion—আশ্লেষণ, সংসক্তি
Combustion—দহন
Compound—যৌগিক পদার্থ
Compressibility—সঙ্কোচনশীলতা, সঙ্কোচ্যতা
Concave—কুব্জ, নতোদর
Condensation—ঘনীভবন
Dew-point—পরিষেকবিন্দু
Divisibility—বিভাজ্যতা
Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা
Element—মৌলিক পদার্থ
Excess air—অধিক বায়ু
General properties of matter—সাধারণ জড়ধর্ম্ম
Impenetrability—অভেদ্যতা
Inertia—স্থিতিপ্রবণতা, জড়ত্ব
Interference—ব্যতিকরণ
Inter-molecular space—অণুমধ্যবর্ত্তী অবকাশ
Ion—কণিকা (কণা)
Matter—জড়, দ্রব্য
Minimum—ন্যূনতম
Molecular attraction—আণবিক আকর্ষণ
Normal temperature and pressure—স্বাভাবিক উত্তাপ এবং চাপ
Observation—পর্য্যবেক্ষণ
Porosity—রন্ধ্রবিশিষ্টতা
Positive ion—যুক্ত তাড়িদ্বাহক কণিকা
Product of combustion—দহনোৎপন্ন দ্রব্য
Property—ধর্ম্ম
Refraction—তির্য্যগ্‌বর্ত্তন, (তির্য্যগ্‌গমন)
Solution—দ্রাবণ, দ্রব
Solvent—দ্রাবক
Solute দ্রাব্য
Spectroscope—রশ্মিনির্ব্বাচক যন্ত্র, রশ্মিবিশ্লেষক যন্ত্র
Weight—ভার, ওজন

শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট—"পুরাণ প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও
২৮এ, মহারাণী হেমন্তকুমারীর ষ্ট্রীট—"পথ কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ

নিবেদন

ও

বিবৃতি

যে দেশের যে ভাষা সেই মাতৃভাষায় কি জ্ঞানার্জ্জন কি কর্ম্মের বিষয়ে শিক্ষালাভ না করিলে তাহা কখনও উপযুক্ত ফল দান করে না। আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন জীবন পরিচালনা এবং জাতির উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু মাতৃভাষাতে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকাতে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে আধুনিক জ্ঞানলাভের এবং কর্ম্মজীবনের দ্রুত প্রসার হইবার উপায় নাই। জগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারের সকল তথ্যই যাহাতে অনায়াসে জাতির প্রাণে প্রাণে পৌছিতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক সকল প্রকারের কর্ম্মশালা দেশে স্থাপিত হইয়া দেশবাসীর প্রতিভা বিকাশের, নানা গুণপনা অধিকারের, নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টির ও পরিশ্রমের সফলতা দ্বারা গৃহে গৃহে নরনারীর আবশ্যক সম্পদ্ বৃদ্ধির পথ হইতে পারে, তাহার প্রয়োজন হইয়াছে।

জগৎ ও মাতৃভাষা

জাতির প্রয়োজন

কার্য্যকরী শিক্ষার এইরূপ পথই যে কোন জাতিকে সত্য প্রাণদান করিতে পারে। বঙ্গভূমিতে, এই পথের পরিচয় দানের নিমিত্তই এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা।

পরিষৎ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের জ্ঞান যাহাতে নর ও নারী, উচ্চ ও নিম্ন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই সমভাবে লাভ করিবার অধিকার ও সুযোগ পান এবং সেই জ্ঞান কাজে নিয়োগ করিয়া আত্মপালন এবং দেশসেবা ও জগতের সেবা করিতে পারেন—এই পরিষৎ তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

এইরূপ কার্য্যে সমগ্র দেশবাসীর সম্পূর্ণ প্রাণের যোগ পরিষৎ আশা করেন, এবং পরিষৎ তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত আহ্বান করিতেছেন।

পরিষদের আশা

১। এইজন্য দেশের সর্ব্বত্র পরিষদের শাখাসমূহ স্থাপিত হইবে।

২। নগরে, সহরে ও ক্ষুদ্রতম পল্লীতেও যাহাতে প্রত্যেকে এই পরিষদের সহিত যোগসূত্রে সংবদ্ধ হইতে পারেন এবং স্ব স্ব ইচ্ছা ও শক্তির উৎকর্ষকর কর্ম্মপ্রেরণা অথবা কর্ম্মের সুযোগ পাইতে পারেন, তদনুযায়ী উপায় করা হইবে।

রিষদের কার্য্যপ্রণালী

৩। **পরিষৎ** তাঁহার শিক্ষাবিভাগকে **জ্ঞানাগার** এবং **কর্ম্মাগার** এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। **বঙ্গীয় বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিজ্ঞান মন্দির** ও **কলিকাতা শিল্পবিদ্যাপীঠ** জ্ঞানাগারের অন্তর্ভূত এবং **বঙ্গীয় বিশ্বকর্ম্মশাল** কর্ম্মাগারের অন্তর্ভূত হইয়াছে। পরিষদের শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত বিজ্ঞান মন্দির ও বিজ্ঞান বিদ্যালয় সমূহ এবং কর্ম্মশালাসমূহ সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইবে।

পরিষদের শিক্ষাবিভাগ

৪। শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত **জ্ঞানাগারে**—শিক্ষাবিভাগের স্থাপিত সকল বিদ্যামন্দিরাদিতে সকল প্রকার অধ্যয়নার্থীর সাধারণ বিজ্ঞানশিক্ষা হইতে পরিষদের সর্ব্বপ্রকার সভ্যের উন্নততর ও উন্নততম চিন্তাধারা বিকাশের পথ প্রস্তুত হইবে, এবং দেশে কার্য্যকর যে কোন কিছুর প্রয়োজন, কিরূপে তাহার উদ্ভাবনা হওয়া সম্ভব তাহা বিচিন্তিত হইবে। জ্ঞানগারে একটি **গ্রন্থাগার**, একটি **গবেষণাগার**, একটি **আচার্য্য-সংগঠন-সঙ্ঘ** এবং একটি **পরিভাষা সঙ্কলন-সঙ্ঘ** থাকিবে। গবেষণাবিভাগে এই বিশিষ্টতা থাকিবে যে, দেশের কোনও উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্পন্ন অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত গুণী ব্যক্তিও যদি উচ্চতর চিন্তার সহায়তা চাহেন তবে সযত্ন সহায়তা পাইবেন এবং তাঁহার নৈপুণ্যের প্রয়োগ নিমিত্ত আবশ্যক হইলে, তিনি কর্ম্মাগারের পূর্ণ সাহায্য পাইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়,—বিদ্যা-মন্দির, বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি এবং গ্রন্থাগার, গবেষণাগার প্রভৃতি

৫। শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত **কর্ম্মাগারে**—প্রাচীন জগতের ও আধুনিক জগতের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রশিল্পের, সর্ব্বপ্রকার পদার্থের এবং বিবিধ শিল্পের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা, উদ্ধার, উৎপাদন ও উৎকর্ষের ব্যবস্থা হইবে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় বস্তু প্রস্তুত ও উহার উৎকর্ষের নিমিত্ত যাবতীয় আয়োজন ও প্রচেষ্টা হইবে।

কর্ম্মাগারের কার্য্য

এই উদ্দেশ্যে—

(ক) দেশের সর্ব্বস্থানে কর্ম্মিসমিতি স্থাপন এবং সেই সমুদয়ের পরিচালনের ব্যবস্থা থাকিবে। কর্ম্মিগণ স্থানীয় প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবেন এবং তদনুসারে কর্ম্মশালায় জিনিষ প্রস্তুত হইয়া সমুদয় কেন্দ্রে প্রেরিত হইবে।

(খ) স্থানীয় কি কি দ্রব্য কর্ম্মশালার প্রয়োজনে আসিতে পারে তাহার অনুসন্ধান ও সংগ্রহ কর্ম্মিসমিতি হইতে হইবে। এই উপায়ে দেশের সমস্ত প্রকার পদার্থ জাতীয় ঐশ্বর্য্যে পরিণত হইতে থাকিবে।

(গ) দেশে যে সকল কর্ম্মশালা স্থাপিত হইবে এবং যাহা পূর্ব্ব হইতেই আছে, সে সকলের সম্পর্কীয় যে কোন প্রকারের কার্য্যে যন্ত্রাদি প্রভৃতির যে কোন সাহায্য আবশ্যক, কর্ম্মাগারের অন্তর্গত বিশ্বকর্ম্মশাল হইতে ঐরূপ সকল সাহায্য প্রদান করা হইবে। এই উপায় দ্বারা সমস্ত দেশের ঐ প্রকার যাবতীয় কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত অল্পব্যয়ে নিয়ত নিরাপদ ও সচল থাকিতে পারিবে। কোন বৃহৎ ব্যাপারেও আবশ্যক হইলে, এই সব ক্ষেত্রে কর্ম্মাগার শিক্ষাবিভাগের অনুমোদনক্রমে তাহার সমস্ত শক্তি এবং উপযোগী সম্পত্তি দ্বারাও কর্ম্মশালার অন্তর্গত আচার্য্যশিল্পী-সংগঠন-সঙ্ঘের সহায়তায় দেশকে পরিপূর্ণ সাহায্য প্রদানে উন্মুখ রহিবেন। ইহাতে দেশের সকল কর্ম্মভবন ও কর্ম্মজীবন নিশ্চিন্তে দ্রুততর অগ্রগতি পাইবে।

দেশের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-সমূহ ও পরিষদের আচার্য্যশিল্পী সংগঠন-সঙ্ঘের যোগাযোগ

(ঘ) বিশ্বকর্ম্মশালায় একটি **আচার্য্যশিল্পী-সংগঠন-সঙ্ঘ** থাকিবে, কর্ম্মিগণ যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে যাহাতে হাতে হাতেই অধ্যাপনা শিক্ষা করিতে ও অধ্যাপনা করিতে পারেন তাহার উপযুক্ত সুবিধা সকল দেওয়া হইবে।

(ঙ) কর্ম্মাগার আবশ্যকমত একটি নিখিলবঙ্গ-কর্ম্মিসভা আহ্বান করিতে পারিবেন। দেশময় কর্ম্মিসমিতি সকলের প্রতিনিধিগণ উহার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিবেন। সেই সমস্ত আলোচনার ফল, কর্ম্মাগার-পরিচালকমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মাগারের ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারা নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত শিক্ষাবিভাগে প্রেরণ করিবেন।

নিখিলবঙ্গ-কর্ম্মি-সভা

(চ) কর্ম্মাগারের কর্ম্মক্ষমতা ক্রমোন্নত ও বিস্তৃততর হওয়ার নিমিত্ত দেশমধ্যে সর্ব্বত্র দ্রব্য-মন্দির, বাজার, মেলা ও প্রদর্শনীসমূহের ব্যবস্থা করা হইবে। শিক্ষাবিভাগের প্রস্তাবে, পরিষদের সাধারণ বিভাগ, কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির অনুমোদনক্রমে এই সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। সেগুলি যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহারও সম্যক্ চেষ্টা হইবে। এইগুলি দ্বারা দেশমধ্যে আত্মবোধ ও আত্মশক্তির উন্মেষ হইয়া দেশীয় দ্রব্যের প্রতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অন্তর যেমন সজীব হইয়া উঠিবে, তেমনই সকলেরই সর্ব্বপ্রকার অভাবপূরণের নানা পথ আবিষ্কৃত হইয়া সর্ব্বদিকে প্রসারিত হইবে। দেশ গৌরবযুক্ত ও সমৃদ্ধ হইবে।

দ্রব্যমন্দির, বাজার, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি

৬। **"পথ"** নামে পরিষদের একখানি মাসিক মুখপত্র কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির নির্ব্বাচিত মুখপত্র-বিভাগ নামক স্বতন্ত্র বিভাগ হইতে সম্পাদিত হইয়া, পরিষদের সাধারণ বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে উহার দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। এই মুখপত্রে পরিষদের উদ্দেশ্য, বঙ্গবাসীর কর্ম্মজীবনের নূতন গতিধারার নির্দ্দেশ, ঐ বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা, বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞানাদির প্রচার, সহজ বাঙ্গালায় এই সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধাদি, চিত্রাদি সমন্বিত

'পথ' মুখপত্র

হইয়া নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। জীবনসংগ্রামে প্রত্যেককেই পরিষৎ কি ভাবে সাহায্যের সূচনা করিয়াছেন, কি কর্ম্মী, কি জিজ্ঞাসু, সকলেই এই 'পথ' পাঠে তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

৭। দেশের কর্ম্মশক্তিকে জাগাইয়া উহাকে নানা কার্য্যের চেষ্টায় লিপ্ত করিতে ও প্রকৃত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য, পরিষৎ আরও বহুবিধ চেষ্টা করিবেন। অগৌণে দেশের মনের এবং গৃহের অন্ধকার যাহাতে দূর হয়, দেশবাসী গুণে, সম্মানে ও মানবধর্ম্মে নিত্য জয়যুক্ত হন ইহাই পরিষদের কাম্য। সমস্ত দেশবাসীর মনের কামনার উপরে ইহার ভিত্তি।

পরিষদের কাম্য

৮। পরিষদের উদ্দেশ্যান্তর্গত ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে কোন বিষয়ের আলোচনার জন্য পরিষদ্‌গৃহ সর্ব্বদা উন্মুক্ত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ

নিয়মাবলী

১। উদ্দেশ্য

বঙ্গীয় নরনারীকে আপন মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানপথে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুশীলনের সুবিধা দেওয়া ও পরিপূর্ণ কর্ম্মজীবনে প্রবৃত্ত ও উন্নত করা এই পরিষদের উদ্দেশ্য।

২। কর্ম্মক্ষেত্র

পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র বঙ্গদেশ।

(১) স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালার প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাবলম্বী অর্থাৎ স্বীয় ক্ষমতায় উপার্জ্জনশীল হইতে পারেন এবং তন্নিমিত্ত কর্ম্মজীবনে অন্ততঃ একটী না একটী গুণেরও অধিকারী হন, এবং যিনি গুণী তিনি যাহাতে নিত্য ক্রমোৎকর্ষের দিকে জীবনের গতি পরিচালনা করিতে নানারূপে সুযোগ পান, ইহার ব্যবস্থা করাই মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য।

(২) দেশের সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মিগণের সম্মিলনেব সুযোগ লাভে, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তথা-কথিত বাধা সকল অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব সমাজসঙ্গত মানবধর্ম্মপালনে ও স্বীয় শক্তির প্রয়োগে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে সকল প্রকার দুঃখের মুক্তির পথে নিত্য নব উন্নতি সাধন করিতে পারেন এবং জীবনের প্রকৃত গৌরব লাভ করিতে পারেন ইহাই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

(৩) পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্যানুসরণে, পরিষদের যাবতীয় বিষয়ের সাহিত্যই বাংলা ভাষায় রচিত হইবে এবং যাবতীয় কার্য্যাদি প্রধানতঃ বাংলা ভাষাতে নিষ্পন্ন হইবে।

৩। পরিষদের নাম

এই সভার নাম 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ' থাকিবে।

৪। পরিষদের অনুষ্ঠাতৃবর্গ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সমবায়ে ইহার অনুষ্ঠাতৃসভা গঠিত হইয়াছে।

(১) ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে, (সভাপতি)

(১) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, (সহ-সভাপতি)

(৩) ,, ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, (সহ-সভাপতি)

(৪) ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন

(৫) ,, যতীন্দ্রনাথ বসু

(৬) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(৭) „ শৈলেশ্বর সান্যাল
(৮) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(৯) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
(১০) „ সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (কর্ম্মসচিব)

সহকারী অনুষ্ঠাতাগণ

১। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মিত্র
২। „ সুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিশেষ মন্তব্য

(ক) অনুষ্ঠাতৃবর্গের আহ্বানে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দেশব্যাপী সভ্যগণের এক বার্ষিক মহাসম্মেলন হইবে, পরিষৎ তাহাকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান মহাসম্মিলনী বলিয়া অভিহিত করিবেন।

(খ) এই পরিষৎ পরিচালনের নিমিত্ত, অনুষ্ঠাতৃগণের অন্ততঃ ছয় জনের অনুমোদনক্রমে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নাম বঙ্গীয় বিজ্ঞান মহাসম্মিলনীতে উপস্থাপিত হইবে। গঠিত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যে কেবলমাত্র কোনরূপ গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই, অনুষ্ঠাতাগণ সাময়িক ভাবে পুনরায় ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫। পরিষদের সভ্যবৃন্দ

নরনারী নির্ব্বিশেষে, পরিষদের নিয়মাবলীর নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সমগ্রদেশের যে কোন ব্যক্তি পরিষদের সভ্য হইতে পারিবেন।

৬। বঙ্গীয় বিজ্ঞান মহাসম্মিলনী

(১) বৎসরে একবার অথবা বিশেষ প্রয়োজন হইলে, অন্য সময়েও, অনুষ্ঠাতৃগণের নির্দ্ধারিত কোন সময়ে ও স্থানে এই পরিষদের সমস্ত সভ্যগণের মিলনে বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-মহাসম্মিলনী নামে একটী মহাসভার অধিবেশন হইবে। অনুষ্ঠাতৃগণ ইচ্ছা করিলে এই মহাসম্মিলনীতে যে কাহাকেও আমন্ত্রণ ও আহ্বান করিতে পারিবেন।

আগামী ১৩৩৯ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-মহাসম্মিলনী আহ্বান করা হইবে।

(২) অনুষ্ঠাতৃসভা ইচ্ছা করিলে, মহাসভা আহ্বানের ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে সাময়িক-ভাবে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৭। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

১। বার্ষিক বিজ্ঞান মহাসম্মিলন পরিষদের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রস্তাবিত সভ্যবৃন্দ হইতে পরিষদের কার্য্য পরিচালনের জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নামে ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন করিবেন। তৎপূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠাতৃবর্গ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির যাবতীয় ক্ষমতা বর্ত্তমানে অনুষ্ঠাতৃ-সভাতে ন্যস্ত রহিয়াছে।

২। গঠিত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের যাবতীয় কার্য্যের একটী বার্ষিক বিবরণী মহাসম্মিলনীতে উপস্থাপিত করিবেন। ঐ বিবরণী অবলম্বনে ও মহাসম্মিলনীর আলোচনা ও নির্দ্দেশ ক্রমে পরবর্ত্তী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-প্রগতির নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উক্ত মহাসম্মিলনী কর্ত্তৃক প্রত্যেক বৎসরে নবগঠিত হইবে।

৩। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, অনুষ্ঠাতৃসভা-রচিত মূল বিধিকে রক্ষা করিয়া পরিষৎ পরিচালনার আবশ্যক যাবতীয় নিয়মাবলীর বিধান এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত আবশ্যক সমুদয় ব্যবস্থা করিবেন। প্রয়োজন বোধ করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অনুষ্ঠাতৃসভার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

মন্তব্য :—(ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যালয়ই পরিষদের প্রধান কার্য্যালয় হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, ইচ্ছা করিলে, সাধারণ বিভাগে কতক কার্য্যভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

(খ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্য ব্যতীত অন্য যে কোন ভদ্রমহোদয়কে এক বৎসরের জন্য বিভাগীয় পরিচালনা কার্য্যে মনোনীত করিতে পারিবেন। এই মনোনীত পরিচালক সংখ্যা প্রতি বিভাগে দুইটী পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

৮। বিভাগ

পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যসকলের সুষ্ঠুরূপে পরিচালন জন্য, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নেতৃত্বে পরিষদের তিনটী স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে।

(১) মুখপত্র বিভাগ
(২) সাধারণ বিভাগ
(৩) শিক্ষা বিভাগ

মন্তব্য :—(ক) প্রত্যেক বিভাগের পরিচালক-মণ্ডলী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গঠিত হইবে।

(খ) বিভাগীয় কোন কার্য্যের কোন নূতন বিস্তৃতি সম্বন্ধে, তত্তৎ বিভাগীয় মণ্ডলী, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

৯। কার্য্য-নির্ব্বাহ প্রণালী

(১) পরিষদের মুখপত্র বিভাগের সম্পাদক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক "পথ" নামে পরিষদের একটী মাসিক মুখপত্র সম্পাদিত হইবে।

(২) পরিষদের সাধারণ পরিচালক মণ্ডলী কর্ত্তৃক সাধারণ বিভাগে নিম্নলিখিত কার্য্য সমুদয় নির্ব্বাহ হইবে।

(ক) সভ্য সংগ্রহ

(খ) অর্থ-সংগ্রহ

(গ) কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতির সহকারী-স্বরূপ, পরিষদের হিসাব রক্ষা এবং উক্ত সমিতির নির্দ্ধারিত যাবতীয় সংগঠনীয় কার্য্য যেমন মেলা, হাট, প্রদর্শনী, সভা আহ্বান ইত্যাদির ব্যবস্থা ও সংরক্ষণাদি কার্য্য।

মন্তব্য :—এই বিভাগে নিম্নলিখিত উপবিভাগ সকল থাকিবে :—

(/০) মুখপত্র পরিচালন উপরিভাগ

(৵০) মুদ্রাযন্ত্র উপরিভাগ

(৶০) গ্রন্থাদিপ্রকাশ ও প্রচার উপবিভাগ

(৩) শিক্ষাবিভাগ পরিচালক মণ্ডলী কর্ত্তৃক শিক্ষাবিভাগের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। এই বিভাগ দুইটী স্বতন্ত্র ধারার অবলম্বনে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

(ক) জ্ঞানধারা

(খ) কর্ম্মধারা

জ্ঞানধারাতে নিম্নলিখিত কার্য্য সমূহ নিষ্পন্ন হইবে—

(/০) বঙ্গীয় বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যামন্দির, বিদ্যাপীঠ ও বিদ্যালয় সমূহের সংগঠন ও পরিচালন।

(৵০) গ্রন্থাগার (গ্রন্থ সংগ্রহ), সাহিত্যালয় (গ্রন্থ প্রণয়ন) ও গবেষণাগার সংগঠন ও পরিচালন।

(৶০) আচার্য্য-সংগঠন-সংঘ ও পরিভাষা-সঙ্কলন-সংঘ সংগঠন ও পরিচালন কর্ম্মধারাতে নিম্নলিখিত কার্য্যসমূহ নিষ্পন্ন হইবে।

মন্তব্য :—গবেষণা বিভাগের বিশেষত্ব এই থাকিবে যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়মে এই গবেষণাগারে শিক্ষাবিভাগ যে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞান ও কর্ম্মধারার যে কোন বিষয়ের গবেষণা কার্য্যের যাবতীয় সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

(/০) বঙ্গীয় বিশ্বকর্ম্মশালা কেন্দ্র এবং সমগ্র দেশে কর্ম্মশালা সমূহের স্থাপনা ও পরিচালনা।

(৵০) সমগ্র দেশ মধ্যে কর্ম্মিসমিতি সমূহের সংগঠন।

(৶০) আচার্য্য-শিল্পী-সংঘ সংগঠন ও পরিচালন।

মন্তব্য :—শিক্ষাবিভাগ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে জ্ঞানধারা ও কর্ম্মধারার অন্তর্গত শাখা সমূহ দেশ মধ্যে স্থাপন করিতে পারিবেন।

(৪) শিক্ষা বিভাগের উভয় ধারাতে নিম্নলিখিত উপবিভাগসকল থাকিবে।

(১) যন্ত্রাগার উপবিভাগ। (২) রসায়ন উপবিভাগ। (৩) পদার্থ-বিজ্ঞান উপবিভাগ। (৪) তড়িৎ উপবিভাগ। (৫) ভূতত্ত্ব ও খনিজ শিল্প উপবিভাগ। (৬) গণিতাদি উপবিভাগ। (৭) স্বাস্থ্য উপবিভাগ। (৮) চিত্রশিল্প উপবিভাগ। (৯) পূর্ত্তশিল্প উপবিভাগ। (১০) ভেষজ উপবিভাগ। (১১) পাত্রাদি শিল্প উপবিভাগ। (১২) স্থাপত্য শিল্প উপবিভাগ। (১৩) কৃষি-বিজ্ঞান উপবিভাগ। (১৪) নৌ-বিজ্ঞান উপবিভাগ। (১৫) জ্যোতির্বিজ্ঞান উপবিভাগ। (১৬) কুটীর শিল্প উপবিভাগ। (১৭) বিবিধ উপবিভাগ।

১০। কার্য্য নির্ব্বাহের উপায়

পরিষদের পৃষ্ঠপোষক প্রদত্ত অর্থাদি, অন্যান্য সভ্যপ্রদত্ত চাঁদার টাকা, সাধারণ অনুষ্ঠানাদি প্রদত্ত সাহায্য, "পথ" মুখপত্র ও প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং কর্ম্মশালা সমূহের লভ্য হইতে পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। এতদ্ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইচ্ছা করিলে সাময়িক কোন প্রকার ব্যবস্থা করিয়াও পরিষদের অর্থ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১১। কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থা

প্রতি বিভাগের পরিচালক মণ্ডলী নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য করিবেন।

(ক) বিভাগীয় সমুদয় নিয়ম প্রণয়ন করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে অনুমোদন জন্য উপস্থাপিত করিবেন এবং অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

(খ) বিভাগীয় সভার আহ্বান নিয়মিত ত্রৈমাসিক এবং আবশ্যকানুযায়ী সময়ে করিবেন ও তাহার বিবরণী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরণ করিবেন।

মন্তব্য :—(ক) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন ক্রমে ও বিভাগীয় পরিচালকমণ্ডলীর নেতৃত্বাধীনে ছাত্র ও ছাত্রী সভ্যগণকে সহকারীরূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকিবে।

(খ) প্রত্যেক বিভাগেই মহিলা সভ্যগণ সমানুপাতে পরিচালকরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

১২। কার্য্য পরিচালকমণ্ডলী

১। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রাপ্ত ক্ষমতানুযায়ী অনুষ্ঠাতৃবর্গের সভাতে মুখপত্র সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

(১) ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে

(২) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

(৩) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৪) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

(৫) শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া সাধারণ বিভাগ পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

(১) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার
(২) „ ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
(৩) „ গৌরীশঙ্কর মিত্র
(৪) „ সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী
(৫) „ কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

৩। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া শিক্ষাবিভাগ পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইল।

(১) ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দে
(২) „ হেমেন্দ্রকুমার সেন
(৩) শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার
(৪) ডক্টর শচীন্দ্রকুমার সেন
(৫) „ যতীন্দ্রনাথ বসু
(৬) শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ
(৭) „ ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
(৮) „ সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
(৯) „ গৌরীশঙ্কর মিত্র
(১০) „ সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
(১১) „ অনন্তকুমার দত্ত
(১২) „ নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

মন্তব্য :—প্রধান বিভাগত্রয়ের অন্তর্গত উপবিভাগ সমূহের সচিবমণ্ডলী প্রত্যেক প্রধান বিভাগ কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছে।

১৩। সভাধিবেশন ও সভার কার্য্য

১। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি প্রতিমাসে অন্ততঃ একটী সভার অধিবেশন করিয়া পরিষদের সমুদয় কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ও আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবেন।

২। প্রতি বিভাগ প্রতি তিন মাসে অথবা আবশ্যকানুযায়ী সময়ে স্বীয় সভাধিবেশন করিবেন এবং প্রতি দুই মাসে বা আবশ্যক মত সময়ে বিভাগের অন্তর্গত সকল উপ-বিভাগের সচিবগণের অথবা তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলন সভা আহ্বান করিবেন এবং উক্ত উভয় প্রকার সভার আলোচিত বিষয়ের বিবরণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে সপ্তাহকাল মধ্যে উপস্থিত করিবেন।

৩। প্রতি ছয়মাসে পরিষদের কর্ম্মিসমিতি সমুদয়ের একটী মিলনাধিবেশন হইবে। দেশব্যাপী কর্ম্মিগণ ঐ সম্মিলনীতে একত্রিত হইবেন এবং শিক্ষাবিভাগের নির্ব্বাচিত তিনজন মধ্যে অন্ততঃ দুইজন প্রতিনিধি এই সভাতে উপস্থিত থাকিবেন। প্রতিনিধিদ্বয়ের স্বাক্ষর সংযুক্ত এই সভার আলোচনার ফল,

কর্ম্মিসম্মিলনী, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে পক্ষকাল মধ্যে উপস্থিত করিবেন। তদনুযায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কোন নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে তাহা যথাযোগ্যভাবে করিবেন।

৪। প্রতি বৎসর অনুষ্ঠাতৃসভা অথবা উক্ত সভার ভারপ্রাপ্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের মহাসম্মিলন আহ্বান করিবেন। এই সভাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের কার্য্যের আলোচনা ও পরবর্ত্তী বৎসরের কার্য্যের সুব্যবস্থা করা হইবে।

৫। অনুষ্ঠাতৃবর্গের যে কোন তিন জনের মত হইলে অনুষ্ঠাতৃসভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অন্ততঃ একমাস সময়ের মধ্যে বিশেষ মহাসভার আহ্বানের নিমিত্ত উপদেশ দিতে পারিবেন।

৬। ভবিষ্যতে কোন অনুষ্ঠাতার স্থান পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ৪ জন সহকারী অনুষ্ঠাতা থাকিবেন। অনুষ্ঠাতৃগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা মনোনীত হইবেন।

৭। যদি কোন অনুষ্ঠাতা বা সহকারী অনুষ্ঠাতা পরিষদের কার্য্য পরিচালনে কোনও সময়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে অনুষ্ঠাতৃবর্গের সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের মতানুসারে তাঁহার স্থানে অন্য কোন অনুষ্ঠাতা নির্ব্বাচন করা যাইতে পারিবে।

১৪। পরিষদের বিশেষ বিভাগ

অনুষ্ঠাতৃসভার অভিলাষানুযায়ী, পরিষদের 'পরামর্শদাতৃ সভা' নামে একটী বিশেষ বিভাগ গঠিত হইয়াছে। এই বিভাগে তিন হইতে ছয়জন পরামর্শদাতা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে। পরিষদের সভ্য ব্যতীত কোন বিশেষ ব্যক্তিও এই সভার পরামর্শদাতৃরূপে মনোনীত হইতে পারিবেন।

পরিষৎ পরামর্শদাতৃ সভা

পরিষদের নিম্নলিখিত সভ্য সমবায়ে বর্ত্তমান পরামর্শসভা গঠিত হইয়াছে—

১। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

৩। অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহলানবিশ

১৫। পরিষদের কর্ম্মালয় প্রভৃতি

(ক) পরিষদের প্রধান কার্য্যালয় এবং প্রধান বিভাগত্রয়ের প্রধান কার্য্যালয় বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে অবস্থিত থাকিবে।

(খ) পরিষদের বিশ্বকর্ম্মশালা এবং নিখিল বঙ্গ কর্ম্মশালার প্রধান কার্য্যালয় পরিষদের নিকটবর্ত্তী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত কোন স্থানে, নগর মধ্যে বা নগর উপকণ্ঠে অবস্থিত থাকিবে।

(গ) বিশেষ বিশেষ শাখা কার্য্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ব্যবস্থা, প্রত্যেক বিভাগ স্বীয় ইচ্ছানুরূপ স্থানে করিতে পারিবেন।

(ঘ) একত্র তিনটী জেলার দ্বারা প্রস্তাবিত হইলে, পরিষদের একটি সম্মিলিত কেন্দ্র (মফঃস্বল কার্য্যকেন্দ্র, মফঃস্বল বিদ্যাকেন্দ্র ও মফঃস্বল কর্ম্মশালা কেন্দ্র) স্থাপিত হইতে পারিবে।

১৬। বিবিধ

(ক) পরিষৎ প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুইটী বিদ্যাগারের ও অন্ততঃ একটী কর্ম্মশালের নূতন স্থাপনার প্রয়াস পাইবেন। পূর্ব্বে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তি ও ইহার অন্তর্গত।
বর্ত্তমানে পরিষদের নিম্নলিখিত বিদ্যাগার ও কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে।

বিদ্যাগার

(১) কলিকাতা শিল্প বিদ্যাপীঠ (Calcutta Engineering College)
(২) কলিকাতা বিজ্ঞানমন্দির (Calcutta Science College)

কর্ম্মশাল

(১) কলিকাতা বিজ্ঞান রসশালা (Calcutta Science Laboratory)
(২) কলিকাতা শিল্পশালা (Calcutta Engineering Workshop)

(খ) পরিষৎ প্রতি বৎসর অন্ততঃ পাঁচখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশে প্রয়াস করিবেন।

গ্রন্থ

বর্ত্তমানে পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশ উপবিভাগে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রকাশার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

১। অজৈব রসায়ন (Inorganic Chemistry)
২। জৈব রসায়ণ (Organic Chemistry)
৩। তাপ (Heat)
৪। আলোক (Light)
৫। শব্দ (Sound)
৬। চুম্বক (Magnetism)
৭। তড়িৎ (Electricity)
৮। যন্ত্র বিজ্ঞান (Mechanics)
৯। গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি (Domestic Sanitation)
১০। গৃহ নির্ম্মাণোপকরণ (Building Materials)
১১। গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী (Details of Construction)
১২। স্থাপত্য বিদ্যা (Architecture)
১৩। স্থিতি বিজ্ঞান (Statics)
১৪। গতি বিজ্ঞান (Dynamics)
১৫। পরিমিতি (Mensuration)
১৬। ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)
১৭। ভূতত্ত্ব (Geology)
১৮। প্রাথমিক পদার্থ বিজ্ঞান (Elementary Physics)

(গ) পরিষৎ এক বৎসর অন্ততঃ কর্ম্মিসমিতি ও ১টী দ্রব্যমন্দির স্থাপনের চেষ্টা করিবেন।

৮। পরিষদ্ সভ্য।

পরিষদের সভ্যগণের নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্রেণী থাকিবে।

১। **পৃষ্ঠ-পোষক**ঃ—(১) যিনি পরিষদে এককালীন ১০০০৲ বা তদূর্দ্ধ টাকা অথবা ঐ মূল্যের কোন সম্পত্তি দান করিবেন তিনি পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হইবেন।

(ক) পরিষদের প্রধান সভ্যের সকল অধিকার ইঁহারা ভোগ করিতে পারিবেন।

(খ) পরিষদের জ্ঞানাগার ও কর্ম্মাগার বিভাগে ইঁহারা তিন বৎসরের জন্য একটী অনুমোদিত ছাত্রকে শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(গ) পরিষদ ইচ্ছা করিলে যে কোন পৃষ্ঠপোষককে উপাধি দ্বাব সম্মানিত করিতে পারিবেন।

২। **পরামর্শদাতা**ঃ—(১) প্রতি বৎসর উক্ত বৎসরের নিমিত্ত কোন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন এবং পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তিকে পরিষৎ পরামর্শদাতারূপে স্থির করিবেন। পরামর্শদাতাগণ পরবর্ত্তী বৎসর-সমূহেও পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

(ক) পরিষদের প্রধান সভ্যের সকল অধিকার ইঁহারা ভোগ করিবেন।

(খ) পরিষৎ ইচ্ছা করিলে ইঁহাদিগকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতে পারিবেন।

৩। **বিশিষ্ট সভ্য**ঃ—শিক্ষাকার্য্যে বা শিক্ষাকল্পে কিংবা বিশিষ্ট কর্ম্মে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এমন বিশেষ ব্যক্তিকে পরিষৎ মনোনয়ন দ্বারা বিশিষ্ট সভ্য করিতে পারিবেন।

(ক) পবিষদের প্রধান সভ্যের সকল অধিকার ইঁহারা ভোগ করিবেন।

(খ) পরিষৎ ইচ্ছা করিলে ইঁহাদিগকে উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিতে পারিবেন।

৪। **প্রধান সভ্য**ঃ—পরিষদের প্রধান সভ্যগণেব যে কোন একজনের প্রস্তাবানুযায়ী ও অনুষ্ঠাতা-গণের কোন একজনের অনুমোদনানুসারে পরিষদের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি পরিষদের প্রধান সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

(ক) পরিষদের প্রধান সভ্যগণ প্রথম বৎসর ৫০৲ টাকা ও পর বৎসর হইতে বার্ষিক ২০৲ টাকা হিসাবে চাঁদা দিবেন।

(খ) কোন প্রধান সভ্য এককালীন ৩৫০৲ টাকা অথবা তদূর্দ্ধ টাকা প্রদান করিলে তিনি পরিষদের জীবনব্যাপী সভ্য হইবেন।

(গ) পরিষদের জ্ঞানাগার বিভাগে যাঁহাদের গ্রন্থাদি এবং মুখপত্র বিভাগে প্রবন্ধাদি গৃহীত হইবে পরিষৎ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের যে কাহাকেও প্রধান সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। ইঁহাদের কোন চাঁদা দিতে হইবে না।

(ঘ) কর্ম্মাগারে যে কোন বিভাগে যিনি নূতন কোন বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিবেন তিনি কোন চাঁদা না দিয়াও সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন।

মন্তব্য ঃ—পরিষৎ ইচ্ছা করিলে যে কোন প্রধান সভ্যকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করিতে পারিবেন।

৫। **সাধারণ সভ্য ঃ**—পরিষদের যে কোন একজন সভ্যের প্রস্তাবে ও দ্বিতীয়ের অনুমোদনে যে কোন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ সভ্য হইতে পারিবেন।

(ক) সাধারণ সভ্য প্রথম বৎসর ২০৲ টাকা ও পর বৎসর হইতে বার্ষিক ১০৲ টাকা চাঁদা দিবেন।

৬। **সহায়ক সভ্য ঃ**—এই পরিষদের যে কোন একজন সভ্যের প্রস্তাবে ও অপর একজনের অনুমোদনক্রমে পরিষদের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বাৎসরিক দুই টাকা চাঁদা প্রদান করিয়া পরিষদের সহায়ক সভ্য হইতে পারিবেন।

(ক) সহায়ক সভ্য মধ্যে যাঁহারা স্বহস্তে ভূমি কর্ষণাদির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন কবেন তাঁহাদিগকে মাত্র অর্দ্ধ চাঁদা (অর্থাৎ বাৎসরিক ১৲ টাকা) দিতে হইবে।

৭। **ছাত্র সভ্য ঃ**—পদিষদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ও বার বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক কলেজ ও স্কুলের যে কোন ছাত্র এই পরিষদের একজন সভ্যের প্রস্তাবনায় ও অনুমোদন অনুসাবে ছাত্র সভ্য হইতে পারিবেন।

(ক) ছাত্র সভ্য বার্ষিক অগ্রিম ৫৲ বা মাসিক ॥০ হিসাবে চাঁদা দিবেন।

৮। **নারী সভ্য ঃ**—এই পবিষদের উদ্দেশ্যে সহানুভূতিপ্রাণা মহিলাবৃন্দ স্বেচ্ছানুসারে এই পরিষদের যে কোন শ্রেণীর পরিষৎ মহিলা সভ্য হইতে পারিবেন।

(ক) যে কোন কলেজ ও স্কুলের বার বৎসবেব উর্দ্ধ বয়স্কের যে কোন ছাত্রী যিনি এই পরিষদের সভ্য হইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি পরিষদের ছাত্রী সভ্য হইতে পারিবেন।